নামঃ (পরিবর্তন করতে হবে)

১. ফিরে দেখা (বিবর্তনে অতীত, বর্তমান)
২. পরিবর্তনের ধারায় সভ্যতা
৩. বিবর্তনের ধারায় মানব সমাজ
৪.শৃঙ্খলিত মানুষ, সমাজ ও সভ্যতা

“মুক্ত করো হে বন্ধ”

ড.মাহমুদ হাসান

উৎসর্গ

আমার পিতা ও মাতা আবদুল কাদের

ও মনসুরা খাতুন এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত,

যাঁরা আমাকে সবই দিয়েছেন,

কিন্তু আমি কিছুই দিতে পারিনি।

মুখবন্ধ

বিশ্বকে জানা ও তার কার্যকারণ অনুসন্ধান মানব প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত। সতীর্থদের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকার ফলে পৃথিবীর আর্থসামাজিক গতিধারা অনুধাবন ও বিশ্লেষণের চেষ্টা বিদ্যার্থী অবস্থা থেকেই। বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় এই বিষয়গুলিতে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তবে জীবনকালে বিশ্বের উত্তাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলী এ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ জাগরূক রাখে। বিশেষত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গত শতাব্দীর সত্তুর এর দশক থেকে মন্দায় রূপান্তরিত হওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতন এই আগ্রহে গতি আনে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ লাইওনেল রবিনস এর মতে বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মূল অতীতের ঘটনাবলীতে গ্রথিত। বর্তমান ঘটনাবলী বুঝতে হলে মানব সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিবর্তন সম্বন্ধে জানা অত্যাবশ্যক। এই বিষয়গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বইপত্র পাওয়া যায়। কিন্তু যারা বিশেষজ্ঞ না হয়েও এই বিষয়ে জানতে চান, তাঁদের জন্য বাংলায় বই পত্র খুব কম। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কন্যা ও জামাতার সাহায্যে আমি এই বিষয়ের ইংরেজী বই যোগাড় করতে পারি। পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশ লিখে নেওয়ার অভ্যাস আছে। এটা জেনে বন্ধুবর অধ্যাপক রুহুল আমিন প্রামানিক ও ডাঃ মাহমুদ হাসান এলটু লিখাগুলো বিন্যাস করে বই আকারে তৈরী করার জন্য প্রণোদনা দেন।

তথ্য বিশ্লেষণ করে অনেক বিশেষজ্ঞই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আমরা এমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন যা কখনো মানুষের ইতিহাসে ঘটেনি। সমস্ত পৃথিবীর আর্থসামাজিক অবস্থাও যে কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে তা খুবই দুর্বল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতনের পর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্থায়ী বলে অনেকেই মনে করছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্ব একের পর এক মন্দার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলির কোন কোনটির অর্থনীতির আকার ছোট হচ্ছে, কোন গুলিতে প্রবৃদ্ধি অনেক কম। রাষ্ট্রের মদদপুষ্ট কর্পোরেশন ও অর্থব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলির লাভ বাড়ছে, কিন্তু ব্যাপক জনগণের আয় কমছে। পণ্য চাহিদা বাড়ছে না, তাই বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। বিনিয়োগে লাভ বজায় রাখার জন্য পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থের বুদ্বুদ তৈরী করছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ দেখা যাচ্ছে না। অল্পসংখ্যক ধনশালী মানুষ, যারা সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা প্রচার মাধ্যমগুলোকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যবহার করছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোর মানুষ তাই পরিস্থিতির গুরুত্ব এখনও অনুধাবন করতে পারেনি। বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে সামগ্রিক তথ্য সম্বলিত বইএর অভাব আছে। কিন্তু বাস্তবতা সম্বন্ধে জানান পশ্চিমা দেশগুলিতেও দরকার, আমাদের দেশেও দরকার। আগামীতে পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক অধোগতির কারণে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল, এর প্রভাব সারা বিশ্বেই পড়বে। তাছাড়া এই পরিস্থিতির কারণে পুঁজিবাদী দেশগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানা অজুহাতে আগ্রাসন সৃষ্টি করে চলেছে। প্রতিরোধ সব জায়গায় গড়ে ওঠা প্রয়োজন, যার পূর্বশর্ত হচ্ছে সচেতনতা বাড়ান।

অল্প পরিসরে সবকিছু নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাই অনেক বিষয় ও কাল বাদ পড়েছে, কোনটা অল্প স্থান পেয়েছে। আমার বিবেচনায় যে গুলো গুরুত্বপূর্ণ তা বেশী স্থান পেয়েছে। ঘটনাবলীর তথ্য যথাসম্ভব নির্ভুল রাখার চেষ্টা করেছি। যথাসম্ভব সূত্র উল্লেখ করেছি। নিজস্ব মতামত না দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সব মতই বিশেষজ্ঞ ও লেখকদের বই থেকে (ক্ষেত্র বিশেষে ইন্টারনেট) নেওয়া। তবে অনেক বিষয়ে একাধিক মত আছে। সব ক্ষেত্রে সব মত উল্লেখ করা যায়নি। এই নির্বাচন আমার নিজের।

এই লিখা সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে। যাঁরা আরও জানতে চান তাদের জন্য গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া হয়েছে। পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি হলে এ প্রয়াস সার্থক মনে করব।

কৃতজ্ঞতা

বন্ধুবর অধ্যাপক রুহুল আমিন প্রামানিক ও ডাঃ মাহমুদ হাসান এলটুর অবদান অনেক। বই আকারে লিখার জন্য পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও, তাদের সঙ্গে আলোচনায় অনেক বিষয় বোঝা সহজ হয়েছে। তাঁরা লিখা পড়ে মতামতও দিয়েছেন। ডাঃ মাহমুদ হাসান এলটু মুদ্রাক্ষরে বিন্যস্ত ও ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়ায় অসীম শ্রম দিয়েছেন। আমার কন্যা ডাঃ সাফরিনা হাসান ও জামাতা কাজী ফয়সল ইসলাম প্রায় সব বই বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছে। এর মধ্যে কিছু পুরনো বই পাশ্চাত্যেও দুষ্প্রাপ্য। আমার স্ত্রী নূরুন নাহার গৃহে সংগৃহীত পুস্তকের স্তূপ মেনে নিয়েছে, যা তার সাংসারিক গৃহকর্মে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে আসছে।

প্রকাশক জনাব ---------- প্রকাশনার সমস্ত পর্যায় ধৈর্য্যের সঙ্গে উত্তরণ করেছেন তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সাহায্যে - যা ছিল অতুলনীয়।

গ্রন্থসুচি

ক্রমিক	অধ্যায়		পৃষ্ঠা
		মুখবন্ধ	--
১	প্রথম অধ্যায়	আদিম সমাজ ও শ্রেণী বিভাগের উৎপত্তি	২
২	দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাচীন যুগ:লৌহ ও সাম্রাজ্য	১৫
৩	তৃতীয় অধ্যায়	মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ	২৭
৪	চতুর্থ অধ্যায়	নবজাগরণ ও সংস্কার	৩৫
৫	পঞ্চম অধ্যায়	উপনিবেশের যুগ	৪১
৬	ষষ্ঠ অধ্যায়	শিল্প বিপ্লব	৫৫
৭	সপ্তম অধ্যায়	পুঁজিবাদের বিস্তার	৬৯
৮	অষ্টম অধ্যায়	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর	৮৬
৯	নবম অধ্যায়	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ার বিপ্লব	১০১
১০	দশম অধ্যায়	মহামন্দা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	১১১
১১	একাদশ অধ্যায়	বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে আমেরিকার পরিকল্পনা	১১৭
১২	দ্বাদশ অধ্যায়	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৩৮
১৩	ত্রয়োদশ অধ্যায়	বর্তমান যুগের ঘটনা প্রবাহ	১৪৯
১৪	চতুর্দশ অধ্যায়	ফিরে দেখা	১৬৯
১৫	পঞ্চদশ	গ্রন্থপঞ্জি	১৯৪

প্রথম অধ্যায়

আদিম সমাজ ও শ্রেণী বিভাগের উৎপত্তি

মানবজাতির শুরুর দিকঃ

আধুনিক মানব প্রজাতি (যা বিজ্ঞানে species নামে অভিহিত) হোমো সেপিয়েন্স (Homo Sapiens) species এর উৎপত্তি কমপক্ষে একলক্ষ বৎসরের আগে। এই প্রজাতির উৎপত্তি হয় প্রায় ৫০ লক্ষ বৎসর আগে আফ্রিকায় বাস করত এমন একটি ape প্রজাতি থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে। Ape রা হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে লেজবিহীন বানরদের একটা শাখা। এই ape প্রজাতি গাছে বসবাস করত। অজানা কারণে এরা গাছ থেকে নেমে মাটিতে বসবাস শুরু করে। আমাদের নিকটতম প্রজাতি শিম্পাঞ্জি এখনও গাছে বাস করে। এই প্রজাতি সোজা হয়ে দুই পায়ে ভর করে হাঁটাও আরম্ভ করে। মাটিতে জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য প্রাণীর চাইতে এই প্রজাতির একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রয়োজন আরও বেশি ছিল। হাতিয়ার তৈরী করে মাটি খুঁড়ে গাছের শিকড় জোগাড় করত। ছোট ছোট জন্তু শিকার করতে ও শিকারী জানোয়ারদের থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন ছিল সবাই একসঙ্গে কাজ করার। যারা এই সহযোগিতার পথে চলতে পারত না এবং এই সহযোগিতার সঙ্গে যে চিন্তাধারায় পরিবর্তন তা আত্মস্ত করতে পারত না, বিবর্তনের ধারায় তাদের সংখ্যা কমে আসত। যারা তা পারত তাদের সংখ্যা বাড়ত।

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে বিবর্তনের এই প্রক্রিয়া চলার ফলে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর সঙ্গে এই প্রজাতির genetic inheritance এ পার্থক্য হয়ে গেল। অন্যান্য প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মত শারীরিক পরিবর্তন বিবর্তনের মাধ্যমে অর্জন করে। যেমন শীতপ্রধান এলাকার প্রাণীর গায়ে ঘন পশম, হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার জন্য লম্বা পা, অনেক উপর থেকে শিকার খোঁজার জন্য তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিবর্তনের মাধ্যমে অর্জন করেছে। এ ব্যাপারে মানুষ কিছুটা পৃথক। মানুষের পূর্ব প্রজাতিগুলো বিবর্তিত হয়েছে এভাবে যেন তারা সব ধরণের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। শারীরিক দিক থেকে কোন বিশেষ পরিবেশে বাস করার জন্য পৃথক বৈশিষ্ট্য তারা অর্জন করেনি। বিভিন্ন পরিবেশে জীবন যাপন করার জন্য কতকগুলো বিশেষত্ব তারা অর্জন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাদের হাত এভাবে তৈরী যে তারা হাত দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতির জিনিষ ধরতে পারে। গলার স্বর ব্যবহার করে ভাষা তৈরী করে এবং অপরের সঙ্গে তথ্য ও ভাব আদান প্রদান করতে পারে। মস্তিষ্কের বিবর্তন হয়ে চিন্তাশক্তি অর্জন করে এবং চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুসন্ধান করে তা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতেও মানব প্রজাতি পারে। শিশুদের পূর্ণতা পেতে দীর্ঘসময় লাগার জন্য এই সময়ে আরেক প্রজন্মের মানুষেরা তাদের অর্জিত জ্ঞান পরের প্রজন্মের মানুষদের দিতে পারে এবং এইভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পূর্বের জ্ঞানের সঞ্চয় চলে যেতে পারে। প্রতি প্রজন্মেই কিছু নতুন জ্ঞান যোগ হয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। মানব মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীর চাইতে এই কারণে ভিন্নভাবে বিবর্তিত হয় ও বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। বিমূর্ত চিন্তা অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তু ও ঘটনা চোখের সামনে নাই সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে ও ধারণা করতে পারে। অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ভাষার ব্যবহার এবং একে অপরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখা এগুলোও মানব মস্তিষ্কে অন্যান্য প্রাণীর চাইতে অনেক বেশি উন্নত। বিবর্তনের ধারায় এইসব গুণাবলি অর্জন করে আধুনিক মানুষের আবির্ভাব সম্ভবতঃ প্রায় দেড় লক্ষ বৎসর আগে আফ্রিকায় হয়।

পরবর্তী ৯০ হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা দফায় দফায় আফ্রিকা থেকে অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় তারা মানুষের কাছাকাছি প্রজাতি নিয়েনডারথাল (Neanderthal) দের সরিয়ে দেয়। ষাট হাজার বৎসরের আগেই তারা মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছে বসতি স্থাপন করে এবং প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে তারা ইউরোপে পৌঁছায়। এই রকম সময়ে তারা কোনভাবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলি থেকে অস্ট্রেলিয়া যেতে সক্ষম হয়। কমপক্ষে ১২ হাজার বছরের আগেই মানুষ এশিয়া থেকে বেরিং সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকায় পৌঁছায়। অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থানে তারা ছড়িয়ে পড়ে। ছোট ছোট দলে তারা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করা শুরু করে। যোগাযোগ রাখা ছিল দুঃসাধ্য, তাই এই ছোট ছোট দলগুলি আলাদা ভাবে হাজার হাজার বছর ধরে জীবনযাত্রা চালাতে থাকে। ফলে তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, অর্জিত জ্ঞান ও ভাষা পৃথক হয়। এছাড়া চোখের রং, চুলের রং ও ত্বকের রং এর মত ছোট খাট বংশগত বৈশিষ্ট্যের

পার্থক্যও একদল থেকে আরেক দল অর্জন করে। কিন্তু Genetic inheritance বিভিন্ন দল গুলির মধ্যে একই থেকে যায়। এক স্থানের মানুষ ও আরেক স্থানের মানুষের যে জেনেটিক (Genetic) পার্থক্য ছিল তা একই স্থানের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্যের চাইতে কম ছিল। এক স্থানের মানুষ আরেক স্থানের মানুষের ভিন্ন ভাষা ও জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম ছিল এবং সব স্থানের মানুষের মধ্যে একই স্তরের বুদ্ধি বৃত্তি ছিল। কাজেই ভৌগলিক ভাবে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকলে মানুষ একই প্রজাতি ছিল। তাই একেক স্থানের মানুষ কিভাবে আচার-আচরণ, জ্ঞান ও জীবন যাত্রার পার্থক্য অর্জন করত তা নির্ভর করত পরিবেশের পার্থক্য ও সেই পরিবেশের সঙ্গে সেই স্থানের মানুষের খাপ খাওয়ানোর পদ্ধতির উপর, তাদের genetic গঠনের এর উপর নয়। এই খাপ-খাওয়ানোর পার্থক্যের উপরই নির্ভর করত একেক স্থানের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সামাজিক আচরণ। পৌরানিক কাহিনী ও অনুষ্ঠান সমূহের (myth and ritual) পার্থক্য সত্ত্বেও দশ হাজার বছর আগে পর্যন্তও বিভিন্ন স্থানের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকগুলো বিষয়ে মিল ছিল। এগুলো হল তাদের খাদ্য সংগ্রহ, আশ্রয়স্থান তৈরী করা ও পোষাক জোগাড় করার উপায়। এর কারণ ছিল তারা ফলমূল, বন্যপ্রাণী, মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করা ও ব্যবহার করার জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করত। এজন্য এই সমাজগুলোকে "hunter and gatherer" বা শিকারী ও সংগ্রাহক সমাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রাচীন আমলের সমাজ ব্যবস্থা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কয়েক শত বৎসর আগেও ছিল। এখনও অল্প কিছু জনগোষ্ঠী কোন কোন জায়গায় রয়ে গেছে। নৃবিজ্ঞানীরা, যেমন রিচার্ড লি, এই জনগোষ্ঠীগুলির পরিবীক্ষণ এর মধ্য দিয়ে মানুষ তার অস্তিত্বের শতকরা ৯০ ভাগ সময় কি ভাবে কাটিয়েছে সে সম্মন্ধে সম্যক ধারণা দিয়েছেন। পশ্চিমা পৃথিবীতে বহুকাল ধরে এ ধারণা চলে আসছিল যে প্রাচীন মানুষ ছিল বর্বর। মনে করা হত প্রাচীন মানুষ ছিল সভ্যতা সংস্কৃতি বর্জিত। জীবনযাত্রার সংগ্রাম ছিল কঠিন এবং একে অপরের সঙ্গে আচরণ ছিল সহিংস। গবেষণার ফলে এটা এখন স্বীকৃত যে আদিম মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে এই ধারণা সঠিক নয়।

বর্তমান পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, ক্ষুধা ও নিরক্ষরতার ফলে মানুষের দুর্দশা, ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ বিগ্রহ, লোভ ও হিংসা আমাদের পীড়া দেয়। সাধারণভাবে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে হিংসুক ও যুদ্ধংদেহী এবং এর মধ্য দিয়ে অসাম্যপ্রিয়তা আমাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক প্রচারণার ফলে। অসংখ্য প্রকাশনায় এই মত প্রচার করা হচ্ছে যে মানব প্রকৃতির কারণেই এই বৈষম্য ও হানাহানির উৎপত্তি। এটা মানব সমাজের শুরু থেকে চলে এসেছে এবং এর কোন বিকল্প নাই।

কিন্তু গবেষণা করে অতীত সম্বন্ধে যা জানা গেছে তা এই ধারণার বিপরীত। প্রত্নতাত্বিক আবিষ্কারসমূহ মানব সমাজের আদি পর্যায় সম্বন্ধে আলোকপাত করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব মানবগোষ্ঠী গত শতাব্দীর প্রথমভাগেও প্রাচীন পদ্ধতিতে জীবন যাপন করত তাদের পর্যবেক্ষণ করেও অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। এ সবের ভিত্তিতে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে,পাঁচ হাজার বছর আগে পর্যন্তও মানুষের সামাজিক জীবনে সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা, বৈষম্য ও নিপীড়ন মূল বৈশিষ্ট্য ছিল না। মানব জাতির ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্যগুলির আবির্ভাব এখন থেকে গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে এবং এ গুলোর কারণ মানব প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত নয়। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য মানুষের সামাজিক বিবর্তন হয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাধান্য পেয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হওয়ার আগে সামাজিক বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ছোট ছোট পারিবারিক গোষ্ঠীতে বাস করে এসেছে। এই গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল জমি এবং সম্পদের যৌথ মালিকানা, খাদ্য বন্টনে সমতা, সমঅধিকারের ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক।[১]

মানুষ বাস করত ৩০ থেকে ৪০ জনের গোষ্ঠীতে। মাঝে মাঝে কয়েকটি গোষ্ঠী মিলিত হত স্বল্পকালের জন্য। বর্তমান সময়ে উন্নত বা অনুন্নত বিশ্বে খেটে খাওয়া মানুষদের জীবনের চাইতে তাদের জীবন কঠিনতর ছিল না। গোষ্ঠীতে কোন শাসকও ছিল না, শ্রেণীবিভাগও থাকত না। কঙ্গোর বুতি পিগমীদের সম্মন্ধে টার্নবুল বলেন,"তাদের কোন গোষ্ঠীপ্রধান বা আনুষ্ঠানিক পরিষদ ছিল না। শৃংখলা রক্ষা ছিল সবার যৌথ দায়িত্ব। জীবন যাত্রার কোন কোন বিষয়ে এক একজনের নেতৃত্ব থাকত, কিন্তু সেটা তাদের সেই ব্যাপারে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার জন্য। জীবন ধারণের উপাদান সবাই সহযোগিতা করে সংগ্রহ করত"।[২] ফ্রিডল তার গবেষণার পর বলেন,"পুরুষ ও নারী সারাদিন কি কাজ করবে বা কিভাবে কাটাবে সেটা বাধ্যবাধকতা ছাড়া নির্ধারণ করত"।[৩] আরেকজন গবেষক লীকক বলেন,"ব্যক্তিগত কোন ভূসম্পত্তি ছিল না। শ্রমের

বিভক্তি শুধু এটুকুই ছিল পুরুষ ও মহিলাদের উপযোগী কাজের বিভাজন। গোষ্ঠীর মধ্যে কাজের বিভাজন হত ঐক্যমতের ভিত্তিতে। একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল উদারতার, স্বার্থপরতার নয়। সবাই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই জীবনযাত্রা চালাত"।[৪] কেউ খাবার যোগাড় করে আনলে অন্যদের না দিয়ে নিজে খেত না। লী আফ্রিকার কালাহারিতে কুং গোষ্ঠীর (যারা বুশম্যান নামেও পরিচিত) মধ্যেও একই বিশেষত্ব পেয়েছেন। যতগুলো মহাদেশে যতগুলো পরিবেশে শিকারী সংগ্রাহকদের সমাজ ব্যবস্থা দেখা গেছে সবগুলিতেই দেখা গেছে পারস্পরিক সহযোগিতাই সমাজের মূলনীতি।[৫] যুদ্ধ বিগ্রহ কখনোই প্রাধান্য পায়নি।

পারস্পরিক সহযোগিতার এই প্রাধান্য বাস্তব প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল। শিকারী সংগ্রাহকরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল ছিল। সংগ্রাহকরা ফলমূল সংগ্রহ করে খাবার এর মূল অংশ যোগান দিত। এটাই ছিল প্রতিদিনের খাদ্যের প্রধান উৎস। শিকারীরা মাঝে মাঝে প্রাণীর মাংস এনে এই খাদ্যে বৈচিত্র্য আনত ও সমৃদ্ধ করত। শিকার করা একজনের পক্ষে সম্ভব ছিল না- অনেকে মিলে করতে হত। সহযোগিতা ছাড়া এই গোষ্ঠীগুলোর টিকে থাকা সম্ভব হত না।[৬] নারীদের উপর পুরুষদের প্রাধান্যও ছিল না। কাজের বিভাজন ছিল ঠিকই। মেয়েরা সংগ্রাহক ছিল আর পুরুষরা ছিল শিকারী। এর কারণ মেয়েদের পক্ষে গর্ভধারণ করা ও শিশুপালন করার প্রয়োজনে শিকার করার সঙ্গে যে বিপদের ঝুঁকি থাকে তা নিতে দেওয়া হত না। তাতে সমস্ত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব হয়ে উঠত অনিশ্চিত। তবে গোষ্ঠীর সমস্ত সিদ্ধান্ত নারী পুরুষ মিলে সমবেত ভাবে নেয়া হত। যে ধারণা কেউ কেউ দেন যে "পুরুষ প্রাধান্য মানব সমাজে সহজাত"-তা সম্পূর্ণই ভুল।

প্রাচীন সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থান ছিল না। প্রায়ই একটি অঞ্চলের ফলমূল ও শিকার কমে গেলে পুরো গোষ্ঠীকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে হত। একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে না পারার জন্য বহন করার মত সামান্য কিছু ব্যক্তিগত জিনিষ ছাড়া আর কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাই গড়ে উঠেনি।

আমাদের প্রজাতির মানুষের ইতিহাস প্রায় দেড় লক্ষ বৎসরের। মাত্র দশ হাজার বৎসর আগে পর্যন্তও সংগ্রাহক-শিকারীর গোষ্ঠীগত জীবন ধারার যে চিত্র বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে নির্ধারণ করেছেন সেটাই ছিল মানুষের জীবন। স্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী কিছু পার্থক্য থাকলেও মানব জাতির সামগ্রিক চরিত্র ছিল এরকমই।

নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব

প্রায় ১০ হাজার বছর আগে মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটে। মানব প্রজাতির অস্তিত্বের প্রায় ৯০ শতাংশ ধরে (এক লক্ষ বছরেরও উপর) ছোট ছোট গোষ্ঠীর সমন্বয়ে মানুষ যেভাবে খাদ্য আহরণ, রীতি-নীতি, ও সামাজিক সম্পর্ক অনুসরণ করে আসছিল প্রথমবারের মত তার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। শত শত বৎসর লেগেছিল এই পরিবর্তন হতে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে এটা হয়। কিন্তু জীবন ধারার পরিবর্তন এর ফলে এতই ব্যাপক হয় যে এই পরিবর্তনকে অনেকে "বিপ্লব" বলে অভিহিত করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের Fertile Crescent বা উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতি স্থানে এটা প্রথম হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই স্থানটিতে বর্তমান প্যালেস্টাইন, লেবানন, দক্ষিণ তুরস্ক, উত্তর সিরিয়া ও ইরাকের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই স্থানে সেই সময় অনুকূল জলবায়ুর কারণে প্রচুর ফলমূল ও শিকার পাওয়া যেত। ফলে সংগ্রাহক এবং শিকারী গোষ্ঠীরা একই স্থানে থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য পেত। তাই একটি জনগোষ্ঠী কিছুদিন পরিশ্রম করেই সারা বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত এবং এটা অনেক বছর ধরেই পারত। অন্যান্য সংগ্রাহক-শিকারী গোষ্ঠীর মত তাদের খাদ্যের সন্ধানে কিছু সময় পর পর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যেতে হত না। ফলে তারা ধীরে ধীরে স্থায়ী বাসস্থান তৈরী করল।[৭] খাদ্য সংগ্রহ করে মাটি বা পাথরের পাত্রে জমা করে রাখা শুরু করল ও পাথরের যন্ত্রপাতির উন্নতি করতে থাকল। জনসংখ্যার দিক থেকে এক এক স্থানে আগের ৩০-৪০ জনের বদলে তখন কয়েক শত মানুষ এক স্থানে বসবাস করা শুরু করল।

একসময় এই স্থানের জলবায়ু বদলাতে থাকে এবং আরও শুষ্ক ও ঠান্ডা হয়। ফলমূল ও শিকার কমে যায় এবং এইসব সংগ্রাহক ও শিকারী, কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এই সব জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। একটি ছিল আবার আগের মত খাদ্যের সন্ধানে কিছুদিন পর পর একস্থান থেকে আরেক স্থানে চলতে থাকা।

কিন্তু শত শত বৎসর একই স্থানে থাকার ফলে তারা তাদের এই জীবন যাত্রার কৌশল ভুলে গেছিল। দ্বিতীয় পথটি ছিল একই স্থানে থেকে খাদ্য সরবরাহ বাড়ানো। বাস্তব প্রয়োজন থেকে তারা দ্বিতীয় পথের চেষ্টা শুরু করেছিল।

এইসব জনগোষ্ঠীর মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বনে পাওয়া ফলমূল সংগ্রহ করতে থাকায় গাছপালা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়ে গেছিল। তখন তারা এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এমন সব গাছ-গাছড়া নিজেরা লাগানো শুরু করল যেগুলো তারা জানতো ভাল পরিমাণে খাবার দেবে। সময়ের সাথে সাথে তারা আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করল যে রোপন করলে কোন ধরনের বীজ থেকে ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং সেগুলো তারা পরবর্তীতে ব্যবহার করতে থাকলো। এই ভাবে এই গোষ্ঠীগুলো ফলমূল সংগ্রাহক থেকে উৎপাদকে পরিণত হয়। কৃষিজাত ফসল নিয়মিতভাবে পাবার ফলে তারা ভেড়া, ছাগল, গরু, গাধা এই সব জন্তুদের মধ্যে যেগুলো অপেক্ষাকৃত ভাবে অনুগত সেগুলোকে আটকে রেখে পালন করা শুরু করল। এভাবে পশুপালন শুরু হল। প্রথমদিকে কৃষি কাজ হত জঙ্গলের গাছ কেটে ফেলে যে টুকু অবশিষ্ট থাকত তা পুড়িয়ে ফেলা হত, তারপর ফসল বোনা হত। বছর কয়েক পর জমির উর্বরতা কমে গেলে এই জমি ছেড়ে দিয়ে নতুন জঙ্গল পরিষ্কার করা হত। খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বদলে যাবার ফলে জীবনধারাও বদলে গেল। মানুষকে তার ফসলের যত্ন নেওয়ার জন্য জমির কাছাকাছি বাস করতে হত। জমিতে ফসল বোনা, আগাছা পরিষ্কার, পানি দেওয়া, ফসল তোলা, ফসল জমা রাখা, ভাগ-বাটোয়ারা করা, শিশুদের দেখাশোনা করা এসব কাজ একজন করতে পারত না, একে অপরকে সাহায্য করতে হত। এই নতুন জীবনযাত্রা থেকে নতুন আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও গল্পগাঁথা চালু হলো। এটাকেই নব্যপ্রস্তর যুগের 'বিপ্লব' বলা হয়েছে।

নব্যপ্রস্তর যুগের পরিবর্তন শুরু হওয়ার হাজার হাজার বছর পরেও শাসক বা কোন শাসনকর্তা দেখা যায়নি। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগেও "সম্পদের বন্টনে সমতার অভাব" ছিল না এবং সমাজে শ্রেণীবিভাগ তেমন অগ্রসর হয়নি।[৮] পুরুষদের প্রাধান্যও তখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমাজ বিবর্তনের এই স্তরে বিগত শতাব্দীতে যে সব জনগোষ্ঠী পৃথিবীতে পাওয়া গেছে ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও এই সব বৈশিষ্ট্য সব গোষ্ঠীরই ছিল।[৯] প্রতিটি গৃহ সম্পূর্ণ সমাজের অংশ ছিল। সমাজে প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্মন্ধে সচেতন ছিল এবং পালন করত। যাদের খাদ্য কম থাকত যে গৃহে বেশী থাকত তারা দিত। সম্মান বেশি ছিল যাদের কম তাদের সাহায্য করায়, নিজে ভোগ করায় নয়।[১০]

নব্যপ্রস্তর যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। সংগ্রাহক-শিকারী সমাজে প্রায় সময়ই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন হত। শিশুদের বহন করে নিতে হত, তাই বহন করতে হয় এরকম একজনের বেশি শিশু একই সময়ে পালন করা সম্ভব ছিল না। তিন-চার বছর পর পর শিশু জন্মই ছিল নিয়ম। গর্ভপাত বা শিশু হত্যার দ্বারা হলেও শিশুর সংখ্যা কম রাখা হত। স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু হলে বেশি ছেলে-মেয়ে পালন করা সম্ভব হত এবং প্রয়োজনও দেখা দিল। বেশি মানুষ জঙ্গল কাটা, কৃষিকাজ ও উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করত। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়তে থাকল। এই হার খুব বেশি না হলেও (০.১ শতাংশ প্রতি বছর) বহু সহস্র বছর ধরে এই বৃদ্ধি মানুষের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। নব্যপ্রস্তর যুগের শুরুতে পৃথিবীর মোট অনুমিত জনসংখ্যা এক কোটি থেকে বেড়ে পুঁজিবাদের শুরুর সময় ২০ কোটিতে পৌঁছায়।

আরও একটি বিরাট পরিবর্তন হয় নব্যপ্রস্তর যুগে। সংগ্রাহক-শিকারী সমাজে গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্বেষ দেখা দিলে পৃথক মতাবলম্বী দল ছেড়ে চলে যেত। অনেকে জড়িত থাকলে দল দুই ভাগ হয়ে আলাদাভাবে জীবনযাত্রা শুরু করত। একই স্থানে বসবাসকারী নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজে নিয়োজিত মানুষদের মধ্যে বিরোধী পক্ষের কৃষি জমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বসতির আকার হল বড়, মানুষের সংখ্যাও হল বেশি, কাজের পরিধি ও প্রকৃতিও আগের চাইতে জটিল হল। কর্মকান্ড চালানোর জন্য সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও মতবিনিময় আরও দরকার হয়ে উঠল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও পদ্ধতি তৈরী হল। বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পরিষদ সৃষ্টি হল। আরও একটা বিরাট পরিবর্তন হল। কৃষিভিত্তিক সমাজে শস্য মজুত থাকত। এতে আক্রমণ করে অন্যান্য গোষ্ঠীর শস্য লুট করার ঘটনা ঘটতে থাকল। যুদ্ধ বিগ্রহ সংগ্রাহক-শিকারী সমাজে ছিল বিরল-তা এখন প্রায়ই হতে থাকল। দলগত সংগঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ কারণেও প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

পরবর্তী কয়েক হাজার বছরে পৃথিবীর কয়েকটি জায়গায় পৃথকভাবে মানব গোষ্ঠী শিকারী সংগ্রাহক ব্যবস্থা থেকে কৃষি ভিত্তিক সমাজে পরিবর্তিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে মধ্য আমেরিকা (বর্তমান মেক্সিকো ও গুয়াতেমালা), দক্ষিণ আমেরিকার এন্ডিজ পর্বতাঞ্চল, আফ্রিকার কয়েকটি স্থানে, ইন্দোচীনে ও পাপুয়া-নিউগিনিতে। এই সমাজগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে প্রাচীন কালের সমাজ ব্যবস্থা যে ভাবে পরিবর্তন হয়েছিল এগুলোর পরিবর্তন একই ভাবে হয়েছে।[১১] তবে বিভিন্ন স্থানে পৃথক ধরণের গাছপালা ও প্রাণী থাকার কারণে পরিবর্তনের ধারায় কিছুটা বিভিন্নতা দেখা যায়। এ থেকে বলা যায় যে, কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর এমন কোন বিশেষ প্রতিভা বা শ্রেষ্ঠত্ব ছিলনা যার দ্বারা তারা মানবগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন স্থানে মানবগোষ্ঠী পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য একই ধরনের বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়েছে। ছোট ছোট ভ্রাম্যমান গোষ্ঠীগুলো ধীরে ধীরে একই স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী বড় জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এই স্থায়ী জনগোষ্ঠীসমূহ ছিল আরও দৃঢ় স্তরে সংগঠিত, তাদের আচরণ বিধি ছিল আরও নিয়ন্ত্রিত এবং তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহ ও কাহিনী সমূহ ছিল আরও বিশদ।

কোন কোন স্থানে জলবায়ুর প্রতিকূলতা, উপযুক্ত গাছপালা ও প্রাণীর অভাব এইসব কারণে কোন কোন গোষ্ঠী কৃষিকাজ শুরু করতে পারেনি। তারা শিকারী সংগ্রাহকই রয়ে গেল।[১২] তারা হাজার হাজার বছর ধরে এইভাবে জীবনযাপন করতে থাকে। কোন কোন গোষ্ঠী পরবর্তীতে অন্যান্য গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে ক্রমে কৃষি সমাজে রূপান্তরিত হয়। যেসব গোষ্ঠী কৃষি কাজ শুরু করেনি তারাও কৃষি সমাজের সংস্পর্শে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। কোন কোন গোষ্ঠী শুধু পশুপালনই জীবনধারনের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে। ব্যবহারিক জিনিসপত্রের আদান-প্রদান পারস্পরিক কাজে লাগে। জন্তু-জানোয়ার থেকে উৎপাদিত পণ্য (যেমন-চামড়া), মাছ এগুলোর বদলে খাদ্যশস্য, কাপড় পশুপালক গোষ্ঠী কৃষিজীবীদের সঙ্গে বিনিময় করত। কখনও কখনও পশুপালক গোষ্ঠীরা সুযোগ পেলে কৃষি ভিত্তিক জনপদে আক্রমণ করে লুটপাটও করত।

কৃষিভিত্তিক জনপদ ও পশুপালক-এই দুই গোষ্ঠীতেই এক একজন ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত এবং অন্যদের চাইতে অধিক সম্মান পেত। কখনও কখনও এই সমস্ত ব্যক্তি গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে গণ্য হত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গোষ্ঠী প্রধান বংশানুক্রমে হত। কিন্তু অন্যদের শ্রমের ফল গোষ্ঠীপ্রধান ভোগ করেছে এ রকম এই সমাজগুলিতে দেখা যায়নি। যারা প্রধান হিসেবে গণ্য হত ও সম্মান বেশি পেত, তারা বরং সমাজের জন্য অন্যদের চাইতে বেশি কাজ করত। দূর্বলদের সাহায্য করা ও নিজের উৎপাদন থেকে যাদের কম থাকত তাদের সাহায্য করাই ছিল এই সমাজ ব্যবস্থাগুলোর বৈশিষ্ট্য। রিচার্ড লী এ সম্পর্কে বলেন, "গোষ্ঠী প্রধান অন্যদের কাছ থেকে যা পেতেন তার বেশির ভাগই অন্যদের মধ্যে বিতরণ করতেন। গোষ্ঠী প্রধানের ক্ষমতা সমাজের সংগঠন ও জনমত দিয়ে সীমিত থাকত"।[১৩] যেসব কৃষি ভিত্তিক সমাজ পরবর্তী কালেও টিকে ছিল ও পর্যবেক্ষণ করা গেছে তাতে এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে। দক্ষিণ আমেরিকার "নাম্বিকাওরা"দের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল দানশীলতা। গোষ্ঠী প্রধান সব সময় প্রস্তুত থাকত তার উদ্বৃত্ত খাবার, কাজ করার হাতিয়ার, অলঙ্কার ইত্যাদি গোষ্ঠীর কোন একজন বা একটি পরিবারের প্রয়োজন হলে তা দিয়ে দেওয়ার জন্য। তাতে এমনও হত যে গোষ্ঠী প্রধানকেই বেশি কষ্ট করতে হত। নিউগিনির 'বুসামা' জনগোষ্ঠীর নেতাকে অন্যদের চাইতে বেশি কাজ করতে হত সবার চাহিদা পূরণ করার জন্য।[১৪]

নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষের পরিবর্তন হল। মানুষ কৃষি কাজ শুরু করল এবং স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলল। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আরেক গোষ্ঠীর যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু পরবর্তী সমাজগুলোর কতকগুলো বিশেষত্ব তখনও দেখা দেয়নি, যেমন সমাজে শ্রেণীবিভাগ,একটি স্থায়ী রাষ্ট্রযন্ত্র যা পরিচালনা করে আমলারা, অস্ত্রবাহী বাহিনী ও মেয়েদের অধীনস্ত করা। এগুলো এসেছে আরো পরে যখন নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লবের সঙ্গে যোগ হল নগরায়নের বিপ্লব।

সভ্যতার শুরু (The First Civilization)

নগর সভ্যতার ইতিহাস মাত্র ৫ হাজার বছরের। এগুলোর চিহ্ন পাওয়া যায় মিশর ও মধ্য আমেরিকার পিরামিডে, মহেনঞ্জোদারো ও হরপ্পার সাজানো শহর গুলিতে, ইরাকের "সিগুরাট" গুলিতে, ক্রিট দ্বীপের নেসোসের প্রাসাদে। নগর সভ্যতা যারা শুরু করল তারা মাত্র কয়েক পুরুষ আগে সাধারণ কৃষিকাজ ছাড়া আর কিছু জানত না। অথচ যখন তারা নগর তৈরী করা শুরু করল, বড় বড় পাথর চাক কেটে তা নগর পর্যন্ত নিয়ে আসা, ইমারত তৈরীর জন্য পাথর প্রস্তুত করা এবং অনেক জায়গায় পাথর খোদাই করে সুন্দর নকশা বানানো, এগুলোর দক্ষতা তারা অর্জন করেছিল। মেসোপটেমিয়া, মিশর,

চীন, ইথিওপিয়া ও মধ্য আমেরিকায় তারা অক্ষর আবিষ্কার করে পাথরে মনের ভাব লিখেছিল। এই সময়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মানুষ টিন ও তামা সংগ্রহ করতে শিখল। এরপর এই দুই ধাতু মিশিয়ে ব্রোঞ্জ নামে একটি ধাতু তৈরী করল-যা তুলনামূলকভাবে শক্ত ছিল। ব্রোঞ্জ দিয়ে হাতিয়ার ও অলংকার তৈরী হত। এই যুগকে সেজন্য 'তাম্রযুগ' ও 'ব্রোঞ্জযুগ' বলা হয়।

জীবন যাত্রার প্রয়োজনেই এই আবিষ্কারগুলো হয়। আদিম কৃষি ছিল প্রকৃতিতে পাওয়া শস্য খুবই সাধারণ কৃষি-হাতিয়ার দিয়ে উৎপাদন করা। উৎপাদন হত কম। জনসংখ্যাও বাড়ছিল। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ফসল কম হলে দুর্ভিক্ষ হত।[১৫] খাদ্যাভাব হলে অন্য এলাকার জনগোষ্ঠীর সঞ্চিত খাদ্য লুট করার জন্য হামলা করা হত। এভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ বাড়তে থাকল। যুদ্ধের প্রয়োজনে উন্নত ধরনের অস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দিল। পাথরের তৈরী ছুরি ও কুঠার এর উন্নতি হল। আবার অন্যদিকে খাদ্যাভাব এড়ানোর জন্য উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থাও চলতে লাগল। যেসব জনগোষ্ঠী উৎপাদন বাড়াতে পারল তারাই টিকে থাকল।

কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ন নানা ভাবে করা হল। শস্যের জাত উন্নয়ন করা ও গৃহপালিত প্রাণীর জাত উন্নয়ন করা আগেই শুরু হয়েছিল। এরপর আসল পালিত পশু (প্রথম দিকে ষাঁড়) জমি চাষ দেওয়ায় ব্যবহার করা-যা আগে মানুষ পাথরের কোদাল দিয়ে করত। ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে জমিকে জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা করা এবং শুষ্ক জায়গায় দেওয়ার জন্য পানি জমিয়ে রাখাও মানুষ শিখে নিল। জমিতে সার হিসেবে জন্তুর গোবর ব্যবহার শুরু হল। আস্তে আস্তে আরও জটিল পদ্ধতিও চালু করা হল। এর মধ্যে রয়েছে পাহাড়ের গাছ কেটে কেটে স্তরে স্তরে চত্বর (terrace) বানিয়ে তাতে চাষ করা, পানির জন্য কূপ খনন করা, জলাভূমির পানি সেঁচে চাষযোগ্য করা ইত্যাদি।

নতুন পদ্ধতিগুলোর ফলে সমাজের কাজকর্মের ধারা বদলাতে লাগল। জমি চাষ দেওয়ার মত ভারী শারীরিক পরিশ্রম পুরুষদেরই উপযুক্ত হওয়ায় নারীরা এ কাজ থেকে বাদ পড়ল। বাঁধ তৈরী, জমি সেচ দেওয়া এগুলোতে অনেক মানুষ লাগত ও পরিকল্পনারও প্রয়োজন হত। পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার জন্য কিছু মানুষ নিয়োজিত হল তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য। খাদ্য জমা রাখার ব্যবস্থা করা হল। মজুত খাদ্যের দেখাশোনা, হিসাব রাখা ও বিতরণের জন্য কিছু মানুষ প্রয়োজন হল। খাদ্য উৎপাদন বাড়ার ফলে কিছু খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকতে লাগল। এতে মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম কিছু মানুষের পক্ষে কৃষিকাজ না করে যুদ্ধের প্রস্তুতি, হস্তশিল্প ও অন্যান্য জনপদের সঙ্গে জিনিসের আদান-প্রদান, এই ধরনের পেশায় নিয়োজিত থাকা সম্ভব হল।

উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য জমা রাখার জন্য উঁচু জায়গায় একটা বড় ঘরের ব্যবস্থা করা হত। সমাজের স্থিতি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হয়ে দাঁড়াল এই শস্যের ঘর। এই শস্যের ঘর দেখাশোনা, শস্যের হিসাব রাখা ও বিতরণের কাজ যারা করতেন তারা হয়ে দাঁড়ালেন বিশেষ সম্মানের পাত্র। ক্রমে ক্রমে তারা আলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মানুষ মনে করতে লাগল। এভাবে শস্য গুদামগুলোই আদিম যুগের প্রথম মন্দির ও এর রক্ষকরা প্রথম পুরোহিত হলেন।[১৬] সময়ের সাথে সাথে এই শস্যগুদামকে ঘিরেই বিভিন্ন কর্মকান্ড শুরু হল। খাদ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা, খাদ্যের বদলে অন্যান্য জিনিষের আদান-প্রদান এই ঘরকে ঘিরেই শুরু হল। হস্তশিল্পীরাও এখানেই তাদের কাজের জায়গা করে নিল। শত শত বৎসর ধরে এই ভাবেই গড়ে উঠল গ্রাম থেকে শহর। মেসোপটেমিয়া, মিশর, চীন, ইত্যাদি অঞ্চল যেখানে প্রথম এই প্রক্রিয়া শুরু হয় তার প্রায় আড়াই হাজার বছর পর মধ্য আমেরিকায় ঠিক একই প্রক্রিয়া ঘটে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।[১৭]

আরও একটা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন এই সময় হয়। মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য আমেরিকা দুই অঞ্চলেই এটা ঘটে। যারা শস্য রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণের কাজে নিয়োজিত থাকত এবং যারা সময়ের সাথে সাথে পুরোহিতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন, তারা শস্যের হিসাব রাখার জন্য পাথরের গায়ে দাগ কেটে রাখা শুরু করলেন। বহু বছর ধরে চলতে চলতে এই দাগগুলো বিশেষ শস্য বা বিশেষ মাপের সূচক হিসাবে একটা বড় অঞ্চলে স্বীকৃত হল এবং প্রমিত বলে ধরে নেওয়া হল। কোন শস্য বা একটি বিশেষ মাপ যে শব্দ দ্বারা পরিচিত ছিল দাগ বা চিহ্নগুলো সেই শব্দের পরিচায়ক হয়ে গেল। এইভাবে শুরু হল লিখা। পুরোহিতদের হাতে ছিল সময়। তারা চাঁদ-তারাদের পর্যবেক্ষণ করে এগুলোর গতি সম্বন্ধে আগেই বলতেন

এতে মানুষের মধ্যে তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা বাড়ত। তারা বর্ষপঞ্জিও তৈরী করত ও ফসল বোনার সঠিক সময় ঠিক করে দিতে পারত। এর থেকেই শুরু হল জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র, এবং এটা সম্ভব হল উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকার কারণে।

মেসোপটেমিয়া ও মধ্য-আমেরিকায় হস্তলিপি আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু হওয়ার পর যে সমস্ত জনগোষ্ঠী এদের সংস্পর্শে আসল, তারা এটা গ্রহণ করে তাদের নিজেদের চিহ্ন দিয়ে ব্যবহার করা শুরু করল। এইভাবে ৫০০০ বছর আগে লিখিত ভাষার ব্যবহার মধ্যপ্রাচ্য থেকে সমস্ত এশিয়া, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল।

শিকারী সংগ্রাহক সমাজ থেকে কৃষি ভিত্তিক সমাজে পরিবর্তন সম্পূর্ণ আলাদাভাবে পৃথিবীর কয়েকটি স্থানে ঘটে। কোন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী বা স্থান এর দাবীদার এটা ঠিক নয়। সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রয়োজনের কারণে মানুষ কয়েকটি স্থানেই এই উন্নয়ন ঘটায়।

সমাজে শ্রেণী বিভাগের উৎপত্তি

মানব সমাজের যাত্রা শুরু থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে পর্যন্ত কাজে বিভক্তি থাকলেও সমাজ শ্রেণী বিভক্ত ছিল না। অর্থাৎ কোন এক শ্রেণীর মানুষ আরেক শ্রেণীর উপর কর্তৃত্ব করত না বা তাদের শ্রমলব্ধ ফল নিজেরা নিয়ে নিত না। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগের উৎকীর্ণ লিপি সংবলিত ফলকে প্রথম নারী দাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। তার কিছু কাল পরে পুরুষ দাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। এরপর থেকেই "পূর্ণ নাগরিক" ও "অধস্তন মানুষ" এই বিভাজনের সমার্থক পরিভাষা দেখা যায়।[১৮] শ্রেণী বিভাগের পরিষ্কার প্রমাণ এই সময়কালেই পাওয়া গেছে। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের এশনুনা (Eshnunna) নামক স্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদরা পেয়েছেন প্রধান রাস্তার সাথে বড় বাড়ী গুলো প্রায়ই ২০০ বর্গমিটার বা তারও বেশি এলাকা জুড়ে। কিন্তু বেশিরভাগ বাড়ীর এলাকা ছিল অনেক ছোট-৫০ বর্গ মিটারের বেশি নয়।

সভ্যতার শুরু মানুষের ইতিহাসের একটা বড় ধাপ বলে মনে করা হয়। কিন্তু যে সমস্ত স্থানে সমাজ পরিবর্তন হয়েছিল সেই সমস্ত স্থানে কতকগুলি নেতিবাচক দিক দেখা যায়। এগুলি হল, সমাজে শোষণভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তি। এক শ্রেণীর মানুষের শ্রমের ফল ভোগ করে আরেক শ্রেণীর মানুষ এভাবেই দাস প্রথার শুরু করল। আরও দেখা গেল সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর শাসন সমাজে চাপিয়ে দেয়ার জন্য অস্ত্রধারী বাহিনী তৈরী এবং রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যান্য উপাদানের উৎপত্তি। এই পরিবর্তন মেসোপটেমিয়া ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে দেখা গেছে।

মেসোপটেমিয়ার সভ্যতায় দাস-দাসীদের শ্রমের ফল দাস মালিকেরা আত্মসাৎ তো করতই-কিন্তু এর চাইতে বেশি লাভজনক ছিল অধীনস্ত শ্রেণীর কৃষকদের বিনাপারিশ্রমিকে অথবা খুব কমপারিশ্রমিকে খাটান। এদের উচ্চ শ্রেণীর মানুষের জমিতে অথবা পুরোহিতদের জমিতে চাষের কাজ, খাল কাটার কাজ এগুলি করানো হত। বিনিময়ে বছরের চার মাস কোন রকমে প্রাণ ধারণের যোগ্য মজুরী দেওয়া হত এবং একখন্ড চাষ করার জমি দেওয়া হত।[১৯] অথচ এই শ্রমজীবী শ্রেণী একসময় স্বাধীন কৃষক ছিল। অন্য শক্তিশালী গোষ্ঠী বিশেষতঃ পুরোহিতদের চাপে তারা অধস্তন কৃষকে পরিণত হয়েছিল।

শ্রেণীগত শোষণ বাড়তেই থাকল। মেসোপটেমিয়ার "লাগাশ" (Lagash) নামক স্থানে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২১০০ শতাব্দীতে বারটি বা তার কিছু বেশি উপাসনালয় বেশিরভাগ কৃষি জমির মালিক ছিল। উৎপাদন খরচ হত ফসলের অর্ধেক। চার ভাগের একভাগ ছিল রাজার খাজনা। বাকী চার ভাগের একভাগ পেত পুরোহিতরা।[২০]

মানুষের পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর হাজার হাজার বৎসর ধরে মানবমন্ডলীর মাঝে যে সামাজিক কাঠামো ছিল তা অপরজনকে শোষণ করার সুযোগ দেয় নাই। এই সময় কেন শোষণ প্রক্রিয়া শুরু হল? কেনই বা শোষিত মানুষ এটা মেনে নিল? মানব সভ্যতার হাজার হাজার বৎসরের যে ইতিহাস পাওয়া গেছে তা থেকে নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, এই আচরণ মানব প্রকৃতিতে আপনা-আপনি আসে নাই।[২১]

মানুষ শুরু থেকেই জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করে আসছে এবং সর্বকালেই নতুন ও উন্নত পদ্ধতিতে তা করার চেষ্টা করেছে। পদ্ধতি পরিবর্তন হলে সমাজে একজনের সঙ্গে আরেকজনের সম্পর্কও বদলাতে থাকে। পরিবর্তনের এক পর্যায়ে সবাইকে এই নতুন পদ্ধতি মেনে নিতে হয়। জীবনযাত্রার পদ্ধতির পরিবর্তনের এক পর্যায়ে শ্রেণী বিভাগ তৈরি হয়।

পরিবর্তনের এই পর্যায়ে, অর্থাৎ কৃষি উৎপাদনে এসে একটি মানবগোষ্ঠী যা উৎপাদন করত তার এক অংশ উদ্বৃত্ত থাকত। প্রয়োজন দেখা দিল উৎপাদনের কাজগুলো সমন্বয় করার ও উদ্বৃত্ত জিনিষ জমা রাখা, কিভাবে খরচ করা হবে তা ঠিক করা ও হিসাব রাখা। এই প্রয়োজনে কিছু মানুষ প্রত্যক্ষ উৎপাদনে অংশ না নিয়ে এই কাজগুলো করতে শুরু করল। কিন্তু উৎপাদন তখনও এত বাড়ে নাই যে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত থাকত। অনাবৃষ্টি, শস্যে পোকা লাগা এসব কারণে খাদ্য সংকট প্রায়ই সৃষ্টি হত। ক্ষুধার্ত মানুষ উদ্বৃত্ত খেয়ে ফেলতে চাইত। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য উদ্বৃত্ত রাখতে হত। যারা সংগ্রহশালা রক্ষণাবেক্ষন করত তাদেরকে উদ্বৃত্ত রাখার জন্য জোর প্রয়োগ করতে হত। ক্ষুধার্ত মানুষকে দিয়ে কাজ করাতেও হত। এইভাবে এই শ্রেণীর মানুষ সমাজের অন্যান্য মানুষের উপর কর্তৃত্ব খাটানোর সুযোগ পেল। সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে তারা অন্যান্য মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল। কৃষিকাজ যতই বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে লাগল, ততই নিয়ন্ত্রকদের ভূমিকা বাড়তে থাকল। কৃষির প্রক্রিয়া পরিবর্তন যেমন, সেচের পানি বন্টন, জঙ্গল কেটে নতুন কৃষি জমির পত্তন ইত্যাদির জন্য আরও সংগঠন ও নেতৃত্ব প্রয়োজন হত, যা এই নিয়ন্ত্রকেরা দিত। এইভাবে একে একে এই শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা বাড়ল। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে এই শ্রেণীর হাতে লুটপাটের সম্পদও সঞ্চিত হত। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে। মানব সমাজ ক্রমেই প্রকৃতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েছে। কিন্তু এর ফলে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ যারা সংখ্যায় কম, তারা সমাজের বাকী অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছে। ক্রমে এই নিয়ন্ত্রণ সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে অন্য শ্রেণীকে শোষণের ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তবে এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজন হল শক্তির। ক্ষুদ্র এই শ্রেণী সমাজের বাকী অংশকে শোষণ ও শাসন করার জন্য ক্রমে গড়ে তুলল রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার সঙ্গে অস্ত্রবাহী একদল মানুষ, যারা শাসক শ্রেণীর আজ্ঞাবহ। তারা তৈরী করল আইন কানুন যার দ্বারা অন্যান্য শ্রেণীকে আবদ্ধ রাখা যায়।

ধর্মবিশ্বাস শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গঠিত হওয়ার আগেও ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা অতি প্রাকৃত শক্তি নিয়ন্ত্রণ করত বলে মনে করা হত। শ্রেণী বিভাগ শুরু হওয়ার পর এই বিশ্বাসকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া শুরু হল। শোষক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল তাদের নিয়ন্ত্রণকে দৃঢ় করার জন্য। এইভাবে এক গোষ্ঠী মানুষ যাদের উৎপত্তি হল সমাজের অগ্রগতির কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য যারা তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে শাসক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হল। তবে এই সময়েও জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। উৎপাদন সমষ্টিগতভাবেই করা হত। কিন্তু উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ চলে যেত মুষ্টিমেয় শাসকের হাতে। মধ্য আমেরিকায় আজটেক ও ইনকা সভ্যতায় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত এই প্রথা চলে এসেছিল।[২২] এশিয়া ও ইউরোপে কৃষিভিত্তিক সমাজ চালু হওয়ার পর ক্রমেই জমির উপর ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়- যদিও এটা অনেক শতাব্দী ধরে অনেক সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে রূপ নেয়।

নারী বৈষম্য ও অবদমন (Oppressor)

সমাজের প্রকৃতির পরিবর্তন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সব জায়গায়ই নারীর সামাজিক অবস্থান বদলে যায়। তারা মানব সমাজের শুরু থেকে হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষদের সঙ্গে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে সমান অংশগ্রহণ করত। কিন্তু কৃষিভিত্তিক সমাজে তারা ক্রমেই পুরুষের উপর নির্ভরশীল ও অধীনতার পর্যায়ে চলে আসল। এই অধীনতার রূপ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম ছিল। কিন্তু যেখানেই শ্রেণী বিভাগ দেখা দিল সেখানেই নারীর ভূমিকা হল অধস্তনের। এটা এতই বিস্তার লাভ করল ও স্থিতিশীল হল যে, বর্তমান কালেও প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে নারীর অধস্তন ভূমিকা মানব প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটা একেবারেই সঠিক নয়।

এই পরিবর্তন নিহিত ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে।[২৩] সংগ্রাহক ও শিকারী সমাজে নারীদের খাদ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা গর্ভধারণ, মাতৃদুগ্ধ দান ও শিশু পালনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কৃষিকাজ শুরুর প্রথম দিকেও এটা সম্ভব ছিল। কিন্তু লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ শুরু, গরুর পাল দেখাশোনা করা এগুলো কঠিন হয়ে পড়ল। যেসব সমাজে নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে এসব কাজ করতে থাকল তাদের জন্মহার কমে গেল ও গোত্রের জনসংখ্যা কমতে থাকল। অন্যদিকে যে সমস্ত গোষ্ঠীতে নারীরা মূল কৃষিকাজে জড়িত হত না, তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বেশি হল। এই সমস্ত গোষ্ঠীই বিস্তার লাভ করল। উৎপাদনে মূল ভূমিকা পালন করার জন্য পুরুষরাই সমাজ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান ভূমিকা রাখা শুরু করল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যুদ্ধেও এই পরিবর্তন হোল। ছোট খাট স্থানীয় ব্যবসা পরিচালনা করতে পারলেও দূরপাল্লার

বাণিজ্য ও যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। যেহেতু সমাজের প্রধানদের মধ্যে ব্যবসায়ী ও সেনাপতিরা ছিল প্রভাবশালী-উৎপাদনের উদ্বৃত্তের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাকল-নারীদের হাতে নয়। নারীরা যদিও সমাজের অন্যান্য কাজে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকল-কিন্তু উৎপাদনের উদ্বৃত্তের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তাদের ভূমিকা হল অধস্তনের। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উৎপত্তি হল পৃথিবীর প্রায় সব স্থানেই। কিন্তু সব জায়গায় এর ধরন একরকম হল না। কোন কোন সমাজে নারীর কোন অধিকারই স্বীকার করা হত না।

সমাজে শাসক ও শোষক শ্রেণীর আবির্ভাব সমাজের বিবর্তনকে আরও প্রভাবিত করতে থাকল। শাসন বজায় রাখার জন্য দাস-দাসী, সৈন্যবাহিনী রাখার জন্য ব্যয় বাড়ল। বড় বড় উপাসনালয়, প্রাসাদ ও সমাধিস্থল তৈরী করার জন্য ব্যয় করা হতে থাকল, তাদের ক্ষমতার গৌরব দেখানোর প্রয়োজনে, তাতেও খরচ বাড়তে থাকল। এইসব মেটান হত উৎপাদনের উদ্বৃত্ত দিয়ে, অতএব শোষণ বাড়তে থাকল। অন্য গোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করে তাদের সঞ্চয় লুট করে নেওয়াও আকর্ষণীয় হতে থাকল। তাতে সাধারণ কৃষকদের কষ্ট আরও বেশি হল। কিন্তু শাসক শ্রেণীর যথার্থতা এতে আরো বাড়ল-কারণ সবাই মনে করল কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণী প্রতিরক্ষার জন্য দরকার।[২৪] কিন্তু শোষণ বাড়তে থাকায় একসময় সমাজের কাজ চলার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যের সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতায় প্রথম সভ্যতার বিকাশের ১০০০ থেকে ১৫০০ বৎসর পর।

প্রথম অন্ধকার যুগ

প্রথম সভ্যতার বড় বড় নিদর্শন গুলি (যেমন পিরামিড) যারা দেখেছেন তারা এগুলির বিশালত্বে মোহিত না হয়ে পারেন না। এ ছাড়া আশ্চর্য হল সেই সময়ের পাথরের তৈরী বাড়ীগুলো যে গুলো, এমনভাবে তৈরী ছিল যে, সেগুলো বৃষ্টি ও বাতাস আটকাতে পারতো। কোন কোন বাড়ী গুলিতে পানি সরবরাহ ও পয়: নিষ্কাশন ব্যবস্থাও ছিল। অথচ এই সময়কালে মানুষ পাথর ও কাঠের হাতিয়ার বেশি ব্যবহার করত। কোন কোন স্থানে তামা, পিতলের হাতিয়ার ছিল। কোন শক্ত ধাতুর হাতিয়ার তাদের ছিল না। যারা বড় বড় স্থাপনাগুলির কাছাকাছি থাকত তাদের উপর এর প্রভাব অনুমান করা যায়। গাজায় অবস্থিত পিরামিড, উরুক এর জিগুরাত ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে প্রতিভাত হত।

কিন্তু এইসব সমাজ একসময় সংকটে পড়ে যায়। মেসোপটেমিয় শহর রাষ্ট্রগুলিতে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। খ্রিষ্টপূর্ব ২৩০০ এর কাছাকাছি সময়ে সারবান নামে একজন এই রাষ্ট্রগুলিকে এক করে একটি বড় রাজ্য তৈরী করে, কিন্তু তার মৃত্যুর পরেই এগুলো আবার ভেঙ্গে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ২১৮০ থেকে ২০৪০ এর মধ্যে মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্য (old kingdom) আভ্যন্তরীন যুদ্ধবিগ্রহে ভেঙ্গে যায়। সিন্ধুর হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো প্রায় একহাজার বৎসর পর্যন্ত টিকে থাকার পর খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে পরিত্যক্ত হয়। এর ১০০ বৎসর পর ক্রিটের সভ্যতা ভেঙ্গে পড়ে এবং তারপর গ্রীসের মিসেনিয়ান সভ্যতা ভেঙ্গে যায়।

এই সভ্যতাগুলি ধ্বংস হওয়ার কারণ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কতকগুলো উপাদান চিহ্নিত করা হয়েছে। যেগুলো সব সভ্যতার মধ্যে দেখা গেছে। শাসক শ্রেণী তাদের নিজেদের ভোগের জন্য সম্পদের ব্যবহার বাড়াতেই থাকে। প্রাসাদ, উপাসনালয় ও সমাধিস্থলের আকার বাড়তেই থাকে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ যোগান দিত কৃষক শ্রেণী। মিশরের প্রধান লিপি থেকে জানা যায় প্রশাসন প্রধানত কৃষকদের সম্পদ শাসকশ্রেণীর কাছে হস্তান্তরে ব্যস্ত থাকত, আর ব্যস্ত থাকত বড় বড় নির্মাণ কাজের তদারকিতে। কৃষির উন্নতি করার কোন প্রচেষ্টা তাদের ছিল না।[২৫] মেসোপটেমিয়ার অবস্থাও ছিল একই, তবে এখানে যোগ হয়েছিল নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। ক্রমবর্ধমান হারে সাধারণ মানুষের উদ্বৃত্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমেই কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে জীবনধারণের জন্য যা দরকার তার চাইতেও কমে যায়। যদিও উপাসনালয় ও প্রাসাদ তৈরীতে নিযুক্ত কারিগররা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নত হাতিয়ার ব্যবহার করত কিন্তু সাধারণ কৃষকেরা নতুন হাতিয়ার সংগ্রহ করতে পারত না। এমনকি সিন্ধু সভ্যতায় শহরগুলিতে বেশিরভাগই পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার হত।[২৬]

ক্রমেই বাড়তে থাকা শোষণের কারণে যেমন সাধারণ কৃষকের জীবনযাত্রার মান কমতে থাকল, তেমনি প্রকৃতিকে জানা ও তাকে ব্যবহার করার ব্যাপারে মানব সমাজের অগ্রগতি এই সময় প্রায় থেমে যায়। গর্ডন চাইল্ড কৃষিভিত্তিক সমাজের

আগের কম উন্নত ও অজ্ঞ মানব সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে এই যুগের মানব সমাজের তুলনা করেছেনঃ "খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ বছরের আগের ২০০০ হাজার বছরের কতকগুলি আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন হয়েছিল যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত করেছিল এবং প্রজাতি হিসাবে পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান শক্তিশালী করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে খাল ব্যবহার করে কৃত্রিম সেচ চালু করা, লাঙ্গল আবিষ্কার, জন্তু-জানোয়ার ব্যবহার করে পরিবহনের কাজে লাগানো, চাকার ব্যবহার, নৌ-পরিবহনে পালের ব্যবহার, বাগান তৈরী করে ফল উৎপাদন, তামা ও ব্রোঞ্জের উৎপাদন ও এগুলো দিয়ে হাতিয়ার তৈরী, ইট তৈরী, সৌর ক্যালেন্ডার তৈরী, হস্তলিপি আবিষ্কার, সংখ্যা গণনা। কিন্তু কৃষিভিত্তিক উৎপাদন শুরুর পরবর্তী দুই হাজার বৎসর (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের পর) এর তুলনায় তেমন কোন উদ্ভাবন দেখা যায়না"।[২৭] অগ্রগতি কিছুটা হয়েছিল- যেমন লোহার ব্যবহার, পানি ব্যবহার দ্বারা চাকা ঘুরিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র বানান, অংকশাস্ত্র। কিন্তু এই অগ্রগতিগুলি নগর সভ্যতাগুলিতে হয় নাই। এগুলো হয়েছিল নগর সভ্যতার বাইরে তুলনামূলক ভাবে "বর্বর" মানবগোষ্ঠীর দ্বারা। একজন গবেষক মিশরের খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ৩০০০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বিশাল সৃষ্টিমূলক ও উদ্ভাবনের সময় বলে উল্লেখ করেছেন। তুলনায় এর পরের সময় ছিল কেরানী ও আমলাতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কাল যা নতুন কাজ নিরুৎসাহিত করেছিল এবং অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেছিল।[২৮]

সমাজের শাসক শ্রেণী যারা বাকী সমাজের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত ভোগ করত তাদের প্রকৃতিকে জানা ও তার মাধ্যমে জীবনযাত্রার উন্নয়নের কোন আগ্রহ থাকল না। প্রথম দিকের যে সমস্ত আবিষ্কার তার অনেকগুলি যেমন, ধাতুর তৈরি হাতিয়ার, নৌযানে পালের ব্যবহার, প্রাণীকে পরিবহনের কাজে লাগানো, এগুলো উদ্ভাবন হয়েছিল শ্রম সাশ্রয় করার জন্য। কিন্তু কৃষিভিত্তিক পরবর্তী যুগে শাসক শ্রেণীর প্রয়োজনে শ্রম দেওয়ার জন্য অনেক মানুষকে লাগানো সম্ভব ছিল। তাই শ্রম সাশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল না। তারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা-যার মাধ্যমে তারা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল-সেটাই টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করল। সুমেরিয়ার রাজারা ও মিশরের ফারাওরা তাই সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী ও কারিগর শ্রেণীকে নতুন অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে উৎসাহ দেওয়ার কোন প্রয়োজন অনুভব করত না। কৃষিভিত্তিক সমাজ গঠন ও নগর সভ্যতার পত্তনের আগে যে জ্ঞান ও প্রযুক্তি আহরিত হয়েছিল তাকেই প্রায় ধর্মীয় শ্রদ্ধার আসনে আবদ্ধ রেখে নতুনত্ব নিরুৎসাহিত করা হল। বিজ্ঞানকে শত শত বৎসর ধরে ধর্ম ও যাদুর পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে তার গতিরুদ্ধ করে রাখা হল। মানব জাতির প্রকৃতি অনুসন্ধান ও নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে সমাজ প্রগতি বন্ধ হয়ে গেল। সমাজের যারা শিক্ষিত তারাই জ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ইতিহাসে এই ঘটনা পরবর্তীতে আরও ঘটেছে।

সমাজের প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে সৃষ্টি হল কৃষিভিত্তিক সমাজ ও নগরজীবন। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন কিছু মানুষকে শ্রম থেকে মুক্তি দিয়ে সাংগঠনিক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নিয়োজিত করল। এরাই পরিণত হল শোষক ও যাজক শ্রেণীতে। তাদের চাহিদা বাড়তে থাকল ও শোষণের মাত্রা বাড়তে থাকল। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান কমতে থাকল। উপরন্তু শোষণ টিকিয়ে রাখতে শাসক শ্রেণী উদ্ভাবন বন্ধ করে রাখল। শোষণ ও উৎপাদন শক্তির এই বন্ধ্যাত্বের ফলে ক্রমেই সমাজের সম্পদের উপর চাপ বাড়তে থাকল। সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটানো যাচ্ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই পর্যায়ে জলবায়ুর পরিবর্তন বা যুদ্ধবিগ্রহের কারণে ফসলের উৎপাদন কমলে বিপর্যয় সামলানো এইসব সমাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নীল নদের বন্যার পানি কমে যাওয়ার কারণে সেচের পানির অভাবে ফসলের ফলনে ঘাটতি হওয়ায় মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্যের (Old Kingdom) শেষে এটা ঘটেছিল। মধ্য আমেরিকায় মায়া সভ্যতার ধ্বংসের কারণও অতি-শোষণ বলে গবেষকরা মনে করেন।[২৯]

শাসক শ্রেণী ও শোষিত কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের থেকে সংঘর্ষের উৎপত্তি হত। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়না, কারণ উপাসনালয়ের উৎকীর্ণ লিপি ও সমাধিস্থলের চিত্রকর্মে শাসকরা এর বহিঃপ্রকাশ ঘটায় নি। এটাই ছিল স্বাভাবিক। তবে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে কৃষক বিদ্রোহের ফলে মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্য ও মায়া সভ্যতার পতন ঘটে।[৩০] তবে এই সংঘর্ষ শুধুমাত্র শাসক ও কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মেসোপটেমিয়া ও মধ্য-আমেরিকায় প্রথমে শাসক শ্রেণী ছিল উপাসনালয়ের পুরোহিতরা। এই দুই স্থানেই ক্রমেই আরেক শ্রেণীর আবির্ভাব হল-এরা হল জমির মালিক এবং সেনাধ্যক্ষরা। মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্যে রাজারা সুদীর্ঘ ৫০০ মাইল লম্বা নীল নদের উপত্যকায় খনন কাজ এবং কর আদায় করার জন্য নির্ভর করত আঞ্চলিক শাসকদের উপর। তারাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা স্বাধীন আচরণ করতে শুরু করে। মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতনের আর একটি কারণ ছিল এই আঞ্চলিক অধিপতিদের বিদ্রোহ। এছাড়াও কৌশলী ও

কারিগর শ্রেণীর সংখ্যাও বাড়ে। শাসক শ্রেণী যতই বড় বড় নির্মাণ কাজে হাত দিল ততই এদের চাহিদা বাড়ল ও সংখ্যা বাড়তে থাকল। একটা ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে উঠল। শত শত মাইল দূর থেকে জিনিষপত্র আনা-নেওয়া করা একটা পেশায় পরিণত হল।

কিন্তু যখন সংঘাত ও বিপর্যয় দেখা দিত তখন শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করে সেখানে নিজেদের অবস্থান নেওয়ার মত ক্ষমতা কৃষক কুলেরও ছিল না বা কারিগর ও ব্যবসায়ীদেরও ছিল না। ফলে সংঘাতের ফল হত ধ্বংস। কৃষকেরা বিদ্রোহ করার পর কৃষি উৎপাদন চালুর রাখার জন্য সেচ ব্যবস্থা ও সংগঠন চালানোর শক্তি তাদের ছিল না। ফলে অনেক স্থানেই সংঘাতের পর নগর ও জনপদ পরিত্যক্ত হয়ে যেত। ক্রিট ও মিসেনি সভ্যতা, মায়া সভ্যতার নগরগুলি এভাবে পরিত্যক্ত হয় বলে অনেকে মনে করেন।

এই ধরনের দূর্যোগের পর শতাব্দীর ব্যবধানে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায় নতুন শাসক শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে আবার নগর গড়ে তোলে। কিন্তু উদ্ভাবন ও নতুন জীবনযাত্রার ধারা সৃষ্টি করতে পারে নাই। বিপর্যয়ের পরের সমাজগুলিতে সেনাধ্যক্ষ, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের ভূমিকা বেশি থাকত। কিছু কিছু উদ্ভাবনের ফলে উৎপাদন শক্তিও বেড়েছিল। এর মধ্যে ছিল তামার বদলে ব্রোঞ্জের ব্যবহার। ব্রোঞ্জ তামার চাইতে শক্ত। কাজেই আরও মজবুত হাতিয়ার তৈরী করা যেত। ঘোড়ায় টানা চাকাওয়ালা গাড়ী যুদ্ধেও ব্যবহার করা যেত। আবার মালামাল হস্তান্তরেও গতি আনল।

তথ্যসূত্রঃ

১. Harman C. A People's History of the World. London, 1999 p 3-4
২. Turnbul C.The Forest People. New York,1962 p 107
৩. Friedl E. Women and Men, The Anthropologist's View. New York, 1975 p 28.
৪. Leacock E. Myths of Male Dominance. New York,1981 p 139-140
৫. Lee R. The !Kung San. Cambridge, 1979 p 118
৬. Maisels CK. The Emergence of Civilization From Hunting and Gathering to Agriculture, Cities and State In the Near East. London, 1993 p 297
৭. Harman C. p 10
৮. Adams RM. The Evolution of Urban Society. London, 1966 p 96
৯. Benedicts R. Patterns of Culture. London, 1935
১০. Harman C. p 12
১১. Katz F. Ancient American Civilization. London, 1989
১২. Diamonds J. Guns, Germs and Steel. New York, 1997 p 139
১৩. Lee R. Reflections on Primitive Communism.in T.Ingold D.Riches and J.Woodburn. (Edit), Hunters and Gatherers, Vol-1. Oxford, 1988 p 262.
১৪. Sahlins M. Stone Age Economics. London, 1974 p 135
১৫. Katz F.
১৬. Harman C. p19
১৭. Katz F.
১৮. Adams RM. P 96
১৯. Adams RM. P 104
২০. Jones TB. Quoted in Maisels CK. The Emergence of Civilization. P 184
২১. Mann M. The Sources of Social Power. Vol-1. Cambridge, 1986 p 39
২২. Adams RM. P 104
২৩. Sachs K. Sisters and Wives. London, 1974 p 117
২৪. Diakhanov IM. The Stucture of Near Eastern Society Before the Middle of 2nd Millenium BC. Oikumene,3:1, Budapest, 1982
২৫. Trigger BG, Kemp BJ, O'Connor D and Loyd AB. Ancient Egypt: A Social History. Cambridge, 1983 p 176
২৬. Gordon Child V. What Happened in History. Harmondsworth, 1948 p 117
২৭. Gordon Child V. Man Makes Himself. London, 1956 p 227
২৮. Trigger BG. et.al. page 67
২৯. Culbert. TP (Ed) The Classic Maya Collapse. Albuquerque, 1973 p 459
৩০. Trigger BG et al. p115

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন যুগঃ লৌহ ও সাম্রাজ্য

মানব সভ্যতার ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব নির্মাণ করে কৃষককুল ও পশুপালকেরা যারা সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্রগুলো বা নগর গুলোর বাইরে জীবন যাপন করত। রাজা ও পুরোহিতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নগর বাসীরা এর কোন কৃতিত্বের দাবিদার নয়। নগর সভ্যতার অর্জনগুলি (যেমন তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার, চাকাকে কাজে লাগান, অক্ষর ব্যবহার করে নিজ নিজ ভাষার লিখিত রূপ তৈরী করা) থেকে শিক্ষা নিয়ে অগ্রগতির যে বন্ধ্যাত্ব নগর সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল, তা ভেঙ্গে এরাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ইউরোপ ও এশিয়ার একটি বিরাট অংশে অনেক মানবগোষ্ঠী বসবাস করত। তারা নগর সভ্যতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। কিন্তু নগর সভ্যতার উদ্ভাবনসমূহ তারা কাজে লাগান শুরু করেছিল। এই মানবগোষ্ঠীসমূহ অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের উদ্বৃত্ত ছিল কম। এই সমাজের শাসকেরাও অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর মতো উৎপাদনের উদ্বৃত্ত ভোগ করত। তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই নতুন উদ্বৃত্ত বাড়ানর জন্য নতুন উদ্ভাবনের চেষ্টা তারা উৎসাহিত করত। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়তে থাকলে এক পর্যায়ে তারা নগর সভ্যতা গুলোর উপর আগ্রাসন করতে সক্ষম হল। নগর সভ্যতাগুলো ইতিমধ্যেই একদিকে শাসক অপরদিকে কৃষককুল, কারিগর, বণিক ও আঞ্চলিক রাজাদের মধ্যে সংগ্রামে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মোটামুটি এই ধারাতেই বড় নগর সভ্যতাগুলো ভেঙ্গে পড়ল। দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ থেকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত গোষ্ঠীগুলো গ্রীসের মিসেনিয়ান সভ্যতা আক্রমণ করল। মিসর আক্রান্ত হল বাইরের "সামুদ্রিক গোষ্ঠী" নামে একদল মানুষের দ্বারা। হিট্টাইটরা দখল করল মেসোপটেমিয়া। চীনে "শাং" রাজবংশকে উৎখাত করল "চৌ"রা। আর কাস্পিয়ান সাগর এলাকা থেকে "আর্যরা" আগ্রাসন করল ক্ষয়িষ্ণু সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলিকে।[১] এই আক্রমণগুলো একই সময়ে বা এক বারেই সম্পন্ন হয়েছে তা নয়, বহু বৎসর ধরে এই প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এসেছে।

মেসোপটেমিয়া, মিসর ও চীনে নগরগুলি ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হল না। নতুন শাসক ও নতুন উদ্ভাবনের ফলে সভ্যতা আবার বেগবান হল। কিন্তু গ্রীসের মিসেনিয়ান সভ্যতা ও সিন্ধুর মহেঞ্জোদারো সভ্যতার উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আক্রমণের ফলে ধ্বংস হল। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হলেও আক্রমণকারীরা নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসল। গরুতে টানা লাঙ্গল দিয়ে চাষ শুরু করার ফলে উত্তর ভারতের শক্ত মাটি, যা আগে চাষ করা যেত না তাও চাষ করা সম্ভব হল। ফলে উৎপাদন আরও বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল-উদ্বৃত্ত আগের চাইতেও বেশী থাকতে লাগল।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয় খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ বছরের কাছাকাছি সময়ে প্রথম আর্মেনিয়ার পাহাড়সমূহে। কয়েকশত বছর পরে এটা আবিষ্কার হয় পশ্চিম আফ্রিকায়।[২,৩] সেটা হল আকরিক লোহা গলিয়ে ধাতু পৃথক করার প্রক্রিয়া (smelting)। এই প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে প্রায় সব স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলে বদলে গেল উৎপাদনের প্রক্রিয়া এবং বদলে গেল যুদ্ধের ধারা।

তামা এবং তার সঙ্গে টিনের সংমিশ্রণ তৈরী করার ফলে নগর সভ্যতার প্রথম দিক থেকেই ব্রোঞ্জের ব্যবহার হয়ে আসছিল। কিন্তু তামার আকর খুব কম স্থানেই পাওয়া যেত এবং এটা থেকে কিছু তৈরী করা ছিল ব্যয়বহুল। উপরন্তু তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরী হাতিয়ারের ধার খুব সহজে নষ্ট হয়ে যেত। এ সব কারণে শাসক শ্রেণীর অলংকার এবং হাতিয়ার হিসাবেই এ গুলো ব্যবহার হত। সাধারণ কৃষকেরা বা কারিগরেরা এ সব ধাতু দিয়ে প্রস্তুত হাতিয়ার বা অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত না। তাই দেখা যায় সেই যুগে বড় বড় স্থাপনা যেমন-পিরামিড, যে শ্রমিক ও কারিগররা তৈরী করেছিল, তারা নগর সভ্যতা শুরু হওয়ার প্রায় ১৫০০ বছর পরেও পাথরের হাতিয়ারই ব্যবহার করত। কৃষকদের মধ্যেও তামা বা ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না।

লোহার আকর তুলনায় আরও সহজে পাওয়া যেত। যদিও আকর থেকে ধাতব লোহা পৃথক করার পদ্ধতি আরও জটিল কিন্তু একবার শিখে নেওয়ার পর কামাররা লোহা থেকে লাঙ্গল এর ফলা, ছুরি, কুড়াল, তীরের ফলা, পেরেক ইত্যাদি তৈরী করা শুরু করল। এগুলো সাধারণ কৃষকেরা ব্যবহার শুরু করায় কৃষি উৎপাদনে বিরাট পরিবর্তন আসল। কুড়াল দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার সহজতর হল, লোহার ফলার লাঙ্গল আরও শক্ত মাটিতে চাষ দিতে পারল। ফসলের উৎপাদন বাড়ল। লোহার তৈরী তরবারি ও বর্শার দাম কম হওয়াতে সাধারণ মানুষের হাতে অস্ত্র এসে গেল। এতে যুদ্ধের ধারা বদলে গেল।

খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে নতুন প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠল নতুন সভ্যতা। মধ্যপ্রাচ্যে আসিরিও সাম্রাজ্য নীল নদ থেকে পূর্ব মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যে অসংখ্য জনগোষ্ঠী ছিল। তাদের ভাষা ভিন্ন হলেও তারা একই হরফ ব্যবহার করা শুরু করল। উত্তর ভারতে এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠতে লাগল। বাণিজ্য আবার শুরু হল। নতুন নগর গড়ে উঠতে লাগল। প্রায় এক হাজার বছর পরে চীনে প্রায় ১৭০টি ছোট ছোট রাজ্য যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে অল্প কয়েকটি রাজ্যে বিকশিত হল। ভূমধ্যসাগরের ধার দিয়ে উত্তর আফ্রিকা, লেবানন, প্যালেষ্টাইন, এশিয়া মাইনর, গ্রীস ও ইতালিতে নগর রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে উঠতে লাগল।

নতুন উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিও শুরু হল। ব্রোঞ্জ যুগে মেসোপটেমিয়া ও মিসরে, বিজ্ঞান বিশেষ করে অংক শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও কিছু জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু এই জ্ঞান চর্চা পুরোহিতদের হাতে থাকায় এগুলো ধর্মীয় জালে ও আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ হয়ে গেল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই শ্রেণীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে আগ্রহ ছিল না। লৌহ যুগে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এই পুরনো অঞ্চলগুলো, বিশেষ করে মেসোপটেমিয়ায় ও মিসরের নগর গুলিতে হল না। এটা মিসরের বাইরের যে সভ্যতা গড়ে উঠল যেমন-ভারত, উত্তর চীন, ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে হল।

এই উজ্জীবিত সভ্যতাগুলিতে লোহা ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষত্ব পাওয়া যায়। নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার শুরু হয়। দূরপাল্লার বাণিজ্যও এই সভ্যতাগুলিতে শুরু হয়েছিল। ব্যবসায়ী ও কারিগরদের প্রাধান্য আগের চাইতে বেশী ছিল। হয়েছিল মুদ্রার প্রচলন, এর ফলে সাধারণ কৃষক ও কারিগরদের জিনিষপত্র আদান প্রদান করা সহজতর হল। একমাত্র চীন ছাড়া অন্যান্য সভ্যতায় শব্দভিত্তিক অক্ষর প্রচলিত হল, যার ফলে আরও বেশী সংখ্যক মানুষ শিখতে পড়তে পারল। আবির্ভাব হল কয়েকটি ধর্মের যে গুলোর ভিত্তি হল ঈশ্বরের প্রাধান্য ও জীবন যাত্রার নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন। সবগুলি সভ্যতাই ছিল কৃষকের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত দিয়ে শাসক ও শোষক শ্রেণীভিত্তিক। এই শাসন ও শোষণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে ছিল। পার্থক্য হল ভৌগলিক অবস্থান, গৃহপালিত পশু, জলবায়ু এ গুলোর উপর ভিত্তি করে মানুষের জীবন যাত্রার বিভিন্নতার কারণে এবং কিভাবে উদ্বৃত্ত আহরন করা হয় তার উপর। এগুলোর উপরই ইতিহাসের ঘটনাবলী নির্ধারিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারত

খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীর কাছাকাছি যে সব "আর্য" মানবগোষ্ঠী সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করেছিল বলে মনে করা হয় তারা গোড়াতে ছিল যাযাবর ও পশুপালক। তারা পশুর মাংস ও দুধের উপর জীবন ধারণ করত এবং গোষ্ঠীপ্রধানদের দ্বারা চালিত হত। নগর সভ্যতার ব্যবহার তারা জানত না। আক্রমণ করে ধ্বংস করার পর তারা নগর পরিত্যাগ করে। লিখিত ভাষা সম্বন্ধেও তারা জানত না। আগের সভ্যতার লিখিত ভাষা ব্যবহার না হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়।

লোহার ব্যবহার খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ শতাব্দী থেকে বাড়তে থাকে। লোহার ব্যবহার জীবন যাত্রা বদলে দেয়। লোহার কুড়াল দিয়ে গঙ্গা উপত্যকায় জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদের এলাকা অনেক বাড়ল। এতে শাসক শ্রেণীর উদ্বৃত্ত ও শোষণের পরিমাণও বাড়ল। কাজেই শাসক শ্রেণী, যার মধ্যে ছিল যোদ্ধারা আর পুরোহিতরা-কৃষিকাজ বাড়াতে উৎসাহ দিতে থাকল। তবে তারা ফসলের এক তৃতীয়াংশ এবং কোন কোন স্থানে অর্ধেক কর হিসাবে প্রতিটি গ্রাম থেকে বলপ্রয়োগ করে আদায় করে নিত। এটাতে তারা ধর্মীয় অনুশাসনের সাহায্য পেত। আর্যরা নিয়ে এসেছিল একটি ধার্মিক অনুশাসন যা ছিল "বেদ" ভিত্তিক। এর আচার অনুষ্ঠান দেবতাদের বিজয় ভিত্তিক কাহিনীকে ঘিরে শ্লোক নির্ভর ছিল। ক্রমেই এই বেদভিত্তিক ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়ে শ্রেণী বিভাগ দেখা দিল। আগে যেটা ছিল পেশাভিত্তিক, সামাজিক পার্থক্যে তা হয়ে দাঁড়াল স্থায়ী

জন্মগত শ্রেণীবিভাগ। উৎপাদনের নিম্নপর্যায়ের শ্রেণীদের উপর উচ্চবর্ণের কর আদায়ের দাবীটি ধর্মীয় যৌক্তিকতাও পেয়েছিল। তবে এই শ্রেণীবিভাগ ধর্মীয় অনুশাসনভিত্তিক ছিল- ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্ভর করে তা ছিল না।

কৃষির প্রসার এর সঙ্গে সঙ্গে ফসলের উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়তে থাকল। উচ্চশ্রেণীর মানুষদের উন্নত বিলাস সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্রের চাহিদাও বাড়তে থাকল। এটা পূরণ করার জন্য কারিগর শ্রেণীর (কামার, তাঁতী, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি) সংখ্যা ও কাজও বাড়ল। তারা নগরে তাদের কর্মকান্ড চালাত। উচ্চশ্রেণীর চাহিদা মেটানোর জন্য দূর-দূরান্ত থেকেও উন্নতমানের জিনিষপত্র আনা নেওয়া শুরু হোল। দূরপাল্লার বাণিজ্যও তাতে অনেক বাড়ল। উপমহাদেশের বাহিরের এলাকার সঙ্গেও তাদের বাণিজ্য চলত। যোদ্ধাদলের নেতারা ছোট ছোট এলাকায় তাদের আধিপত্য স্থাপন করল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ উত্তর ভারতে আনুমানিক ১৬টি বড় রাজ্য ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১ শতাব্দীতে মগধ রাজ্য অন্য সব রাজ্যগুলি জয় করে সিন্ধু নদের পূর্ব থেকে সমস্ত উত্তর ভারত জুড়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২৪-৩০১ খ্রিষ্টপূর্ব)। এই "মৌর্য" রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র (বর্তমান বিহারে)। একজন গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস এর মতে পাটলিপুত্র ছিল সেই সময় পৃথিবীর সবচাইতে চিত্তাকর্ষক নগর। তাঁর মতে মগধ সেনাবাহিনীতে ৬,০০০ হাতি, ৮০,০০০ অশ্বারোহী ও ২ লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল।[৪] এটা অনেকটা অতিরঞ্জিত বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। তারপরেও পরিব্রাজক যেটা বিশ্বাস করেছিলেন তাতে ধারণা করা যায় যে মগধ সাম্রাজ্যের শক্তি ও মহিমা উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সাম্রাজ্য নগরগুলি আকারে ও কর্মকান্ডে বড় হল। ভারত থেকে স্থল পথে একদিকে ইরান ও মেসোপটেমিয়া এবং অন্যদিকে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য সুরক্ষিত করা হয়েছিল। সমুদ্র পথে আরব, মিসর, পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলত। এই সময়কালে পৃথিবীব্যাপী (পুরনো পৃথিবী বা old world) বাণিজ্যের প্রসারে এই পথগুলো ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হত বিরাট সম্পদের। এই সম্পদ যোগাড় করার জন্য বিরাট রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরী হয়েছিল। রাষ্ট্রই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। খনিজ পদার্থ,লবণ এ গুলোর উপরও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল পুরোপুরি। বিশাল সেনাবাহিনী ও কর্মচারীদের ভরণ পোষণের জন্য গ্রাম পর্যায় হতে কর আদায় করা হত। মূলতঃ কৃষকের উৎপাদিত ফসলের উদ্বৃত্তই সবকিছুর যোগান দিত। আমলাতন্ত্র গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ছিল কেন্দ্র থেকেই আঞ্চলিক শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হত এবং সব ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা হত। কয়েকটি গ্রামে একজন করে হিসাবরক্ষক নিয়োজিত থাকত যে জমির সীমানা, উৎপাদিত ফসল ও গৃহপালিত পশুর হিসাব ও মানুষের সংখ্যারও হিসাব রাখত। একজন আদায়কারী থাকত যে প্রতিটি কর্মকান্ডের কর আদায় করত। সমস্ত কর্মশক্তি পরিচালনায় সাহায্যের জন্য একটি বিস্তৃত গোয়েন্দা ব্যবস্থাও ছিল।[৫] তবে রাষ্ট্র পরিচালনা ও উৎপাদনের উন্নতির জন্য কিছু কাজ করা হয়েছিল। রাষ্ট্র নতুন জমিতে চাষাবাদ শুরু করার জন্য নতুন গ্রাম তৈরী করা, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা, পানি বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করা-এটা তার কর্মচারীদের দ্বারা করাত। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপন করা এবং জমি বিক্রি করা এটা বন্ধ করা হয়েছিল কারণ এর থেকে স্থানীয় শাসকেরা লাভবান হত।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৬৪-২২৭ খ্রিষ্টপূর্ব) এই সাম্রাজ্যের গৌরব ছিল শিখরে। অশোকের মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। যে বিরাট সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনিক লোকবল সাম্রাজ্য চালাতে দরকার হত তার ভরণ পোষণের জন্য যে বিরাট সম্পদ লাগত, তার যোগান দেওয়া সাম্রাজ্যের শক্তির বাইরে চলে যাচ্ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা তখনও ততটা উন্নত হয় নাই যে, স্থানীয় রাজাদের কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। তবে সাম্রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ভেঙ্গে পড়ে নাই। কৃষি ভূমির বিস্তার অব্যাহত থাকল। দূরপাল্লার বাণিজ্য বাড়ল। দক্ষিণ ভারতে রোমান মুদ্রা ব্যবহার হত এবং নৌপথে ইথিওপিয়া, মালয় উপদ্বীপ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও রোমান রাজত্বের সঙ্গে জিনিষপত্রের আদান প্রদান চলতে থাকল। বস্ত্র, বিলাস দ্রব্য, রেশম বস্ত্র ইত্যাদির উন্নতি হতে থাকল। ভারতের বণিকেরা গ্রীক-রোমক সাম্রাজ্যের বিলাসদ্রব্যের সরবরাহকারী হয়ে দাঁড়াল।[৬]

খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আরও কয়েকটি নতুন মানুষের দল উত্তর ভারত আক্রমণ করে এবং যুদ্ধ বিগ্রহের পর সেখানে বসবাস করে স্থানীয়দের সঙ্গে মিশে যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল "শক" যারা মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিল। আরেকটি দল মঙ্গোলিয়া অঞ্চল থেকে এসে "কুশান" সাম্রাজ্য স্থাপন করে। কনিষ্ক ছিলেন

কুশান রাজাদের অন্যতম। কুশানদের রাজ্য আফগানিস্তান ও ইরানের কিছু অংশ নিয়ে উত্তর ভারতের পাটলিপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজত্বে ভারত, পারস্য, চীন ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় উত্তর ভারত আবার একই শাসকের অধীনে আসে (৩২০ থেকে ৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ)। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল কম-বরং স্থানীয় পর্যায়ের শাসক ও কর্মকর্তাদের উপর কর্মকান্ড ছেড়ে দেওয়া হত। এই সময়কালে সংঘাত তুলনামূলকভাবে কম ছিল। অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের জন্য এই এই সময়কে কেউ কেউ "সোনালী যুগ" বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই সময় হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন উপাদান পরিশীলিত রূপ নেয়। ৫০০ খ্রিষ্টাব্দে আবার মধ্যএশিয়ার আর এক আক্রমণকারী জাতিগোষ্ঠী যারা "হুন" নামে পরিচিত এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। একবার হর্ষবর্ধন অল্প সময়ের জন্য উত্তর ভারতে আবার একক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন (৬০৬ থেকে ৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)।

এই সময়কালে অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। সংখ্যা গণনা, ও লেখার পদ্ধতি-যেটা এখনও প্রচলিত, তা উদ্ভাবন হয় এখানেই। যদিও এটাকে আরব পদ্ধতি বলা হয়। আরবরা ভারত থেকেই এটা ইউরোপে নিয়ে যায়। দশমিক পদ্ধতিও এখানেই আবিষ্কার হয়। আর্যভট্ট ৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি থেকে সঠিক সৌর বৎসর গণনার রীতি উদ্ভাবন করেছিলেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি কমে যেতে থাকে। উপমহাদেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়, যে গুলি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। এই কারণে ব্যবসা বাণিজ্যও কমে যেতে থাকে। আঞ্চলিক রাজারা অর্থনৈতিক দূর্বলতার কারণে রাজকর্মচারীদের কাজের জন্য অর্থ না দিয়ে একটি অঞ্চলের শাসনভার দিয়ে দিত-সাথে সাথে কর আদায়ের দায়িত্বও। সাধারণত এই অর্থনৈতিক শাসকেরা ব্রাহ্মণ হত। শাসকেরা বর্ণ প্রথাকে জোরালোভাবে প্রয়োগ করে বিভিন্নগোষ্ঠীর উদ্ভাবনী শক্তি সীমিত করে দিত। জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হল নিম্নবর্ণের যারা এই প্রথার কারণে সমাজের মূলধারা থেকে প্রায় বহিস্কৃত হয়ে গেল। প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতে যে পরিবর্তন ও উদ্ভাবন হয়ে আসছিল তা একসময় স্থবির হয়ে গেল। ছোট ছোট রাজ্য যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে লাগল। গ্রামগুলি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সামাজিক নিগড় ও অনুশাসন জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে আবদ্ধ করে রাখল। পরবর্তীকালে মুসলিম ও ইউরোপীয় বিজেতারা ভারতকে এই অবস্থাতেই পেয়েছিল।

প্রাচীন চীন

পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সভ্যতা শুরু হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে। তারপরে তা গ্রীস, রোম হয়ে ইউরোপে পূর্ণ রূপ নেয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল একই সময়ে উত্তর চীনে এক সভ্যতার উত্থান হয়েছিল যা প্রায় ২০০০ বৎসর স্থায়ী হয়। এই সভ্যতা মানবজাতিকে দান করেছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত আবিষ্কার। তবে একেবারে আদিকাল থেকে বর্ণনা শুরু করা যায়।

মেসোপটেমিয়ায় যে সময় প্রথম কৃষিকাজ শুরু হয়, সেই সময়ের কাছাকাছি সময়ে উত্তর চীনে বজরা (millet) চাষ ও শূকর পালন করা শুরু হয়। দক্ষিণ চীনে ধান চাষ এবং মহিষ পালন করা শুরু হয়। ধান চাষের কৌশল বজরা চাষের তুলনায় পৃথক। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালের দিকে নব্য প্রস্তর যুগের প্রযুক্তি ব্যবহার করে নগর গড়ে উঠে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৭শ শতাব্দীর শেষ দিকে তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরী করা হয়। ব্রোঞ্জের অস্ত্র উচ্চশ্রেণীর যোদ্ধারা ব্যবহার শুরু করে। উত্তর চীনে এই অস্ত্র ব্যবহার করে শাং (Shang) রাজবংশের পত্তন হয় (১৭০০ থেকে ১১২২ খ্রিষ্টপূর্ব)। এই উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা শাসক, পুরোহিত ও যোদ্ধার ভূমিকা পালন করত।

এর পরের রাজবংশ ছিল "চৌ"(Chou),১০২৮ থেকে ২২২ খ্রিষ্টপূর্ব এই সময় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল শিথিল। একটি শহরকে ঘিরে কিছু গ্রাম, এই রকম ছোট ছোট অনেক রাজ্য ছিল। এর মধ্যে কিছু বড় রাজ্যও ছিল-যার রাজারা নামেমাত্র চৌ সাম্রাজ্যের আধিপত্য স্বীকার করত। এই সময় ইয়াংসী নদী অঞ্চলে বিস্তৃত সেচ ও পরিবহনের জন্য জালের মত পরস্পর ছেদী খাল খনন করা হয়। কৃষি উৎপাদন এই সময় রাজারা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রাখত। জমির ব্যক্তি মালিকানা ছিল না। কৃষকরা যেভাবে আদেশ দেওয়া হত সেভাবেই ফসল বুনত ও ফসল তুলত।[৭] চৌ যুগের শেষের দিক ছিল চৈনিক

দর্শনের ঐতিহ্য তৈরীর যুগ। এই সময়ে বিখ্যাত দার্শনিক ও জ্ঞানী পন্ডিতের মধ্যে ছিলেন কনফুসিয়াস, লাও-জু এবং মেনসিয়াস। পরবর্তীকালে কনফুসিয়াস ও মেনসিয়াস এর অনুসারীরা তাঁদের অনুশাসনসমূহকে ভিত্তি করে একে এক ধর্মের রূপ দেয়-যা কনফুসিয়ানিজম (Confucianism) নামে পরিচিত। লাও-জুর অনুসারীরাও তাওয়িজম (Taoism)এর জন্ম দেয়।[৮]

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে চীন পরস্পর বিবাদমান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রযুক্তির উন্নতি হল। তরবারি আড় ধনু (cross bow) ব্যবহারের ফলে সাধারণ কৃষকদের দিয়ে রথ (chariot) আরোহী বাহিনীর প্রতিরোধে লাগান গেল। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতক পরিচিত হল "যুদ্ধরত রাজ্যগুলির যুগ"(the age of the warring states)। তবে এই যুগে কৃষিজমির ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়। উত্তর চীনে জঙ্গল কেটে জমি তৈরী এবং জলাভূমির পানি সেঁচে জমি তৈরী করা হয়। ব্যাপক আকারে লোহা তৈরী করা হয় যা পৃথিবীতে সেই সময় অদ্বিতীয় ছিল। কুড়াল, কোদাল, লাঙ্গল এবং অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যায় তৈরী হত। কৃষিরও প্রযুক্তিগত উন্নতি হল। বলদে টানা লাঙ্গল দিয়ে জমিতে গভীর কর্ষণ (deep ploughing),পশু ও মানুষের বর্জ্য সার হিসেবে ব্যবহার, বজরা ছাড়াও সয়াবিন ও গমের চাষ এগুলো এই সময় শুরু হয়। জমির উর্বরতা বাড়ানর জন্য ডালজাতীয় ফসলের ব্যবহার শুরু হয়। এ সবের ফলে উৎপাদন বাড়তে থাকে।

গার্নেটের মতে "যুদ্ধরত রাজ্যগুলির যুগ" ইতিহাসে একটি অনন্য উদ্ভাবনের যুগ। ধাতব বস্তু, কাঠ, চামড়ার তৈরী জিনিষসহ সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন কাপড়, শস্য, লবণ, ইত্যাদির ব্যবসাও এই যুগে ব্যাপক আকারে হয়। ধনী ব্যবসায়ীরা ব্যবসার সাথে সাথে বড় আকারের শিল্পদ্রব্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করত। তারা বহু শ্রমিক ও কর্মচারীর কর্মসংস্থান করত এবং বড় বড় নৌকার বহর এর মালিক ছিল। রাজ্যের সম্পদ তৈরীতে এদের অংশ ছিল সবচেয়ে বড়। রাজ্যগুলির রাজধানী ও নগর হয়ে উঠেছিল বড় শিল্পকেন্দ্র ও ব্যবসায়ের আধার। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যুদ্ধের একটা বড় কারণ ছিল এইসব শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ।[৯]

শাসকদের জন্য নতুন ব্যবস্থা সফলভাবে চালানর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রাচীন উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করা-কারণ এই শ্রেণী ব্যবসা ও শিল্পের প্রসারের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চি'ন (Ch'in) রাজারা এটা পেরেছিলেন বলেই অন্যান্য রাজ্য জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ২২১ শতাব্দীতে চি'ন শি হুয়াং ইতিহাসের প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তারা একটা নতুন আমলা ও সৈনিক শ্রেণী তৈরী করল যারা প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর জায়গা নিল। এরা কৃষককে জমির মালিকানা দিল ও প্রত্যক্ষভাবে কর আদায় করা শুরু করল। এতে স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ভূমিকা খর্ব হল।[১০] এটা ছিল সামাজিক কাঠামোর একটা বিরাট পরিবর্তন যাকে কেউ কেউ "বৈপ্লবিক" বলেও আখ্যা দিয়েছেন।[১১] এই পরিবর্তন ঘটানো হয় অস্ত্রের শক্তিতে এবং বহু মানুষ প্রাণ হারায়। একটি হিসাব অনুযায়ী খ্রিষ্টপূর্ব ৩৬৪ থেকে ২৩৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়। সাম্রাজ্য স্থাপনের পর প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার প্রাচীন অভিজাত পরিবারকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এই পরিবর্তন শুধু যে একজন রাজা ও তার সৈন্যবাহিনী করল তা নয়। প্রযুক্তি ও কৃষির পরিবর্তনের ফলে যে সামাজিক শক্তিগুলির উত্থান হল সেটাও এর কারণ ছিল।

কৃষি উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ও পুরাতন শাসকশ্রেণীর উদ্বৃত্ত বাড়ল। বিলাসদ্রব্যের চাহিদাও বাড়তে থাকল। ঘোড়া, রথ, অস্ত্রের চাহিদাও বাড়তে থাকল। কৃষকেরও প্রয়োজন হল আরও বেশী পরিমাণে কৃষিতে ব্যবহৃত হাতিয়ারের। ফলে কারিগরদের সংখ্যা বাড়ল। নতুন উদ্ভাবনও হতে থাকল, ব্যবসা বাণিজ্যও বাড়ল। ব্যবসার প্রয়োজনে একই মানের ওজন ও একই মানের মুদ্রার প্রয়োজন হল এবং এগুলো চালু করা হল। ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তিও অনেক বাড়ল। একজন ঐতিহাসিকের মতে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ হতে তৃতীয় শতাব্দীতে যে সামাজিক গঠনের পরিবর্তন হয়েছিল তাতে এই সম্ভাবনা খুবই ছিল যে চীনে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধান না হয়ে শিল্প-ব্যবসা ভিত্তিক নগরকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও সভ্যতাই প্রধান হয়ে উঠবে।[১২] আরেকজন ঐতিহাসিক মনে করেন এই সময় চীনে মজুরি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হওয়ার সম্ভাবনা ইউরোপের চাইতে অনেক আগে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আমলাতন্ত্র শাসন ক্ষমতা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়ায় এটা আর হয়নি।[১৩] আমলারা রাষ্ট্রের উৎপাদন উদ্বৃত্তের নিয়ন্ত্রণ অভিজাতশ্রেণী, ব্যবসায়ী ও যোদ্ধাদের কাছ থেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। ব্যবসায়ীরা রাজাকে অভিজাতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমর্থন দিয়েছিল,

কিন্তু যুদ্ধজয়ের ফল চলে গেল আমলাদের হাতে। এরপর ব্যবসায়ীদের উপর চাপ বাড়তে থাকে। এটা চি'ন যুগ ও পরবর্তী হান যুগেও দেখা যায়। রাজ্যের পক্ষ থেকে লোহা ও লবণ এই দুইটি প্রধান শিল্প নিয়ে নেওয়া হয়। তাদের উপর বার্ষিক হারে কর ধার্য করা হয়। কর ফাঁকি দিলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

চি'ন সাম্রাজ্যের অধীনে যত মানুষ বাস করত রোম সাম্রাজ্যের অধীনে এর চাইতে কম মানুষ ছিল। রোম সাম্রাজ্যের ৫৯৮৪ কিলোমিটার রাস্তার তুলনায় চি'ন সাম্রাজ্যের রাস্তা ছিল ৬৮০০ কিলোমিটার। রাস্তাগুলো একই নকশায় করা হয়। গাড়ীর axle (যে দন্ডটি কেন্দ্র করে চাকা ঘোরে) তা সমস্ত রাজ্যে ছিল একই মাপের। এই রাজত্বে আনুমানিক তিন লক্ষ শ্রমিককে তিন হাজার কিলোমিটার বৃহৎ প্রাচীর (great wall) তৈরীতে লাগান হয়। খাল কেটে একটি নদীর সঙ্গে আরেকটি নদীর সঙ্গে সংযোগ করে সেচ ও নৌ পরিবহনের জন্য একটি বিরাট নৌপথ সৃষ্টি করা হয়েছিল-যা পৃথিবীর অন্য কোথাও সে সময় ছিল না।

এই রাজত্বগুলির রাজারা ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রাধান্য খর্ব করা ছাড়াও সাধারণ মানুষকে দমন করে রাখার অন্যান্য ব্যবস্থাও নিয়েছিল। এর মধ্যে একটা ছিল বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা বন্ধ করা। একজন সম্রাট রাজ্যের সব বই পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। রাষ্ট্রীয় এই কঠোর নিয়ন্ত্রণের কোন বিরূপ প্রভাব অল্পকালের মধ্যে দেখা যায়নি। উৎপাদন ও ব্যবসা বাড়তে থাকে। সাম্রাজ্য বিস্তার হয়ে কোরিয়া, মধ্য এশিয়া ও ইন্দোচীন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিছু কিছু প্রযুক্তিও আবিষ্কার হয়। দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দেই চীনে ইস্পাত তৈরী হতে থাকে-ইউরোপে যা প্রায় ১৫০০ বছর পরে হয়েছিল। পৃথিবীর প্রথম পানি শক্তিচালিত চক্রও উদ্ভাবন হল।

সাম্রাজ্যের কর এতই বেশী ছিল যে, কৃষকরা বাধ্য হত বিদ্রোহ করতে। বারে বারেই এ ধরনের বিদ্রোহ হয়েছে। যদিও মিসর, মেসোপটেমিয়া, ভারত, ও রোমের ক্ষেত্রে বিপ্লবের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না, চীনে এসব যথেষ্ট পাওয়া যায়। কৃষক বিদ্রোহ কখনো কখনো ব্যাপক আকার ধারণ করে একটি প্রদেশ সম্পূর্ণ বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, কখনো তা রাষ্ট্রের রাজধানী দখল করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। চি'ন রাজবংশ পতনের জন্য এরকম একটি বিদ্রোহ দায়ী। তবে এসব বিদ্রোহ কখনোই কৃষকদের পক্ষে যায় নাই। তাদের রাজ্য চালানর মত সংগঠন ছিল না। সব সময়ই শাসকশ্রেণীর এক অংশ এরকম বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্ষমতা দখল করত, তারপর তারা কৃষকদের দমন করত।

হান সাম্রাজ্য ইউরোপের আধুনিক যুগের সময়কাল যতটা এতটা সময় টিকে ছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে কৃষক বিদ্রোহ তাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দিয়েছিল। স্থানীয় শাসকেরা প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। ১৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এক বিদ্রোহের ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে। নগরগুলোর অবনতি হয়। দূরপাল্লার বাণিজ্য কমে যায়। স্থানীয় শাসকেরা কৃষকদের নিয়ন্ত্রণভার নিয়ে নেয়। সেচ কার্য নিয়ন্ত্রণ করা, কর আদায় করা তারাই করতে থাকে। কৃষিকাজ, শিল্প ও ব্যবসা চলতে থাকে, কিন্তু দূরপাল্লার আদান প্রদান কমে যাওয়ায় তা মূলত স্থানীয় চাহিদা মেটাতে থাকে, এর ফলে চাহিদা কমে যায়, উদ্ভাবনও বন্ধ হয়ে যায়। একটা দীর্ঘকালের উন্নতি স্থবির হয়ে যায় এবং এটা প্রায় তিনশত বছর স্থায়ী হয়। ভারতে পঞ্চম শতকে এরকম স্থবিরতা এসেছিল। প্রায় এরকম সময়ে রোমান সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু চীনে সভ্যতার কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে নাই এবং দ্রুত পুনর্গঠনের ভিত্তি রয়ে গেছিল।

গ্রীসের নগর রাজ্য গুলির সভ্যতা

ভূমধ্যসাগর এ সভ্যতার আদিযুগে উল্লেখ করার মত প্রথম হয় মিনোয়ান সভ্যতা। গ্রীসের সবচাইতে বড় দ্বীপ ক্রীটে ছিল এর অবস্থান। নব্য প্রস্তরযুগে এখানে যারা বাস করত তারা খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সাল নাগাদ পাথর, ইট দিয়ে তৈরী নগর, ক্রীটের উপকূল অঞ্চলে গড়ে তুলেছিল। তাদের সঙ্গে গ্রীসের মূল ভূখন্ড, মিসর ও এশিয়া মাইনরের জিনিষপত্রের আদান প্রদান ছিল। তারা বড় বড় প্রাসাদও তৈরী করেছিল-সবচাইতে বড় প্রাসাদ ছিল নোসস (Knossos) এ। এই সভ্যতা প্রায় ছয়শত বছর স্থায়ী হয়। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে আগুনে নোসস পুড়ে যাবার পর থেকে এই সভ্যতার পতন হয়। মিনোয়ান প্রাসাদগুলি চিত্রকলায় ভরপুর ছিল। তাদের শৈল্পিক রীতি মিসর ও গ্রীসে পরবর্তীকালে অনুসরণ করা হয়। তাদের ধর্ম ও আচার আচরণ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায় নাই। কিন্তু আচার অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত ছিল বলেই চিত্রকলা থেকে ধারণা করা যায়।

তাদের লিখিত তথ্য সম্বলিত ফলক পাওয়া গেছে অনেক। এই যুগের শেষ দিকের ফলকগুলি গ্রীক লিপির আদি রূপ বলে মনে করা হয়।

মিসেনিয়ান (Mycanaeans) সভ্যতাঃ

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সাল থেকে গ্রীসে নতুন এক শ্রেণীর মানুষ উত্তরপূর্ব দিক থেকে আসতে থাকে। এরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলত। পরবর্তী গ্রীকেরা এদেরকেই তাদের পূর্ব পুরুষ বলে মনে করত। এরা ধীরে ধীরে আদি অধিবাসীদের সরিয়ে বসতি স্থাপন করল। সভ্যতার দিক দিয়ে এরা মিনোয়ানদের তুলনায় ছিল বর্বর। এরা ছিল পশু পালক, রথ চালানোর প্রযুক্তি আয়ত্ত করেছিল ও যুদ্ধে পারদর্শী ছিল। কিছু বড় বড় প্রাসাদ ছাড়া এই সভ্যতার অবশিষ্ট তেমন কিছু নাই।[১৪]

খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিসেনিয়ান সভ্যতার কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নাই। উত্তর দিকে গ্রীসের মূল ভূখন্ড থেকে মানবগোষ্ঠী ক্রমাগতভাবে মিসেনিয়ানদের সরিয়ে তাদের এলাকায় বসতি স্থাপন করতে থাকে। এরা বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক গোষ্ঠী মূল ভূখন্ড থেকে ক্রীটস, রোডস ইত্যাদি দ্বীপে বসতি স্থাপন করে। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। একটা উল্লেখযোগ্য ফল হল গ্রীক ভাষাভাষী মানুষ ইজিয়ান সাগরের তীর থেকে ও দ্বীপ সমূহে অনেকগুলো বসতিতে ছড়িয়ে পড়ল। এর বেশীরভাগই আকারে ছোট ছিল। সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যা বাড়লেও অনেকগুলোতেই দশ হাজারের বেশী অধিবাসী ছিল না। তবে এই মানব বসতিগুলো ছিল স্ব-শাসিত (autonomous) কোন রাজা বা সাম্রাজ্যের অংশ নয়। প্রথমদিকে এ গুলো ক্ষুদ্র নৃপতি বা দলপতি শাসিত হলেও সময়ের সাথে সাথে এই বসতিগুলি ভূস্বামীদের পরিষদ দ্বারা শাসিত হত।

গ্রীক সভ্যতা

ইজিয়ান (**A**egean) সমুদ্রের পশ্চিমে গ্রীস অবস্থিত। এটির মূলত: তিনটি ভৌগলিক বিভাগ রয়েছে। দক্ষিণ দিকটি একটি উপদ্বীপের মত-এটা পেলোপনিজ নামে পরিচিত। এটি একটি ছোট ভূখন্ড দ্বারা এর উত্তর আর একটি উপদ্বীপের সঙ্গে যুক্ত। সবচাইতে উত্তরে রয়েছে পর্বত অধ্যুষিত অঞ্চল মেসিডোনিয়া। গ্রীক আক্রমণ এই ভৌগলিক গঠনের কারণে উত্তরে স্থলভূমি থেকে কঠিন ছিল। সমুদ্রপথে আক্রমণ বরং এর চাইতে সহজ ছিল। এই সময় প্রায় সব অধিবাসীই সমুদ্রতীরের ৬০-৭০ কিলোমিটার এর মধ্যেই বাস করত। সমুদ্র পথে অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও ছিল তুলনামূলকভাবে স্থলপথের চাইতে সহজ। গ্রীসের মূল ভূখন্ডে জমি তত উর্বর ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতেই জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বসতিগুলো জমির প্রয়োজন অনুভব করছিল। মানুষ মূল ভূখন্ডের দিকে না গিয়ে নৌপথে প্রথমে ইজিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তারপর আরও দূরে দূরে নৌপথে গিয়ে নতুন বসতি স্থাপন করল। চারশত বছর পর দেখা গেল পূর্ব দিকে কৃষ্ণ সাগর থেকে পশ্চিমে ফ্রান্স ও সিসিলি এবং দক্ষিণে লিবিয়া পর্যন্ত গ্রীকদের উপনিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। কোন কোন উপনিবেশ উর্বর কৃষিভূমিতে প্রধানত ফসল উৎপাদনেই নিয়োজিত হল। আবার কোন কোন উপনিবেশ প্রধানত ব্যবসা বাণিজ্যই করত। সিসিলি, ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল, উত্তর আফ্রিকায় কৃষিভিত্তিক বসতি স্থাপিত হল। সিসিলির সিরাকিউস সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হল- খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩৫০ পর্যন্ত এথেন্স ছাড়া একমাত্র এই শহরেই এক লক্ষের বেশী অধিবাসী ছিল। কৃষি উৎপাদন ভিত্তিক এই উপনিবেশগুলো থেকে গ্রীস বা তার উপকূলীয় দ্বীপ সমূহে মূলবসতিতে খাদ্যশস্য পাঠান হত। সেখান থেকে আসত শিল্প দ্রব্য। মূল বসতিগুলো সাধারণত পরবর্তী উপনিবেশ গুলোর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করত না। তারা স্ব-শাসিত ছিল। কিন্তু আত্মীয়তা ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক তাদের কাছাকাছি রাখত। গ্রীসের মূল ভূখন্ড ও তার আশে পাশের দ্বীপগুলির বসতি এইভাবে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যে পারদর্শী হয়ে উঠল এবং এই কাজগুলিই তারা প্রধানত করত। জমি উর্বর না হওয়ায় শস্য উৎপাদন না করে জলপাই ও আঙ্গুর উৎপাদনই মূল ভূখন্ডে বেশী হত। জলপাই থেকে তৈরী তেল ও আঙ্গুর থেকে তৈরী সুরা মূল্যমানের দিক থেকে বেশী হওয়ায় পণ্যদ্রব্য হিসাবে আরও আকর্ষণীয় ছিল। এছাড়া মৃৎশিল্প ও ধাতু শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যাদিও তারা বাণিজ্য করত। নিজেদের উৎপাদিত পণ্য ছাড়াও মিসর ও এশিয়া মাইনরের জন্যও পণ্য গ্রীক বণিকেরা আনা নেওয়া করত।

এথেন্স ও আরও কয়েকটি নগরে অর্থ ও ব্যবসা সংক্রান্ত কার্য ফলকের প্রারম্ভ পাওয়া যায়। ধাতব মুদ্রার প্রচলন ছিল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ যুগের আগেও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যকে মূল্যমান ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য চালান হয়ে আসছিল। এর ভিত্তিতে বিণিময় বাণিজ্য (barter) ও ঋণদান (credit) এর অনেক আগেই চালু হয়েছিল। কিন্তু ধাতব মুদ্রার ব্যবহার এই কাজগুলোকে সহজতর করেছিল এবং অনেক বিস্তৃত করে দিয়েছিল। যে সমস্ত জায়গায় বা মানুষেরা বিণিময় বাণিজ্য ব্যবস্থায় অংশ নিতে পারত না- তারাও ধাতব মুদ্রার প্রচলনে ব্যবসা করতে পারত। ধাতব মুদ্রার আবিষ্কার ঠিক কোন সময়ে হয়েছিল তা বলা যায় না। প্রথম যে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায় তা ছিল খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর-এশিয়া মাইনর থেকে। তবে ব্যাপক প্রচলন গ্রীক নগরগুলিতে শুরু হয় বলে মনে করা হয়। সোনা ও রূপার মিশ্রণে ইলেকট্রাম নামে ধাতুর মুদ্রা, শুধু সোনার মুদ্রা বা শুধু রূপার তৈরী মুদ্রা, সবই ব্যবহার করা হয়- তবে রূপার মুদ্রাই বেশী ব্যবহার হয়, এর কারণ ছিল রূপা বেশী পাওয়া যেত ও তা ব্যবহার করা সহজতর ছিল। এথেন্সের রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত লরিয়াম (Laurium) নামক স্থানে রূপার খনি এথেন্সকে দিয়েছিল ঐশ্বর্য আর ট্রাইরেমস (triremes) নামক কার্যকর যুদ্ধজাহাজ তৈরীর ক্ষমতা। এই যুদ্ধ জাহাজ ব্যবহার করেই গ্রীকরা পারসিকদের পরাজিত করে এবং এর সাহায্যেই পূর্ব ভূমধ্যসাগরে প্রধান শক্তি হিসাবে নিজেদের স্থাপন করে।[১৫]

আলেকজান্ডার এর বিজয়ের ফলে গ্রীক সংস্কৃতি একটি বিরাট এলাকায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেলেও গ্রীকেরা অনেক এলাকায় থেকে যায়। তারা এসব এলাকায় প্রশাসন পরিচালনা থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। গ্রীস থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় গ্রীক ভাষা বলা হত। রোমের উত্থানের আগে পৃথিবীর সবচাইতে বড় শহর ছিল সম্ভবত আলেকজান্দ্রিয়া, এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। আলেকজান্দ্রিয়া মিসরে অবস্থিত হলেও এটা ছিল কার্যত একটি গ্রীক শহর। এই শহরে মিসরের গম, প্যাপিরাস, লিনেনের কাপড়, কাঠের জিনিষ, আফ্রিকার হাতির দাঁত, উটপাখির পালক, আরব ও পারস্যের কার্পেট, ভারতের তুলা ও চীনের রেশম সবই আদান প্রদান হত।

জমির উর্বরতা গ্রীসের মূল ভূখন্ডে কম থাকার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়েছিল কৃষক ও তার পরিবারের ভরণ পোষণের পর শস্য উৎপাদনের খুব কমই উদ্বৃত্ত থাকত। উদ্বৃত্ত বাড়ানর একটা উপায় দেখা গেল যাদের পরিবার নাই তাদের কৃষিকাজে লাগান। এটা হল দাসশ্রম প্রসারের একটা ভিত্তি। দাসরা ফসল উৎপাদন করলে তাদের ভরণ পোষণের পর উদ্বৃত্ত বেশী থাকত। এই উদ্বৃত্ত দাস মালিকদের বিনা শ্রমে আয়েশী জীবন যাপনের ব্যবস্থা করল। যুদ্ধ বন্দীদের দাস হিসাবে ব্যবহার করা হত।[১৬] খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে একজন মুক্ত মানুষকে এক বছর খাটানর জন্য যে পারিশ্রমিক দিতে হত তার অর্ধেকের চাইতেও কমে একজন যুদ্ধবন্দী দাস কেনা যেত। দাসত্ব আগেও ছিল কিন্তু দাসেরা মূলত মালিকদের ব্যক্তিগত কাজই করত। এই প্রথম গ্রীসে তারপর রোমে ব্যাপকভাবে দাসদের উৎপাদন বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করার কাজে ব্যবহার করা শুরু হল। যদিও দাসেরা মোট মানুষের সংখ্যার অনুপাতে কম ছিল, কিন্তু কোন কোন গবেষকের মতে তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদন ছাড়া শাসক, কর্মচারী, কবি দার্শনিকদের শ্রম বিহীন জীবন যাপন সম্ভব হত না।

চীনে দাস বিদ্রোহ প্রায়ই হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তেমন দাস বিদ্রোহ গ্রীসের ইতিহাসে দেখা যায় না। এর একটা কারণ হল দাসরা বিভিন্ন দেশ থেকে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে আসত। তারা ছিল ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ এবং নিজেদের সংঘবদ্ধ করা কঠিন ছিল। তবে দাসদের উৎপাদন বাড়ানর কোন আগ্রহ স্বভাবতই ছিল না এবং প্রযুক্তিগত উন্নতিও তারা করার চেষ্টা করত না। বড় ভূস্বামী (যাদের অনেক দাস জমিতে কাজ করত এবং নিজেদের কোন কাজ করার দরকার হত না) আর ছোট ছোট খামার মালিক (যারা নিজেরা জমিতে কাজ করত এবং হয়ত দু একজন দাস রাখত), এই দুই এর দ্বন্দ্ব সমাজে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বড় ভূস্বামীরা তাদের আগের সময়ের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র তুলে দিয়ে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে নেয় যা অলিগার্কি (oligarchy) নামে অভিহিত। রাজ্যের কাজ চালান, যেমন প্রশাসনিক খরচ, সামরিক (নৌবাহিনী যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত) খরচ চালানর জন্য তারা ক্রমবর্ধমান হারে ছোট ভূস্বামীদের উপর কর ধার্য করত। কর দেওয়ার জন্য ক্ষুদ্র জমির মালিকেরা উচ্চবিত্তের কাছে ঋণ করত। এক পর্যায়ে ঋণ শোধ না দিতে পারার জন্য আদালতের মাধ্যমে উচ্চবিত্তরা তাদের জমি নিয়ে নিত। আদালত উচ্চবিত্তের পক্ষেই থাকত। উচ্চবিত্তদের মধ্যে কেউ কেউ ছোট ভূমি মালিকদের দুঃখ দুর্দশা পুঁজি করে তাদের নিয়ে তৎকালীন শাসকদের উৎখাতও করত। কিন্তু তাতে সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হত না। তবে কোন কোন স্থানে (যেমন এথেন্সে) এই ছোট ভূমি

মালিকদের (যাদের সংখ্যা ছিল বেশী) চাপে শাসন ক্ষমতায় একটা পরিবর্তন আনা হয়। একে বলা হত ডেমোক্র্যাসী (democracy) যার আভিধানিক অর্থ জনগণের শাসন। বাস্তবে সব জনগণের সমন্বয়ে এই শাসন ব্যবস্থা নির্ধারিত হত না। দাস দাসী, মহিলা ও বহিরাগত ব্যবসায়ীদের এতে অংশ নিতে দেওয়া হত না। তবে এই ব্যবস্থায় সামগ্রিক অর্থনীতির বিন্যাসে পরিবর্তন না হলেও ছোট ছোট ভূমি মালিকরা বিত্তশালীদের শোষণ থেকে কিছুটা রক্ষা পেত। স্বভাবতই বিত্তশালীরা এই ব্যবস্থা পছন্দ করত না। বিভিন্ন সময়ে তারা এই ব্যবস্থাকে উৎখাত করে ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে নিত। এতে তাদের একটা সুবিধা ছিল। অস্ত্র শস্ত্র ও বর্ম উচ্চমূল্যের হওয়ায় তারাই এগুলো ব্যবহার করতে পারত এবং শক্তির দিক থেকে বেশী থাকত। গ্রীক নগর রাজ্যগুলির ইতিহাস তাই "ডেমোক্র্যাসী" ও বিত্তবানদের সংঘাতের ইতিহাস- বেশীরভাগ স্থানে বিত্তবানেরা নিজেদের আধিপত্য কায়েম করত। এথেন্সে এটা সম্ভব হয় নাই। এর কারণ ছিল বাণিজ্যের উপর এথেন্সের নির্ভরতা। আর বাণিজ্য নির্ভর করত নৌবাহিনীর উপর। নৌবাহিনী চালাত বেশীরভাগ কম বিত্তবান শ্রেণীর লোক। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে "ত্রিশ বৎসর এর যুদ্ধ" নামে দুই নগর রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধ হয়। একদিকে ছিল এথেন্স ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী অন্যান্য শহর- যারা নিম্নবিত্ত মানুষের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং "ডেমোক্র্যাসী"র পক্ষে ছিল, অপরদিকে ছিল সম্রাট এবং মূল ভূখন্ডের অন্যান্য রাজ্য যারা বিত্তশালীদের দ্বারা পরিচালিত ছিল।

গ্রীক নগর সভ্যতার উত্থানের প্রেক্ষাপটে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এর প্রভূত অগ্রগতি হয়। কয়েক শতক ধরে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা হয়। অ্যারিষ্টোটল, প্লেটো, ডেমোক্রিটাস এবং আরও অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবনের জন্ম দেন। এই সাংস্কৃতিক অর্জনই পরবর্তীতে ইউরোপের মধ্যযুগের "পুনর্জাগরণের" ভিত্তি ছিল।

গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোর আর একটা সুবিধা ছিল-মেসোপটেমিয়া, মিসর বা পারস্যের রাষ্ট্রগুলোর মত বড় এবং স্থবির প্রশাসনের চাইতে গতিশীল ছিল ছোট গ্রীক রাজ্যগুলি। তাদের বড় ভূস্বামী এবং ছোট ভূস্বামীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকার পরেও জনসংখ্যার একটা বড় অংশ যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকত। এ কারণেই তারা সমন্বিতভাবে বহু শতাব্দী বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেছে। এরই উপর ভিত্তি করে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মেসিডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডার এর বাহিনী মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্যের বিরাট সাম্রাজ্য জয় করতে পেরেছিল। আলেকজান্দ্রিয়াতে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটতে থাকে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ সালের কাছাকাছি সময়ে এখানে ইউক্লিড জ্যামিতি নামক গণিতের শাখার ভিত্তি স্থাপন করেন। এরাষ্টোথিনিস নামে এক বিজ্ঞানী এই রকম সময়ে এখানে পৃথিবীর ব্যাস (diameter) নির্ধারণ করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে হিপারকাস নামে আর এক বিজ্ঞানী ত্রিকোনমিতি নামে গণিতের আর এক শাখার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব গণনা করেন।

রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনঃ

রোম সাম্রাজ্যের উত্থানকে প্রাচীন সভ্যতার শিখর বলে অভিহিত করা হয় আর এর পতনকে বলা হয় ঐতিহাসিক ট্রাজেডী (tragedy) বা বিয়োগান্ত ঘটনা।[১৭] রোম সাম্রাজ্য ছিল সত্যই বিরাট। ইতালির একটি ছোট নগর থেকে শুরু হয়ে এই সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা যা বিস্তৃত ছিল দানিয়ুব ও রাইন নদীর দক্ষিণে সমগ্র ইউরোপ সাহারা, মরুভুমির উত্তরের সমস্ত উত্তর আফ্রিকা, নীল নদের উত্তরে সমস্ত মিসর, ও এশিয়া মাইনর-এই বিস্তীর্ণ এলাকায় রোম সাম্রাজ্য আধিপত্য বিস্তার করে। এর পশ্চিম অংশ প্রায় ছয় শত বৎসর স্থায়ী হয় আর এর পূর্ব অংশ প্রায় ১৬ শত বছর টিকে থাকে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র সর্বসাধারণের জন্য দালান ও উপাসনালয়, খেলার ষ্টেডিয়াম ও পানি সরবরাহের জন্য কৃত্রিম নালা, রাস্তাঘাট তৈরী করা হয়-যা পরবর্তী যুগের মানুষদের জন্য বিস্ময় হয়ে রয়েছে।

তবুও এই বিশাল কর্মকান্ডে মানুষের আগের যুগগুলিতে অর্জন করা জীবনযাত্রা পরিবর্তনের ক্ষমতা বা আগের যুগগুলিতে আহরিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান খুব বেশী বাড়ে নাই। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও মিসর, গ্রীস, ভারত ও চীন সভ্যতায় যে গতিতে নতুন উদ্ভাবন হয়েছিল তা রোমান সাম্রাজ্যে দেখা যায় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে অল্প কয়েকটি বিষয়ে রোম সাম্রাজ্যে অগ্রগতি দেখা যায়। একটি ছিল রোমান স্থাপত্য ও প্রকৌশল। যে বড় বড় স্থাপনা তারা সাম্রাজ্যের সর্বত্র তৈরী করেছিল তা সত্যিই বিস্ময়কর। তারা একটি আরও উন্নত নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত আইন তৈরী করেছিল, বিশেষত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার এর বিষয়গুলিতে। বিরাট সাম্রাজ্য ধরে রাখা ও পরিচালনা করার একটা প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী

করাও তাদের কৃতিত্ব। সম্ভবত তাদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল আগের যুগগুলিতে মেসোপটেমিয়া, মিসর ও গ্রীসে যে অগ্রগতি হয়েছিল সেটা মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে দেওয়া।[১৮]

শুরুতে রোম অনেকটা গ্রীস নগর সভ্যতাগুলোর মত ছিল। আত্মীয়তার সূত্রে সম্পর্কিত কৃষিজীবীদের একটি বসতি থেকেই প্রথম শুরু বলে ধারণা করা হয়। অন্যান্য অঞ্চলের বাণিজ্যের পথে অবস্থিত হওয়ায় এর থেকে অতিরিক্ত আয়ও হত। জনসংখ্যা বাড়ে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে এটা একটা বর্ধিষ্ণু নগরে পরিণত হয়। এর আগে পর্যন্ত রোম শাসন করত উত্তর দিকের এক্রস্কান (Etruscan) রাজ্য। এই সময় এক্রস্কানদের তাড়িয়ে দেয় রোমানরা। পরবর্তী চারশত বছরে সামরিক অভিযানের দ্বারা রাজ্যের পরিধি বাড়তে থাকে। যুদ্ধে পদাতিক সৈন্য ছিল কৃষকেরা কিন্তু তারা সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করত না এবং সামরিক অভিযানে পাওয়া ধনসম্পদের ভাগও পেত না। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল একটা অভিজাত শ্রেণীর সদস্যদের হাতে- যাদের প্যাট্রিসিয়ান (patrician) পরিবার বলা হত। সিদ্ধান্ত যেখানে নেওয়া হত সেই সিনেট, আঞ্চলিক প্রশাসক বা কনসালগণ, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী প্রিটর (praetor), বিচারকগণ-সবাই এই শ্রেণীর সদস্য ছিলেন। একটি পরিষদ ছিল (assembly)-যেটা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ও বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা রাখত। কিন্তু এর ১৯৩ সদস্যের ৯৮ জনই আসত অভিজাতদের মধ্য থেকে। ক্ষুদ্র কৃষক বা প্লেবিয়ান (plebeian) দের মধ্য থেকে আগতরা সংখ্যায় এদের সঙ্গে পেরে উঠত না। সম্পত্তি নাই এমন রোমান যাদের বলা হত প্রোলেতারি (proletarii), এদের ছিল মাত্র এক ভোট। অভিজাত শ্রেণী তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করত ক্রমাগত ছোট কৃষকদের জমি গ্রাস করতে। এই শ্রেণীর লোকেরা সৈন্যবাহিনীর অধিপতিও হত, ফলে রাজ্যজয়ের পর বিজিত রাজ্যের জমির বড় অংশ তারাই দখল করত। এতে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরী হয়। পরবর্তীকালের এক ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে লিখেন- প্যাট্রিসিয়ানরা অন্যদের সঙ্গে দাসের মত আচরণ করত। তাদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিত এবং তাদের শাস্তি ও মৃত্যুদন্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিত। তাদের এই আচরণ এবং তাদের চাপিয়ে দেওয়া দেনা, যুদ্ধের জন্য কর দেওয়া ও সৈন্য হিসাবে যুদ্ধে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা ইত্যাদির কারণে অন্যরা বিদ্রোহ করে।[১৯] বহু বছর ধরে এই দুই শ্রেণীর সংঘাত চলে, ফলে ক্ষুদ্র জমি মালিকেরা "ট্রিবিউন" নামে এক শ্রেণীর প্রতিনিধি রাখার অধিকার পায়। ট্রিবিউনের সদস্যরা অভিজাত শ্রেণীর শোষণ থেকে প্লেবিয়ানদের রক্ষা করার চেষ্টা করত। খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৭ সালে দুই শ্রেণীর একটি বড় সংঘাতের পর প্লেবিয়ানরা সর্বস্তরে নিয়োগ পাওয়ার অধিকারও আদায় করে।

নতুন ভূখন্ড জয় করায় রোমের ক্ষুদ্র কৃষকেরা এসব স্থানে আরও বেশী জমি চাষ করার অধিকার পায়। তবে রাজ্য জয়ের ফলে যে ধনসম্পদ লুট করা হত তার সিংহভাগই ভোগ করত অভিজাত শ্রেণী। এই শ্রেণী তাদের ধনসম্পদের একটা অংশ ব্যয় করত নতুন জমি কেনার জন্য। ক্ষুদ্র কৃষকেরা পদাতিক সৈন্য হিসাবে যুদ্ধরত থাকায় ফসল উৎপাদনে পূর্ণ সময় দিতে পারত না। তার উপর ছিল বাড়তে থাকা করের বোঝা। ঋণগ্রস্ত হয়ে তাদের জমি চলে যেত অভিজাত শ্রেণীর হাতে। এদিকে যুদ্ধ বন্দীদের সংখ্যা রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। যুদ্ধ বন্দীরা হয়ে যায় দাস- দাসের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- তৃতীয় মেসিডোনিয়ার যুদ্ধের পরে ১৫০,০০০ যুদ্ধ বন্দীকে দাস হিসাবে বিক্রী করা হয়।[২০] খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের দাসদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ আর অন্যান্য মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩২ লক্ষ। উপরন্ত যারা দাস নয় তাদের প্রতি আটজনে একজন ছিল সৈনিক ফলে সমাজে দাসদের অনুপাত ছিল আরও বেশী। বড় বড় ভূস্বামীদের জন্য দাস নয় এমন মানুষকে শ্রমিক হিসাবে কাজ করানোর চাইতে একজন দাস কিনে তাকে কাজে লাগান ছিল কম ব্যয় বহুল। একজন বড় ভূস্বামী তার দাসদের দিত বছরে একটি পোশাক, একটি কম্বল, আর খাবার থাকত মাংস ছাড়া।[২১] কম খরচে বড় খামারে দাসরা ফসল উৎপাদন করায় ছোট ছোট ভূস্বামীরা প্রতিযোগিতায় ক্রমেই পিছিয়ে পড়ে এবং তারা আরও দরিদ্র হতে থাকে। অনেকে তাদের ছেলে মেয়েদের পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, যারা পরে দাস হিসাবে বিক্রী হয়।[২২] অভিজাত ধনীদের সঙ্গে ক্ষুদ্র গরীব কৃষকদের সংঘাত শুরু হয়। টাইবেরিয়াস গ্রাচ্চা (Tiberius Gracchus) ও তার ভাই গায়া গ্রাচ্চা (Gaius Gracchus) অভিজাত শ্রেণীর হলেও ট্রিবিউন নির্বাচিত হওয়ার পর তারা গরীব কৃষকদের জন্য বড় ভূস্বামীদের জমি বিতরণ ও আরও কিছু সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে। দুজনকেই অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা হত্যা করে (খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক)। পরবর্তীতে আরও কয়েকজন সংস্কারক একই পরিণতির শিকার হয়। বিজিত রাজ্যগুলির ধনসম্পদ অধিকার ও ক্ষমতা দখল নিতে শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বও এইসময় বাড়ে। এই পটভূমিতে অনেক স্থানে দাসরাও বিদ্রোহ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৮ থেকে ১৩২ সাল পর্যন্ত সিসিলিতে হাজার হাজার দাস বিদ্রোহ করে। স্পার্টাকাস নামে এক দাসের নেতৃত্বে আরও বড় এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৭৩ সালে। এই বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং কোন

কোন ঐতিহাসিকের মতে প্রায় এক লক্ষ দাস মারা যায়।[২৩] ক্ষুদ্র কৃষকদের বিদ্রোহ বা দাস বিদ্রোহ কোনটাই রোম সাম্রাজ্যের গঠনের কোন পরিবর্তন ঘটায় নাই।

রোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি। শাসক শ্রেণী ও সভ্যতা ছিল শহর ভিত্তিক। শহরে শিল্প উৎপাদন ছিল নগণ্য। ব্যবসা ও শিল্পের বাইরে কৃষি উৎপাদন প্রায় ২০ গুণ বেশী ছিল।[২৪] সাম্রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই ছিল কৃষক এবং সমাজের অভিজাত শ্রেণীর সম্পদ আসত কৃষকের ফসলের উৎপাদনের অংশ এবং তার উপর ধার্য কর আদায় থেকে। শহরগুলো ছিল শাসনের কেন্দ্র ও অভিজাত শ্রেণীর বিলাসের জায়গা, শিল্প উৎপাদন বা ব্যবসার স্থান নয়। সাম্রাজ্যে যে সব রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল তা ছিল সামরিক অভিযানের জন্য, এর মাধ্যমে পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান ছিল ব্যয় বহুল। উদাহরণস্বরূপ নির্দিষ্ট ওজনের গম ৩০০ মাইল দূরে নিতে হলে তার দাম দ্বিগুণ হয়ে যেত। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে নাই। একমাত্র আলেকজান্দ্রিয়াতেই শিল্প বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল। তুলনায় এই সময় চীনে রাস্তা ও খালের মাধ্যমে দূরপাল্লার ব্যবসা বাণিজ্য বিকশিত হয়েছিল। রোমের শহরগুলি তার চারদিকের এলাকার উপর নির্ভরশীল থাকত কৃষিকাজের জন্য আর শহরে ছোট ছোট কারখানায় কারিগররা শিল্পদ্রব্য তৈরী করত। শহরের অভিজাত শ্রেণী ও বড় ভূমি মালিকেরা গ্রামের কৃষি, কৃষক,কৃষি শ্রমিক ও দাসদের উৎপন্ন ফসলের ভাগ ও কর বাড়ানর জন্য চাপ বাড়াতে থাকত। কিন্তু উৎপাদন বাড়াতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বিনিয়োগ করত না। ফসলের উৎপাদন বাড়ালে তা অভিজাত শ্রেণী নিয়ে যাবে, এজন্য দাস ও কৃষি শ্রমিকেরা নতুন প্রযুক্তি উৎপাদনে উৎসাহ পেত না- তাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বিনিয়োগের সুযোগও ছিল না। কাজেই প্রযুক্তি উন্নত হয়েছিল কম। নতুন প্রযুক্তি আসলেও তা কাজে লাগান হয় নি। পানি চালিত চাকার উল্লেখ দেখা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৫ সালে কিন্তু তা প্রায় দুইশত বছর তেমন ব্যবহার হয়নি, কারণ দাসদের দিয়ে অথবা গাধা দিয়ে টানা ভূমি চাষ বড় ভূ-স্বামীদের কাছে সুবিধাজনক মনে হয়েছে।

রাজ্যজয় অভিযান শেষ হতে থাকল ফলে নতুন দাসদের সংখ্যাও কমতে লাগল। এদিকে ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছোট কৃষক ও ভূমি শ্রমিকদের বিদ্রোহও বাড়ল। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায়ই বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। অনেক জায়গায় কৃষকেরা অতিরিক্ত শোষণের কারণে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে আশ্রয় নেয়। কৃষি উৎপাদন কমে যায়। এজন্য কৃষকদের জমি না ছাড়ার জন্য আইন করা হয়। এই যুগে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীন গোলযোগের সুযোগ নিয়ে বাইরে থেকে আক্রমণ করতে শুরু করে বিভিন্ন শক্তি। জার্মানী থেকে গথ (Goth)রা ও ফ্রান্সে গল (Gaul)রা বিভিন্ন সময় আক্রমণ করে। ব্রিটেনসহ সাম্রাজ্যের সীমানার দিকের রাজ্যগুলি হাতছাড়া হয়ে যায়। আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য সৈন্যসংখ্যা বাড়াতে হয়। এজন্য বাইরে থেকে ভাড়াটে সৈন্যেরও দরকার হয়। চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক বাহিনীতে প্রায় ৬৫০,০০০ মানুষ ছিল।[২৫] এই বিরাট সৈন্যবাহিনী পালন করার জন্য বিপুল সম্পদ লাগত যা আসত কৃষকদের ফসল ও কর থেকে। এতে কৃষকেরা আরও দরিদ্র হতে থাকে। শহরের ব্যবসায়ী ও কারিগররাও বাড়তে থাকা করের ফলে কর্মকান্ড কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়। আঞ্চলিক সেনাপতিরা বিদ্রোহ করতে শুরু করে এবং কেউ কেউ রোম দখল করার জন্য অভিযান চালায়। ক্রমেই স্পেন, উত্তর আফ্রিকা হাত ছাড়া হয়ে যায়। পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দে গথদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য তার গৌরব হারায়।

তথ্য সূত্রঃ

১. Harman C A. People's History of the World. London, 2008 p 45.
২. Cage JD (Ed). Cambridge History of Africa Vol.2. Cambridge,1979 p 398
৩. Diamond J. Guns,Germs and Steel, London.1977 p 394
৪. Kosambi DD. An Introduction to the study of Indian History. Bombay,1966 p 66
৫. Thapar R. A. History of India. Harmondsworth,1966 p 86
৬. Basham Al. A Cultural History of India. Oxford, 1975 p 44
৭. Maspero H. China in Antiquity. Folkestone, 1978 p 45,70
৮. https://history.howstuffsworks.com/asian-history/history-of-china.htm.accessed on 20th March,2010
৯. Gernet J.A. History of Chinese Civilisation. Cambridge, 1982 p 67,72
১০. Cho-Yun Hsu. Han Agriculture. Washington,1980 p 4-6
১১. Harman C. p 56
১২. Cho- Yun Hsu. P 3
১৩. Harman C. p 57
১৪. Roberts JM. A Short History of the World. New York,1993 p 82-88
১৫. Cameron R. A Concise Economic History of the World. New York, 1997 p 37
১৬. Osborne R. Greece in the Making. London, 1966 p 140-141
১৭. Harman C. p 71
১৮. Harman C, p 72
১৯. Sallust. The Histories vol.1. Oxford, 1992 p 24
২০. Jones AHM. The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History. Oxford, 1974 p 122
২১. Brunt PA. Social Conflicts in the Roman Republic. London, 1971 p 33
২২. Brunt PA. Italian Manpower. 225 B.C.-AD 14. Oxford,1971 p 9
২৩. Harman C. p 79
২৪. Jones AHM. p 36
২৫. Jones AHM. p 129

তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ

ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগ ধরা হয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর সময়কে। এর শুরু হয় রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে এবং শেষ হয় ষোল শতকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার আন্দোলনের সময়।[১] এই যুগকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্থবিরতার সময় বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু এই সময়কালে বাস্তবে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা ছিল। এই সময় পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে স্থায়ী নগর গড়ে ওঠে। আধুনিক সময়ের অনেক রাষ্ট্রের উৎপত্তি এই সময়কালের ঘটনাবলীর কারণে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত সবস্থানে কৃষিই ছিল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশ। পূর্বের সুমেরীয় সভ্যতা থেকে শুরু করে রোমান সাম্রাজ্যে অধিকাংশ মানুষ কৃষিতে নিয়োজিত থাকলেও নগরগুলিই সমাজ ও অর্থনীতিকে বেশী প্রভাবিত করত। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজে কৃষি যে শুধু প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছিল তাই নয়, কৃষি ও গ্রামভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের নিয়ামক শক্তি ছিল, যদিও নগরও বিস্তার লাভ করেছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সময় অত্যধিক কর আদায়, দুর্নীতি ও অপশাসনের কারণে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ভেঙ্গে পড়ে। নগর গুলির অবনতি হয় এবং ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এর উপর অষ্টম শতকে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়। এটা প্রায় দুই শতক স্থায়ী হয়। স্ক্যান্ডিনিভিয়া থেকে ভাইকিংরা আক্রমণ করে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য বিস্তার করে, ফ্রান্সের উত্তরাংশ দখল করে প্যারিস পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এমনকি ভূমধ্যসাগরেও ঢুকে পড়ে। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকা থেকে মুসলিমরা স্পেন অধিকার করে নেয় এবং সিসিলি, কর্সিকা এই সমস্ত দ্বীপ দখল করে ভূমধ্যসাগরে একক আধিপত্য স্থাপন করে। নবম শতাব্দীতে ম্যাগিয়ার গোষ্ঠীসমূহ কার্পাথিয়ান পর্বত অতিক্রম করে মধ্য ইউরোপ আক্রমণ করে। তারা উত্তর ইতালী, পূর্ব ফ্রান্স, ও দক্ষিণ জার্মানী অঞ্চলে লুটপাট ও ধ্বংস করে পরবর্তী শতকে হাঙ্গেরীতে বসবাস শুরু করে।

এইসব আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য মধ্য ইউরোপের ফ্রাঙ্ক রাজারা এক ধরনের সামাজিক কাঠামো তৈরী করে। যুদ্ধের জন্য অশ্বারোহী যোদ্ধা প্রয়োজন ছিল। কর সংগ্রহের কার্যকর কোন ব্যবস্থা না থাকায় রাজার পক্ষে তাদের ভরণপোষণ করার উপায় ছিল না। এ ছাড়া তাদের রাজ্যের প্রশাসন চালানর জন্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে সব কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল, তাদেরও বেতন দেওয়ার কোন পথ ছিল না। রাজারা তাই রাজ্যের এক একটি অংশ এক একজন শাসকের (যাদের পরিচিতি ছিল কাউন্ট, ডিউক বা মার্কুই নামে) দায়িত্ব দিয়ে দিত। এই শাসকেরা এইসব ছোট ছোট এলাকার প্রশাসন চালু রাখত, কর আদায় করত ও সৈন্য ভরণ পোষণ করত।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ম্যানর পদ্ধতি নামে আর এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার ফলে অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা অনেক প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বড় খামার স্থাপন করে। এগুলো ল্যাটিফান্ডিয়া (Latifundia) নামে পরিচিত ছিল। স্যারাসেন, ম্যাগিয়ার ও ভাইকিংদের আক্রমণের ফলে শাসকশ্রেণীর মধ্যে আক্রমণকারীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। জমির কৃষকেরা আইনের দ্বারা ভূমি দাস ছিল, যেসব স্থানে এই আইন ছিল না সেখানেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার কারণে কৃষকের নির্দিষ্ট জমির কাজ ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া বা কাজ করা সম্ভবপর হত না। ম্যানর ব্যবস্থার প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় নবম শতাব্দীতে। সেই সময় উত্তর ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও উত্তর ইতালীতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে এটা ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল ও পূর্ব ইউরোপেও বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন এলাকায় ম্যানর ব্যবস্থার কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও তার একটা সাধারণ গড়ন ছিল। ম্যানর বা বড় কৃষি খামার এর এক অংশ জমি ছিল মালিকের নিজের। এই জমির সঙ্গে তার নিজের বাসভবন, বাগান, শস্যের গোলা থাকত, আরও থাকত ঘোড়ার আস্তাবল, কামার ও কাঠমিস্ত্রীদের কাজ করার জায়গা। আর এক অংশ থাকত কৃষকদের জমি। পশুচারণ ক্ষেত্র, মাঠ, বনভূমি থাকত সর্বসাধারণের। কিন্তু মালিক এটার তত্ত্বাবধান করত। কৃষকেরা ম্যানর মালিকের বাসস্থানের কাছাকাছি গ্রামে ছোট ছোট বাড়ীতে থাকত।

কৃষকদের ম্যানর মালিকের জমিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে হত। বাকী সময় তারা তাদের জমিতে কাজ করত। জমি চাষ করা, বীজ বোনা ও ফসল কাটা যৌথভাবেই কৃষকেরা করত। এ ছাড়াও তাদের ম্যানর মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হত। মালিকের বাড়ী, বাগান, আস্তাবলেও কৃষক ও তার পরিবারের সদস্যদের বিনা পারিশ্রমিকে অথবা সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করতে হত।

গ্রামের সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ থাকলেও সামগ্রিকভাবে বিভাজন করলে তিন প্রধান স্তরে ভাগ করা যায়। উপরের স্তরে থাকত শাসক ও বিত্তবান শ্রেণী, এর মধ্যে রাজা থেকে শুরু করে আঞ্চলিক শাসক ও বড় ভূস্বামীরা অন্তর্গত ছিল। জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগ বা তার কম হলেও এরাই শাসন কাজ চালাতেন, শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন, শত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষা করতেন। এর পরের স্তরে থাকত ধর্মযাজকেরা, এদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের ভাগ ছিল। ধর্মযাজকদের উচ্চতর পদগুলো (যেমন বিশপ ও এ্যাবট) সমাজের উঁচুতলার ছেলেদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। নিম্নতর পদগুলো গরীব ঘরের ছেলেরা পেত।

সমাজে দাস ছিল। তবে নবম শতাব্দীতে এসে দাসের সংখ্যা কমে আসে। এরপর উচ্চবিত্ত লোকদের গৃহভৃত্য হিসাবেই পুরোপুরি দাস বলা যায়- এমনটি পাওয়া যেত। কিন্তু দরিদ্র কৃষকদের এমনই অবস্থা ছিল যে, তারা নামে দাস না হলেও কাজে তাই ছিল। তাদের নিজস্ব জমি জমা ছিল না, এমনকি জমির মালিকের অনুমতি ছাড়া তারা বিবাহ করতেও পারত না। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এই ধরনের বাঁধন কমতে থাকে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে এগুলি থেকে যায় এমনকি আরও শক্তিশালী হয়।

ম্যানর কেন্দ্রীক সমাজ ব্যবস্থায় মালিকের জন্য কতটা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে হবে তা নির্ভর করত কৃষকের নিজের কত পরিমাণ জমি ভোগ দখলের ইজারা থাকত তার উপর। কোন জমির ইজারা যাদের ছিল না তাদের সপ্তাহের তিন চার দিনই ম্যানর মালিকের কাজ করতে হত। যাদের জমির ইজারা ছিল তাদের কম শ্রম দিতে হত। কৃষক পরিবারের মেয়েরা সুতা ও বস্ত্র তৈরী করত, অনেক ক্ষেত্রে ম্যানর মালিকের কারখানায়, কখনও নিজেদের ঘরে। অনেক কৃষক পরিবারের ছেলে মেয়েরা ম্যানর মালিকের বাড়ীতে গৃহভৃত্যের কাজ করত। তাছাড়াও ম্যানর মালিককে জমির ইজারার জন্য কৃষকেরা খাজনা দিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে একজন কৃষক তার আয়ের অর্ধেকটাই খাজনা দিত বলে হিসাব করা হয়েছে। এছাড়া ফসলের এক দশমাংশ দিতে হত গীর্জাকে। কম জমির ইজারাদাররা জমির আয় থেকে সংসার চালাতে পারত না। তারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কৃষকদের জমিতে অতিরিক্ত শ্রম দিয়ে আরও কিছু আয় করত।

এই ম্যানর প্রথা কয়েক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। তৎকালীন সমাজে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। ব্যবসা বাণিজ্য ছিল কম, প্রযুক্তি ছিল কম উৎপাদনশীল। এর মধ্যেও ম্যানর ব্যবস্থা এক ধরনের সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে ও একটা সহনীয় পর্যায়ে জীবন যাত্রা চালু রাখে। মধ্যযুগে কৃষিতে দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়, প্রথমটি হচ্ছে এর আগের দুই পালাক্রমে শস্য আবাদ পদ্ধতির পরিবর্তে তিন পালাক্রমের শস্য আবাদ পদ্ধতির প্রচলন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে চাকাযুক্ত ভারী লাঙ্গলের ব্যবহার।

এই যুগের আগে দুই পালাক্রমে জমি চাষ করা হত। এটা প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শুষ্ক আবহাওয়ার উপযোগী ছিল। এই পদ্ধতিতে এক বছর জমিতে শস্য আবাদ করা হলে পরের বছর আবাদ না করে ফেলে রাখা হত। এতে জমির উর্বরতা বজায় থাকত ও জমির আর্দ্রতাও থাকত। উত্তর পশ্চিম ইউরোপ, রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার আগে সেখানকার অধিবাসীরা স্থায়ীভাবে জমিতে চাষাবাদ করত না। এই অঞ্চলের বিভিন্ন গল (Gaul) ও জার্মানিক (Germanic) গোত্রগুলি প্রধানতঃ তাদের গরুর পালের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা গাছপালা পুড়িয়ে জমি পরিষ্কার করে ফসলও বুনত। জমির উর্বরতা কমে গেলে তারা গরুর পাল নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেত। রোমানরা এসে সেই অঞ্চলে দুই পালাক্রমের ফসল আবাদ শুরু করল। কিন্তু তাদের হালকা লাঙ্গল এখানকার শক্ত জমি চাষ করে আবাদ করার উপযুক্ত ছিল না। সেই কারণে তাদের চাষাবাদ এই অঞ্চলের অল্প কিছু অপেক্ষাকৃত কম শক্ত জমিতে সীমিত ছিল। ফলকযুক্ত ভারী লাঙ্গলের উৎপত্তির স্থান ও সময় জানা নেই। কিন্তু এর ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে উত্তর পশ্চিম ইউরোপের উর্বর কিন্তু শক্ত জমি চাষ করা সম্ভব হল। এতে উল্লেখযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ল, তবে ভারী লাঙ্গল ব্যবহার করতে কয়েকটি বলদের প্রয়োজন হত।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ফ্রান্সে প্রথম তিন পালাক্রমের আবাদ শুরু হয়। এই পদ্ধতির একটি উদাহরণ হলঃ প্রথম যব বা ওট বসন্তকালে বুনে গ্রীষ্মকালে তোলা হত, এরপর আর একটি ফসল (গম অথবা রাই) হেমন্তকালে বুনে পরবর্তী গ্রীষ্মকালে তোলা হত। তারপর জমি এক বছর আবাদ না করে রাখা হত। তিন পালাক্রম পদ্ধতিতে জমির উৎপাদন প্রায় এক তৃতীয়াংশ বেশী হত এবং বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদন সম্ভব হত। এই কারণে যেখানে মাটি ও আবহাওয়া এই পদ্ধতির উপযোগী ছিল, সেই সব অঞ্চলে এই পদ্ধতির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। একাদশ শতাব্দী নাগাদ উত্তর ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, দক্ষিণ ইংল্যান্ড, হল্যান্ড এই সব এলাকায় তিন পালাক্রমের শস্য আবাদ প্রচলিত হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বেশীরভাগ স্থানেই দুই পালাক্রমের আবাদ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে।

কৃষিতে আরও কিছু পদ্ধতিগত উন্নতি এই যুগে করা হয়। লোহা তৈরীর পদ্ধতি উন্নত হওয়ায় বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতিতে লোহার ব্যবহার বাড়ে। লাঙ্গলের ফলায় লোহার ব্যবহার শুরু হয়। লোহার তৈরী কাস্তে, কুড়াল, কোদাল, ইত্যাদি ব্যবহার হতে থাকে। গৃহপালিত প্রাণীর বর্জ্য বহুকাল আগে থেকেই সার হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছিল, কিন্তু এই যুগে সে গুলো সংগ্রহ করার আরও সংগঠিত উদ্যোগ নেওয়া হয়। ত্রয়োদশ শতকে মটর ও ক্লোভার (clover) এর আবাদ করে সেগুলো আবার লাঙ্গল দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রচলন হয়। এর দ্বারা উর্বরতা বাড়ান হত। ফসলের ক্ষেত্রেও নুতনত্ব আসে। রাই (rye) ও ওট (oat) মধ্যযুগের আগে ইউরোপে খুব কম স্থানেই আবাদ হত। মধ্যযুগে এইগুলি উত্তর ও পূর্ব ইউরোপে ব্যাপকভাবে চাষ হতে থাকে। মটর, মসুর ও শীম পূর্বের চাইতে অনেক বেশী স্থানে আবাদ শুরু হয়। অনেক শবজী ও ফল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, এমনকি এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে মধ্য ও উত্তর ইউরোপে নিয়ে এসে ফলন শুরু করা হয়। অনেক ফলের উন্নত জাত কলম (grafting) এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়। কলম করার পদ্ধতিটি উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত স্পেনীয় মুররাই (moor) ইউরোপে নিয়ে আসে। এই মুসলিম মুরদের কাছ থেকে ইউরোপীয়রা তুলা, ইক্ষু, লেবু জাতীয় ফল ও ধান চাষ শিখে। ইতালীর একটা বড় অঞ্চলে শেষ পর্যন্ত ভাত প্রধান খাদ্যের স্থান নেয়। মুসলিম সভ্যতার মাধ্যমে তুঁত গাছের চাষ ও রেশম উৎপাদন এর পদ্ধতি আসে উত্তর ইতালীতে ও উৎপাদন শুরু হয়। বস্ত্র উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে প্রাকৃতিক কাপড়ের প্রাকৃতিক রং, যেমন ম্যাডার (madder), জাফরান, ওড (woad) এর উৎপাদনও বাড়ে। সংকর প্রজাতি সৃষ্টির (cross breeding) মাধ্যমে উন্নত ধরনের পশু (যেমন অধিক দুগ্ধ উৎপাদন সক্ষম গাভী, অধিক পশম সম্পন্ন ভেড়া) তৈরী করা হয়।

সামগ্রিকভাবে প্রাচীন যুগের তুলনায় মধ্যযুগে কৃষি উৎপাদনে বিভিন্নতা আসে ও সংকর প্রক্রিয়ার উন্নতির ফলে পরিমাণও বাড়ে। পশু পালনেও উন্নতি হয়। বস্ত্র উৎপাদনও গুণগতভাবে পরিবর্তিত হয়। পশম ও লিনেনের সঙ্গে তুলা ও রেশমের তৈরী বস্ত্র উৎপাদন শুরু হয়।

পশ্চিম ইউরোপের জনসংখ্যা ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ছিল বলে অনুমান করা হয়। চতুর্দশ শতকের শুরুতে তা বেড়ে হয় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৫ কোটির মধ্যে। এর বড় কারণ সম্ভবতঃ পুষ্টির উন্নতি। খাদ্যের পরিমাণ এই সময় বেড়েছিল এবং খাদ্যের বৈচিত্রও এসেছিল, ফলে সামগ্রিক পুষ্টির উন্নতি ঘটেছিল। স্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে একদিকে যেমন রোগের কারণে মৃত্যুর হার কমল, তেমনি জন্মের হার বাড়ল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল বড় কারণ।

এই বর্ধিত জনসংখ্যার একটি ছোট অংশ শহরবাসী হয়। বাকী অংশ গ্রামগুলিতেই কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে। মোটামুটি তিন ধারায় এই অংশ ভাগ করা যায়। একভাগে বর্ধিত জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের গ্রামেই থেকে যায়, সে কারণে সেখানে পরিবার প্রতি আবাদী জমির পরিমাণ কমে। দ্বিতীয় অনেক অনাবাদী এলাকা পরিষ্কার করে নতুন স্থানে আবাদ শুরু করা হয় এবং নতুন বসতি হয়। দশম শতকের শুরুতে উত্তর পশ্চিম ইউরোপে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম ছিল অনেক দূরে দূরে। এগুলির মধ্যে ছিল অনাবাদি জমি বা-জঙ্গল। হল্যান্ড অঞ্চলে সাগরে বাঁধ দিয়ে নতুন জমি উদ্ধার করে চাষ করা হয়। এই সব এলাকার যারা শাসনকর্তা বা অধিপতি ছিলেন তারা জন বসতি বাড়ানর জন্য যারা অনাবাদি জমি বা জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ শুরু করত তাদের জমির মালিকানা দিয়ে দিত। ফলে তারা মালিককে খাজনা দিত কিন্তু কয়েক দিক থেকে অর্থনৈতিকভাবে অধিপতিদের থেকে ছাড় পেল। যেমন-জমির মালিকানা স্বত্ব পেল, অধিপতিকে বিনামূল্যে শ্রম দেওয়া থেকে ছাড় পেল। তৃতীয়তঃ ভৌগলিকভাবে নতুন নতুন অঞ্চলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ল। আইবেরিয়ান উপদ্বীপ (স্পেন

ও পর্তুগাল সমন্বয়ে) অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রায় ৪০০ বৎসর মুসলিম মুরগণ শাসন করে। এই মুররা ছিল কৃষিতে অত্যন্ত দক্ষ, তাদের শাসনামলে রাজধানী কর্দোভা ছিল পশ্চিম ইউরোপের সবচাইতে বড় শহর ও বিদ্যাচর্চার সবচাইতে বড় কেন্দ্র। ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ পীরেনিজ পর্বত এর উত্তর অর্থাৎ ফ্রান্স থেকে আসা খ্রিষ্টানরা প্রায় সম্পূর্ণ উপদ্বীপ দখল করে নেয়। ত্রয়োদশ দশকের শেষদিকে পশ্চিম ইউরোপীয় নরম্যানরা মুসলিমদের কাছ থেকে সিসিলি দখল করল এবং তারপর দক্ষিণ ইতালী থেকে মুসলিমদের বিতাড়িত করে। জার্মান জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা দশম শতকের পর পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া এ সব অঞ্চলে দশম শতকের আগে আদিম স্লাভিক (slavic) জাতিগোষ্ঠীরা বাস করত। এরা সংখ্যায় খুব কম ছিল এবং শিকার করে ও ফলমূল আহরণ করে (hunter & gatherer) জীবন যাপন করত। বেশীর ভাগ জায়গায় জনবসতি ছিল না। জার্মান জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা এই অঞ্চলগুলিতে তাদের উন্নত কৃষিপদ্ধতি চালু করল। তারা নগর ও নগরকেন্দ্রিক ছোট ছোট শিল্পও গড়ে তুলল। সময়ের সাথে সাথে রোমান ধর্মযাজকেরা এদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করল। ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ এই অঞ্চলে উৎপাদিত গম ও অন্যান্য শস্য বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগর দিয়ে পোল্যান্ড ও জার্মানী থেকে হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে রফতানী শুরু হল। ক্রুসেড (crusade) শুরু হয় ১০৯৫ সালে। ইউরোপের খ্রিষ্টানরা জেরুজালেম পুনরুদ্ধার এর নামে আক্রমণ শুরু করে। কয়েক দফায় যুদ্ধ প্রায় একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর ফলে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটানর জন্য রসদ সরবরাহ বাড়ে এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের আগে থেকেই অর্থনৈতিক অবনতির ফলস্বরূপ নগর সমূহের জনসংখ্যা কমতে শুরু করেছিল। কোন কোন শহর একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়েছিল, কোন কোনটায় মানুষ খুবই কমে গিয়েছিল। এই শহরগুলো তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আহরণ করত। কিন্তু দূর-দূরান্তের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য খুবই কমে গিয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীর আগে ইতালীর নগরগুলি পূর্ব ভূমধ্যসাগরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। সপ্তম থেকে দশম শতক পর্যন্ত পূর্ব দিকের এই অঞ্চলগুলি ছিল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এলাকা। পশ্চিম ইউরোপ ছিল পশ্চাদপদ ও দরিদ্র। এই দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য চালিয়ে ইতালীর নগরগুলি লাভ করত। রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলে ইতালীর নগরগুলির অবক্ষয় হলেও এই বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা টিকে ছিল। একাদশ শতাব্দী থেকে নগরগুলি আবার উন্নতি শুরু করল। কৃষি উৎপাদন বাড়ল, গ্রামের মানুষ নগরগুলিতে গিয়ে ব্যবসা ও শিল্পে কাজ নিল। এই উন্নতির ফলে গ্রামাঞ্চলে ম্যানর প্রথা আস্তে আস্তে ভাঙ্গতে লাগল। বিনা পারিশ্রমিকে মালিককে শ্রম দেওয়ার বদলে পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রথা চালু হল। ম্যানর এর সাধারণের জন্য উম্মুক্ত জমিও ভাগ ভাগ করে আলাদা করা হল। জলসেচ ও সার ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ান হল।

আঞ্চলিক রাজা-রাজড়া বা বড় ভূস্বামীরা নগরগুলিতে কর্তৃত্ব চালাতে চাইলেও ধনী ব্যবসায়ী ও অন্যান্য নগরবাসীদের যৌথ চাপের মুখে প্রশাসনে পরিবর্তন ঘটে। প্রথমদিকে নগরবাসীরা সমিতি গঠন করে, পরবর্তীতে তারা নগর সরকার গঠন করে এবং রাজাদের কাছে স্বাধীনভাবে প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। কোন কোন জায়গায় তাদের এজন্য যুদ্ধও করতে হয়। ১০৩৫ সালে মিলান যুদ্ধ করে এই স্বাধীনতা অর্জন করে। এই নগর রাষ্ট্রগুলি তাদের আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে তাদের শাসন ব্যবস্থা বিস্তার করে। ইতালীতে এইভাবে অনেকগুলি নগর রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে এটা হয়নি। অন্যান্য অঞ্চলে নগরায়ন দেরীতে শুরু হয় এবং এতটা শক্তি অর্জন করতে পারেনি। জার্মানী, ফ্রান্স, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় নগরভিত্তিক কর্মকান্ড বাড়তে থাকে। কিন্তু আঞ্চলিক রাজাদের আধিপত্য থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারেনি। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে যেখানে মিলানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ এবং ভেনিস, জেনোয়া ও ফ্লোরেন্স প্রত্যেকটিতেই এক লক্ষের বেশী, সেখানে লন্ডনের জনসংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার এর কাছে এবং জার্মানীর কোলন এর জনসংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার এর মত।

একমাত্র যে অঞ্চল উত্তর ইতালীর সমৃদ্ধ নগরগুলির কাছাকাছি যেতে পেরেছিল সেটা হল ইউরোপের উত্তরাঞ্চল যা ″Low countries″ নামে পরিচিত। ″Low countries″ মধ্যযুগের ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের একটি এলাকা । এটি রাইন ও আরও কয়েকটি নদীর ব-দ্বীপ জুড়ে অবস্থিত। বর্তমান নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ এবং উত্তর ফ্রান্স ও পশ্চিম

জার্মানীর কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে এই এলাকা গঠিত ছিল।[২] মোট জনসংখ্যা অনুপাতে নগরবাসীর সংখ্যা প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল (উত্তর ইতালীর কাছাকছি)। এই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি ছিল অগ্রবর্তী এবং এই অঞ্চল শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যেও ছিল অগ্রগণ্য। দ্বাদশ শতকে নগরায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে উন্নতি হয়।

একাদশ শতাব্দীর আগেও ইতালী ও লেভান্ট (levant) (পূর্ব ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চল বর্তমান সাইপ্রাস, ইসরাইল, জর্ডান, প্যালেষ্টাইন, লেবানন,সিরিয়া ও দক্ষিণ তুরস্ক) এর মধ্যে পণ্য আদান প্রদান হত। এই ব্যবসায় প্রধানতঃ পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা মূল ভূমিকা পালন করত। এই ব্যবসায় যেসব পণ্য সামগ্রী ইউরোপে আনা হত সেগুলি বিলাসদ্রব্য বলে গণ্য করা হত, সিল্কের কাপড় ও চীনামাটির তৈজষ সামগ্রী আসত চীন থেকে, বিভিন্ন মসলা আসত মালাক্কা থেকে, ব্রকেড (brockade) আসত পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে। এছাড়াও সিরিয়া থেকে তুলা আসত, বদলে পাঠান হত উত্তর ইউরোপ থেকে উল ও লিনেনের কাপড়, ভেনিস থেকে কাঁচের তৈরী জিনিস, মধ্য ইউরোপ থেকে ধাতুর তৈরী কাজের জিনিষ। ইতালীর নগর রাজ্যগুলির মধ্যে ভেনিস ব্যবসা বাণিজ্যে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। আর একটি নগর রাজ্য জেনোয়া যুদ্ধে উত্তর আফ্রিকার মুর মুসলমানদের পরাজিত করে উত্তর আফ্রিকায় বাণিজ্য স্থাপন করে। অন্যান্য ইতালীর নগরগুলির সঙ্গে জেনোয়া ও ভেনিস পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে নেয়। তারা কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত নৌ বাণিজ্য বিস্তার করে। ক্রুসেডের ফলেও তাদের বাণিজ্যের কমতি হয় নি।

আরেকটি বাণিজ্য পথ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠে। এটা মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সময় ঘটে। মঙ্গোল সাম্রাজ্য পূর্ব ইউরোপ থেকে পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেটা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচাইতে বড় সাম্রাজ্য। মঙ্গোল সম্রাটরা নিষ্ঠুর প্রকৃতির বলে পরিচিত হলেও তারা ব্যবসা বাণিজ্যে বাধা দেয় নাই। The great silk route নামে পরিচিত এই পথে ইউরোপ থেকে মধ্যএশিয়া হয়ে চীন পর্যন্ত বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। তাছাড়া স্থলপথে পারস্য পর্যন্ত গিয়ে তারা নৌপথে ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য চালাত। বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কোপোলো এই পথে যাত্রা করে তাঁর বিবরণ লিখে গেছেন।

ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অংশের বাণিজ্য ছিল দুই ধরনের। প্রথমতঃ প্রাচ্যদেশ থেকে আসা বিলাসদ্রব্য পশ্চিমাঞ্চলে বিতরণ করা; দ্বিতীয়তঃ খাদ্যশস্য, শুকানো মাছ, লবণ, ভোজ্যতেল, মদ (wine) এই অঞ্চলের উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় নিয়ে বিক্রি করা। এই ব্যবসায় ইতালীয়রা প্রধান হলেও স্পেনের অধিবাসীরা এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলিমরাও অংশ নিত।

উত্তর ইউরোপে উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগর এলাকায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ানেরা বাণিজ্য চালাত। কিন্তু মধ্যযুগের পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে জার্মানরা এখানে প্রাধান্য বিস্তার করে। জার্মানীর প্রায় ২০০ নগর সহযোগিতা করে এই অঞ্চলে বাণিজ্য করতে থাকে। ১৩৬৭ সালে ডেনমার্কের রাজা তাদের বাণিজ্য কমিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার পর তারা "হানসা" (Hansa) নামে সংগঠিত হয়ে বাণিজ্য চালাতে থাকে। ইউরোপের প্রায় সব বড় বড় শহরে তারা সহযোগিতা করে জার্মান এলাকা গড়ে তুলে। রিগা, ডানজিগ এগুলি ছিল বিদেশে পুরোপুরি জার্মান শহর।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল পণ্যদ্রব্য তৈরীতে বিশেষত্ব অর্জন করতে শুরু করে। ইংল্যান্ড ভেড়ার উল তৈরীতে, বেলজিয়াম ও হল্যান্ড উলের কাপড় তৈরীতে, উত্তর ফ্রান্স মদ (wine) তৈরীতে, বাল্টিক সাগর অঞ্চল খাদ্যশস্য তৈরীতে এবং উত্তর ইউরোপ শুকনো মাছ তৈরীতে দক্ষতা অর্জন করে। পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ জাহাজগুলো উত্তরে মদ ও লবণ নিয়ে যেত এবং উত্তর ইউরোপ থেকে শুকনো মাছ নিয়ে আসত।

স্থলপথে মালপত্র আনা নেওয়া করার চাইতে সমুদ্রপথে এটা করলে ব্যয় অনেক কম হয়। মধ্যযুগে যখন রেলগাড়ি বা মটর যান ছিল না তখন এটা আরও সত্য ছিল, কাজেই অধিক মালপত্র বহন সমুদ্রপথেই হত। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হত না। উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপের মধ্যে সমুদ্র পথ এত দীর্ঘ ও বিপজ্জনক ছিল যে এই পথে খুব কম বাণিজ্য হত। চতুর্দশ শতাব্দীতে জাহাজ নির্মাণ ও সমুদ্র যাত্রার কলাকৌশলের উন্নতি হওয়ায় সমুদ্র বাণিজ্য বাড়তে থাকে। এর আগে ইউরোপে দক্ষিণ ও উত্তর এর মধ্যে যোগাযোগ আল্পস পর্বতের কয়েকটি গিরিপথ হয়ে চলত। স্থল পথে এই যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন রাজ্য কর আদায় করত আবার নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করত । মালপত্র আনা নেওয়ার জন্য কয়েকটি কোম্পানীও গড়ে ওঠে।

প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো ছিল দক্ষিণে মিলান ও জেনোয়া নগর রাজ্য ও উত্তরে হামবুর্গ, ভিয়েনা, ক্র্যাকো (Cracow) লুবেক (Lubek) ও ব্রুগে (Bruges)। আল্পস পর্বতের উত্তরে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে কতকগুলো বড় পণ্য বাজার (যে গুলি fair নামে পরিচিত) গড়ে ওঠে। এর মধ্যে লিপজিগ ও ফ্রাঙ্কফোর্ট এ বড় বাজার ছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল উত্তর ফ্রান্সের শ্যাম্পেন নামক অঞ্চলের চারটি বড় শহর। শ্যাম্পেন এর অধিকর্তারা কাউন্ট (count) নামে পরিচিত। তারা এখানে বাজার বসার ব্যবস্থা করত, নিরাপত্তা দিত, এবং কোন বিবাদের জন্য বাণিজ্যিক আদালতের ব্যবস্থাও করেছিল। এই অঞ্চলের চারটি শহরে পালাক্রমে সারা বৎসরই বাজার বসত। এখানে ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা পণ্যের সঙ্গে ফ্রান্স ও জার্মানীর পণ্য এবং স্পেনের পণ্যের আদান প্রদান হত। এই বাজারগুলিতে বানিজ্যিক বিবাদ সমাধান করার জন্য আদালত সৃষ্টি করা হয় এবং অর্থ আদান প্রদানের জন্য ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় যেমন: (letter of credit)। এগুলো ব্যবসা বাণিজ্যে গূণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। বাজারগুলোর ব্যবসা বাণিজ্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর কমে গেলেও এই আর্থিক ব্যবস্থাপনা গুলোর প্রভাব থেকে যায়।

ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে সমুদ্রপথে পণ্য আদান প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি হয় জাহাজ চলাচল প্রযুক্তির উন্নতির কারণে। ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তর সাগর পর্যন্ত জাহাজের বহর চলা সম্ভব হয়। এতে স্থলবাণিজ্য কমে আসে। এর ফলে আগের ছোট ছোট বাণিজ্যিক সংস্থার তুলনায় অনেক বড় বাণিজ্যিক ও আর্থিক (financial) কোম্পানী গঠিত হয়। এইসব কোম্পানীগুলোর প্রধান দপ্তর ইতালীর নগর রাজ্যগুলিতে থাকত কিন্তু তাদের শাখা ইউরোপের অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে ছিল। এই পরিবর্তনকে "commercial revolution" বলে অনেকে আখ্যায়িত করেছেন।

এই ধরনের ব্যবসায় কেউ কেউ নিজের মূলধন খাটিয়ে কাজ করত। সময়ের সাথে সাথে একাধিক ব্যক্তির মূলধন যোগ করে ব্যবসা শুরু হল। এর মধ্যে একজন মালামাল নৌপথে নিজে নিয়ে যেত, অন্যেরা মূলধন খাটাত এবং কেউ কেউ মালামাল সংগ্রহ বা সরবরাহ করত। এটা commenda নামে পরিচিত ছিল। বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বাড়তে থাকলে একটি ভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক সংগঠন তৈরী হতে থাকল যার নাম হল vera societa।[৩] এই সংগঠনে অংশীদারের সংখ্যা থাকত অনেকজন। এই সংগঠন গুলোর বেশীর ভাগই ইতালীর নগরগুলি (ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলান)তে গড়ে ওঠে। এরা ব্যবসা বাণিজ্য পণ্য আনা নেওয়া ছাড়াও টাকা জমা রাখা, খাটান ও ধার দেওয়া এই সব কাজ করত। এদের অনেকের নিজস্ব জাহাজের বহর ও স্থলপথে চলাচলের উপযোগী মালবাহী ঘোড়ায় টানা গাড়ীর বহরও ছিল। এদের শাখা ইউরোপের অনেক শহরে থাকত। টাকা ধার নিয়ে বাণিজ্যে খাটানর প্রথাও চালু হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে জাহাজ ও তার পণ্য বীমা করার ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে।

মধ্যযুগের বাণিজ্যে ব্যাংক ও টাকা ধার দেওয়া (credit) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। দ্বাদশ শতক থেকেই উত্তর ইতালীর ভেনিস ও জেনোয়াতে টাকা জমা রাখার জন্য ব্যাংক চালু হয়। পরবর্তীতে এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে অর্থ পাঠান শুরু হয়। প্রথমে এক ব্যাংকেই টাকা জমা রাখা ও তোলা এভাবেই শুরু হয়। পরবর্তীতে এক ব্যাংক হতে অন্য ব্যাংকে টাকা পাঠান বা একজনের টাকা অন্যজনকে দেওয়া এটাও চালু হয়। এরও পরে ব্যাংকগুলো over draft (যে পরিমাণ টাকা জমা আছে তার চাইতে বেশী টাকা দেওয়া শুরু করে)। ইউরোপের অন্যান্য স্থানে,(যেমন- বারসেলোনা, লন্ডন, ব্রুগে) ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়। দূরবর্তী স্থানে বাণিজ্যের জন্য ব্যাংকগুলো টাকা দেওয়া শুরু করে। অনেক পরিমাণ মুদ্রা বা স্বর্ণ দূর-দূরান্তরে নেওয়ার অসুবিধার জন্য bill of exchange ব্যবহার হত বেশী।

টাকা পয়সার লেন-দেনে আরেকটি সমস্যা ছিল-বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার প্রচলন ও এদের মধ্যে মানের অনিশ্চয়তা। যেমন একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে অনেক জায়গায় পেনী নামে স্বল্পমূল্যের মুদ্রা চালু ছিল। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে রাজা, ডিউক, কাউন্ট এমনকি পাদ্রীরাও এই মুদ্রা তৈরী করত। এগুলোর আকৃতি, ওজন, ও এর মধ্যে রূপার পরিমাণ এক এক স্থানে ছিল এক এক রকম। রাজারা অর্থনৈতিক দূরবস্থায় পড়লে অনেক সময় তাদের মুদ্রায় রূপার পরিমাণ কমিয়ে আরও অধিক মুদ্রা বাজারে ছেড়ে দিত। এই পরিস্থিতিতে কিছু কিছু মানুষ, যারা মুদ্রা ব্যবসায় জড়িত ছিল, এই মুদ্রাগুলি কিনতে ও তার আসল মূল্য নির্ধারণ করতে পারত। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপে ফ্লোরেন্স থেকে সোনার "ফ্লোরিন" নামে একটি মুদ্রা চালু হয়-যার মূল্য ছিল স্থিতিশীল।

মধ্যযুগে কৃষির তুলনায় শিল্প অর্থনীতিতে অনেক ক্ষুদ্র পরিসরে ছিল। কিন্তু ক্রমেই এটার গুরুত্ব বাড়ছিল। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে নতুন উদ্ভাবন হতে থাকে এবং শিল্পের অগ্রগতি হতে থাকে। বস্ত্রশিল্প ছিল সবচাইতে বড় এবং ব্যাপক। প্রতিটি দেশের একটি অঞ্চলে বস্ত্র তৈরীর ব্যবস্থা ছিল। তবে কয়েকটি অঞ্চল বস্ত্র তৈরীতে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। এর মধ্যে ছিল উত্তর ফ্রান্স, বর্তমান বেলজিয়াম, ইতালীর উত্তরাঞ্চল, ইংল্যান্ডের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল। উল বা পশম ছিল বস্ত্র তৈরীর প্রধান কাঁচামাল। ফ্রান্স ও পূর্ব ইউরোপের অল্প কিছু অঞ্চলে লিনেন বস্ত্র তৈরী হত। রেশম ও তুলার বস্ত্র শুধুমাত্র ইতালী ও মুসলিম শাসিত স্পেনে তৈরী হত। অতীতের তুলনায় শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা কয়েকগুণ বেড়েছিল, এর প্রধান কারণ ছিল তিনটি প্রযুক্তির উদ্ভাবনঃ চাকা দিয়ে সুতা তৈরী, পা দিয়ে চালান তাঁত ও পানির শক্তি দ্বারা চালিত মিল। ইংল্যান্ড ও ফ্ল্যান্ডার্সএ ব্যবসায়ীরা তাঁতীদের কাঁচামাল সরবরাহ করত। তাঁতীরা নিজেদের বাড়ীতেই বস্ত্র তৈরী করত। ব্যবসায়ীরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে তা বিক্রি করত। ইতালীতে তাঁতীদের এক জায়গায় নিয়ে এসে তত্ত্বাবধায়কদের অধীনে বস্ত্র তৈরী করত।

বস্ত্রশিল্পের চাইতে আকারে ছোট হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধাতু শিল্প। মধ্যযুগের শেষদিকে এই শিল্পে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। প্রাচীনকাল থেকে লোহা আবিষ্কার ও লোহার তৈরী অস্ত্র ও শোভাবর্ধনের জিনিষপত্র তৈরী হলেও এগুলো তৈরীর প্রক্রিয়া ছিল কঠিন, তৈরী হত কম, দামও ছিল বেশী। ধনী ব্যক্তিরাই শুধু এগুলো ব্যবহার করতে পারত। তামা ও পিতলের তৈরী জিনিষের দাম তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও সাধারণ মানুষ এগুলো খুব কম ব্যবহার করত। মধ্যযুগে লোহা আকর আরও সহজলভ্য হয়। লোহা প্রস্তুতে সেই সময় অতি প্রয়োজনীয় কাঠ কয়লা আরও বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। লোহা তৈরীর প্রযুক্তিরও উন্নতি হয়, ফলে লৌহজাত দ্রব্যের মূল্য কমতে থাকে এবং আরও বেশী পরিমাণে পাওয়া যেতে থাকে। চামড়ার তৈরী জিনিষ আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতে থাকে। তেমনই মাটি ও কাঠের তৈরী জিনিষপত্রও বিভিন্ন প্রয়োজনে আরও বেশীভাবে ব্যবহার হত অনেক অংশে।

মধ্যযুগের কারিগররা বাস্তব প্রয়োজনের কারণে প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে। এই যুগে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা আবিষ্কৃত কোন বস্তুর ব্যবহার বাস্তবে দেখা না গেলেও ঘড়ি ও চশমার এই সময় উন্নতি হয় ও ব্যবহার শুরু হয়। কম্পাস এর ব্যবহারও এই সময় বিস্তার লাভ করে। বারুদ ও বন্দুক ও এইসময় উদ্ভাবিত হয়। যদিও এগুলি ব্যবহারের ফল পরবর্তীকালে দেখা যায়। কাগজ তৈরী ও ছাপাখানার ব্যবহারও এই যুগে শুরু হয় এবং এটার অর্থনৈতিক পরিসর কম থাকলেও এর সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল অনেক বেশী।

পানি প্রবাহের দ্বারা চাকা ঘুরিয়ে বিভিন্ন কাজ কর্মের নিদর্শন খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকেই দেখা গেছে। চীন হতে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত সব জায়গায় পানিপ্রবাহ বাহিত চাকার ব্যবহার ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড উইলিয়াম দি কনকারার (William the Conquerer) এর সময়ে ৩০০০ গ্রামে জরিপ চালিয়ে ৫৬২৪টি পানির মিল (water mill) পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকেই পানির মিলের সাহায্যে শস্য ভাঙ্গা, কাপড় তৈরী, কাগজ তৈরী, কাঠ চেরাই, লোহা তৈরীর চুল্লীর হাপর চালান ইত্যাদি কাজ করা হত। তবে যে সমস্ত অঞ্চলে পানির অভাব ছিল সেখানে পানির মিল চালানর সুযোগ ছিল না। আবার সমতল ভূমিতে পানি পাওয়া গেলেও উপর থেকে নীচে পানির প্রবাহ না থাকায় এখানেও পানির মিল বসান যেত না। দ্বাদশ শতক থেকে বায়ুচালিত মিলের প্রচলন হয়। হল্যান্ড ও ফ্ল্যান্দার্সে বায়ুচালিত মিল এর বিশেষ প্রসার ঘটে। বায়ু ও পানি চালিত মিল গুলিতে যে চালক অংশ থাকত (gear) তা বেশ জটিল ছিল। যারা এই যন্ত্রাংশ গুলি তৈরী, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করত তারা যন্ত্র, বল ও গতি সংক্রান্ত বিদ্যার বাস্তব প্রয়োগে পারদর্শিতা অর্জন করে। তারা যন্ত্রের ঘড়ি তৈরী করতে শুরু করে। চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপের প্রায় প্রতিটি শহরে কমপক্ষে একটি যান্ত্রিক ঘড়ি স্থাপন করা হয়। যন্ত্রের কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও দক্ষতা শুধু যে অর্থনৈতিক উন্নতি করেছিল তা নয়- মধ্যযুগের ইউরোপের মানুষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরও তা পরিবর্তন ঘটায়। বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সম্পূর্ণ অজানা এবং মানুষ প্রকৃতি, দেবতা ও অলৌকিক শক্তির হাতে অসহায়-এই ধারণা ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষ এটা আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে থাকে যে, বিশ্ব ও প্রকৃতিকে জানা যায়, তার শক্তিগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে কাজে লাগান সম্ভব। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ড এর জ্ঞানী ব্যক্তি রজার বেকন (Roger Beacon) লিখেছিলেন "(এটাও সম্ভব) পাল ও দাঁড় ছাড়া জাহাজ চলবে, কোন জন্তু জানোয়ার টানবে না কিন্তু গাড়ী চলবে, উড়ন্ত যান হবে, যন্ত্রের সাহায্যে নদী ও সাগরের গভীরে চলাচল করা যাবে"।

একাদশ শতকে জনসংখ্যার যে বৃদ্ধি হচ্ছিল তা ত্রয়োদশ শতকে এসে থেমে যায়। সম্ভবত যতটা জনসংখ্যা তখনকার সম্পদ ও প্রযুক্তি দ্বারা ধারণ ও প্রতিপালন করা সম্ভব ছিল তার চাইতে সংখ্যা বেশী হয়ে যায়। চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে ঘন ঘন কৃষি উৎপাদনে ধ্বস নামে এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৩১৫ থেকে ১৩১৭ সাল পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ইউরোপে একটি বড় দুর্ভিক্ষ হয় এবং মৃত্যুর হার স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দশগুণ বেড়ে যায়। এরপর ১৩৪৮ সালে শুরু হয় প্লেগ (plague)এর মহামারী। এই রোগ এশিয়া থেকে ইউরোপে আসে। দুই বৎসর যাবত মূলত শহরে মহামারী চলতে থাকে। কোন কোন শহরে অর্ধেক মানুষই মারা যায়। সমগ্র ইউরোপের জনসংখ্যা এই মহামারীর ফলে এক তৃতীয়াংশ কমে যায় বলে ধারণা করা হয়। এই রোগের নাম দেওয়া হয় "কৃষ্ণ মৃত্যু" (black death)। কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ চলে যায় না। পরবর্তী শতকে প্রতি দশ থেকে পনের বছরে একবার করে এই মহামারী হতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় যুদ্ধ। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক জুড়ে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এর মধ্যে "শত বছরের যুদ্ধ" (hundred years war) এর ফলে পশ্চিম ফ্রান্সের একটি বড় এলাকা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে আবাদী জমির পরিমাণ আর বাড়ান সম্ভব হল না। পশু চারণভূমি ও পতিত জমি যতই আবাদ হতে থাকল। ততই পশুর সংখ্যা কমে গেল, পশুর থেকে পাওয়া সারও কমল। উৎপাদন বাড়ানর জন্য জমিতে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ধরনের ফসল লাগান ও "সবুজ সার" ব্যবহার করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। রাজা ও জমিদাররা কর বাড়ায় ও কৃষি শ্রমিকদের মজুরী কমতে থাকে। এই সমস্ত কারণে "মহা দুর্ভিক্ষ" ১৩১৫-১৩১৭ এর আগে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ে। দুর্ভিক্ষের সময়কালে ফ্লেমিশ (Flemish) কৃষকদের বিদ্রোহ এর একটা বহিঃপ্রকাশ। ১৩৫৮ সালে প্রায় সমস্ত ফ্রান্স জুড়ে কৃষকরা বিদ্রোহ করে। ১৩৮১ সালে ইংল্যান্ডে বিদ্রোহ হয় যা মহা কৃষক বিদ্রোহ (great peasant revolt) নামে পরিচিত। এইসব বিদ্রোহ শাসক ও রাজ রাজড়ারা কঠিন হস্তে দমন করে। তবে এই বিদ্রোহ গুলোর পরবর্তী কাল গুলিতে রাজা ও শাসকেরা কৃষকদের মজুরী কমানর ব্যাপারে এবং কর আদায়ের ব্যাপারে দমন নিপীড়ন আর আগের মত চালাতে পারত না। পশ্চিম ইউরোপে কৃষকদের আয় বাড়ে। চতুর্দশ শতকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ধ্বংসের পর সমৃদ্ধির কাল আসে। পূর্ব ইউরোপে জনসংখ্যা আগেও কম ছিল। প্লেগ মহামারীর পর শহরগুলি প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। গ্রামে জমির মালিকেরা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করে। পশ্চিম ইউরোপের শহরগুলিতে মহামারীর পর জনসংখ্যা কমে গেল, ব্যবসা বাণিজ্যও কমে গেছিল। পঞ্চদশ শতকে ধীরে ধীরে জনসংখ্যা, উৎপাদন, ও ব্যবসা বাড়তে থাকল। ষষ্ঠদশ শতকের শুরুতে জনসংখ্যা ও কাজকর্ম অন্য যে কোন সময়ের চাইতে বেশী ছিল।

তথ্যসূত্রঃ

১. Burrow J. A History of Histories; Epics, Chronicles and Inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century. London, 2009 p 416
২. http://en.wikipedia.org/wiki/low_countries, accessed 01 April, 2010
৩. Rondo C. A Concise Economic History of the World From Paleolithic Times to the Present. Oxford. 1997 p 66

চতুর্থ অধ্যায়

নবজাগরণ ও সংস্কার Renaissance to Reformation

পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপে রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা হয়। এর ফলে মানুষের জীবনযাপনের পদ্ধতি বদলে যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের গঠনের নতুন পদ্ধতি চালু হয়। এই নতুন ধরনের রাষ্ট্র কয়েক রকম আকারে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস বর্ণনায় বিভিন্ন এলাকার "দেশ ও রাষ্ট্র" সম্বন্ধে বলা হয়। কিন্তু সেই সময়কার দেশ বা রাষ্ট্রের গঠন আধুনিক যুগের রাষ্ট্রের গঠনের চাইতে অনেকটা ভিন্ন ধরনের ছিল। আধুনিক যুগের রাষ্ট্র বলতে আমরা ধরে নেই তার একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানার মধ্যে একটি প্রশাসনিক কর ও শুল্ক কার্যক্রমের কাঠামোর আওতায় একটি জনগোষ্ঠী থাকবে। এই সীমানার মধ্যে মালপত্র আনা নেওয়ায় কোন আমদানি রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হবে না। এটাও ধরে নেওয়া হয় যে এই সীমানার মধ্যে জনগণ প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। বিনিময়ে তারা এই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকবে। সাধারণত রাষ্ট্রের এক বা একাধিক স্বীকৃত ভাষা থাকে এবং সাধারণ নাগরিক ও শাসক বর্গ উভয়েই এই ভাষা বা ভাষাসমূহ ব্যবহার করেন।

মধ্যযুগে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির এই চরিত্র ছিল না। প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এবং একই ভাষা ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর উপর ভিত্তি না করে রাষ্ট্র গঠিত ছিল। ইংল্যান্ডের রাজা ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে বর্তমান ফ্রান্সের এক অংশে ফ্রান্স ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর উপর আধিপত্য রাখার যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফ্রান্সের রাজারা আল্পস পর্বত পেরিয়ে উত্তর ইতালীতে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। কিন্তু পূর্ব ফ্রান্স, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্স তাদের দখলে ছিল না। বিবাহ সূত্রে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজারা অন্য কোন রাজ্য বা রাজ্যের অংশ পেয়ে যেতেন। এই রাজ্য তাদের নিজের রাজ্য থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হতে পারত। কখনও কখনও যুদ্ধের ফলে রাজ্য স্থানান্তর হত। রাজ্যের একীভূত প্রশাসন, কর ও শুল্ক ব্যবস্থা বিরল ছিল। বেশীর ভাগ রাজ্য খন্ড খন্ড এককে বিভক্ত ছিল। সেগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত হত: ব্যারনী (Barony), বরো (Borough) ইত্যাদি। এগুলির নিজস্ব প্রশাসন, কর ব্যবস্থা, শুল্ক এমনকি আলাদা আইন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আদালত থাকত। রাজার প্রতি আনুগত্য অনেক ক্ষেত্রেই ছিল নাম মাত্র। অনেক সময় অন্য রাজার কাছে বেশী সুবিধা পেলে এই আঞ্চলিক শাসকরা আনুগত্য পরিবর্তন করত। রাজারা তাদের প্রজাদের ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করত না। সরকারী দলিলপত্র প্রায়ই ভিন্ন ভাষার হত।

পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক থেকে পরিবর্তন শুরু হল। রাজারা তাদের রাজত্যের উপর আরও কর্তৃত্ব স্থাপন করা শুরু করল। তবে এই প্রক্রিয়া বহুকাল ধরে চলে। স্পেনের রাজারা তাদের কাটালান (Catalan), ভ্যালেন্সিয়ান (Valencian), কাষ্টিলিয়ান (Castilian), আরাগনিজ (Aragonse), অংশ গুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানর জন্য প্রচেষ্টা শুরু করল, সাথে সাথে দেড় শতক ধরে ইতালি ও Low countries এর কর্তৃত্ব রাখার জন্য যুদ্ধ চালাতে থাকল। ফ্রান্সের রাজারা আঞ্চলিক শাসকদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছিল, তারপরও পৃথক আঞ্চলিক আইন ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীন মাল আদান-প্রদানে শুল্ক ব্যবস্থা বন্ধ করতে পারেনি।

পরিবর্তন হয়ে যে নতুন রাজ্যগুলো রূপ নিল সেগুলোর কর্মকান্ডও কিছুটা আলাদা ছিল। মূলত সামন্ত প্রথার উপর ভিত্তি করে হলেও কৃষি বহির্ভূত উৎপাদন ও এগুলোর আদান-প্রদানে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানও এ রাজ্যগুলো শুরু করল। ফলে কৃষি ভিত্তিক সামন্ততন্ত্র ও নগর ভিত্তিক ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে একটা সমতা তৈরী হল। তবে এই রাজারা রাজ্য জয় করে তাদের শাসনাধীন এলাকা বাড়ান-এই পুরাণ পদ্ধতি ছেড়ে দেয়নি।

ফার্দিনান্দ ও ইসাবেল মুসলিম মুরদের পরাজিত করে গ্রানাডা রাজ্য জয় করে নিল। কিন্তু মুসলিমরা যা খ্রিষ্টানদের উপর কখনো চাপিয়ে দেয়নি, তাই তারা করল। তারা মুসলিমদের খ্রিষ্টান হতে বাধ্য করল। যারা খ্রিষ্টান হল না তারা হয় পালিয়ে

গেল নয়তো ধরা পড়লে তাদের হত্যা করা হল। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে নয়শত বৎসর ধরে যে মুসলিমরা ঐ অঞ্চলে বসবাস করছিল তারা বিতাড়িত হল। এমনকি যারা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করল তারাও রেহাই পেল না। ১৫৭০ এর দশকে অন্যত্র এক যুদ্ধে পরাজয়ের দিক থেকে দেশের মানুষের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা নির্যাতনের শিকার হল। ইহুদী ধর্মাবলম্বী মানুষ যারা আটশত বছরের বেশী সময় মুসলিম শাসনামলে গ্রানাডায় শান্তিতে বসবাস করে আসছিল, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। তারা উত্তর-আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ এবং অটোমানশাসিত বলকান দেশগুলোতে চলে গেল। অটোমান সাম্রাজ্যে (তুর্কী-মুসলিম) ইহুদীরা কোন নির্যাতন ভোগ করে নি। বিংশ শতকে মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ইহুদীরা এসব অঞ্চলে বসবাস ও কাজকর্ম চালিয়ে গেছে।

নতুন চেতনার উন্মেষ

পঞ্চদশ শতকে যখন রাজ্যশাসনে এই পরিবর্তন গুলি ঘটছিল, তখন ইউরোপের চিন্তাজগতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। ইউরোপীয় মধ্যযুগ ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার, পৃথিবী সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্প-সাহিত্যে বন্ধ্যাত্ব দিয়ে আচ্ছন্ন। ইতালী থেকে শুরু করে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ল প্রাচীন গ্রীক ও রোমান যুগের জ্ঞানের বিস্তার, যা ছিল মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার চাইতে আরও বুদ্ধিনির্ভর ও উদার। পরবর্তী একশত বৎসরে ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যে নতুন চেতনার ফলে সৃষ্টিশীলতা আসল এবং বিজ্ঞানের উন্নতি হল। প্লেটো, আরিষ্টটল ও ইউক্লিডএর সময়ের পর ইউরোপের চিন্তাজগতে এত নতুনত্ব ও প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়নি। গ্রীক ও রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যকে ঘিরে এই নবযাত্রা শুরু হওয়ায় একে রেনেসাঁ (Renaissance) বা পুনর্জাগরণ বলা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও চেতনার জগতে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। স্পেনের টলেডোতে মূর শাসনামলে ল্যাটিন, গ্রীক ও আরবী ক্লাসিক্যাল রচনা সমূহ অনুবাদ করা হয়। চতুর্দশ শতকে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ধর্মযাজকদের যৌথ নিষ্পেষণে তা বন্ধ হয়ে যায়। রেনেসাঁ এই পরিবর্তনের ধারা আরও বড় পরিসরে আবার শুরু করে। ইতালীর নগর রাজ্য (city-state) গুলিতে শুরু হয় এই পরিবর্তন। শুরুতেই কিন্তু এই পরিবর্তন মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাকে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করেনি। ইতালীর নগর রাজ্য গুলিতে প্রভাবশালী ছিল বড় ব্যবসায়ীরা। ভূস্বামীরা এখানে প্রভাবের দিক থেকে তাদের চাইতে কম ছিল। কিন্তু যে সমাজ ও যে উচ্চ স্থানগুলি ব্যবসায়ীরা অধিকার করত তা ছিল ভূস্বামীদের তৈরী সামন্ততান্ত্রিক সমাজের। তার ফলে এই ব্যবসায়ীরা যারা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করত তাতে বিপরীতমুখী ভাবধারা দেখা যেত। তারা সাধারণ কারিগরদের মধ্য থেকে শিল্পকর্ম তৈরী করার কাজ দিত। শিল্পকর্মগুলি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে হলেও তাতে মানবতার বিজয়ের বাণী থাকত। মাইকেল এঞ্জেলোর Last judgement, God giving life to Adam শীর্ষক চিত্র গুলি এই পরিচয় দেয় । রেনেসাঁ সাহিত্যিকদের যে ভাষা ব্যবহার করতে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত করত তা ছিল ল্যাটিন। ল্যাটিন ভাষা সাধারণ মানুষ ব্যবহার করত না। এটা ছিল খুব অল্পসংখ্যক উচ্চবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের ভাষা। ফলে নগর-রাষ্ট্রগুলির সাধারণ মানুষরা এই সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে জানতে পারত না। কিন্তু ল্যাটিন ব্যবহারের ফলে ইউরোপের অন্যান্য স্থানের সাহিত্যকর্মীদের সঙ্গে আদান-প্রদান সহজ হয়ে ছিল।

রেনেসাঁর ভাবধারা যতই ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ততই তা শুধুমাত্র প্রাচীন গ্রীক-রোমান যুগের পুনর্জীবন না থেকে নতুন ধ্যান-ধারণার সৃষ্টিতে পরিণত হল। মানুষের মধ্যে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা ও সমালোচনা করার পরিবেশ তৈরী হল। এতে নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হল যা কপারনিকাস ও গ্যালিলিওর সত্য সন্ধানে দেখা যায়। ষষ্ঠদশ শতক শুরু হল ক্লাসিকাল গ্রীক ও রোমান জ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যকে নিজ নিজ স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে এর চেতনাকে আত্মস্ত করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। একশ বৎসরের মধ্যে তা পরিণত হল নিজ নিজ ভাষায় নতুন চেতনায় কাল জয়ী সাহিত্য সৃষ্টিতে। ইংরেজীতে শেকসপীয়র, মারলো ও বেন জনসন, ফরাসীতে রাবেলাই (Rabelais),স্প্যানিস ভাষার সারভান্তে (Cervantes) ভাষার ও চিন্তা সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে।

ধর্ম কাঠামোর পরিবর্তন

স্পেনে মুসলিম মুরদের কাছ থেকে গ্রানাডা জয় করার ২৫ বৎসর পর ১৫১৭ সালে দক্ষিণ জার্মানীর উইটেনবার্গ শহরে মার্টিন লুথার নামে ৩৪ বৎসর বয়স্ক একজন ধর্মযাজক তার গীর্জার দরজায় ৯৫টি অংশ (thesis) বিশিষ্ট একটি অভিযোগপত্র টাঙ্গিয়ে দিল। অভিযোগগুলি ছিল ক্যাথলিক ধর্মের নেতাদের বিভিন্ন আচার আচরণকে সমালোচনা করে। মার্টিন লুথার এর এই সমালোচনার ফলে ক্যাথলিক চার্চে এক বিরাট ভাঙ্গন শুরু হয়। বারশত বৎসর আগে কনস্ট্যানটিন

এর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর এত বড় ভাঙ্গন পশ্চিমের খ্রিষ্টধর্মে আর ঘটেনি। দক্ষিণ জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডের শহরগুলিতে মার্টিন লুথার এর মতবাদ সমর্থন পেল। জার্মান অঙ্গরাজ্যগুলির কয়েকজন শক্তিশালী রাজা তাকে সমর্থন করল। ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডেও অনেকের মধ্যে তার মতবাদ সমর্থন পেল। এসবই হল ক্যাথলিক চার্চ এই মতবাদকে দমন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী ক্যাথলিক চার্চ থেকে ইংল্যান্ডকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। রাজা তার স্ত্রী ক্যাথরীনকে তালাক দিতে চেয়েছিল। পোপ তাতে সম্মতি না দেওয়ায় অষ্টম হেনরী এই সিদ্বান্ত নেয়। ক্যাথলিক ধর্ম সম্বন্ধে মার্টিন লুথার এর সমালোচনা ছিল ব্যাপক। গীর্জার আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা, পোপের তার অধীনস্ত ধর্মযাজকদের উপর খবরদারীর অধিকার, ধর্মযাজকদের সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন ও পাপস্খলন এর দলিল বা Indulgence এর বিক্রয়ের এর বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন। Indulgence হল পোপের পক্ষ থেকে যাজকদের একটি দলিল যা বলা হত পাপ মুছে দিয়ে স্বর্গে প্রবেশে সাহায্য করতে পারে। অর্থের বিনিময়ে এই দলিল যাজকরা বিক্রি করত। এই অর্থে পোপ একটি নতুন গীর্জা তৈরী করছিলেন আর Mainz এর আর্চবিশপ তার এই পদের জন্য Fugger এর ব্যাংক থেকে যে টাকা নিয়ে পোপকে দিয়েছিলেন-সেই টাকা ফেরত দিচ্ছিলেন ব্যাংকটিকে।[১] গীর্জার অবস্থান সমাজে এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ধর্মযাজক ও গীর্জার বিরুদ্ধে সমালোচনা সমাজের ও রাজনীতির বিরুদ্ধে সমালোচনায় পরিণত হয়। তাই যারা সেই সময়ের সমাজব্যবস্থার সুবিধাভোগী ছিল তারা স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। ফলে পরবর্তী একশত পঁচিশ বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে। জার্মানীর Smalkaldic যুদ্ধ, ফ্রান্সের ধর্মকেন্দ্রিক গৃহ যুদ্ধ, স্পেনের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নেদারল্যান্ডের দীর্ঘ যুদ্ধ, ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ, ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ যা জার্মানীকে বিধ্বস্ত করেছিল, এগুলো সবই বিভিন্ন ভাবে ক্যাথলিক ধর্মের সমালোচনার পর থেকেই শুরু হয়েছিল।

মার্টিন লুথার তার চিন্তাভাবনার ব্যাপারে অত্যন্ত কুশলী ছিলেন। তিনি তার পক্ষে যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে অনেক বই লিখেছিলেন। তিনি জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করলেন। ফলে ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ আরও বেশী জানতে পারল। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও যে পরিবর্তনের সূচনা তিনি করেছিলেন তার জন্য এগুলো যথেষ্ট ছিল না। এর আগেও ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে এই ধরনের আন্দোলন হয়েছিল। প্রায় দুইশত বৎসর ধরে ইউরোপের অনেক নগরে গোপন প্রতিবাদী Wadensian চার্চ ছিল। বোহেমিয়াতে একশত বৎসর আগে Hussite রা চার্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এই সময় এবং আরও অন্যান্য প্রতিবাদী আন্দোলন বিস্তার লাভ করেনি এবং চার্চকে বিভক্ত করতে পারেনি। মার্টিন লুথার এর প্রতিবাদ এত ব্যাপক হয়ে চার্চকে বিভক্ত করল তার কারণ ছিল চতুর্দশ শতক থেকে আরও অন্যান্য পরিবর্তন সমাজে হচ্ছিল। এর মধ্যে কয়েকটি উপাদান হল আগে বর্ণিত রাজ্যশাসন পদ্ধতির ক্রমপরিবর্তন, রেনেসাঁর ফলে নতুন চিন্তা ভাবনা, উদার দৃষ্টি ভঙ্গি ও সমালোচনার ধারা সৃষ্টি হওয়া। তবে সর্বোপরি ছিল আর্থসামাজিক গঠনের পরিবর্তন। সামন্ত অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিচ্ছিল। আর মার্টিন লুথার এর শুরু করা প্রতিবাদ থেকে জন্ম নেওয়া প্রটেষ্ট্যান্ট (Protestant) মতবাদ ছিল তার একটি বহিঃপ্রকাশ।

অর্থনীতির ক্রমবিকাশ

পশ্চিম ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা শত শত বৎসর ধরে ধীর গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল। উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছিল, এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা থেকে আনা নতুন প্রযুক্তি আত্মস্ত করে তার সঙ্গে তাদের নিজেদের উদ্ভাবন যোগ করে শিল্প দ্রব্য, জাহাজ তৈরী ও যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরীতে উন্নতি হয়েছিল। এর ফলে ষষ্ঠদশ শতকের শুরুতে যে সব জিনিস তৈরী হত তা দ্বাদশ শতাব্দীতে - এমনকি অনেক জিনিস চতুর্দশ শতাব্দীতেও ছিল না। প্রায় প্রতিটি শহরে কলের ঘড়ি ছিল, বাতাস ও পানি চালিত মিল, ব্লাস্ট ফার্নেস (blast furnace) এ তৈরী ঢালাই লোহা, জাহাজ তৈরী, জাহাজের পাল -মাস্তুল তৈরী, জাহাজ নেভিগেশন এর নতুন পদ্ধতি, যুদ্ধের জন্য বন্দুক ও কামান তৈরী শুরু হয়েছিল। ছাপাখানার ব্যবহার অল্পসংখ্যক লাইব্রেরীতে রক্ষিত বই ব্যাপক মানুষের নাগালের মধ্য নিয়ে এসেছিল।

প্রযুক্তির এইসব পরিবর্তন ছিল অন্যান্য পরিবর্তনের পূর্বশর্ত। বলা যেতে পারে কলম্বাস হয়তো আরবদের কাছে পাওয়া astrolabe, চীনাদের কাছে পাওয়া কম্পাস ছাড়া আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত, কিন্তু এই যন্ত্রগুলি ছাড়া যাওয়া আসার নিয়মিত নৌ পথ চিহ্নিত করা তার পক্ষে সম্ভব হত না। এইগুলি ছাড়া আবার আমেরিকায় ফিরে আসা ও স্পেনীয়দের আমেরিকা মহাদেশে বিভিন্ন এলাকা দখল করাও সম্ভব হত না। ইউরোপীয় রেনেসাঁর অগ্রদূতরা হয়ত প্রাচীন গ্রীক ও

রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু শিক্ষিত মানুষের আগ্রহ জাগাতে পারত, কিন্তু জ্ঞান চর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে ব্যাপক পরিবর্তন রেনেসাঁর ফলে দেখা গিয়েছিল তা ছাপাখানার সাহায্যে এই সমস্ত বইয়ের হাজার হাজার কপি মানুষের কাছে না পৌঁছালে হওয়া সম্ভব ছিল না। একই ভাবে পোপের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার এর আন্দোলন ছড়িয়ে পড়াও সম্ভব ছিল না ছাপার মাধ্যমে তা সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়লে। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে এই প্রযুক্তির দ্বারা জিনিস তৈরীর জন্য সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনও হয়েছিল। তা না হলে ব্যাপক হারে শিল্পদ্রব্য তৈরী সম্ভব হত না। সামন্ততান্ত্রিক যুগের প্রথম দিকে উৎপাদন পদ্ধতি যা ছিল তাতে সীমিত প্রয়োজন মেটান সম্ভব হত। কৃষকদের জীবন ধারণের পর যে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকত তা ভূস্বামীর জন্য কিছুটা বিলাস দ্রব্যের যোগান দিত। এই সমাজ ব্যবস্থায় মুদ্রার ভূমিকা খুব বেশী ছিল না। কারও সম্পদ বাড়ানোর সুযোগ থাকলে সে মুদ্রা বা স্বর্ণের বদলে জমির পরিমাণ বাড়াত। অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই পরিবর্তন দেখা যায়। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে তার বিনিময়ে বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদন বাড়তে থাকে। সোনা বা রূপার জন্য পণ্য উৎপাদন বা বিক্রী করা এবং সোনা ও রূপার বিনিময়ে অন্য পণ্য কিনা ক্রমেই বাড়ে। কৃষকের টাকার দরকার হয় খাজনা দেওয়ার জন্য, কৃষিতে ব্যবহৃত হাতিয়ার কেনার জন্য বা দুর্দিনে বাঁচার জন্য। ভূস্বামীরাও আরও বেশী বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করত। দূরপাল্লার বাণিজ্য বাড়ার জন্য অন্যান্য দেশ থেকে বিলাস দ্রব্য ইউরোপে আসা শুরু করল। এই ভাবে সময়ের সাথে সাথে কাজের ধরন বদলে যেতে থাকল। আগে মানুষ কাজ করত উৎপাদনের জন্য যা তার প্রয়োজন মিটাত। ক্রমেই তা পরিণত হল উৎপাদন করা অর্থ উপার্জনের জন্য, আবার সেই অর্থ দিয়ে আরো অর্থ উপার্জন করার জন্য। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেও এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে তা নয় - কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছিল কয়েক শতক ধরে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে বাজার গড়ে ওঠা ও পণ্যের আদান প্রদানও ছিল এই পরিবর্তনের অংশ। বড় শহর ও বন্দর এর আশেপাশে কৃষিভূমিতে শিল্পে ব্যবহৃত কৃষি উৎপাদন শুরু হয়েছিল। বড় বড় আকারের জমিতে কাপড় তৈরীতে ব্যবহৃত লিনেন এর জন্য ফ্লাক্স (Flax), তেলের জন্য জলপাই, মদ তৈরীর জন্য আঙ্গুর ও কাপড় এর রং হিসেবে জাফরান এর উৎপাদন বাড়ে। শহরের বণিকেরা গ্রামাঞ্চলে কারিগরদের দিয়ে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করতে শুরু করে-অতীতে যেখানে কারিগররা নিজেদের উদ্যোগেই এটা বানাত। বণিকেরা এই উৎপাদিত দ্রব্য বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করতে থাকে। এই ভাবে গ্রাম ভিত্তিক শিল্প উৎপাদন গড়ে ওঠে। আবার বোহেমিয়া, দক্ষিণ জার্মানী ইত্যাদি যেসব জায়গায় খনিজ পদার্থ পাওয়া যেত সে সমস্ত জায়গায় মজুরীর ভিত্তিতে খনিশ্রমিক নিয়োগ করা হয়। উৎপাদন সম্পর্কের এই পরিবর্তনের ফলে চতুর্দশ শতকে যে সামাজিক সংকট দেখা দেয় তার পরিণতি পঞ্চম শতকে রোমান সাম্রাজ্য এবং তৃতীয় ও ত্রয়োদশ শতকে চীন সাম্রাজ্য যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তার তুলনায় আলাদা হয়। রোমান সাম্রাজ্য ও চীন সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের ফলে গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গরাজ্যের সৃষ্টি হয়, যেগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার অর্থনৈতিক লেনদেন খুবই কমে গিয়েছিল। তুলনায় চতুর্দশ শতকে ইউরোপীয় সমাজে যে সংকট দেখা দেয় তার একটা বড় কারণ ছিল মহামারী আকারে প্লেগ রোগের আবির্ভাব। এই দুর্যোগের ফলে গ্রামাঞ্চল দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। কিন্তু শহরগুলো টিকে থাকে। যেহেতু আগে থেকেই শহর ও তার আশেপাশের গ্রামাঞ্চল বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করত এবং সেগুলো বিক্রি করা হত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে, তাই পঞ্চদশ শতকেই শহরগুলি আবার ধীরে ধীরে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। জাহাজ নির্মাণ শিল্প, ছাপাখানা এই রকম নতুন কর্মকান্ডও যোগ হয়। উৎপাদন ও আদান প্রদান এর ফলে শহরভিত্তিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠন হয়। তবে সব শহর একইভাবে উন্নতি করতে পারেনি। আগের বর্ধিষ্ণু শহরগুলির মধ্যে বারসেলোনা, ভেনিস ও বাল্টিক সাগর তীরবর্তী শহরগুলি ও উত্তর ইউরোপের শহরগুলি পিছনে পড়ে-আর বর্তমান নেদারল্যান্ডের শহরগুলি, ইংল্যান্ড, স্পেন, ও দক্ষিণ পূর্ব জার্মানীর শহরগুলি বেশী এগোতে থাকে। চতুর্দশ শতকের পর সাধারণ মানুষের গড় মজুরী প্রায় দুই গুণ বেড়েছিল। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে অনেক জিনিষের দাম বাড়তে থাকে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান কমতে থাকে। কৃষকদের উপর ভূস্বামীদের বিভিন্ন ধরনের খাজনা বাড়তে থাকে। শহর ও গ্রামে ধনী মানুষেরা অর্থ উপার্জনে মেতে ওঠে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কর্তেজ (Cortes) ও পিজারো (Pizzaro) স্বর্ণ ও রৌপ্য আনার ব্যবস্থা করেন।

মধ্যযুগে গীর্জা ও ধর্মযাজকরা ছিল সামাজিক মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু ধর্মযাজকেরাই টাকার লোভে পড়ে যান। পাপমোচনের সনদ (indulgence) বিক্রী করে যাজকেরা টাকা উপার্জন করতে থাকেন, যার বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার আন্দোলন করেন। টাকা দিয়ে ধর্মযাজকদের আসনে বসা যেত। অনেক ধনী পরিবার তার অল্পবয়স্ক ছেলেদের জন্য আসন (যেমন Bishop) কিনে নিত। বড় ব্যবসায়ী পরিবার মেডিসি ও বর্গিয়া টাকার জোরে পোপ (Pope) হয়ে গেল এবং তার

ফলে আরও টাকা বাড়ানোর সুযোগ পেল। ধর্মযাজকেরা গরীব কৃষকদের উঁচু হারে সুদে টাকা ধার দিত যদিও সুদ খাওয়া তাদের ধর্মে পাপ বলে গণ্য। এই সময়কালে খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে পরিবর্তনের আন্দোলন ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শিল্প উৎপাদন শুরু হওয়ায় সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অনেক মতামত রয়েছে-যার মধ্যে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক ওয়েবার (Weber) অন্যতম। সামন্ততান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে ক্রমেই শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ভূমিকা বাড়তে থাকে। ভূস্বামী প্রভাবিত সামাজিক ধ্যান-ধারণায় নতুন উৎপাদন সম্পর্কের ফলে পরিবর্তন আসে। ধর্ম ও ধর্মযাজকেরা যেহেতু পূর্বতন সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন তাই পরিবর্তিত জীবনযাত্রা, সামাজিক সম্পর্ক ও চিন্তাধারা ধর্মের পালিত রীতিনীতি, ধ্যানধারণার পরিবর্তনের জোয়ার আনে। এই পরিবর্তনের আন্দোলনে মার্টিন লুথার, জাঁ কালভিন (Jean Calvin), জন নক্স (John Knox) এবং আরও অনেক ধর্মযাজক ও চিন্তাবিদ অংশ নেন। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, সামাজিক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব ও খ্রিষ্টধর্মের ভিতরে পরিবর্তনের আন্দোলন-এইসব একসূত্রে গ্রথিত। এই পরিবর্তনগুলো অনেক বছর ধরে ইউরোপে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় পর্যায়ে আলোড়নের সৃষ্টি করে-যা অনেক যুদ্ধবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রকে বদলে দিলো। এই পরিবর্তিত ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো ইউরোপের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার সূচনা।

জার্মানীর সংস্কার আন্দোলন (Reformation)

ষষ্ঠদশ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান জার্মানী ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শহরগুলো কাউন্সিল বা সিনেট দ্বারা পরিচালিত হত। আর এই কাউন্সিল বা সিনেটে বংশ পরম্পরায় আধিপত্য করত ধনী ব্যবসায়ী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা। গ্রামাঞ্চলে এলাকাগুলোতে বড় ভূস্বামী ও ধর্মযাজকেরা প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল।

মার্টিন লুথার ও পরবর্তীতে ফ্রান্সে জাঁ কালভিন (Jean Calvin) খ্রিষ্টধর্ম পালনের ব্যাপারে কিছু সমালোচনা উপস্থাপন করেন। তাঁদের রাষ্ট্রকাঠামো বা সমাজ বদলের কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু তারা যে ধর্মসংস্কার এর প্রক্রিয়া শুরু করেন তা শেষ পর্যন্ত ইউরোপে সামাজিক আন্দোলন ও যুদ্ধের সৃষ্টি করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র যন্ত্রে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। মার্টিন লুথার এর বক্তব্য ছিল যীশুখ্রিষ্ট ও তার ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা (apostle) বাইবেলে ধর্মীয় যে অনুশাসন দিয়ে গিয়েছিলেন তা ক্যাথলিক ধর্মের প্রতিষ্ঠান বিকৃত ও কলুষিত করেছে। তাদের বক্তব্য ছিল ধর্ম মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে ধর্মযাজকদের মধ্যস্থতা সঠিক নয় - বিশেষতঃ এই মধ্যস্ততা যদি অর্থের বিনিময়ে হয়। মার্টিন লুথার এর মতবাদ দক্ষিণ জার্মানীতে নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এই মানুষেরা ক্যাথলিক ধর্মের ধর্মযাজক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলোর অনাচার এর বিরুদ্ধে আগে থেকেই অসন্তুষ্ট ছিল। তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্র তৈরী করে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পর জাঁ কালভিন এর আন্দোলন একই অবস্থার সৃষ্টি করে ফ্রান্সে।

মার্টিন লুথার এর মতবাদ ১৫২১ সাল থেকে শুরু করে প্রথমে শহরগুলোতে ব্যাপক সমর্থন পায়। শহরের ব্যবসায়ী শ্রেণী ধর্মযাজকদের উপর নানা কারণে বিক্ষুব্ধ ছিল। বিশেষতঃ ধর্মযাজকদের কর দিতে হত না অথচ ব্যবসায়ীদের তা দিতে হত। আর একদিকে ধর্মযাজকেরা কৃষকদের কাছ থেকে যে খাজনা নিত তার ভাগ ব্যবসায়ীরা পেত। কাজেই ব্যবসায়ীরা চাচ্ছিল আন্দোলনের মাধ্যমে যাজকদের প্রভাব কিছুটা কমিয়ে আনা। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণীর লোকেরা যাজকদের সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে চাচ্ছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা একের পর এক শহরে আন্দোলন করে গীর্জা ও যাজকদের বিরুদ্ধে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। একের পর এক জার্মানীর শহরগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। তবে শহরগুলির কর্তৃপক্ষ (কাউন্সিল বা সিনেট) যেগুলো ধনী ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করত - তারা ধর্মের নিয়ম কানুন এ কিছু পরিবর্তন এনে আন্দোলন প্রশমিত করেছিল।

১৫২৪ সালে আরও সহিংস আন্দোলন দেখা যায়। এটা কৃষকদের যুদ্ধ (peasant war) বলে পরিচিত। কারও কারও মতে আধুনিক যুগের আগে এটা ইউরোপের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গণঅভ্যুত্থান। এর আগের অর্ধ শতকে জার্মানীতে বিচ্ছিন্ন ভাবে এবং সীমিত এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। কিন্তু এই সময় হাজার হাজার কৃষক ও গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী দক্ষিণ ও মধ্য জার্মানীতে গীর্জা দখল ও লন্ডভন্ড করে ফেলল ও ধনী সামন্তদের দূর্গ আক্রমণ করা শুরু করল। প্রথমদিকে গ্রামের বড় ভূমি মালিক ও ধর্মযাজকেরা দিশেহারা হয়ে গেল ও কৃষকদের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা চালায়। অনেক জায়গায় তারা বিদ্রোহ দমনের জন্য শহরের ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ও রাজ্যগুলির রাজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা তাদের এলাকায় বিদ্রোহ

চলার কারণে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। ধর্ম বিষয়ে দাবীর সাথে সাথে বিদ্রোহীরা আর্থসামাজিক দাবীও তুলে ধরে। ভূমিদখল প্রথা বাতিল, জমিদারদের দেয় বিভিন্ন খাজনা বাতিল, সর্বসাধারণের ব্যবহৃত জমি জমিদারদের দখল বন্ধ করা ইত্যাদি দাবী তোলা হয়। বিদ্রোহীদের ধারণা ছিল তাদের দাবী দাওয়া শাসকেরা মেনে নেবে। বিদ্রোহ করলেও কৃষকেরা সংযত আচরণ করে। [২]

শাসকদের পক্ষে দাবী মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তারা এক দিকে আপোষ আলোচনার ভান করতে থাকে, অন্যদিকে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকে। মার্টিন লুথার নিজে এই আন্দোলন শুরু করলেও কৃষকদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং শাসকদের পক্ষে দাঁড়ান। তিনি লিখেন "রাজন্য ও বিচারকদের মৃত্যুর চাইতে সব কৃষকের মৃত্যু হওয়া ভাল।" "তাদেরকে পাগলা কুকুরের মত হত্যা করা উচিত"।[৩] ১৫২৬ সালের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল এক লক্ষেরও অধিক বিদ্রোহীর প্রাণের বিনিময়ে। [৪]

তথ্য সূত্রঃ

১. Febvre L. Martin Luther: A Destiny. New York, 1929 p 73-76
২. Elton GR. Reformation Europe. Glasgow,1963 p 59
৩. Harman C. A People's History of the World. London, 2008 p 88
৪. Bronowski J and Mazlish B. The Western Intellectual Tradition. New York,1960 p 88

পঞ্চম অধ্যায়

উপনিবেশের যুগ

১৫০০ সালের আগে পৃথিবী ছিল শত শত ছোট অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত, যেগুলো মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তাদের মধ্যে বাণিজ্য ও পণ্য আদান প্রদান হত, কিন্তু তা সীমিত আকারে। আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশ সম্মন্ধে ইউরোপ খুব একটা জানত না। অষ্ট্রেলিয়া ছিল সম্পূর্ণ অজানা। এশিয়া হতে ইউরোপে স্বল্প পরিমাণ বিলাস দ্রব্য যেত। ১৮০০ সালের আগে (আমেরিকা ছাড়া) পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ইউরোপের উপস্থিতি ছিল বাণিজ্য কেন্দ্র, অল্প কয়েকটি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন আর সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমিত। এশিয়ার মূল্যবান পণ্যদ্রব্য; বিশেষত: মশলার বাণিজ্য অধিকার করার জন্য ইউরোপ থেকে এশিয়ার নৌপথ আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা শুরু হয়, আর পর্তুগীজরা এতে সফল হয়। স্পেনের উদ্যোগে এই প্রচেষ্টার ফল হয় ভিন্ন, আমেরিকা আবিষ্কার। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পূর্ণ বদলে যায়। চার শতক ধরে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ বাকী পৃথিবীর প্রায় পুরোটাই দখল করল ও তাদের আর্থসামাজিক গতি প্রকৃতি বদলে ফেলল। শিল্প বিপ্লব ও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হয়ে গেল অধিকৃত দেশগুলি।

মশলার যুগ

যখন থেকে মানুষ আগুন ব্যবহার করতে শিখল, আর আগুনের সাহায্যে রান্না করা শুরু করল, সম্ভবত তখন থেকেই মশলার ব্যবহার শুরু। প্রাচীন কালে দু-একটি মশলা (যেমন সরিষা, জুনিপার juniper ফল) উৎপন্ন হলেও বেশীর ভাগ মশলাই ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে আসত। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধরনের মশলা পৃথিবীর সব জায়গায় এত সহজে পাওয়া যায় এবং দামও সেই সময়ের তুলনায় এত কম, এটা চিন্তা করাই কঠিন যে কয়েক শত বৎসর আগেও মশলা ছিল দুস্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন এশিয়ার যে কয়েকটি মূল্যবান পণ্যের কারণে ইউরোপ থেকে এশিয়ায় আসার পথ খোঁজা শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে মশলাই ছিল প্রধান। এটাই ছিল সমুদ্রজয়ের যুগ। এই পথ খুঁজতে গিয়েই আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার হয়। এই উদ্যোগ থেকেই উপনিবেশের যুগ শুরু হয় আর পৃথিবীর ইতিহাস বদলে যায়।

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৬০০ শতকে মিশরে লবঙ্গ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। লবঙ্গ তখন পৃথিবীর এক জায়গায় উৎপন্ন হত,বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জে। পরবর্তী কালে মিশরে দারুচিনি ও গোলমরিচ এর ব্যবহার বিষয়ে মিশর এর Ebers Papyrus এ লিখা আছে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৫৫০)। প্রাচীনকালে ভারত, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের সঙ্গে মিশরের যে বাণিজ্য ছিল এটা তার পরিচয়। সম্ভবত এই দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় কয়েকবার পণ্য হাত বদল হত। তাতে তার দামও বেড়ে যেত। সমুদ্রপথে এই বাণিজ্য আরব বণিকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে এই বাণিজ্য পথের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল ভারতের কেরালা। কেরালা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে আসা মশলার বাণিজ্য কেন্দ্র ছাড়াও গোলমরিচ উৎপাদন ও বিক্রয়ের কেন্দ্র ছিল। বণিকেরা দক্ষিণ ভারত থেকে আরব উপদ্বীপ ও মিশর হয়ে ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপের গ্রীস ও রোমে মশলা পৌঁছে দিত। মশলা বাণিজ্য এতই লাভজনক ছিল যে আলেকজান্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২-৩৩১ সালে মিশর বিজয়ের পর মূলতঃ মশলা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর পত্তন করেন। এই বন্দর প্রধানত মশলা বাণিজ্যের শুল্ক আদায় করেই সম্পদশালী হয়। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যের উত্থানের পর আলেকজান্দ্রিয়া পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বন্দর নগরীতে পরিণত হয় এবং মশলা বাণিজ্যের সবচাইতে বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। রোমানরা ভারত পর্যন্ত নিজেরাই বাণিজ্য পথ স্থাপন করে এবং আরবদের সমান্তরালে চালাতে থাকে। রোমানরাই প্রথম ব্যাপকভাবে Preserved খাদ্য (বিশেষ করে মাংস) মশলা ব্যবহার করে উপাদেয় করে তোলার ব্যবস্থা করে। রোমান রান্নার বইয়ে এর পরিচয় পাওয়া যায়। মশলা এত মূল্যবান ছিল যে এটা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হত। কোন কোন স্থানে মজুরী হিসেবে গোলমরিচ দেওয়া হত। রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কালে ৪৪১ খ্রিষ্টাব্দে ভিসিগথ (Visigoth) আলরিফ যখন রোম জয় করেন, তখন রোমানদের প্রাণের বিনিময়ে তিনি ৩০০০ গোলমরিচ দাবী করেছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে বিভিন্ন ধরনের মশলা আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার বাণিজ্যের একটা বড় অংশ ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আধুনিক যুগের সূচনা হয় মশলা বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে। ঐ সময় মশলার ব্যবহার ছিল খাদ্যদ্রব্য বিশেষত মাংস সংরক্ষণ করার জন্য। সংরক্ষিত খাদ্য যখন পরে ব্যবহার করা হত তখন এর স্বাদ বাড়ানোর জন্য মশলা

ব্যবহার করা হত। ঐ সময় ইউরোপে শীতকালে খাদ্যশস্য, শবজী ইত্যাদি উৎপাদন কম হত। তাই শীতকালে ব্যবহারের জন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ না করে উপায় ছিল না। আর দীর্ঘ দিন খাদ্য সংরক্ষণ করায় খাবার এ টাটকা খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ তো থাকতই না, বরং স্বাদ ও গন্ধ বিকৃত হয়ে যেত। তাই যারা কিনতে পারত, তারা মশলা কিনে তার সাহায্যে স্বাদ ও ঘ্রাণ উন্নতি করার চেষ্টা করত। এছাড়াও মশলার ব্যবহার ছিল প্রসাধনী দ্রব্য প্রস্তুতে এবং ভেষজ ঔষধ তৈরীতে। মৃত ব্যক্তির সৎকারেও মশলার ব্যবহার ছিল।

কিন্তু ইউরোপ ছিল মশলা বাণিজ্যের একদম শেষ মাথায়। গোলমরিচ উৎপন্ন হত দক্ষিণ ভারতের কেরালায়। আর দারুচিনি উৎপন্ন হত শ্রীলংকায়। লবঙ্গ ও জায়ফল উৎপন্ন হত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মালাক্কায়। এইসব স্থান থেকে খ্রিষ্টের জন্মের আগে থেকেই আরব ও উত্তর আফ্রিকার বণিকরা ইউরোপে মশলা নিয়ে আসত। ফলে মশলা ইউরোপে ছিল খুবই উচ্চমূল্যের। ১৩০০ শতকে এক সময় ইউরোপে এক পাউন্ড জায়ফলের দাম ছিল সাতটা স্বাস্থ্যবান ষাঁড়ের সমান। ধনী লোকদের পক্ষেও মশলা ব্যবহার করা কঠিন ছিল। ১৪০০ শতকে যখন নৌ-পরিবহন ও জাহাজ পরিচালনা পদ্ধতির উন্নতি হল যাতে করে দূরপাল্লার জাহাজ চলাচল সম্ভব হল, তখন ইউরোপের রাজা রাণীরা মশলা বাণিজ্যে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হল।

আরবদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আরবদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে। মুসলিম আরবরাও মশলা - বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল এবং তাদের মাধ্যমেই মশলা বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলিতে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। দশম শতকে প্রায় সম্পূর্ণ মশলা-বাণিজ্য পথ আরব মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে মুসলিম বিজয়ের সাথে সাথে ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য কমে আসে এবং অষ্টম শতকে তা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। দশম শতকে মিলান, জেনোয়া ও অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় নগর রাজ্যের উত্থানের ফলে বাণিজ্য কিছুটা বাড়ে।

ক্যাথলিক চার্চের ইতিহাসে একাদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সময় ছিল সফল ধর্ম বিস্তার এর কাল। এই সময় প্রায় সমস্ত ইউরোপ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। বাইজেন্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস-১ সেলজুক তুর্কদের আক্রমণ হতে তার সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সাহায্য করার জন্য খ্রিষ্টানদের প্রতি আহবান জানান। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ১০৯৫ সালে পোপ দ্বিতীয় আরবান (Urban) ধর্মযুদ্ধের আহবান জানান। ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড এর ফলে খ্রিষ্টানরা জেরুজালেম দখল করে এবং সেখানকার অধিবাসীদের হত্যা করে। ফেরার সময় খ্রিষ্টান যোদ্ধারা ধনসম্পদ নিয়ে আসে। কিন্তু এই সম্পদের মধ্যে সোনা রূপার চাইতেও মূল্যবান মশলা ছিল বেশী।

এশিয়ার জীবনযাত্রা ক্রুসেডের যোদ্ধাদের প্রভাবিত করে। এর একটা বড় প্রভাব ছিল রান্নায় মশলার ব্যবহার। সমুদ্র পথে ভেনিস এই মশলার-বাণিজ্যের ইউরোপীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময় চেংগীজ খান (১১৬২ - ১২২৭ খিস্টাব্দ) এর নেতৃত্বে মঙ্গোলরা বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এটা চীন থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের রাজত্বে এশিয়া থেকে স্থলপথে মশলা আমদানী শুরু হল। চতুর্দশ শতকে প্লেগ এর মহামারী এশিয়া থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় অটোমান সম্রাটরা কনস্ট্যান্টিনোপোল দখল করে। স্থলপথে বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার মাধ্যমে নৌপথে ভেনিস পর্যন্ত মশলার বাণিজ্যের প্রধান পথ হয়ে দাঁড়ায়।

পঞ্চদশ শতকে জাহাজ চলাচলের প্রযুক্তির উন্নতির ফলে দূরপাল্লার নৌ বাণিজ্য সম্ভবপর হল। পর্তুগাল ও স্পেন এ ব্যাপারে এগিয়ে ছিল। পর্তুগীজরা আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ দিক ঘুরে সমুদ্র পথে ভারতে পৌঁছানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর অনেকগুলো ব্যবসা-কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস নামে এক জেনোয়াবাসী স্পেনের রাজা রাণীর আনুকূল্যে ভারত পৌঁছানোর জন্য পশ্চিম দিকে তিনটি জাহাজ নিয়ে যাত্রা করেন। সেই সময় পৃথিবী গোলাকার এটা অনেকেই সঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন। পশ্চিম দিকে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যে আমেরিকা নামে একটা বড় মহাদেশ আছে তা জানা ছিল না। ফলে কলম্বাস এক মাস পর যেখানে পৌঁছালেন তা তিনি ভারত মনে করলেও আসলে তা ছিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ। যদিও এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু এই আবিষ্কার পৃথিবীর বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে অনেক পরে।

সেই সময়ের অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে যাবার পথ আবিষ্কার। পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল এর পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কো-ডা-গামা পূর্বে স্থাপিত বাণিজ্য কেন্দ্র ধরে এগিয়ে ১৪৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে পূর্ব উপকূলে যেতে সক্ষম হন। মোজাম্বিক পৌঁছে তিনি আরব বণিকদের সন্ধান পান। ইবনে মজিদ নামে একজন আরব বণিকের সাহায্যে কেরালার কালিকট বন্দরে ২০শে মে ১৪৯৮ সালে পৌঁছান। এই যাত্রায় ভাস্কো- ডা- গামা বিনিময়ের জন্য তেমন কোন পণ্য নিয়ে আসেন নি। ১৫০২ সালে তিনি বিশটি জাহাজ নিয়ে দ্বিতীয়বার আসেন ও কালিকট দখল করেন। এবার তিনি এত মশলা নিয়ে লিসবনে ফিরে আসেন যে মশলার দাম কমে ভেনিসের তুলনায় লিসবনে এক-পঞ্চমাংশ হয়ে যায়। আরব ও ভেনিসের বণিকদের আধিপত্য এইভাবে ভেঙ্গে দেয় পর্তুগীজরা। এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

স্পেন ও পর্তুগাল রাজ্য জয়ের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। এটা এত প্রকট আকার ধারণ করল যে ১৪৯৪ সালে পোপ আলেকজান্ডার (চতুর্থ) এর মধ্যস্থতায় ইউরোপের বাইরের বিশ্বকে ৪৬° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ দ্বারা দুইভাগে ভাগ করে পূর্ব অংশ পর্তুগাল ও পশ্চিম অংশ স্পেনকে দেওয়া হল। স্পেন ও পর্তুগাল দুই রাজ্যই এটা মেনে নিল। এই সময় পর্তুগীজ অভিযানকারী (explorer) পেদ্রো আলভারজ কাবরাল পশ্চিম দিকে নৌ অভিযান চালিয়ে ব্রাজিলের উপকূলে পৌঁছেন। হিসাবের ভুলের কারণে এটা সীমানা রেখার পূর্বদিকে বলে ধরা হয় এবং পর্তুগাল তার অধীনস্ত এলাকা বলে নিয়ে নেয়।

পর্তুগালের আর একজন অভিযানকারী আলফোনসো ডি আলবুকার্ক ১৫১১-১২ সালে ভারতের গোয়া দখল করেন। এরপর তিনি বর্তমান মালয়েশিয়ার মালাক্কার সুলতানের রাজ্য দখল করেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি সেখানকার সব মুসলিম অধিবাসীকে হত্যা করেন। আলবুকার্ক এর স্থাপন করা বন্দর মালাক্কা থেকে আন্টোনিও ডি আবরু ১৫১২ সালে বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জের দিকে রওনা হন। তিনি বান্দা দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। বান্দা দ্বীপপুঞ্জ ছিল সেই সময় জায়ফলের এবং জয়ত্রীর পৃথিবীতে একমাত্র উৎস। এইভাবে পর্তুগীজরা অনেক ধরনের মশলার উৎপাদন স্থলে পৌঁছে যায়।

মশলা সংগ্রহের বিকল্প পথের খোঁজে স্পেন ফার্দিনান্দ ম্যাগিলানকে ১৫১৯ সালে আমেরিকার দক্ষিণ দিক ঘুরে পশ্চিম দিকে অভিযানে পাঁচটি জাহাজ দিয়ে পাঠাল। তিনি প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে ফিলিপাইনে পৌঁছেন। স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে নিহত হন। শেষ পর্যন্ত তার নাবিকেরা একটি মাত্র জাহাজ ভর্তি মশলা নিয়ে ১৫২২ সালে স্পেন পৌছে। স্পেন ও পর্তুগালের এই দ্বন্দ্ব ১৫৮০ সালে শেষ হয় যখন পর্তুগাল স্পেনের অধীনে চলে যায়। ফলে স্পেন সমস্ত মশলা বাণিজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় এবং মশলার দাম বাড়াতে থাকে। এর ফলে ইউরোপের অন্যান্য নৌ শক্তি বৃটেন, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ড মশলা বাণিজ্যের সুফল ভোগ করতে পারল না। বৃটেন ও ফ্রান্স তাদের জাহাজ গুলোকে জলদস্যুতার কাজে লাগাল। তারা যেখানে জাহাজ পাচ্ছিল সেখানেই স্পেনের জাহাজ মালামালসহ দখল করে নিত। ১৫৭৯ সালে নেদারল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলি "নেদারল্যান্ডের যুক্ত প্রদেশ" নামে আবির্ভুত হল, আগে তারা স্পেনের দখলে থাকলেও এখন তারা প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের কাজ চালাতে লাগল। নেদারল্যান্ড কর্নেলিস ডি হুটম্যান নামে এক অভিযানকারীকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পাঠাল। এই অভিযান তেমন সফল না হলেও পরবর্তীতে এই অঞ্চলে নেদারল্যান্ডের আধিপত্য বিস্তারে এই অভিযান কাজে লেগেছিল। ১৫৮৮ সালে স্পেনের নৌ বহর "আর্মাদা" ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নৌ অভিযানে নেমে পরাজিত হল। এতে তাদের বাণিজ্যের কর্তৃত্ব অনেকটা খর্ব হল। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ রাজকীয় ফরমান বলে "ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" স্থাপন করেন। নেদারল্যান্ড ও ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (Vereengide Oost Indische Compagnie-VOC) স্থাপন করে ১৬০২ সালে। পর্তুগাল, ফ্রান্স, সুইডেনও এদের অনুকরণ করে তাদের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন করে।

১৬৭০ সাল নাগাদ নেদারল্যান্ডের VOC পৃথিবীর সব চাইতে বড় কোম্পানী হয়ে দাঁড়াল এবং তাদের শেয়ার মালিকদের ৪০ শতাংশ ডিভিডেন্ড দিতে পারল। মশলা বাণিজ্যে তাদের আধিপত্যের কারণ ছিল এই সময় তাদের নৌ ও সামরিক শক্তি। জায়ফলের বাণিজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে তারা এত উদগ্রীব ছিল যে ইংরেজদের সঙ্গে তারা রুন নামে একটি দ্বীপ বিনিময় করল। রুন ছিল বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার একটি ছোট দ্বীপ যা তখন ছিল জায়ফল উৎপাদনের বড় এলাকা। এটা ছিল ইংল্যান্ডের দখলে। বিনিময়ে তারা ইংল্যান্ডকে নিউ আমষ্টারডাম নামে একটি আমেরিকার দ্বীপ দিল।

পরবর্তীতে এই নিউ আমষ্টারডামই নিউইয়র্কের ম্যানহাটন দ্বীপে পরিণত হয়। ব্যবসায় একছত্র নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার জন্য রুন দ্বীপ সহ বান্দা দ্বীপপুঞ্জের সব প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে VOC হত্যা করেছিল। বান্দা দ্বীপপুঞ্জে আসার ১৫ বৎসর এর মধ্যে এখানকার বাসিন্দাদের সতের ভাগের ষোল ভাগকেই তারা হত্যা করে। জাপান থেকে শ্রমিক ও সৈন্য নিয়ে এসে তারা কাজ চালায়। এর ফলে তারা জায়ফল উৎপাদন ও বাণিজ্যে একক আধিপত্য স্থাপন করে।

লবঙ্গ-র ক্ষেত্রেও VOC একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। আমবন (Ambon) দ্বীপ ছাড়া আশেপাশের যত দ্বীপ এ লবঙ্গ চাষ হত, সেখানকার সব গাছ তারা ধবংস করল। ১৬৪১ সালে ডাচরা মালয়েশিয়ার মালাক্কা রাজ্য দখল করে। ১৬৫৮ সালে তারা শ্রীলংকার দারুচিনি উৎপাদন ও ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। ১৬৬৩ সালে তারা ভারতের মালাবার উপকূলে গোলমরিচের ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এর ফলে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে এসে পৃথিবীর প্রায় বেশীরভাগ মশলার ব্যবসাই নেদারল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তবে এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এই সময় ইউরোপের খাবার তৈরীর পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। মশলার ব্যবহার কমে আসে। তাছাড়া বৃটিশ ও ফরাসীরা জায়ফল গাছ আফ্রিকার জাম্বিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ গ্রানাডা ও অন্যান্য স্থানে রোপণ করে। এইভাবে নেদারল্যান্ডের কর্তৃত্ব কমতে থাকে। VOC র লাভ কমতে থাকে এবং ১৭৯৯ সালে এই কোম্পানী দেওলিয়া হয়ে যায়। ১৭৮০ সালে VOC ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং ১৮২৪ সালে চুক্তির মাধ্যমে বৃটেন ও নেদারল্যান্ড পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভাগ করে নেয়।

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে মশলা ব্যবসা সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিন হাজার বছর ধরে এই ব্যবসার উপর আধিপত্য বিস্তার করা ও ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন রাজ্য ও গোষ্ঠীর প্রচেষ্টার অবসান হয়। তিন হাজার বৎসরে বিভিন্ন শক্তি এই বাণিজ্যের ফলে ধনসম্পদ অর্জন করে। বাণিজ্য ধরে রাখার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ করে, মশলা উৎপাদক দেশগুলিতে অত্যাচার চালায়। তবে ঊনবিংশ শতকের শুরুর পর থেকে মশলা উৎপাদন ও ব্যবসায় আর কারও একাধিপত্য থাকল না।

স্পেনের আমেরিকা বিজয়

ক্রিস্টোফার কলম্বাস ছিলেন ইতালীর জেনোয়া অঞ্চলের একজন নাবিক। তাঁর আশা ছিল পশ্চিম দিকে যাত্রা করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চীন ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌছাবেন। পূর্ব- ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তখন ছিল মশলার অন্যতম এলাকা- এটা আগেই বলা হয়েছে। তিনি শেষ পর্যন্ত স্পেনের রাজা ও রানীকে রাজী করাতে পারলেন তাঁর অভিযানে অর্থায়ন করতে। ১৪৯২ সালের ৩রা আগষ্ট তিনি তিনটি জাহাজ নিয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন, উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ায় পৌছান। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মশলা সংগ্রহ এই ব্যবসায় ভাগ বসান ছিল লক্ষ্য। পৃথিবী গোল এ বিশ্বাস পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের মিশ্রণে কলম্বাসের হিসাব ছিল ভুল ও পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫ শতাংশ কম ধরে নিয়েছিলেন। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোট দ্বীপে পৌছান, সেখান থেকে আরও দুটি দ্বীপে যান, যেগুলি এখন কিউবা ও হাইতি নামে পরিচিত। তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌছে গেছেন।

এই দ্বীপগুলির অধিবাসী ছিল এমন মানুষেরা যাদের কোন রাষ্ট্র ছিল না, ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও কোন ধারণা তাদের ছিল না। তাদের আচরণ ছিল অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। কলম্বাস নিজে তাদের সম্মন্ধে লিখেছিলেন "পৃথিবীতে এদের চাইতে আরও ভাল মানুষ আছে কিনা-সন্দেহ, এরা এত স্নেহশীল ও উদার"। কিন্তু কলম্বাসের উদ্দেশ্য ছিল ধনসম্পদ আহরণ। এখানকার অধিবাসীদের ধরে দাসের কাজ করান শুরু করলেন। সামান্য কিছু স্বর্ণালঙ্কার ছিল এদের। এগুলো তো জোর করে নেওয়া হলই, এদের নির্যাতন করা হল কোথায় স্বর্ণের উৎস তা জানার জন্য।[১] এর পরের যাত্রায় কলম্বাস আরও লোকজন নিয়ে এসে সাতটি উপনিবেশ স্থাপন করলেন। এবার একটা নিয়ম করা হল, ১৪ বৎসর বয়সের বেশী যারা আদিঅধিবাসী আছে, তাদের প্রত্যেককে তিন মাস পর পর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ স্পেনীয়দের দিতে হবে। তা না হলে তাদের হাত কেটে ফেলা হবে, যাতে তারা রক্তপাত হয়ে মারা যায়। এই বর্বরতার পরও স্বর্ণের দাবী মেটান যায় নাই, কারণ এই দ্বীপগুলিতে বড় স্বর্ণের খনি ছিল না। সব আদিঅধিবাসীকে দাস হিসাবে খাটান শুরু হল। কলম্বাসের এই ব্যবস্থাগুলোর ফলাফল হল মর্মান্তিক। কলম্বাস আসার সময় হিসপানিওয়ালার (বর্তমানে যে দ্বীপে হাইতি ও ডমিনিকান রিপাবলিক অবস্থিত) জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষেরও বেশী, পঞ্চাশ বছর পর ১৫৪২ সালে এই সংখ্যা নেমে দুইশতে আসে। আদিঅধিবাসীরা (যাদের ইন্ডিয়ান নাম দেওয়া হয়েছিল) মারা যাবার পর কাজ স্পেনীয়দেরই করতে হত। তারা যে ধন-সম্পদের লোভে এখানে এসেছিল,তা হতাশায় পরিণত হল। কাজ আদায় করার জন্য তাদের উপরও অত্যাচার শুরু হল। তৃতীয় সফরের পর

কলম্বাসকে বন্দী করে স্পেনে ফেরৎ পাঠান হল। কিছুদিন পর মুক্তি পেয়ে চতুর্থবারের মত ফিরে এলে এবারও কোন ফল দেখাতে পারেন নি। স্পেনের রাজা তাঁকে হিসপানিওয়ালাতে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন।

মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো উপত্যকায় ত্রয়োদশ শতকে আজটেক গোষ্ঠীর মানুষেরা বসতি স্থাপন করে। তারা ছিল শিকারী -সংগ্রাহক, কৃষির অভিজ্ঞতা তাদের খুব বেশী ছিল না। এই উপত্যকায় আগে থেকেই অন্যান্য জনগোষ্ঠীরা বাস করে আসছিল, তারা আজটেকদের সবচাইতে কম উর্বর জমি দিল। আজটেকরা কৃষির কৌশল রপ্ত করে নতুন পদ্ধতিতে উৎপাদন বাড়ান শিখল। ক্রমেই তারা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে পদানত করল। এজন্য তাদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করতে হল। তাদের সমাজে যোদ্ধারাই ছিল সবচাইতে প্রভাবশালী, অন্যান্য শ্রেণী হল নিপীড়িত। তবে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল শত শত মাইলব্যাপী-দক্ষিণে যা বর্তমান গুয়াতেমালা পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

১৫১৮ সালে হারনান কর্তেজ (Hernan Cortes) নামে একজন স্পেনীয় সৈন্য ৫০০ যোদ্ধা নিয়ে কিউবা থেকে জাহাজে করে মধ্য আমেরিকার উপকূলে আসল। এখানকার ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের খবর তার কাছে পৌঁছেছিল। আসার পরই সে তার জাহাজগুলিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলল, যাতে তার সৈন্যদের আর ফেরার পথ না থাকে। আজটেক রাজা মন্টেজুমা তাদেরকে সমুদ্র উপকূল থেকে মেক্সিকো উপত্যকায় আনার ব্যবস্থা করল। তার সাহায্য ছাড়া আজটেক সাম্রাজ্যের রাজধানীতে আসা সম্ভব হত না। কর্তেজ বন্ধুত্বের ভান করে কৌশলে মন্টেজুমাকে বন্দী করল। পরবর্তী দুই বছরে আজটেকদের সৈন্যবাহিনীকে (যা তার সৈন্যদের চাইতে কয়েক শত গুণ বড় ছিল) কর্তেজ পরাস্ত করল। এই সাফল্যের কারণ ছিল কয়েকটি, স্পেনীয়দের ছিল উন্নত অস্ত্র- ইস্পাতের তৈরী, আজটেকদের লোহা বা ইস্পাত ছিল না, স্পেনীয়দের ছিল কামান ও অশ্বারোহী। ঘোড়া আজটেকরা আগে দেখেনি। স্পেনীয়রা গুটি বসন্ত রোগের জীবাণূ বহন করে এসেছিল (তাদের অজান্তেই)। যুদ্ধে রাজধানী অবরোধের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আজটেকরা বিরাট সংখ্যায় গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এই রোগের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না। একটা বড় কারণ ছিল আজটেকদের অনৈক্য। অধিকাংশ আজটেক ছিল রাজার দ্বারা নিপীড়িত।[২] তারা স্পেনীয়দের স্বাগত জানিয়েছিল। শেষ যুদ্ধে স্পেনীয় বাহিনীতে আজটেক যোদ্ধার সংখ্যা রাজার বাহিনীর চাইতেও বেশী ছিল।

মেক্সিকো বিজয়ের এক দশক পরে ফ্রান্সিসকো পিজারো নামে আর একজন স্পেনীয় পানামা থেকে দক্ষিণ দিকে আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অনুসরণ করে সমুদ্রযাত্রা করলেন। এর আগে দুইবার তিনি এই অঞ্চলে তথ্য সংগ্রহে এসেছিলেন এবং খবর পেয়েছিলেন যে, মহাদেশের অভ্যন্তরেও একটা বিরাট সাম্রাজ্য আছে। টুমবেজ (Tumbez) নামে এক উপকূলীয় শহরে তিনি অবতরণ করলেন, সঙ্গে ছিল ১০৬ জন পদাতিক ও ৬২ জন অশ্বারোহী সৈন্য। সেখানে তিনি জানতে পারলেন (বর্তমান) পেরুর ইনকা সাম্রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে দুই ভাইএর মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে। দুই ভাইএর মধ্যে একজনের (আতাহুয়ালপা) প্রতিনিধিদের সঙ্গে পিজারো যোগাযোগ করে তাকে সাহায্য করতে চাইলেন। প্রতিনিধিরা তাঁকে কাজামার্কা নামক শহরে নিয়ে গেল দূর্গম পাহাড়ী পথের মধ্য দিয়ে। স্থানীয় ইনকাদের সাহায্য ছাড়া স্পেনীয়দের পক্ষে মহাদেশের অভ্যন্তরে যাওয়া সম্ভব হত না। কাজামার্কা শহরে স্পেনীয়রা তাদের কামান ও অশ্বারোহী বাহিনী চারদিকে স্থাপন করে লুকিয়ে রাখল। এর পরবর্তী ঘটনা পিজারোর ভাই হার্নান্দের বর্ণনায়:"তিনি (আতাহুয়ালপা) আসলেন, তাঁর আগে তিন থেকে চারশত ঊর্দি পরিহিত ইন্ডিয়ান গান গাইতে গাইতে রাস্তা পরিস্কার করে আসল। তারপর আতাহুয়ালপা তার পারিষদবর্গ নিয়ে আসলেন-তার মধ্যে যারা গুরুত্বপূর্ণ তাদেরকে মানুষরা বহন করে নিয়ে আসল"।[৩] এরপর পিজারোর সঙ্গে আসা একজন পাদ্রী আতাহুয়ালপাকে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে স্পেনের রাজার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার আহ্বান জানাল। পাদ্রী এটাও বলল পোপ আমেরিকার এই অংশ স্পেনকে দিয়েছেন। আতাহুয়ালপা উত্তরে বলেছিলেন, আমি কারও অধীনস্ত হতে রাজী না। আর যে পোপের কথা বলা হচ্ছে, তিনি যে দেশ তার নয়, তা দান করার কথা বলা পাগলের প্রলাপ হবে। এরপর পিজারোর ইঙ্গিতে চারদিকে লুকানো কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হল আর অশ্বারোহী সৈন্যরা আক্রমণ করল। ইনকাদের হিসাব মতে প্রায় দশ হাজার ইনকা মারা যায়।[৪] আতাহুয়ালপাকে বন্দী করা

হল এবং তাকে বাধ্য করা হল স্পেনীয়দের তার সাম্রাজ্যের অধিকার ছেড়ে দিতে। অনেক পরিমাণ স্বর্ণ যোগাড় করে আতাহুয়ালপা আশা করেছিল তার বিনিময়ে সে মুক্তি পাবে। কিন্তু পিজারো স্বর্ণ পাওয়ার পর আতাহুয়ালপাকে হত্যা করল। এরপর আরও স্পেনীয় এই হত্যা ও লুটতরাজে যোগ দিল। পিজারো ইনকাদের রাজধানী কুজকোর উদ্দেশে রওনা হল। কুজকো দখল করার পর বাড়ী বাড়ী ঢুকে হত্যা ও লুট করা হল। তবে ইনকাদের সম্পূর্ণ দমন করতে আরও সময় লেগেছিল। ১৫৭২ সালে শেষ ইনকা রাজা তুপাক আমুরাকে হত্যা করার পর প্রতিরোধ বন্ধ হয়। সাম্রাজ্যে নিয়ম করা হয়, প্রতিটি ইনকা পুরুষকে বছরের নয় মাস বিনা পারিশ্রমিকে স্পেনীয়দের শ্রম দিতে হবে। এছাড়াও স্পেনীয়দের আনা রোগ প্লেগ,যার বিরুদ্ধে ইনকাদের কোন প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না, মহামারীর সৃষ্টি করল। স্পেনীয়দের আসার সময় লিমা উপত্যকায় ইনকাদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ হাজার। ১৫৪০ এর দশকে মাত্র দুই হাজার বেঁচে ছিল। পোটোসি নামে এক শহরের পাশে রূপা ও পারদের খনিতে ইনকাদের শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ১৫৭০ এর দশকে এই শহরে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ বাস করত, যা সেই সময়ে পৃথিবীতে জনবহুল শহরগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। আর্চবিশপ লইজা (Loyza) র নেতৃত্বে এক কমিশন এই সময় রিপোর্ট দিয়েছিল, জনস্বার্থে এই বাধ্যতামূলক শ্রম দরকার।[৫]

১৫৪০ সাল নাগাদ স্পেন তার অধিকৃত আমেরিকায় নিয়ন্ত্রণ প্রায় সম্পূর্ণ করল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রথমদিকে মূল্যবান জিনিষ বিশেষত: স্বর্ণ লুট ও এরপর খনিতে স্বর্ণ উৎপাদন করা হল। স্বর্ণ উৎপাদন ১৫১৫ সালের পর থেকে কমে যেতে লাগল (১৫৩৩ সালে পেরুতে ইনকাদের সঞ্চিত স্বর্ণ লুট করার আগে তা বাড়েনি)। ফলে অর্থনীতির অবনতি হতে লাগল। ১৫১৫ সালের পর ইক্ষু উৎপাদন শুরু হল এবং খামার স্থাপন করা শুরু হল। এই খামারগুলিতে আদিঅধিবাসী "ইন্ডিয়ান"রা কাজ করত না। তারা সেই সময় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কাজ করত আফ্রিকা থেকে ধরে আনা দাস। দাসদের আনা শুরু হয় ১৫০৩ সাল থেকেই। তবে ইক্ষু উৎপাদন শুরু হওয়ার পর ১৫১৮ সাল থেকে বেশী সংখ্যায় আসতে থাকে। ১৫২০ সাল থেকে চিনি রপ্তানী করা শুরু হয়।[৬]

মেক্সিকোতে আদিবাসীদের সংখ্যা অনেক কমলেও তারা স্পেনীয়দের চাইতে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল। এখানে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি চলতে থাকল। আজটেকদের সময়ের মত ভুট্টা, সীম ও অন্যান্য শবজী চাষ হতে থাকল। কিছু কিছু গমও উৎপাদিত হল। তবে আঙ্গুর ও জলপাই এর উৎপাদন সফল হয়নি। স্পেনীয়দের আসার আগে আদিবাসীদের একমাত্র গৃহপালিত পশু ছিল কুকুর। স্পেনীয়রা গরু, ঘোড়া, ভেড়া ও শূকর পালন শুরু করল এবং এদের সংখ্যা এত বাড়তে থাকল যে, ১৫৪০ সাল নাগাদ মধ্য মেক্সিকোতে কৃষিজমিকে পশুচারণভূমিতে রূপান্তর করা হতে লাগল।

পেরুতে আদিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ থামাতে ১৫৪৮ সাল পর্যন্ত লাগল। এই সময় এখানে রূপার খনি আবিস্কার হওয়ায় রূপাই হল অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ। এখানকার স্পেনীয়রা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সঙ্গে আদান প্রদানে রূপাই ব্যবহার করতে লাগল। ১৫৩৭ সালে কলম্বিয়ায় রূপার খনি আবিস্কার হয়। কিন্তু পেরুর পোটোসিতে ১৫৪৫ সালে বড় রূপার খনি আবিস্কার স্পেনের সাম্রাজ্যের অর্থনীতি বদলে দেয়। উত্তর মেক্সিকোতেও ১৫৪৬ সালে রূপার খনি আবিস্কার হয়, যদিও তা তত বড় ছিল না। ১৫৫০ থেকে ১৬১০ সাল পর্যন্ত অর্ধশতক ধরে পেরুর অর্থনীতির (কিছুটা মেক্সিকোরও) কেন্দ্র ছিল রূপার খনিগুলি। ১৫৪০ থেকে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত ১৬ হাজার টন রূপা ও ১৬০ টন স্বর্ণ স্পেন ইউরোপে নিয়েছিল। যদিও স্পেনের রাজারা যুদ্ধ বিগ্রহে এই সম্পদ খরচ করে ফেলেছিল।[৭] খনির কাজে নিয়োজিত মানুষদের চাহিদা সরবরাহ ছিল বাকী অর্থনীতির কাজ। আদিবাসী ও আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা দাসেরা খনিতে কাজ করত; স্পেনীয় খনি তদারককারী ও মালিকেরা লাভের কিছু অংশ নিত, ব্যবসায়ী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি খনি ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করত, স্পেনের রাজার ভাগ এক পঞ্চমাংশ নেওয়া হত। কিন্তু তারপরও অধিকাংশ মানুষ কাজ করত জমিতে, আর অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি ভিত্তিক। আমেরিকায় স্পেনীয় অধিকারের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। তার প্রধান দান ছিল আমেরিকার আদিবাসীদের ধ্বংস করা।

দাস ব্যবসা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সম্পদের একটা বড় অংশ এসেছিল দাস-ব্যবসা থেকে। এই ব্যবসায় অস্ত্রের মুখে হাজার হাজার পশ্চিম আফ্রিকাবাসীকে জোর করে ধরে নিয়ে জাহাজে তুলে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে আমেরিকায় নেওয়া হত। এই যাত্রা হত অত্যন্ত শোচনীয় পরিবেশে-প্রতি দশ জনে একজন পথেই মারা যেত। তাদেরকে আমেরিকায় নীলামে বিক্রি করা হত। তারপর তারা সারাজীবন বিনা পারিশ্রমিকে তার মালিকের কাজ করত প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৮ ঘন্টা-অনেক সময় চাবুক দিয়ে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হত। কমপক্ষে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ এই পরিণতি ভোগ করেছে।[৮] প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ সমুদ্রযাত্রায় মারা যায়। একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, ১৮২০ সাল নাগাদ প্রায় ১ কোটি আফ্রিকানকে আমেরিকায় আনা হল, ইউরোপ থেকে আসল ২০ লাখ। কিন্তু আমেরিকায় ইউরোপীয়ান বংশোদ্ভূতদের সংখ্যা হল ১ কোটি ২০ লাখ- আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের প্রায় দুই গুণ।[৯]

স্পেনীয়রা আমেরিকা জয় করার পর আদিবাসী "ইন্ডিয়ানদের" সঙ্গে নির্মম আচরণ করে তা বলা হয়েছে। তার উপর ছিল- ইউরোপ থেকে নিয়ে আসা সংক্রামক রোগের মহামারী- আদিবাসীদের জনসংখ্যা ৯০ শতাংশ কমে গেল। কাজ করার লোকের অভাব পূরণ করার জন্য আফ্রিকার দাস কিনে নিয়ে আসা শুরু হল। দাস ব্যবসা বড় আকার ধারণ করল পর্তুগাল, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যখন তাদের উপনিবেশগুলিতে তামাক ও ইক্ষু চাষ শুরু করল। তামাক ও ইক্ষু চাষে অনেক শ্রমিক লাগত। যতই তামাক ও চিনির বাজার বাড়তে থাকল, ততই শ্রমিকের দরকার বাড়ল, আর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকা থেকে দাস আনা হতে থাকল।

প্রাচীন যুগে বা মধ্যযুগে মানুষ চামড়ার রং মানুষকে বড় বা ছোট করে এটা মনে করত না।[১০] এটা মানুষের ওজন বা উচ্চতার পার্থক্যের মতই একটা বৈশিষ্ট্য মনে করত। আফ্রিকা হতে আনা দাসদের সঙ্গে মিলে অন্যান্য শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করা শুরু করল, ছোট জমির সাদা চামড়ার মালিকেরা যাদের দাস ছিল না, তারাও বড় ভূস্বামীদের প্রতি বিদ্বেষবশত: দাসদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীরা আমেরিকার আদিবাসীদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হল। এই সমস্ত কারণে বিত্তশালী ও বড় ভূস্বামীরা আফ্রিকার বংশোদ্ভূত দাস আর আদিবাসীদের সম্মন্ধে অন্যান্য সাদা মানুষদের ঘৃণা ও ভীতি সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করল। কৃষ্ণবর্ণ দাসদের জন্মগতভাবে শ্বেতাঙ্গদের চাইতে নিকৃষ্ট বলে প্রচারণা করা হল। আদিবাসীদের বলা হল বর্বর, মানুষখেকো। কিন্তু যে সমস্ত ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত লোক ১৫২০ ও ১৫৩০ এর দশকে মেক্সিকোর আজটেক সভ্যতা ও পেরুর ইনকা সভ্যতা দেখেছিল, তারা এই সভ্যতাগুলির ঐশ্বর্য ও অর্জন দেখে অভিভূত হয়েছিল। টেনকটিটলান (Tenochtitlan) নামে আজটেক শহর ইউরোপের যে কোন শহরের সমমানের ছিল। ইনকাদের রাজধানী কুজকো ৩০০০ মাইল দীর্ঘ সড়কপথ দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সাথে যুক্ত ছিল। সারা ইউরোপে কোথাও এমন ছিল না।[১১] তাদের কৃষিতে সেচ পদ্ধতি ছিল অভিনব। অঙ্কশাস্ত্রেও তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। ক্রমেই বহু দশক ধরে বর্ণবাদ পশ্চিমা বিশ্বে বিশ্বাসে পরিণত হল।

পুঁজিবাদের উত্থানে উপনিবেশবাদ ও দাস ব্যবসার একক অবদান ছিল তা অনেকেই মনে করেন না। কিন্তু এদুটোর ভূমিকা যে উল্লেখযোগ্য ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। পশ্চিম ইউরোপ বিশেষত: বৃটেনের অর্থনীতিতে এদুটোর প্রভাব ছিল বিরাট। প্রক্রিয়াটি "ত্রিমুখী বাণিজ্য" নামে অভিহিত হয়েছে। আফ্রিকায় ইউরোপীয় অস্ত্র, লোহার জিনিষপত্র ও কাপড়ের বিনিময়ে দাস সংগ্রহ করত। দাসদের আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পাড়ে বিক্রি করা হত। সেই অর্থ দিয়ে তামাক, চিনি এবং পরবর্তীতে তুলা কিনে ইউরোপে নিয়ে এসে লাভে বিক্রি করা হত। বাণিজ্যে সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজনে জাহাজ তৈরী ও মেরামত দরকার হত- এতে জাহাজ শিল্প হল সমৃদ্ধ। কার্ল মার্কস উপনিবেশবাদ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আদি পুঁজির সঞ্চয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন।[১২] ডেভিস স্বীকার করেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে ভিত্তি তৈরী করে তা না থাকলে শিল্প বিপ্লব

এত দ্রুত হত কিনা সন্দেহ।[১৩] হবসবম বলেছেন, আমাদের শিল্প সমৃদ্ধ অর্থনীতি কম উন্নত দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।[১৪]

এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার

পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য প্রথমদিকে ছিল প্রধানত: স্থলপথে মধ্য এশিয়ার পথ দিয়ে পশ্চিম এশিয়া ও কৃষ্ণ সাগরের বন্দরগুলি থেকে ইউরোপে মালপত্র আসত। পঞ্চদশ শতকের আগে নৌপথে ইউরোপের জাহাজগুলি মরক্কোর পর আর যেত না। পঞ্চদশ শতকে এটা বদলে গেল। জাহাজের উন্নত গঠন প্রণালী ও নতুন জাহাজ চালনার প্রযুক্তি আরও দূরপাল্লার সমুদ্রযাত্রা সহজতর করল। এ ব্যাপারে পর্তুগীজরা ছিল অগ্রণী। ১৩৮৫ সালের পর পর্তুগাল একদেশে পরিণত হয়। এরপর সে দেশে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না। ভূমধ্যসাগর সে সময় ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। ভূমধ্যসাগরে যেতে না পারায় পর্তুগীজদের আটলান্টিক মহাসাগরে দৃষ্টি দিতে হল। আটলান্টিক ছিল পর্তুগীজদের মাছ ধরার ক্ষেত্র আর দূর পাল্লার নৌ-বাণিজ্যের সমুদ্র। এশিয়ার মূল্যবান জিনিষপত্রের (যেমন মশলা, রেশম বস্ত্র, সূতী বস্ত্র, চীনা মাটির দ্রব্যাদি ইত্যাদি) ইউরোপে উচ্চশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে চাহিদা ছিল। এই বাণিজ্য ছিল লাভজনক এবং এটা আরব বণিক ও ইতালীয় বণিকরা নিয়ন্ত্রণ করত। বিশেষত: মশলার ব্যবসা ছিল আকর্ষণীয়- এটা আগেই বলা হয়েছে। এই ব্যবসায় অংশ নেওয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে এবং রাজ-প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে পর্তুগীজরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে এগোতে থাকে। তারা এই অঞ্চলে এজোর্স, মাদিরা ইত্যাদি দ্বীপ আবিস্কার করে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। ১৪৮৮ সালে তারা আফ্রিকার দক্ষিনাঞ্চল উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছায়। ১৪৯৮ সালে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছেন। এরপর পর্তুগীজরা আরও পূর্বদিকে বর্তমান শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন ও জাপান পৌঁছে। তারা এইসব এলাকায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। এশিয়ার মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে পর্তুগীজদের দেওয়ার কিছু না থাকায় তারা বলপ্রয়োগ ও লুটপাটের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করল।[১৫] রেশমবস্ত্র, হাতির দাঁত, বিশেষত: গোল মরিচ ইউরোপে নিয়ে বিক্রি করে লাভ করল। এর আগে যে পথে এইসব পণ্যদ্রব্য যেত (যেমন নিকট প্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল), সেই পথ কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। পর্তুগালের রাজকোষ সমৃদ্ধ হল। পর্তুগীজ রাজা তার বণিকদের ব্যবসা একচেটিয়া রাখার জন্য সমস্ত এশিয়ার বাণিজ্য তার নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল। সব ব্যবসায়ীকে পর্তুগীজ রাজার কাছ থেকে সনদ নিতে হত ও কর দিতে হত। এই ব্যবস্থা চালানর মত সামরিক শক্তি ও সম্পদ পর্তুগালের ক্ষমতার বাইরে ছিল। ১৫৩০ এর দশকের পর থেকেই ইউরোপের অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরা এই আইন ভেঙ্গে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ব্যবসা শুরু করল। এশিয়াতেও ব্যবসায়ীরা পর্তুগীজদের জাহাজের চাইতে ছোট কিন্তু দ্রুতগামী জাহাজে পর্তুগীজদের এড়িয়ে ব্যবসা শুরু করল। ১৫৬০ সাল নাগাদ পর্তুগীজ অবরোধ ভেঙ্গে ভূমধ্যসাগর দিয়ে আবার মশলা ইউরোপে আসা শুরু করল। কিন্তু অবরোধ কার্যকর রাখার জন্য যে খরচ তা ছিল অনেক। ১৫২৪ সাল থেকেই পর্তুগীজ রাজা খরচ চালানর জন্য ধার করা শুরু করলেন এবং ক্রমেই তা বাড়তে থাকল। পর্তুগালের অনেক মানুষ ব্রাজিলে গিয়ে বসতি স্থাপন করায় জনবল কমে গেল। গ্রামাঞ্চলে কৃষি হল অবহেলিত। এই অবস্থায় ১৫৭৮ সালে রাজা মরক্কোর অভিযানে গিয়ে সাত হাজার সৈন্যসহ নিহত হলেন। তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। স্পেনের রাজা আত্মীয়তার সূত্রধরে সিংহাসন দাবী করলেন ও পর্তুগালের অভিজাত শ্রেণীদের বশ করে সিংহাসন অধিকার করলেন। পর্তুগালের জন্য এটা হল বিপর্যয়। স্পেনের শত্রু ছিল হল্যান্ড। এর আগে ডাচ ব্যবসায়ীরা লিসবনে মশলা কিনতে আসত। স্পেনের রাজা তাদের নিষিদ্ধ করে দিলেন। ডাচরা তাদের সংখ্যাধিক্য ও নৌশক্তির বলে পরবর্তী চল্লিশ বছরে এশিয়াসহ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য দখল করে নিল। ১৬৪০ সালে পর্তুগীজরা আবার স্বাধীন হল ও ডাচদের সঙ্গে সন্ধি করল। কিন্তু ততদিনে অল্প কয়েকটি জায়গা ছাড়া সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেছে।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে স্পেন ছিল ইউরোপের সবচাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্র। এছাড়া ষষ্ঠদশ শতকের প্রথমদিকে স্পেনের রাজা চার্লস অন্যান্য ইউরোপীয় রাজাদের মৃত্যুর কারণে ঘটনাচক্রে আত্মীয়তার সূত্র ধরে স্পেন ও স্পেনের আমেরিকার রাজত্ব ছাড়াও বারগান্ডী, অষ্ট্রীয়া, ইতালীর একটা বড় অংশ, নিম্ন ভূমির দেশ (Low Countries) এগুলোর রাজত্বও পেলেন। এছাড়াও তাঁকে পোপ নির্বাচিত করা হল। বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে তাঁর সম্পদ নি:শেষ হতে লাগল। আমেরিকা থেকে আসা স্বর্ণ, রৌপ্যও খরচ হয়ে গেল। জার্মানীতে রাজা যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন, পূর্বদিকে অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হল। রাজকোষ খরচ মেটাতে না পারায় অন্যান্য দেশে প্রচুর দেনা করতে হল। দেনা সময়মত শোধ করতে না পারায় ১৫৫৭ থেকে ১৬৪৭ সাল পর্যন্ত ছয়বার দেওলিয়া ঘোষণা করে খাতকদের হাত থেকে বাঁচতে হল। প্রতিবার দেওলিয়া হবার পর ধার নিতে গেলে সুদের হারও অনেক বেশী হল। সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা বাড়ল, কৃষির অবনতি হল।[১৬]

সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক থেকেই পর্তুগীজ শক্তির পতনের পর এই স্থান দখল করে ডাচরা। ডাচদের মূল লক্ষ্য ছিল মশলার দ্বীপ মলুক্কা (Molucca) (বর্তমান ইন্দোনেশিয়াতে অবস্থিত)। ডাচরা ইউনাইটেড ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্থাপন করে তার মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করল, কোম্পানীর লোকেরা স্থানীয় শাসকদের সহযোগিতায় ব্যবসা চালাতে লাগল। ১৬০৯ সালে বাটাভিয়ায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হল (বর্তমান জাকার্তা)। ডাচরাও তাদের কর্মকান্ডে নিষ্ঠুরতার প্রমাণ রেখে গেছে- যেমন স্থানীয় অধিবাসীদের দাস হিসাবে কাজ করান, বিদ্রোহ দমনে হত্যা করা ইত্যাদি। প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য তারা স্থানীয়দের এবং চীনাদের জাহাজ ধ্বংস করে। মশলার ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। প্রায় একশত বছর ধরে আমস্টারডামে পাঠান পণ্যের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগই ছিল মশলা।[১৭] ডাচরা তাইওয়ান ও জাপানেও পর্তুগীজদের ব্যবসা নিয়ে নিল। তারা শ্রীলঙ্কা ও ভারতের কালিকটেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হল। ইংল্যান্ডের নৌশক্তি বাড়লে তারা এই অঞ্চলে ডাচদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পেরে উঠল না। ফলে ১৭০০ সাল নাগাদ তারা মশলার ব্যবসার চেষ্টা না করে ভারতে ব্যবসায় নিয়োজিত হল। বৃটেনের ইতিহাসে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ভারত অধিকার

ভারতে বৃটিশদের প্রতিযোগী ছিল ফরাসীরা। বৃটিশরা ভারতে প্রভাব বিস্তার করে ধীরে ধীরে। প্রথম তারা মাদ্রাজে ফোর্ট সেন্ট জর্জ স্থাপন করে। এরপর তারা পর্তুগীজ রাজার কাছ থেকে বৃটেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিয়েতে যৌতুক হিসাবে বোম্বাই পায়। এখান থেকে তারা সূতীবস্ত্র ও কফির ব্যবসা চালাতে থাকে। ১৭০০ সালে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকরা ভারতে নতুন এলাকা নেওয়ার চেষ্টার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়। কিন্তু ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর প্রেক্ষাপট বদলে যায়।[১৮] সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকাজ চালান শুরু করেন। স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে বিদেশী বণিকদের যোগাযোগ ছিল। স্থানীয় বণিকেরা এই সময় অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল।[১৯] বৃটিশরা এই সুযোগ নিল।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে অগ্রসর ছিল। ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের সমমানের ছিল। এদেশে উন্নতমানের তাঁতবস্ত্র "মসলিন" তৈরী করা হত ও রপ্তানী করা হত। সেই সময় বৃটিশদের পূর্বপুরুষরা প্রায় আদিম জীবন যাপন করত।[২০] বাংলাদেশ ছিল মোগল সাম্রাজ্যের সবচাইতে সম্পদশালী অংশ- তার ধনসম্পদ ইউরোপীয়দের ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছিল।[২১] বৃটিশরা যখন ভারত অধিকার করে তখন শিল্পের উন্নতির দিক দিয়ে ইংল্যান্ডের সমমানের ছিল। বাংলা প্রদেশ অধিকার যিনি করেছিলেন, লর্ড ক্লাইভ, তিনি লিখেন, বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ঢাকা ১৭৫৭ সালে ছিল লন্ডন শহরের মতই বড়, জনবহুল ও ধনশালী।[২২] বাংলার শাসকশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ১৭৫৭ সালের ২২শে জুন ক্ষুদ্র বৃটিশ বাহিনী প্রায় বিনা যুদ্ধেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরাট

বাহিনীকে পরাজিত করল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। এই যুদ্ধই বৃটিশদের ভারতে প্রবেশের রাস্তা খুলে দেয়। এই প্রদেশের ধনসম্পদই বৃটেনকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অধিকার করার ক্ষমতা দেয়। বৃটেনের ভারত শাসনই বিশ্ব পুঁজিবাদের অগ্রগতির ধারা নির্ধারণ করে। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার পায়। কর আদায়ের নামে ব্যাপক লুটপাট হয়। মানুষ অত্যাচারে কাজকর্ম ফেলে লোকালয় ত্যাগ করে। ১৭৬৯-৭০ সালে (বাংলা সন ১১৭৬) এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। এই দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তুরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। অথচ ১৭৭২ সালে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানীর পরিচালকদের কাছে লিখেন, বাংলাদেশের ব্যাপক মানুষের মৃত্যু এবং তার ফল স্বরূপ কৃষির চরম অবনতি সত্ত্বেও ১৭৭১ সালে নীট রাজস্ব আদায় এমনকি ১৭৬৮ সালের রাজস্বের চেয়েও বেশী হয়েছে। এরপর আরও কয়েকটি দুর্ভিক্ষ হয়।

১৮৪০ সাল নাগাদ ঢাকার জনসংখ্যা দেড়লক্ষ থেকে কমে ত্রিশ হাজার হয়। বৃটিশ হাউস অব লর্ডসে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন (একজন বৃটিশ সরকারী কর্মকর্তা, যিনি পরবর্তীতে বৃটিশ ভারতের অর্থমন্ত্রীও হয়েছিলেন) সাক্ষ্য দেন, বাংলা অঞ্চলে গ্রাম জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।[২৩] ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" নামে ভূমি পরিচালনা ব্যবস্থা চালু করেছিল ১৭৯৩ সালে। ব্যক্তিমালিকানায় জমির কর আদায়ের ব্যবস্থা করায় বৃটিশ শাসক ও তার দেশীয় সহযোগিরা প্রভূত লাভবান হলেও দেশের বহুল সংখ্যক নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল-এটা ১৮৩২ সালে বৃটিশ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক স্বীকার করেন এই দুর্ভোগের কোন তুলনা পৃথিবীর ব্যবসার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বাংলার তাঁতীদের হাড় মাঠে ঘাটে শুকাচ্ছে।[২৪] তবে বৃটিশরা লাভবান হয়েছিল। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদিও অনেক দিক দিয়ে বিফল, কিন্তু একটা বড় জমিদার শ্রেণী তৈরী করেছে, যাদের জনসাধারণের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে এবং যারা বৃটিশ শাসন বজায় রাখতে সক্রিয়। উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা এই পদ্ধতি পরবর্তীতে আরও অনেক দেশে কাজে লাগিয়েছে।

ভারতের ব্যবসায়ীরা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রথম পর্যায়ে এটাকে স্বাগত জানিয়ে সহযোগিতা করেছে। কারণ কোম্পানী তাদের কাছ থেকে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য (মূলত সুতীবস্ত্র) কিনত আর তাদের সম্পদ সুরক্ষা করত। ক্রমেই ভারতের অন্যান্য রাজ্য বৃটিশরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসল। কোন কোন স্থানে তারা যুদ্ধে স্থানীয় রাজাকে পরাজিত করল, আর কোন কোন স্থানে তাদের অসম চুক্তি করতে বাধ্য করল (যাতে রাজা নামে মাত্র শাসনকর্তা থাকল)। ১৮৫০ সাল নাগাদ প্রায় সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। মারাঠাদের পরাজিত করা হল ১৮১৮ সালে, সিন্ধু জয় করা হল ১৮৪৩ সালে, শিখরা পরাজিত হল ১৮৪৯ সালে, আর অযোধ্যা জয় করা হল ১৮৫৬ সালে। রোমান শাসকদের ভাগ করো ও শাসন করো (Divide and Rule) এই নীতি প্রয়োগ করে একজন শাসককে আরেকজনের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে, কোন কোন স্থানে উৎকোচ দিয়ে একশ্রেণীর বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীকে ব্যবহার করে এবং এক ধর্মাবলম্বী মানুষদের আরেক ধর্মাবলম্বী মানুষদের বিরুদ্ধে উম্মাদনার সৃষ্টি করে তারা নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে চলল। বৃটিশরা ২০ কোটি মানুষকে তাদের ৪০ হাজার সৈন্য (এবং তার সঙ্গে তাদের অধীন ২ লক্ষ দেশীয় সৈন্য) দিয়ে জয় করল।[২৫]

বিপুল ঐশ্বর্য ভারত থেকে বৃটেনে যেতে শুরু করল। এর বেশীরভাগই এদেশের কৃষকের শ্রমলব্ধ অর্থ। প্রতি বছর বৃটেনে ২০ লক্ষ পাউন্ড এর কাছাকাছি অর্থ পাঠান হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তা বৎসরে ২ কোটি থেকে ৩ কোটি পাউন্ডে দাঁড়ায়।[২৬] ব্যক্তিগতভাবেও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা ধনসম্পদ অর্জন করেছিল। ক্লাইভ ২ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউন্ড (মূলত লুটপাট করে অর্জন করা) নিয়ে যান ফিরে যাবার সময়। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস এর বড় বড় উৎকোচ নেওয়ার খ্যাতি সুবিদিত।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট থাকলেও তাদের ব্যবসা বা শিল্প নীতির উপর কোন প্রভাব ছিল না। নিয়ন্ত্রণ ছিল কোম্পানীর সদর দফতর ইংল্যান্ডের। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে এটা পরিস্কারভাবে দেখা গেল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের সুতীবস্ত্র ইংল্যান্ডে বাজারজাত করে কোম্পানী লাভ করত। উনবিংশ শতকে যান্ত্রিক তাঁতের দ্বারা অধিক পরিমাণে ও কমদামে বস্ত্র তৈরী করা শুরু হল বৃটেনে। বৃটেনের সুতীবস্ত্র ভারতের বাজার দখল করে নিল। ভারতের লক্ষ লক্ষ তাঁতী সর্বস্বান্ত হল, ভারতের ব্যবসায়ীরা হল ক্ষতিগ্রস্ত। এছাড়া ব্যাংক ব্যবসা, জাহাজ তৈরী শিল্প ইত্যাদি দেশীয় ব্যবসায়ীদের হাতছাড়া হয়ে গেল। ভারতের শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়ে গেল, কিন্তু নীতি নির্ধারণে এদেশের ব্যবসায়ীদের কোন ভূমিকা না থাকায় তারা দেশের স্বার্থ ও নিজেদেরও স্বার্থরক্ষা করতে পারল না।

উনবিংশ শতাব্দী নাগাদ ভারতের রপ্তানী অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বৃটেনের বাণিজ্য ঘাটতির দুই পঞ্চমাংশ পূরণ করা হচ্ছিল। ভারতের জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশের অধিক কোন না কোনভাবে বৃটেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।[২৭] ভারতের মানুষের প্রদত্ত কর দিয়ে বৃটিশ সেনাবাহিনী পালন হচ্ছিল তাই নয়, এই সেনাবাহিনীকে বৃটেনের প্রয়োজনে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ব্যবহার করা হচ্ছিল। বৃটেনের উৎপাদিত পণ্যের একচেটিয়া বাজার হিসাবে ভারতকে ব্যবহার করা হচ্ছিল। ভারতে উৎপাদিত আফিম চীনে বাজারজাত করা হচ্ছিল।

চীনে প্রভাব বিস্তার

১৭৯৩ সালে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ এর দূত হিসাবে লর্ড ম্যাকার্টনী চীনের রাজদরবারে এসে পারস্পরিক কূটনৈতিক সমতা এবং মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রার্থনা করলেন। চীনের সম্রাট এটা প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্রাট তার বক্তব্যে ইংল্যান্ডের কথা উল্লেখ করে বল্লেন, "আপনাদের সুদূর দ্বীপ, যা নিস্ফলা, সমুদ্র দ্বারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন", তবে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন "আনুগত্য দেখিয়ে উপহার পাঠানর জন্য" এবং ভবিষ্যতে আরও ভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখানর উপদেশ দিলেন।[২৮] এই আচরণ শুধু যে ঔদ্ধত্য ছিল তা নয়। এটা তৎকালীন চীনের উচ্চশ্রেণীর তাদের সভ্যতা ও সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস এর বহি:প্রকাশ ছিল। এটা একশত বছর পর ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের মধ্যে দেখা গেছে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষদের সম্বন্ধে। চীনারা মনে করত তাদের সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ, বস্তুগত, কৌশলগত দক্ষতা তাদের সবই আছে, বাইরে থেকে তেমন কিছু আনার দরকার নাই। যেটুকু বাণিজ্য ক্যান্টনের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে হচ্ছে (প্রায় এক হাজার ইউরোপীয় তখন সেখানে ছিল) তা যথেষ্ট। এটা মনে করার কারণও ছিল। এর আগে কয়েক শতকের বাণিজ্যে চীনারা ইউরোপে তৈরী এমন কিছু পায় নাই যা তাদের দরকার। চীনাদের সঙ্গে বাণিজ্যে ইউরোপীয়দের তাই হয় রূপা দিতে হত, অথবা এশিয়ার অন্য দেশ থেকে আনা পণ্য দিতে হত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে বৃটিশরা এমন একটা জিনিষ খুঁজে বের করল, যা চীনে বিক্রি করা যায়; তা হল আফিম। এই সময় বৃটেন চীন থেকে ক্রমেই বাড়তে থাকা পরিমাণে চা কিনছিল রূপার বিনিময়ে। ভারতে বিশাল এলাকায় তারা অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদন বন্ধ করে আফিমের চাষ শুরু করল। এটা তারা চীনে বিক্রি করা শুরু করল। ১৮১০ সাল নাগাদ ৩ লক্ষ ২৫ হাজার কিলোগ্রাম আফিম তারা বৎসরে চীনে বিক্রি করছিল। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় চীনারা যখন নেশাগ্রস্ত হতে শুরু করল, তখন চীনের কর্তৃপক্ষ এটা বন্ধ করার চেষ্টা করল। তারা গুদামে রক্ষিত আফিম বাজেয়াপ্ত করা ও গুদাম বন্ধ করা শুরু করল ১৮৩০ এর দশকের শেষদিকে। চীনের মানুষকে নেশাগ্রস্ত করার অধিকার রক্ষা করার জন্য বৃটেন যুদ্ধ শুরু করল।

১৮৪০ সালের জুন মাসে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ ক্যান্টন নদীর মোহনায় উপস্থিত হল। সাংহাই এর পতনের পর নানকিংএ হামলা শুরু হওয়ার পর ১৮৪২ সালে চীন পরাজয় স্বীকার করল। এভাবে শেষ হল প্রথম আফিম যুদ্ধ। নানকিংএ চুক্তি হল। চীন হংকং বৃটেনকে দিতে বাধ্য হল, চীনের পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করা ও স্থায়ীভাবে থাকার অধিকার দিল বৃটিশদের,

পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক কমান হল। আর বৃটিশ নাগরিকদের চীনা আদালতে বিচার করা যাবে না এটা মানতে হল। অন্যান্য দেশ সুযোগ পেয়ে চাপ দিয়ে একই ধরনের চুক্তি করতে বাধ্য করল। আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্স এটা করল।

তবে চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার চীন তখনও দেয়নি। দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সামাজিক গঠন বদল না হওয়ায় বিদেশী পণ্যের চাহিদা বাড়ছিল না। চীনের আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি (যা ভারতের মত ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি) বিদেশী পণ্যের অনুকূল ছিল না। বৃটিশ বণিকেরা তাই আফিম চোরাচালান করতেই থাকল।[২৯] এর বিনিময়ে চীন থেকে রূপা বাইরে পাচার হতে থাকল। রূপা চীনে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার হত। চীনের কম উর্বর পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের অবস্থার অবনতি হল। চীনের কৃষকরা বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহ "তাইপিং" বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ১৮৪০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্রোহ শুরু হয়ে ১৮৫৩ সাল নাগাদ চীনের প্রায় অর্ধেক এলাকা বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেল। এই বিদ্রোহে যদিও চীনের সমাজ ব্যবস্থা আধুনিক করার দাবিই উঠেছিল, কিন্তু বিদেশী শক্তিগুলি তাদের সুযোগ সুবিধা খর্ব হবে এই আশঙ্কা করছিল।[৩০] তাই বিদেশী শক্তি বিশেষত: বৃটেন ও ফ্রান্স চীনের সম্রাটকে সাহায্য করল তার সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন করতে এবং আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত করতে। ১৮৬৪ সালে বিদ্রোহীদের কেন্দ্র নানকিং শহরের পতন হল। প্রায় এক লক্ষ বিদ্রোহী নিহত হল।

এর আগেই ১৮৫৬ সালে বৃটেন ও ফ্রান্স চীনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ শুরু করেছিল। বিদ্রোহের ফলে চীনের সম্রাট আরও দুর্বল হয়ে গেল এবং বিদেশী শক্তির উপর নির্ভরতা বাড়ল, বিদেশীরা চীনকে আরও সুবিধা দিতে বাধ্য করল। আরও কয়েকটা বন্দরে বাণিজ্য করার সুযোগ, দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য করার সুযোগ, ইয়াংসি নদীতে টহল দেওয়ার অধিকার ইত্যাদি তারা আদায় করে নিল। আফিম ব্যবসারও অনুমোদন দেওয়া হল। বিদেশী শক্তিগুলি চীনের অভ্যন্তরে পণ্য বিক্রির জন্য চাপ সৃষ্টি করতেই থাকল। এ সত্ত্বেও উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে চীনের অভ্যন্তরে তাদের বাণিজ্য বেশী বাড়েনি। কোন বিদেশী শক্তিই চীন পুরোপুরি দখল করে নি। এর বড় কারণ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা। কোন একটি দেশ যখন বেশী সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করত, তখন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সম্মিলিতভাবে সেটা প্রতিরোধ করত। চীন সীমিত আকারে হলেও তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারল।

উপনিবেশ স্থাপন ও তার প্রভাব

উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম পর্যায়ে বাণিজ্যিক পুঁজির প্রভাব ছিল প্রধান। এই সময়কালে (ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে) ইউরোপীয় দেশগুলিতে পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা বেশী ছিল না। উপনিবেশ স্থাপন করে প্রধানত: কয়েকটি উপায়ে লাভ করা হল: (১) প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পণ্যবাণিজ্যে পুরনো বণিক ও নিয়ন্ত্রকদের সরিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করা যাতে এই বাণিজ্যের লাভ নিজেরা পায়। মশলা বাণিজ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তির আধিপত্য স্থাপন এর ভাল ঊদাহরণ। (২) উপনিবেশ দখল করে সেখানকার সঞ্চিত ধন সম্পদ জোর করে নিয়ে নেওয়া। দক্ষিণ আমেরিকার স্বর্ণ ও রূপা আহরণ এবং ভারতে লুটপাট এর ঊদাহরণ। (৩) যে সমস্ত পণ্য ইউরোপে তৈরী হয় না, অথচ চাহিদা আছে, সেগুলো উপনিবেশ থেকে অতি স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ করে বাজারজাত করা। আমেরিকার চিনি, তামাক ইত্যাদি ও এশিয়ার সুতীবস্ত্র, চা ইত্যাদির বাণিজ্য এর ঊদাহরণ। (৪) আফ্রিকায় দাস সংগ্রহ করে আমেরিকায় বিক্রি করা। জলদস্যুতা, লুটপাট, অপহরণ করে দাস চালান-এগুলোর মাধ্যমে লাভ একসময় কমে আসল। আক্রান্ত দেশ ও সমাজগুলির শতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদ এক সময় শেষ হয়ে আসল।[৩১]

তবে এই বিশাল সম্পদ আহরণ উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশগুলোর উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। সাথে সাথে পৃথিবীর অর্থনৈতিক সামাজিক পরিবর্তনও প্রভাবিত করেছিল। আন্তর্জাতিক পণ্য আদান প্রদান বাড়ায় সম্পদ আহরণকারী দেশগুলিতে পণ্য উৎপাদনের গতি বাড়ল এবং অর্থের আদান প্রদান বাড়ল এবং অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। ক্রমেই

এই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত সামন্তবাদী উৎপাদন প্রথার পরিবর্তন ঘটিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করল। বর্ধিত উৎপাদনের জন্য কারখানায় উৎপাদন শুরু হল, যান্ত্রিক ও কৌশলগত আবিষ্কার হল ও প্রয়োগ হতে লাগল। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে বাণিজ্যের চরিত্র বদলাতে থাকল। আগে উপনিবেশবাদী দেশগুলো উপনিবেশে পণ্যদ্রব্য কিনত, অনেক সময় তার বিনিময়ে তাদের দেওয়ার মত পণ্য থাকত না। ক্রমেই তারা নিজেদের দেশে কারখানায় পণ্য উৎপাদন করে তা উপনিবেশে বিক্রি করতে লাগল। উপনিবেশে তারা তাদের দেশের উৎপাদনের জন্য দরকারী কাঁচামাল সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করল। এতে উপনিবেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন করতে হল। তাছাড়া উপনিবেশগুলোর বিদ্যমান অবস্থায় শিল্পজাত পণ্যের চাহিদাও কম ছিল। এটাও বাড়ানর দরকার হল। এজন্য যে পরিবর্তনগুলো করা হল তা হল: (১) বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া, ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা চালু করা, বড় বড় খামারের ব্যবস্থা করা যেখানে কাঁচামাল উৎপাদন করা যাবে। এই প্রয়োজনে কোন কোন স্থানে আদিঅধিবাসীদের তাদের ভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, কোন কোন জায়গায় তাদের হত্যা করে জমি দখল করা হল। (২) বাধ্যতামূলক শ্রমের মাধ্যমে খনি ও বাণিজ্যিক খামার এর শ্রমিক সৃষ্টি করা হল, (৩) ভূমির খাজনা ও অন্যান্য কর দেওয়ার জন্য মুদ্রা চালু করা হল, (৪) যেখানে উপনিবেশের কিছু শিল্প উৎপাদন গড়ে উঠেছিল, সেগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হল।[৩২]

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, অবকাঠামো, শিক্ষা ব্যবস্থা, এমনকি উপনিবেশের জনগণের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করে ফেলে। দখলকারী দেশের প্রয়োজনে এসমস্ত ঢেলে সাজান হয়। উপনিবেশের বা তার জনগণের প্রয়োজনের কথা একদমই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। উপনিবেশ তখন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অংশ হয়ে যায়। উপনিবেশের কাঠামো সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জাতিয়তাবাদী নেতারা চারটি বিশেষত্ব চিহ্নিত করেন।[৩৩] (১) উপনিবেশগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত করা হয়, কিন্তু তার অধিনস্ত করে। (২) উপনিবেশের অর্থনীতির বিভিন্ন অংশগুলিকে বিনষ্ট করে উপনিবেশবাদী দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের পরিপূরক উপাদান গড়ে তোলা হয়। (৩) কর ব্যবস্থা, বিনিময় ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপনিবেশের সামাজিক উদ্বৃত্ত উপনিবেশবাদী দেশে স্থানান্তর করা হয়। (৪) উপনিবেশের উপর শাসক দেশের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়। যে সমস্ত দেশ অন্য দেশের উপনিবেশ ছিল তাদের উপর উপনিবেশের যুদ্ধের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত হবে এবং তারা শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হবে এরকম আশা অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু উপনিবেশের ফলে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক যে পরিবর্তনগুলো ঘটান হয়েছে, তার ফলে তাদের পক্ষে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়েছে,"শিল্প-বিপ্লব" নয়।[৩৪] পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্তির কারণে যে সমস্ত বিকৃতি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় বহু যুগ ধরে ঘটেছে, তা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে নতুন আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো গড়ে না তুললে পরিপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব নয়, এটা কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন।[৩৫] উপনিবেশবাদের বিশ্লেষণ তাই শুধু ইতিহাস জানার জন্যই প্রয়োজন তা নয়, ভবিষ্যতের উন্নয়নও এখান থেকে শিক্ষা না নিলে দুরূহ হবে।

তথ্য সূত্রঃ

১. Harman C. A People's History of the World. London,1999 p 163
২. Roberts JM. The Pelican History of the World. Harmondsworth,1976 p 611
৩. Quoted in:Harman C. p 169
৪. Prescott WH. The Conquest of Peru. New York,1961 p 253
৫. Hemmings J.The Conquest of Peru. London,1970 p 407
৬. Davis R. The Rise of Atlantic Economies. New York, 1973 p 45
৭. Roberts JM. p 612
৮. Blackburn R. The Making of New World Slavery. London,1973 p 3
৯. Manning P. Slavery and African Life. Cambridge,1990 p 104
১০. Harman C. p 252
১১. Harman C. p 161
১২. Quoted in: Smith AK. Creating a World Economy, Merchant Capital, Colonialism and World Trade 1450-1825. Boulder, 1991 p 226
১৩. Davis R. The Industrial Revolution and the British Overseas Trade. Leicester,1979 p 10
১৪. Hobsbawm E. Industry and Empire:An Economic History of Britain since 1750. London, 1968 p 32
১৫. Smith AK. p 78
১৬. Kamen H. Spain, 1469-1714. London, 1983 p 167
১৭. Roberts JM. p 606
১৮. Roberts JM, p 607
১৯. Harman C. p 396
২০. Anstey V. The Economic development of India. London, 1929
২১. Harman C. p 356-7
২২. Chomsky N.World Orders Old and New. New York, 1994 p 115
২৩. Quoted in Chomsky N. p 115
২৪. Chomsky N. p 116
২৫. Harman C. p 356
২৬. Chandra B. Essays on Colonialism. Hyderabad, 1999 p 82
২৭. Chandra B. p 295
২৮. Roberts JM. p 777
২৯. Magdoff H. Imperialism from the Colonial Age to the Present. Delhi, 2009 p 49
৩০. Harman C. p 361
৩১. Magdoff H. p 3, 4
৩২. Magdoff H. p 18,19
৩৩. Chandra B. p 10-12
৩৪. Chandra B. p 40
৩৫. Chandra B. p viii

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিল্প বিপ্লব

কৃষির আবিষ্কার ও নগর সভ্যতার উত্থানের পর পৃথিবীর ইতিহাসে শিল্প বিপ্লবকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হয়। এই সময়ে মানব সমাজ এই প্রথম উৎপাদন শক্তির সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে ফেলে। এরপর থেকে মানুষ বিপুল পরিমাণে দ্রুত ও অবিরত পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হল। অতীতে কোন মানব সমাজই এত বিপুল পরিমাণে ও এই রকম অবিচ্ছেদ্যভাবে উৎপাদন করতে পারেনি। আগের সমাজ ও সভ্যতাগুলোতে সামাজিক গঠনের দুর্বলতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পশ্চাদপদতার জন্য উৎপাদন ক্ষমতা ছিল কম এবং তা প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত।

শিল্প বিপ্লব কখন শুরু হল তা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে। এর প্রস্তুতিপর্ব ছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এ প্রক্রিয়া বেগবান হয়। ১৭৮০ দশক থেকে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগুলোর উর্ধগতি দেখা যায়। বৃটেনে প্রথম এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটা কাকতালীয় ছিল না। শিল্প ও বাণিজ্যে পর্তুগাল থেকে রাশিয়া পর্যন্ত ইউরোপের কয়েকটি রাজ্যেই এই সময়কালে অগ্রগতি হয়েছিল। তবে মাথাপিছু উৎপাদনে বৃটেন তখন ইউরোপের সব দেশের চাইতে অনেক এগিয়ে ছিল। কিন্তু বৃটেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অন্যান্য দেশের চাইতে পিছিয়ে ছিল। কাজেই শিল্প বিপ্লব বৃটেনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ছিল না। বিজ্ঞানে ফরাসীরা এগিয়ে ছিল বিশেষত: পদার্থবিদ্যা ও অংকশাস্ত্রে।[১] ফরাসী বিপ্লব বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রতিকূলতা দূর করেছিল যেটা বৃটেনে এর পরেও বিরাজ করছিল। ফরাসীরা উন্নত ধরনের জাহাজ তৈরী করত এবং অনেক বেশী প্রযুক্তিগত আবিষ্কার করেছিল। প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ জার্মানীতে বৃটেনের চাইতে উন্নতমানের ছিল। বৃটেনের শিক্ষা ব্যবস্থা এই সময় ছিল পশ্চাদপদ। ইংল্যান্ডের তৎকালীন দুই বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজ এ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ছিল শ্লথ।[২] তবে শিল্প বিপ্লবের জন্য বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন ছিল না। যে সব প্রযুক্তি এই সময় কাজে লেগেছিল সেগুলো ছিল খুবই সাধারণ। Flying shuttle, spinning jenny, the mule ইত্যাদি নতুন প্রযুক্তি সাধারণ কারিগরদের পক্ষেই উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছিল। এমনকি সেই সময়ের সবচাইতে উন্নত উদ্ভাবন জেমস ওয়াটের বাস্প ইঞ্জিন তৈরী করার জন্য যে পদার্থবিদ্যার প্রয়োজন হয়েছিল তা কয়েক দশক আগেই জানা ছিল।

তবে অন্যান্য কিছু উপাদান বৃটেনে শিল্প বিপ্লবের জন্য আরও প্রয়োজনীয় ছিল। একটা ছিল কৃষি উৎপাদনের আমূল পরিবর্তন। সংখ্যায় কম কিছু ভূমি মালিক প্রায় সমস্ত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের জমি চাষ করত প্রজা কৃষকেরা। এতে কয়েকটি পরিবর্তন হয়। প্রথমতঃ কৃষি উৎপাদন বাড়ান হয় যাতে করে শিল্প-বাণিজ্যে কর্মরত ক্রমবর্ধমান সংখ্যার মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। বৃটেনের কৃষিতে উৎপাদন ১৮৩০ এর শতকে যা ছিল, তা খাদ্যের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ পূরণ করার জন্য যথেষ্ট। এটা উল্লেখ করা দরকার যে এই সময়ের জনসংখ্যা একশ বছর আগের জনসংখ্যার চাইতে দুই গুণেরও বেশী ছিল। দ্বিতীয়তঃ কৃষিতে বড় সংখ্যায় মানুষ উদ্বৃত্ত হওয়ার ফলে শিল্পে শ্রমিকের যোগান দেওয়া সম্ভব হল। তৃতীয়তঃ কৃষি আয়ের অর্থ দিয়ে শিল্প উৎপাদনে পুঁজির ব্যবস্থা হল। কৃষিতে নিয়োজিত মানুষরা শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের জন্য একটি বড় আকারে এর বাজার হিসাবে কাজ করল। এ ছাড়াও শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় জাহাজ, বন্দর, রাস্তাঘাট, নদীপথ এগুলো তৈরী করা হচ্ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প উৎপাদন অনেক বেড়েছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধি ছিল সবই আগের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রায় সব উপাদানই বৃটেনে তৈরী ছিল। দুটি জিনিষ এই পরিস্থিতিকে বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। এক হলো, এমন একটি শিল্প যা উৎপাদন বাড়াতে পারলে তার মালিকের জন্য প্রভূত লাভের ব্যবস্থা করে এবং যার জন্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় খুবই সামান্য। দুই-পণ্যের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার যা একটি দেশের দখলে। বৃটেন এই দিক দিয়ে পরিস্থিতির উপযুক্ত ব্যবহার করতে সক্ষম হলো। সুতী বস্ত্র উৎপাদনে তখন প্রথম শর্ত পূরণ করতে সক্ষম ছিল। আর ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে ১৭৯৩ থেকে ১৮১৫ সালের যুদ্ধের পর কার্যত: ইউরোপের বাইরে বৃটেনের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।

সপ্তদশ শতকে বৃটেনে মূলত পশমের বস্ত্র উৎপাদন করা হত। সুতীবস্ত্র আমদানী হত ভারত থেকে। এটা বেশ জনপ্রিয় ছিল এবং পশমের কাপড়ের চাইতে কম দামে পাওয়া যেত। যদিও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত থেকে আনা সুতীবস্ত্রের বাজার বাড়ানর জন্য চেষ্টা করত কিন্তু বৃটেনের পশম বস্ত্র প্রস্তুতকারকদের চাপে সুতীবস্ত্রের আমদানী সীমিত থাকত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটেনেই সুতীবস্ত্র শিল্পের প্রসার ঘটল। বিশেষত লিভারপুল, ব্রিষ্টল ও গ্লাসগো অঞ্চলে। ভারতের সুতীবস্ত্র লব্ধ অর্থ দিয়ে আফ্রিকায় দাস কেনা হত। এই দাসদের আমেরিকার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ সমূহে তুলা উৎপাদনে লাগান হত। এই তুলা দিয়ে সুতী বস্ত্র তৈরী হত বৃটেনে। সুতীবস্ত্র বিক্রি করা হত আফ্রিকা ও আমেরিকায়। ১৭৫০ থেকে ১৭৬৯ সালের মধ্যে বৃটেন থেকে সুতীবস্ত্র রপ্তানী দশগুণের বেশী বাড়ে।[৩] এই সময় আন্তর্জাতিক বাজার বৃটেনের দখলে ছিল এবং বৃটিশ সরকার রপ্তানীকারক ও ব্যবসায়ীদের সব ধরণের সহযোগিতা দিত। ১৮২০ সালে বৃটেনের সুতীবস্ত্র রপ্তানী ছিল ইউরোপে ১২.৮ কোটি গজ ও আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া) আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছিল ৮ কোটি গজ। ১৮৪০ সালে ইউরোপে রপ্তানী ছিল ২০ কোটি গজ, কিন্তু আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া) আফ্রিকা ও এশিয়ায় বেড়ে হল প্রায় ৫৩ কোটি গজ।[৪] আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আফ্রিকা ও এশিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য বিস্তারের ফলেই এই বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। ভারতের বস্ত্রশিল্প পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়, এবং ভারত পরিণত হয় বৃটেনের বাজারে। ১৮২০ সালে ভারত ১.১ কোটি গজ বস্ত্র বৃটেন থেকে আমদানী করে- ১৮৪০ সালে সেটা বেড়ে হয় ১৪.৫ কোটি গজ। এখানে উল্লেখ্য পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইতিহাসের শুরু থেকে এই সময় পর্যন্ত ইউরোপ এশিয়া থেকে রপ্তানীর চাইতে অনেক বেশী আমদানী করেছে। ইউরোপের খুব কম পণ্যদ্রব্যই ছিল যার চাহিদা ছিল এশিয়ায়। কিন্তু এশিয়ার মশলা, রেশম. ও সুতীবস্ত্র, মূল্যবান পাথর এগুলোর বিরাট চাহিদা ছিল ইউরোপে। বাণিজ্যের ঘাটতি ইউরোপ পুরণ করত স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে লুটপাট করে। এই প্রথম বাণিজ্যের পাল্লা ইউরোপের দিকে ঝুঁকল।[৫]

সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে শক্তিধর হওয়ার জন্য বাজার দখল করে উৎপাদন দ্রুত বাড়িয়ে পণ্য বিক্রি করার সুযোগ হল শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীদের। উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে তা বাড়ান হল- কিন্তু যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রয়োজন হল তা ছিল সাধারণ ও মূল্যও ছিল কম। এসব যন্ত্র একবারে স্থাপন করারও প্রয়োজন ছিল না- এটা একটা একটা করে করা যেত, স্থাপন করাও কঠিন ছিল না। উৎপাদন বাড়ানর ব্যবস্থা করা ব্যবসার লাভ থেকেও করা সম্ভব ছিল। পুঁজির জন্য ধার করার প্রয়োজন হত না। ১৭৮৯ সালে রবার্ট ওয়েন নামে এক দর্জির সহকারী ১০০ পাউন্ড দিয়ে ম্যানচেষ্টারে সুতীবস্ত্র উৎপাদন শুরু করেন। ১৮০৯ সালে তার নিজের ৮৪০০০ পাউন্ড দিয়ে তিনি তার অংশীদারদের স্বত্ব কিনে নেন। সুতীবস্ত্র উৎপাদনের কতকগুলো অনুকূল পরিস্থিতি ছিল। সমস্ত কাঁচামালই আসত দেশের বাইরে থেকে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশের কৃষিতে যে সীমাবদ্ধতা, তা বাইরে ছিল না। ১৭৯০ সালের দিক থেকে প্রায় সমস্ত তুলাই আমদানী হত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্য (state) গুলি থেকে। শ্রম ছিল আফ্রিকা থেকে আনা দাসদের কারণে সস্তা। আর বর্দ্ধিত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির কোন অভাব ছিল না।

তুলা ও সুতীবস্ত্র উৎপাদনই ছিল প্রথম শিল্প যার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত "শিল্প বা কারখানা" বলতে বস্ত্রশিল্পকেই বোঝা যেত। বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন তার প্রসার ও রপ্তানী বাণিজ্যে তার প্রসার ছিল এতই বিরাট যে দেশের অর্থনীতি নির্ভর করত বস্ত্রশিল্পের উপর। কাঁচামাল হিসাবে তুলা আমদানী ১৭৮৫ সালে ছিল ১.১ কোটি পাউন্ড- ১৮৫০ সালে তা হল ৫৮.৮ কোটি পাউন্ড। এই সময়ে সুতীবস্ত্রের উৎপাদন ৪ কোটি গজ থেকে বেড়ে হল ২০০ কোটি গজ। ১৮১৬ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত সুতীবস্ত্রই ছিল রপ্তানীর প্রায় অর্ধেক।

অন্যান্য শিল্পেও উৎপাদন বাড়ছিল। নগরগুলির আকার বাড়ে। ফলে খাদ্য, পানীয় ও ঘরে ব্যবহার করার জিনিষপত্রের চাহিদা বাড়তে থাকে। কিন্তু এ গুলোর আকার বস্ত্র শিল্পের তুলনায় এত ছোট ছিল যে তাদের প্রভাব সমস্ত অর্থনীতির উপর ছিল খুবই কম।

শিল্পায়নের অগ্রগতির জন্য Capital goods শিল্প স্থাপন অপরিহার্য। Capital goods যা মূলধন জাতীয় পণ্য হল সেই সমস্ত পণ্য যা অন্য শিল্পের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে যন্ত্রপাতি, মেশিন, সেতু, রেলপথ। লৌহ শিল্প এগুলোর উৎপাদনের জন্য সবচাইতে বড় উপাদান। সাধারণ ভাবে Capital goods শিল্পে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হত না- কারণ বিনিয়োগের পরিমাণ এ সব শিল্পে বড়। লাভ পেতে বেশী সময় লাগে, লাভের পরিমাণও থাকে কম। যুদ্ধের

সময় চাহিদা বাড়ার কারণে এই ধরনের শিল্পের প্রসার বেশী হয়। ১৭৫৬ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত কয়েকটা যুদ্ধের জন্য বৃটেনের লোহা উৎপাদন বাড়লেও এরপর থেকে তা কমতে থাকে। ১৮০০ সালে বৃটেনের লোহা উৎপাদন ইউরোপের বাকী দেশগুলোর লোহা উৎপাদনের অর্ধেকেরও অনেক কম ছিল।

কয়লা উৎপাদনে বৃটেন অনেক এগিয়ে যায়। শিল্প কারখানায় কয়লা চালিকা শক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হত। উপরন্ত বৃটেনে বন জঙ্গল কম থাকার কারণে ইউরোপের তুলনায় কাঠ কম পাওয়া যেত। বাড়ীঘর শীতে গরম রাখার জন্য কয়লা ব্যবহার বৃটেনে বেশী ছিল। নগর এর প্রসার হওয়ায় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কয়লার ব্যবহার বাড়তে থাকে। ১৮০০ সাল নাগাদ বৃটেন ১ কোটি টন কয়লা খনি থেকে আহরণ করত। যা ছিল সারা পৃথিবীর কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী। তুলনায় ফ্রান্স এই সময় আহরণ করত ১০ লক্ষ টনেরও কম। কয়লা উৎপাদনের ব্যাপকতা ও বৃদ্ধি শিল্পে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের পরিবেশ সৃষ্টি করে। Capital goods শিল্পে বৃহৎ বিনিয়োগও কয়লা শিল্পের কারণে ঘটে। কয়লা খনিতে পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজন থেকেই বাষ্প ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হয় ও কয়লা খনিতেই প্রথম ব্যবহার হয় । পরবর্তীতে বাষ্প ইঞ্জিন বস্ত্র শিল্পে ব্যবহার হয় ও উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। Capital goods শিল্পেও কয়লা উৎপাদন ব্যাপক বিনিয়োগের সৃষ্টি করে। খনি সমূহে বিরাট পরিমাণের কয়লা স্থানান্তর করার প্রয়োজন হত। খনি থেকে কয়লা বন্দর বা পরিবহনের কেন্দ্রে নিতে হত। এই প্রয়োজনে প্রথম রেল ব্যবহার করা হয়, যার উপর দিয়ে কয়লা বহনকারী গাড়ীগুলো আরও সহজে যেতে পারে। গাড়ীগুলো টানার জন্য বাষ্প ইঞ্জিনের ব্যবহারও যৌক্তিক ছিল। ১৮২৫ সালে ষ্টকটন থেকে ডারলিংটন কয়লা পরিবহনের রেলপথ ছিল প্রথম আধুনিক রেলপথ। বলা যায় কয়লা খনি ছিল রেলপথের জন্মদাতা। রেলপথ বৃটেনে সফলভাবে চালু হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই অন্যান্য দেশে রেলপথ তৈরী শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ১৮২৭ সালে, ফ্রান্সে ১৮২৮ সালে, জার্মানী ও বেলজিয়ামে ১৮৩৫ সালে স্বল্প পরিসরে রেলপথ তৈরী হয়। মালামাল পরিবহনে এটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। স্থলপথে রাস্তায় মালামাল পরিবহন ছিল ধীর ও ব্যয়বহুল। তুলনায় রেলপথে ৫০-৬০ মাইল গতিতে বিপুল পরিমান মালামাল পরিবহন সম্ভব হল রেলপথে। রেলপথ তৈরী, রেলপথের জন্য ব্রীজ তৈরী, ষ্টেশন তৈরী এগুলোতেও অনেক Capital goods এর প্রয়োজন হল। এর মধ্যে অন্যতম হল লোহা। রেলপথ তৈরীর প্রথম দুই দশকে (১৮৩০-১৮৫০) বৃটেনে লোহা উৎপাদন ছয় লক্ষ আশি হাজার টন থেকে বেড়ে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন হল। অর্থাৎ তিন গুণেরও বেশী বাড়ল। কয়লা উৎপাদন এই সময়কালে দেড় কোটি টন থেকে বেড়ে প্রায় ৫ কোটি টনে পৌছাল। রেলপথ বিস্তীর্ণ হওয়ার ফলে বাজারও বাড়ল। অনেক জায়গা যে গুলোতে আগে মাল পরিবহন করা কঠিন ছিল- সেখানে রেলপথের কারনে এখন উৎপাদিত জিনিষ সহজে পৌঁছান সম্ভব হল।

রেলপথ তৈরীতে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু হল। ১৮৩০ সালে পৃথিবীতে মাত্র একশত মাইলের কাছাকাছি রেলপথ ছিল। ১৮৪০ সালে তা হল ৪৫০০ মাইল এবং ১৮৫০ সালে ২৩৫০০ মাইলেরও বেশী। ১৮৪০ সালে রেলপথে বিনিয়োগ ছিল ২.৮ কোটি পাউন্ড, ১৮৫০ সালে ছিল ২৪ কোটি পাউন্ড। বেশীরভাগ পুঁজি ছিল বৃটিশ। বিনিয়োগের লভ্যাংশ ছিল কম- গড়ে ৩.৭ শতাংশ। তারপরও বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। এর কারণ হল এই সময় বৃটেনে ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় এত দ্রুত বাড়ে যা ভোগে বা অন্যত্র বিনিয়োগ করা কঠিন ছিল। ধারণা করা হয় ১৮৪০ এর শতকে বৎসরে ৬০ কোটি পাউন্ড উদ্বৃত্ত অর্থ ছিল, যা বিনিয়োগ করা প্রয়োজন হত। তুলনায় সুতীবস্ত্র শিল্পে fixed ও working capital মিলে ১৮৩৩ সালে ৩.৪ কোটি পাউন্ড ও ১৮৪৫ সালে ৪.৭ কোটি পাউন্ড ছিল বলে অনুমান করা হয়। আয়ের উপর করও ছিল খুব কম, অন্যান্য শিল্পে Capital cost এত কম ছিল যে বিনিয়োগের সুযোগ ছিল সীমিত। বিদেশে বিনিয়োগ ছিল একটা সম্ভাবনা- এবং এটা করাও হত। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সমস্ত পুঁজিই লোকসানের খাতায় চলে যায়। ১৮১৮ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত ২৫টি বিদেশী সরকারের কাছে ঋণ দেয়া ৪.২ কোটি পাউন্ড এর অর্ধেক ঋণ (১৬টি বিদেশী সরকারের কাছে) খেলাপী হয়ে যায়। এই তুলনায় রেলপথ বিস্তারে বিনিয়োগ হয় অনেক বেশী।

শিল্পে উৎপাদনের যুগ যে শুধু মসৃণ উত্তরণের পথ ছিল তা নয়। বেশ কয়েক ধরনের সমস্যা এই যুগে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়। একটি ছিল সামাজিক পরিবর্তনের কারণে গ্রাম থেকে শহরে আগত মানুষ শিল্প উৎপাদনের কাজ করে খুব কম মজুরী পেত। উৎপাদনের খরচ কমানর জন্য বেশীরভাগ মহিলা ও শিশুদের দিয়ে কাজ করাত ও খুব কম মজুরী দিত। ১৮৩৫ সালের দিকে বৃটেনের সমস্ত শ্রমিকদের অর্ধেকই ছিল নারী- এক চতুর্থাংশ আঠার বছরের নীচে বালক ও এক চতুর্থাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। জীবন যাত্রার মান ছিল নিম্ন। বড় ব্যবসায়ী ও মিল মালিকেরা অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে মুদ্রা

সরবরাহ ও কর প্রথা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। তারা প্রয়োজনে ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত। ছোট ব্যবসায়ীদের করও বেশী দিতে হত, তাদের ঋণ পাওয়ারও সুযোগ ছিল কম। তারাও শ্রমিকদের মত বিক্ষুব্ধ ছিল। এই বিক্ষোভ কয়েকবারই ১৮৩০ ও ১৮৪০ এর দশকে বৃটেনে ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নেয়। বৃটেনের ইতিহাসে এইরকম বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ঘটনা এই প্রথম। ১৮৪৮ সালে শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষের বিক্ষোভ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

আর একটি সমস্যা হল উৎপাদন বৃদ্ধির গতি কমে যাওয়া এবং তার ফলে লাভের পরিমান কমে যাওয়া। এর একটি দিক হল মাঝে মাঝে প্রবৃদ্ধির হার বাড়া আর মাঝে মাঝে কমে যাওয়া (cycle of boom and slump)। অষ্টাদশ শতকেও মন্দা দেখা গিয়েছিল কিন্তু সে গুলো বিশেষ কারণে (যেমন ফসল উৎপাদন কোন বছর কম হওয়া) ঘটে বলে মনে করা হত। উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকবার এই রকম মন্দা দেখা দেয় (১৮২৫-২৬, ১৮৩৬-৭, ১৮৩৯-৪২, ১৮৪৬-৪৮)। এই ধরনের মন্দা পুঁজিবাদী উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বলে এই সময় স্বীকৃত হয়। কিন্তু কারণ মনে করা হয় আগের মতই বিশেষ কোন ঘটনা (যেমন কোন দেশের stock এ ফাটকাবাজী)। পুঁজিবাদী উৎপাদনের মধ্যে মন্দা যে অন্তর্নিহিত তা মনে করা হয়নি।

১৮১৫ সালের পর থেকে লাভের অংশ কমে যেতে থাকে, এটার একটা কারণ ছিল আরও বেশী প্রতিযোগিতা। এর ফলে উৎপাদনের খরচ কমল না, কিন্তু তৈরী পণ্যের দাম বাজারে কমতে থাকল। আর একটা কারণ ছিল মূল্যহ্রাস (deflation)। এ সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে উৎপাদন লাভজনক ছিল এবং বাজার প্রসার এর মাধ্যমে বিক্রির পরিমান বাড়াতে পারলে লাভও বাড়ত। কিন্তু লাভের হার বাড়ানর জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর মধ্যে একটা হল উৎপাদন খরচ কমান। এজন্য যেমন মানুষের শ্রমের পরিবর্তে ক্রমেই যন্ত্রের উদ্ভাবন করা হতে থাকল তেমনি শ্রমিকদের মজুরীও কমতে থাকল। তবে এর একটা সীমা হল বাঁচার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তা দেওয়া। শিল্পমালিকেরা এ জন্য বড় ভূস্বামীদের দায়ী করল। তারা কৃষি পণ্যের দাম তুলনামূলকভাবে বৃটেনে বাড়িয়ে রেখেছে। অন্যান্য দেশের কৃষিপণ্য উচ্চ শুল্কের কারনে বৃটেনের বাজারে ঢুকতে পারত না। এছাড়াও ছিল ভূস্বামীদের কৃষিপণ্যের উপর আধিপত্য। ফলে কৃষিপণ্যের দাম না কমলে জীবন যাত্রার ব্যয় কমে না এবং শ্রমিকদের মজুরী কমান যায় না। এর ফলে শিল্পমালিক ও বড় ভূস্বামীদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরী হল।

অনেকটা অপরিকল্পিত ভাবেই বৃটেনে শিল্প উৎপাদন গড়ে ওঠে। কিন্তু সেই সময়ের মানদন্ডে বৃটেনের শিল্প উৎপাদন ছিল যুগান্তকারী । বৃটেনের বহির্বাণিজ্য তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের প্রায় দ্বিগুণ ছিল মধ্য ঊনবিংশ শতকে। বৃটেনের তুলা ব্যবহার ছিল ফ্রান্সের বারগুণ ও যুক্তরাষ্ট্রের দুই গুণ। বৃটেনের লোহা উৎপাদন ছিল পশ্চিমা বিশ্বের মোট লোহা উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশী। শিল্প বিপ্লব বৃটেনে শুরু হলেও সারা পৃথিবীকে বদলে দিচ্ছিল।

পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ঃ

সপ্তদশ শতকে নেদারল্যান্ডের অধিবাসী বা ডাচরা একটা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হয়েও ইউরোপের সবচাইতে অগ্রণী অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। তাদের এই অর্জন হঠাৎ হয়নি, এর পিছনে আছে দীর্ঘ ইতিহাস। নেদারল্যান্ডের উন্নতির সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদন ও অর্থনীতির উত্থানের সম্পর্ক রয়েছে। তাই নেদারল্যান্ডের অর্থনীতির অভ্যুদয় সম্পর্কে জানা দরকার।

মধ্য যুগের শেষের দিকে ইউরোপের উত্তর পশ্চিম দিকে কতকগুলো ছোট ছোট (Counties) স্বাধীন রাজ্য ছিল। বর্তমান ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডের কয়েকটা অংশ জুড়ে অবস্থিত ছিল এগুলো। এদের একসঙ্গে বলা হত নিম্নভূমি (Low countries) বা নীচু অঞ্চলের রাজ্য। কারণ এই রাজ্যগুলির উচ্চতা সমুদ্রের উচ্চতার সামান্য উপরে ছিল। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই রাজ্যগুলো এক রাজ্যে বারগান্ডির ডিউকের (Burgandy) অধীনে আসল অষ্টাদশ শতকে। কোন কোন রাজ্য উত্তরাধিকারসূত্রে, কোনটা জয় করে, আবার কোনটা কিনে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের চুক্তি হয়। এই রাজ্যগুলিকে উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। বিভাজন হয় মিউজ (Meuse) নদী দ্বারা। উত্তর ও দক্ষিণের মাঝে সাধারণভাবে কিছু পার্থক্য ছিল। দক্ষিণাঞ্চল অন্যান্য ইউরোপীয় দক্ষিণ অঞ্চলের মত রোমান সাম্রাজ্যের অংশ থাকায় রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠান সমূহ এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর মধ্যে ছিল পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য অংশের মত সামন্ত ব্যবস্থা। তবে অর্থনৈতিক ভাবে দক্ষিণাঞ্চল ছিল সমৃদ্ধ। কৃষিতে তারা অন্য

কোথাও যা ছিল না এমন একটি পালাক্রমে ফসল রোপণ ব্যবস্থা চালু করে, যা ছিল জটিল, তাতে উৎপাদন অনেক বেড়েছিল। এছাড়া জমি যখন অনাবাদি থাকত তখন শালগম লাগান হত। এটা গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হত। আবার গরুর গোবরের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বাড়ত।[৬] কৃষি উৎপাদন এর সাথে সাথে দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনও বাড়ল। শিল্পেও এই অঞ্চল উন্নতি করে। স্পেনের মেরিনো ভেড়ার পশম থেকে উচুঁ মানের বস্ত্র তৈরীতে এখানকার কারিগররা পারদর্শিতা অর্জন করে। এই বস্ত্র ইউরোপের সৌখিন পশম বস্ত্রের বাজারে স্থান করে নেয়।

দক্ষিণ নিম্নভূমি পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে অনেক বেশী নগরকেন্দ্রিক ছিল। ত্রয়োদশ শতকেই এই অঞ্চলে অনেকগুলো নগর ছিল। একমাত্র উত্তর ইতালীতে এত সংখ্যক নগর ছিল। এই নগরগুলি প্রধানত কারিগরী শিল্পের কেন্দ্র ছিল। বস্ত্র উৎপাদন ছাড়াও শহরগুলিতে আসবাবপত্র, গহনা, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি তৈরী হত। নগরায়নের ফলে গ্রামাঞ্চলের উপর নগরের আধিপত্য স্থাপিত ছিল। প্লেগ মহামারীর পর নগরের ধনী ব্যক্তিরা গ্রামে অর্থ লগ্নি (Invest) করা শুরু করল। জমি স্বল্পমেয়াদী ইজারা দেওয়া হত ও ফসলের বদলে কর আদায় করা হত টাকায়।[৭] ব্যবসা বাণিজ্যেও এই অঞ্চল সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ত্রয়োদশ শতক থেকেই এখানে স্ক্যান্ডিনেভিয়া, জার্মানী ও পোল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা কাজ করত। ইংল্যান্ডের পশম এখান থেকে পুনরায় রপ্তানী করা হত। এখানকার বণিক ও কারিগরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। পঞ্চদশ শতকে এসে কারিগরদের সংগঠন গিল্ড (Guild) প্রাধান্য বিস্তার করে। পঞ্চদশ শতকে এসে আরও একটি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। শহরের ব্যবসায়ীরা গ্রামের ঘরে ঘরে পণ্য উৎপাদন সংগঠন করা শুরু করেছিল।[৮] বারগান্ডির ডিউকদের সহযোগিতায় এই প্রক্রিয়া এগিয়ে যায়।

উত্তরের রাজ্যগুলি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। এখানে কৃষি উৎপাদনে সামন্ত প্রথাও সংগঠিত ছিল না। তা সত্বেও প্রথমদিকে দক্ষিণের চাইতে এই অঞ্চল কম অর্থনৈতিক উন্নতি করেছিল। সমুদ্রে মাছ ধরায় এই অঞ্চলের মানুষ অগ্রগামী ছিল, তারা হারিংবুই (Haringbuis) নামে এক ধরনের জাহাজ তৈরী করেছিল। এই জাহাজগুলো ছিল বড় আকারের এবং একবারে ছয় থেকে আট সপ্তাহ সমুদ্রে থাকতে পারত। ফলে অনেক দূরে দূরে গিয়ে মাছ ধরা সম্ভব হল। এই সঙ্গে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে জাহাজেই মাছ প্রক্রিয়াজাত করা ও শুকানর ব্যবস্থাও তারা করেছিল। এই শুকান মাছ এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী পণ্য ছিল, এর বিনিময়ে তারা বাল্টিক অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য ও আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে লবণ আমদানী করত।[৯]

দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে এই অঞ্চল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন করে। কৃষি জমির অভাব পূরণের জন্য তারা সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে বাঁধের ভিতরের পানি নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা করে। পানি যাতে আবার ঢুকে না পড়ে সে জন্য বাঁধগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে সমুদ্র থেকে অনেক জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। একজন লেখক হল্যান্ডকে এই জন্য "নতুন দেশ" বলেন। এই কর্মকান্ড শহরের ধনীলোকদের অর্থায়নে হয়। তারা জমি উদ্ধার এর পর তা বিক্রি করে দিত। যারা কিনত তারা এ জমি চাষ করত, অথবা পশু চারণের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করত। উৎপাদিত খাদ্য শস্য শহরে ব্যবহার করা হত। কিন্তু দুগ্ধজাত পণ্য ও পশু রপ্তানী করা হত। ষষ্ঠদশ শতকের প্রথমদিকে এসে দেখা গেল অল্প সংখ্যক কৃষকের হাতে অধিকাংশ জমি এসে গেছে।[১০]

পঞ্চদশ শতকে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে উত্তর ও দক্ষিণের পার্থক্য অনেকটা কমে গেল। এই সময় এ্যান্টওয়ার্প শহর বাণিজ্যের কেন্দ্রমূল হয়ে ওঠে। এর আগে দক্ষিণের ব্রুগে (Bruges) ছিল বড় কেন্দ্র। এ্যান্টওয়ার্প শুধু এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে তাই নয়, এই শহর সমস্ত ইউরোপের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ইউরোপের বাণিজ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ তখন ডাচরা চালাত। জার্মান ব্যবসায়ীরা এখানে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করত, পর্তুগীজরা এশিয়া থেকে মশলা নিয়ে আসত এবং তা এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠান হত। ইংল্যান্ডের পশমবস্ত্র ব্যবসায়ীরাও এইখানে ব্যবসা করত।[১১] একজন লেখক বলেন, ইতিহাসে এই প্রথম একটি সমগ্র ইউরোপীয় ও বিশ্ব বাজার সৃষ্টি হল।[১২]

এই অঞ্চলের জন্য সম্ভবত: সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাল্টিক অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য যা "mother trade" নামে অভিহিত হয়েছে। বাল্টিক অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হত। ইউরোপের মুদ্রাস্ফীতি সেই অঞ্চলকে স্পর্শ করেনি। এখান থেকে কম দামে খাদ্য শস্য নিয়ে এসে নিজেদের প্রয়োজন মিটাত নিম্নভূমির রাজ্যগুলি এবং অনেক খাদ্যশস্য বেশী দামে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে বিক্রি করে লাভ করত। আরও একটা ফল হল- খাদ্যশস্য উৎপাদন করার

আবশ্যকতা না থাকায় নিম্নভূমিতে কৃষকেরা অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদন করার দক্ষতা অর্জন করতে থাকল। এখানে শন চাষ করা হল- যা থেকে লিনেন নামে বস্ত্র তৈরীর আঁশ পাওয়া যেত, নানা ধরনের উদ্ভিদজাত কাপড়ের রং, বাধাকপি, ফুলকপি, আপেল ও নাসপাতি, টিউলিপ ফুল ইত্যাদিরও চাষ করা হল। তাছাড়া গরু পালনও বাড়ল। কৃষির এই বৈচিত্র্য ইউরোপের আর কোথাও দেখা যায় নি। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন করার উদ্যোগ এখানেই ছিল। বিভিন্নভাবে জমির উর্বরতা বাড়ানর প্রক্রিয়াও তারা উদ্ভাবন করল। চতুর্দশ শতকে যেখানে গম উৎপাদনের অনুপাত ছিল ১ঃ৪, সেটা ষোড়শ দশকে বেড়ে হল ১ঃ১০।[১৩]

এই সমৃদ্ধির মধ্যে ষোড়শ শতকেই নিম্নভূমির রাজ্যগুলি স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। এই অঞ্চল ছিল স্পেনের রাজার অধীনে। স্পেনের রাজা তাদের ক্রমবর্ধমান ব্যয় মিটানর জন্য এই অঞ্চলেই কর বেশী আরোপ করা শুরু করল। কারণ এই অঞ্চল ছিল সমৃদ্ধ। ষোড়শ শতকের ষাটের ও সত্তুরের দশকে প্রতিবাদ শুরু হয়। তবে ১৫৭৬ সালের ঘটনায় এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ স্পেনের শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আরও দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিল। ১৫৭৬ সালে নিম্নভূমিতে অবস্থান করা স্পেনের সৈন্য বাহিনীর এক অংশ বেতন না পাওয়ার জন্য বিদ্রোহ করে এ্যান্টওয়ার্প শহরে ব্যাপক ধ্বংস যজ্ঞ চালায়। নিম্নভূমির রাজ্যগুলি ১৫৭৯ সালে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৫৮১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্পেন দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। উত্তরাঞ্চলের সাতটি রাজ্য নদীর বাধার কারণে স্পেনের আওতার বাইরে থেকে যায়। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে নতুন উদ্যমে স্পেন শাসন ও শোষণ শুরু করে। ফলে হাজার হাজার মানুষ, যার মধ্যে অনেক দক্ষ কারিগর, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিও ছিল, এরা উত্তরের স্বাধীন নিম্নভূমি রাজ্যগুলিতে চলে আসল। এখানে আরও উদার ও উন্মুক্ত পরিবেশে তারা তাদের পেশা ও বাণিজ্য করার সুযোগ পেল।[১৪] এর ফলে উত্তরাঞ্চল হয়ে উঠল সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলের শহর ও বন্দর হিসাবে আমষ্টারডাম হয়ে উঠল ইউরোপের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। এখানে সারা ইউরোপের ব্যবসায়ী ও বণিকেরা মুদ্রা বিনিময় করত ও বিভিন্ন ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করত। ১৬৩৯ সালে আমষ্টারডাম এর স্টক এক্সচেঞ্জ কাজ শুরু করে। ডাচরা নৌ বাণিজ্যের বীমা ব্যবসাও প্রথম চালু করে।[১৫] বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প উৎপাদনেও নেদারল্যান্ড এগিয়ে ছিল। লৌহজাত দ্রব্যাদি, জাহাজ তৈরী, অস্ত্র তৈরী, বস্ত্রশিল্প, বই ছাপান, কাঁচশিল্প ইত্যাদি শিল্প শহরগুলিতে গড়ে উঠেছিল। ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত স্পেনের সঙ্গে ডাচদের যুদ্ধ চলতে থাকে। তা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতকের প্রথম দিক থেকেই ডাচরা বাণিজ্যের দিক দিয়ে পৃথিবীতে সবচাইতে এগিয়ে ছিল। ডাচদের কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাও এ সময়ে পৃথিবীতে সবচাইতে উন্নত ছিল।

স্পেনের সঙ্গে এবং স্পেনের মাধ্যমে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়তে থাকে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও ডাচদের পণ্যদ্রব্য ক্রমশই ইতালীর নগর রাজ্যগুলির পণ্যদ্রব্যের স্থান দখল করে নেয়। আমষ্টারডামই ইংল্যান্ডের পশম কাপড়, সুইডেনের লোহা, আমেরিকার চিনি, নরওয়ের কাঠ এমনকি এশিয়ার মশলা কেনা কাটার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এশিয়ায় বাণিজ্যরত ব্যবসায়ীদের নিয়ে ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় ১৬০২ সালে। এই কোম্পানী প্রথমে ইংরেজদের ইন্দোনেশিয়া থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর তারা পর্তুগীজ বাণিজ্য সাম্রাজ্যের উপর হামলা চালায়। ১৬৪১ সালে ডাচরা মালাক্কা দখল করে এবং ১৬৫৮ সালে সিলোন দখলের মাধ্যমে পর্তুগীজদের এশিয়ার সাম্রাজ্য শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসে। এশিয়ার বাণিজ্যে ডাচরা পর্তুগীজদের চাইতে বেশী লাভবান হয়।

ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সফলতায় উৎসাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে ও আমেরিকায় বাণিজ্যের জন্য ওয়েষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করা হল ১৬২১ সালে। প্রথমেই স্পেনিশ জাহাজ ও বাণিজ্য আক্রমণ করা শুরু হল। ১৬২৮ সালে আমেরিকা থেকে স্পেনে রৌপ্য নিয়ে আসা স্পেনীয় জাহাজের বহর করায়ত্ত করা হয়। এছাড়াও পর্তুগাল থেকে ব্রাজিলে পণ্য আদান প্রদানরত তিন শতেরও বেশী জাহাজ দখল করে নেয়। পর্তুগীজদের তারা আফ্রিকার স্বর্ণ উপকূল থেকে হটিয়ে দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব ব্রাজিল দখল করার অভিযান ব্রাজিলিয়ানরাই ব্যর্থ করে দেয় এবং এই কোম্পানী দেওলিয়া হয়ে যায়। শিল্প ও বাণিজ্যে ডাচদের সাফল্যের একটা কারণ ছিল, শ্রমিকদের কম মজুরীর কারণে তাদের পণ্যের দাম অন্যান্য দেশের পণ্যের চাইতে কম ছিল। গ্রামাঞ্চলে খামারগুলি ছিল অল্প কিছু মানুষের হাতে, বেশীরভাগ মানুষই ছিল কৃষি শ্রমিক। কাজের জন্য তারা শহরে চলে আসতে বাধ্য হত। শহরগুলির লোকসংখ্যা বাড়তে থাকল- এক সময় প্রায় ৫৬ শতাংশ মানুষ শহরবাসী ছিল। শহরের শিল্প কারখানাগুলো কম মজুরীতে মানুষ নিয়োগ করতে পারত।[১৬]

১৬৬০ সাল নাগাদ নেদারল্যান্ডের অর্থনৈতিক অবনতি হওয়া শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আটলান্টিক অঞ্চলের বাণিজ্যে ডাচদের ভূমিকা নগন্য হয়ে যায়।[১৭] নেদারল্যান্ডের অবনতির কারণ হিসাবে কয়েকটা উল্লেখ করা যায়, সপ্তদশ শতকে প্রতিবেশী ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ে কর্তৃক প্রতিযোগিতা। তাছাড়া তাদের পণ্য ডাচদের বাণিজ্য পণ্য বহরে বহন বন্ধ করার জন্য ইংল্যান্ড নেভিগেশন এ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ করে। এর ফলে ডাচদের বাণিজ্য কমে যায়। তাছাড়া ফ্রান্সও ডাচ পণ্য তাদের বাজারে কম প্রবেশ করতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কর বসায়। ডাচদের যে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল তা নিজেদের বাজারে সম্পূর্ণ বিক্রি করা সম্ভব হত না। ডাচদের এই অবক্ষয় ডাচ ব্যবসায়ীরাও উপলব্ধি করেছিল। তারা দেখল ইংল্যান্ড ডাচদের চাইতে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আরও ভাল ক্ষেত্র এবং তারা সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করা শুরু করে।

ইংল্যান্ডের ক্রান্তিকালঃ

আধুনিক যুগের শুরুতেও ইংল্যান্ড ছিল একটি পশ্চাদপদ দেশ। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী নিজেকে "ইউরোপের প্রান্তে একজন ক্ষুদ্র রাজা" বলে বর্ণনা করেছিলেন।[১৮] ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে অগ্রগতির যে সব চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, তা ইংল্যান্ডে ছিল না। এরপরেও ইংল্যান্ড যে পরবর্তীতে অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে এগিয়ে যেতে পেরেছিল তা তার অর্থনৈতিক ভিত্তির জন্য, প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য নয়। এর কারণ ছিল কতকগুলো সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন যার কারণে পরবর্তীতে দ্রুত উন্নতি করা সম্ভব হয়।

মধ্যযুগের শেষে ইংল্যান্ড ইউরোপের অন্যান্য এলাকার চাইতে কম উন্নত ছিল। এখানে নগরায়নও তুলনামূলকভাবে কম হয়েছিল। অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে ভূমির উর্বরতা বেশী হওয়ায় এবং বৃষ্টিপাত যথেষ্ট হওয়ায় খাদ্য শস্য উৎপাদন যথেষ্ট ছিল। প্লেগ মহামারী পরবর্তী সময়ে রপ্তানীমূল্য বেশী থাকায় পশমের জন্য জমিতে কৃষিকাজ করার চাইতে অনেক জমিতে পশুপালন করা শুরু হয়েছিল। পশমই ছিল তখন একমাত্র রপ্তানীযোগ্য পণ্য।

পঞ্চদশ শতকে কৃষিভূমির অধিকাংশই চাষ করত কৃষকেরা যারা নিজেরা জমির মালিক ছিল না। এদের মধ্যে কারও কারও ইজারা ছিল দীর্ঘ কালের জন্য নির্দিষ্ট কর এর বিনিময়ে। এরা ছিল ভাগ্যবান। অধিকাংশই ছিল স্বল্প সময়ের ইজারাদার- এদের জমি থেকে উৎখাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশী- অথবা ইজারা শেষ হলেই কর বাড়ত। আরও ছিল অনেক প্রায় ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক যারা প্রায় দিন এনে দিন খাওয়ার পর্যায়ে দরিদ্র ছিল।[১৯] পঞ্চদশ শতকে অভিজাত শ্রেণীর সুযোগ সুবিধারও অবনতি হয়েছিল। সিংহাসনের দাবিদার প্রতিপক্ষদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ যা War of roses নামে পরিচিত (১৪৫৫-১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে), এতে অভিজাত শ্রেণী ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধের পর তাদের নিজস্ব বাহিনীগুলোও ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাতে তাদের সামরিক শক্তি কমে যায়। এছাড়া তাদের কর দিতে হত যা ইউরোপের মূল ভূখন্ডের অভিজাত শ্রেণী দিত না। দেনার দায়ে তাদের সম্পত্তিও নিয়ে নেওয়া হত। অভিজাত শ্রেণীর ভূমি মালিকরা অনেকেই নির্দিষ্ট হারে দীর্ঘকালের জন্য ইজারা দিয়েছিল। মূল্য স্ফীতির জন্য তারা ব্যয় মেটাতে না পেরে অনেকেই জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হল। সামাজিক স্তর গুলির পরিবর্তন ছিল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাজা অষ্টম হেনরী রোমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চার্চ অব ইংল্যান্ড স্থাপন করেন। সাথে সাথে রোমান ক্যাথলিক চার্চের যে প্রভূত ভূ সম্পত্তি ইংল্যান্ডে ছিল তার অনেকটা বাজেয়াপ্ত করেন ও রাজকোষে অর্থ সংগ্রহের জন্য তা বিক্রি করেন। এতে সাময়িকভাবে অর্থের প্রয়োজন কিছুটা মিটাতে পারলেও সমাধান হল না। রাজার অর্থ সংগ্রহের উপায় ছিল ভূমি রাজস্ব, বাণিজ্য শুল্ক ও তার নিজস্ব ভূমি থেকে আয়। এই সময় মূল্যস্ফীতি হওয়ায় রাজ্যের কাজকর্ম চালানর খরচও বেড়ে গিয়েছিল অথচ আয় বাড়ছিল না। ফলে তাদের নিজেদের জমি বিক্রি করে ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছিল। ১৫৬১ সালে রাজা ইংল্যান্ডের মোট জমির ৯.৫ শতাংশের মালিক ছিল। ১৬৪১ সালে সেটা ছিল মাত্র দুই শতাংশ।[২০]

দরিদ্র কৃষকেরা সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হল। সাধারণের ব্যবহারের জমি ভূমি মালিকেরা দখল করে কৃষিকাজ করায় এর উপর নির্ভরশীল দরিদ্র কৃষক শ্রেণী কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে শহরে চলে আসতে বাধ্য হল। অনেকের জমি ধনী লোকেরা কিনে নিল তাদের উৎপাদন বাড়ানর জন্য। কিছু কিছু ভূমিহীন কৃষক শহরে চলে আসলেও অনেকেই গ্রামাঞ্চলে কৃষি মজুর হিসাবে রয়ে গেল।[২১]

যদিও ইংল্যান্ডে অধিকাংশ শ্রেণীর অবনতি ঘটল কিন্তু এর মধ্যে একটি শ্রেণী প্রভূত উন্নতি করল। Gentry নামে অভিহিত এই শ্রেণী সাধারণ কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উৎপত্তি লাভ করে। অন্যান্য শ্রেণীর সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে তারা জমি সংগ্রহ করল। প্রথমদিকে ছোট ছোট জমি কিনলেও তাদের আর্থিক ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা অভিজাত শ্রেণী, গীর্জার সম্পত্তি, এমনকি রাজার সম্পত্তিও কিনে নেয়। সপ্তদশ শতকের শুরুতে এরা ইংল্যান্ডের চাষযোগ্য জমির প্রায় ৫০ শতাংশের মালিক হয়ে যায়। গড়ে ২০০ একরের চাইতে বড় খামারে কৃষি মজুরদের কাজে লাগিয়ে তারা কৃষিপণ্য উৎপাদন করত। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার এই পরিবর্তন ছিল বৈপ্লবিক।

আর এক শ্রেণীর মানুষও উন্নতি করল, তারা হল বণিকেরা। মধ্যযুগে অন্যদেশের বণিকেরা পণ্য আনা নেওয়া করত। ষোড়শ শতকে ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্যে তাদের ভূমিকা বাড়াতে থাকে। এজন্য তারা সংঘবদ্ধ হয়ে কোম্পানী তৈরী করে। মার্চেন্ট এ্যাডভেঞ্চারার নামে একটি সংঘের প্রায় ৩৫ হাজার সদস্য ছিল। আবার অন্য দিকে ছিল টার্কী (Turkey) কোম্পানী যার সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র বারজন। এই সময় থেকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগের শুরু হয়। এর একটি উদাহরণ হল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যা ১৬০০ সালে স্থাপিত।

এই সময় লন্ডনের পুরনো বণিকদের সঙ্গে অন্যান্য বন্দরের বণিকদের সংঘাত সৃষ্টি হয়। লন্ডনের মাধ্যমে সব বাণিজ্য পরিচালনার বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নেয়। ক্রমেই আইন করে অন্যান্য বন্দরের বণিকদের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৬০৬ সালে ফ্রান্স, পর্তুগাল ও স্পেনে বাণিজ্য সব বণিকের জন্য উন্মুক্ত করে আইন করা হয়। ১৬২২ সালে তারা বস্ত্র রপ্তানীরও অনুমতি পায়। আরও একটি শ্রেণী এই সময় উন্নতি করে, তারা হল বস্ত্র উৎপাদনকারীদের সংগঠন যারা- clothier নামে পরিচিত ছিল। তারা গ্রামাঞ্চলে বাড়ীতে বাড়ীতে বস্ত্র উৎপাদন করার ব্যবস্থা করেছিল ব্যাপক আকারে। ইউরোপের কোন অঞ্চলে বস্ত্র উৎপাদন এতটা ব্যাপক ও সংগঠিত ছিল না। এটা সম্ভব হয়েছিল তার একটা অন্যতম কারণ হল- শহরের উৎপাদক সংঘ (Guild) শক্তিশালী ছিল না ফলে প্রতিরোধ ছিল কম। এই clothier রা গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে পশম বিতরণ করে বস্ত্র তৈরীর ফরমায়েশ দিত, অনেককে প্রয়োজনীয় কারিগরী সাহায্য দিত। বস্ত্র তৈরী হলে নির্দিষ্ট দামে এটা কিনে নিয়ে বাজারে বিক্রি করত। বাড়ীর বস্ত্র প্রস্তুতকারীরা বাধ্য হত কম দামে এ কাজ করতে- কারণ তাদের পক্ষে একা একা এই বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করা ও বিক্রির ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। clothier রা এইভাবে বড় আকারে বস্ত্র উৎপাদন করে অনেক লাভে ব্যবসা করতে পারত এবং তারা পুঁজি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। এইভাবে উৎপাদন বাড়তে থাকায় শিল্পে পুঁজির প্রয়োজন বেড়ে যায়। এই প্রথম কারিগর ও উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত যারা তাদের সঙ্গতির চাইতে অনেক বেশী পুঁজির দরকার হল। আগের উৎপাদন ব্যবস্থা ও পুঁজির মালিক ও কারিগর এবং শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। এতে পুঁজির মালিকদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হল উৎপাদনের উপর,এটা ছিল এই যুগের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ।[২২]

সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের পরিবর্তনও এই সময়ের ইংল্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অধিকাংশ মানুষ মধ্যযুগের মত কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল এই যুগে। কিন্তু কতকগুলো শ্রেণীর আবির্ভাব এই সময় হয় যারা আগে হয় ছিলই না বা থাকলেও ভূমিকা ছিল কম। এর মধ্যে ছিল gentry বা রাজণ্যবর্গের পরের অভিজাত সম্প্রদায়। সামরিক শক্তি বা সামাজিক প্রাধিকার ছাড়াই ইউরোপের কোথাও অন্য কোন শ্রেণী এত বেশী জমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে নি। পেশাজীবীরা এই সময় প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা (clothier) অন্যান্য ব্যবসায়ী, ছোট উৎপাদনকারীরাও এই সময় সমাজে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমষ্টিগত এই শ্রেণীগুলো মধ্যযুগের সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রয়োজনীয় অবস্থান সৃষ্টি করে। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ড অর্থনীতিতে ও সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যযুগের তুলনায় অনেক বদলে যায়।

সপ্তদশ শতকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ইংল্যান্ড উন্নতির সোপানের পাদদেশে অবস্থান করছিল। কিন্তু ইতিহাসে উন্নতির পূর্বশর্ত পূরণ করার পরও পিছিয়ে যাওয়ার বহু উদাহরণ আছে। মনে করা হয়, যদি পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্যের রাজাদের মত ইংল্যান্ডের রাজারাও তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করতে পারত তা হলে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত এমনকি বন্ধ হয়ে যেতে পারত। ১৬৬০ সালে ইংল্যান্ডের রাজার ক্ষমতার সীমা বেঁধে দেওয়া নিশ্চিত হয়, এতেই ইংল্যান্ডের অগ্রযাত্রাও বাধামুক্ত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের রাজা জন এর বিরুদ্ধে রাজ্যের ব্যারনরা (Baron) বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংল্যান্ডের উত্তর ফ্রান্সে কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যারনরা রাজাকে অর্থ ও সৈন্য জোগান দিত। ইংল্যান্ডের রাজারা আগে ব্যারনদের সঙ্গে আলোচনা করে কর নির্ধারণ করতেন। ১২০৪ সাল নাগাদ রাজা জন যুদ্ধে হেরে উত্তর ফ্রান্সের রাজত্ব হারাল। এরপর ব্যারনদের সঙ্গে আলোচনা না করে রাজা জন কর বাড়িয়ে দিল। তাদের উপর কর বাড়ান, ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাওয়ার ফলে নরম্যান্ডিতে তাদের জমি-জমা চলে যাওয়া ইত্যাদি কারণে তারা বিক্ষুব্ধ হন। ইংল্যান্ডে এ ধরনের বিদ্রোহ আগেও হয়েছিল কিন্তু অতীতে তারা সিংহাসনের অন্য উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসিয়ে সমাধানের পথ খুঁজত। রাজা জনের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় ব্যারনরা নিজেরাই বিদ্রোহ করল। ১২১৫ সালে ফ্রান্স ও স্কটল্যান্ডের রাজার সমর্থনে বিদ্রোহীরা রাজা জনকে Articles of the Barons নামে একটি দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করল। এটা ছিল একটা চুক্তিপত্র যাতে রাজার ক্ষমতার কিছুটা সীমা নির্ধারণ করা হল যাতে রাজা প্রজা নিপীড়ন করতে না পারে। রাজা জন কিছুদিন পরই এই দলিল মানতে অস্বীকার করে এবং আবার ব্যারনরা বিদ্রোহ করে। ১২১৬ সালে রাজা জন মারা যাওয়ায় তার নাবালক ছেলে হেনরীকে সিংহাসনে বসান হয়। হেনরীর সমর্থকরা বিদ্রোহী ব্যারনদের সমর্থন কমানর জন্য ১২১৬ সালেই আর একটি ঘোষণা দেয়। আগের চার্টার (charter) এর তুলনায় এটা একটু ছোট ছিল। পরবর্তীতে ১২৯৭ সালে রাজা এডওয়ার্ড চার্টার টি পুণরায় ঘোষণা করেন। ম্যাগনা কার্টার ফলে রাজারা রাজকোষের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছিলেন। ষ্টুয়ার্ট রাজারা এই নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। এর মধ্যে একটা পন্থা হল অর্থের বিনিময়ে ব্যবসার মনোপলি (monopoly) দেওয়া। ষ্টুয়ার্ট রাজা প্রথম চার্লস এর সময় প্রায় সাতশত মনোপলি (monopoly) দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া তারা রাজত্বে প্রশাসনের পদে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়া শুরু করল। রাজসভার পিয়ার (peer) এর অবস্থানও বিক্রি করা হল । এতে রাজাকোষে কিছু অর্থ আয় হলেও মানুষ মনে করা শুরু করল রাজা নিয়ম ভঙ্গ করে অর্থ আদায় করছে। এতে জনমত রাজার বিপক্ষে চলে যেতে লাগল। রাজা চার্লস ১৬২৯ সাল থেকে পার্লামেন্টের অধিবেশন না ডেকেই রাজ্যশাসন শুরু করেন। ১৬৪০ সালে স্কটিশ বিদ্রোহ শুরু হল। বিদ্রোহ দমন করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং চার্লস পার্লামেন্ট অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হলেন। পার্লামেন্ট ছাড়া রাজার কর আরোপের বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট সদস্যরা অবস্থান নেওয়ায় চার্লস পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন পার্লামেন্ট গঠন করলেন। নতুন পার্লামেন্টও তার বিরোধিতা করল। রাজার কর আরোপ করা ও ধর্মের ব্যাপারে কড়াকড়ি করার বিরুদ্ধে gentry দের নিয়ে একটা বিরুদ্ধ পক্ষ গড়ে উঠল। চার্চ অব ইংল্যান্ডের নিয়ম কানুন অন্যান্য খ্রিষ্টান গোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা রাজা চার্লস করেছিলেন। চার্লস পার্লামেন্টের সঙ্গে সমঝোতা না করে অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন।

ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের কোন স্থায়ী অস্তিত্ব ছিল না। রাজা যখন অতিরিক্ত কর ধার্য্য করতে চাইতেন তখন তা অনুমোদন দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকতেন। কর আদায় করত জেন্ট্রিরা (gentry)। ইংল্যান্ডে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না। প্রশাসনিক কাঠামো ছিল খুবই দুর্বল। স্থানীয় জেন্ট্রিরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করত, বিচার ব্যবস্থা চালাত ও প্রশাসন চালাত। যুদ্ধের সময় তারাই সৈন্যবাহিনী তৈরী করত। এটা ছিল ফ্রান্সের সম্পূর্ণ বিপরীত। পার্লামেন্টে থাকত জেন্ট্রিদের প্রতিনিধিরা। তারা পার্লামেন্ট আলোচনা করে রাজার কাছে বিল আকারে প্রস্তাব পাঠাত, বিশেষত কর সংক্রান্ত ব্যাপারে। যেহেতু জেন্ট্রিরা রাজার হয়ে কর আদায় করত, তাই তাদের বাদ দিয়ে কর আদায় করা রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জেন্ট্রিদেরও রাজাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করার একমাত্র উপায় ছিল কর আদায় করতে অস্বীকৃতি জানান।

স্কটল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধে রাজার বাহিনী হেরে গিয়ে উত্তর ইংল্যান্ডের বিস্তৃত এলাকা হারাল। রাজা বাধ্য হয়ে ১৬৪০ সালেই আবার পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকলেন। সুযোগ পেয়ে পার্লামেন্ট বিভিন্ন আইন পাশ করল- এর মধ্যে ছিল, পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া রাজা নতুন কর আরোপ করতে পারবেন না। রাজা পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিতে পারবেন না, রাজা না ডাকলেও তিন বছর পর পর পার্লামেন্ট বসবে। ১৬৪২ সালে রাজা পার্লামেন্টের নয়জন নেতাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সৈন্য নিয়ে অভিযান চালালেন-কিন্তু তাদের ধরতে পারলেন না। লন্ডনে তার কর্তৃত্ব দৃঢ় নয় এটা অনুভব করে রাজা লন্ডন ছেড়ে চলে গেলেন। রাজা ও পার্লামেন্ট এর মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির চেষ্টা ফলপ্রসূ হল না। রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ক্রমেই রাজা অথবা পার্লামেন্টের পক্ষে- অবস্থান নিল। কয়েক বছর ধরে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হল। প্রথম দিকে রাজার অনুগত বাহিনী জয়লাভ করতে লাগল। ১৬৪৫ সালে পার্লামেন্টের সৈন্য বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। সৈন্যরা ছিল ক্লান্ত, তারা ঠিকমত বেতনও পেত না। অনেকেই পালিয়ে যেতে লাগল। কোন কোন স্থানে বিদ্রোহের সম্ভাবনাও দেখা দিল। উপরন্ত ভয় ছিল স্কটল্যান্ডের বাহিনী রাজার সঙ্গে আপোষ করে ফেলতে পারে।

এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল ক্যামব্রিজশায়ারের নেতা অলিভার ক্রমওয়েলের বাহিনী। তার আয়রনসাইড (ironside) নামে পরিচিত বাহিনীর গঠন ছিল ভিন্ন। তিনি স্বচ্ছল কৃষকদের মধ্য থেকে যারা স্বেচ্ছায় সেবা দিতে চাইত তাদের নিয়ে এই বাহিনী গঠন করেছিলেন। এরা অন্যান্য বাহিনীর মত বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দেওয়া বেতনভূক বাহিনী ছিল না। এ ছাড়া ক্রমওয়েল তাদের মনোবল দৃঢ় রাখার জন্য ও অনুপ্রাণিত করার জন্য তাদেরকে নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর উন্নয়নের জন্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রচার কার্য চালানর জন্য সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে সব জায়গায় যাজকেরা যেত। কাজেই তার বাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল। ১৬৪৪ সালে রাজার বাহিনীকে মারসডেন মুর (Marsden Moor) নামক স্থানে পরাজিত করার পিছনে আয়রনসাইডদের বড় ভূমিকা ছিল।

পার্লামেন্টের সম্পূর্ণ সৈন্য বাহিনীকে আয়রনসাইডদের মত পুনর্গঠন করার জন্য উদ্যোগ নিলেন ক্রমওয়েল। এতে পার্লামেন্টের কিছু সদস্য বিরোধিতা করলেও গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ী, কারিগর, এবং কিছু পার্লামেন্ট সদস্যের সমর্থনে সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের দায়িত্ব পান ক্রমওয়েল। মূলতঃ অশ্বারোহী বাহিনী আয়রনসাইডদের মত অনুপ্রাণিত হয়ে যারা স্বেচ্ছায় যোগ দিতে রাজী ছিল তাদের নিয়ে তৈরী করা হল। এরা হল পুনর্গঠিত সৈন্যবাহিনী যা দি নিউ মডেল আর্মি (the new model army) নামে পরিচিত হল। এরাই হল পার্লামেন্টের সৈন্যবাহিনীর মূল শক্তি। ১৬৪৫ সালেই এর ফল পাওয়া গেল। রাজার পক্ষের বাহিনী পরাজিত হল এবং পার্লামেন্ট বাহিনী রাজার সদর দপ্তর অক্সফোর্ড দখল করে নিল। রাজা পালিয়ে গেলেন ও স্কটল্যান্ডের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করলেন।

পার্লামেন্ট পক্ষের রক্ষণশীলশক্তি এরপর এই বৈপ্লবিক নিউ মডেল আর্মি ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং বড় ভূস্বামীদের শ্রেণীগত নিয়ন্ত্রণ আবার ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। সৈন্যরা এর বিরোধিতা করতে লাগল এবং সমস্ত বাহিনীতে তাদের পক্ষে প্রচারণা চালাতে লাগল। তারা সৈন্যদের দাবী দাওয়ার পক্ষে, ছোট ও মধ্য ভূস্বামীদের ভোট ও অন্যান্য অধিকারের পক্ষে এবং প্রেসবাইটারিয়ানদের কঠোর অনুশাসনের বিপক্ষে সোচ্চার হল। সৈন্য বাহিনীর বাইরে একদল গণতন্ত্রমনা লোক এদের সঙ্গে যোগ দিল- এরা লেভেলার (leveller) নামে পরিচিত হল। রক্ষণশীল প্রেসবাইটারিয়ানরা সৈন্যবাহিনীর উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করল। ক্রমওয়েল ও তার সহযোগিরা নিউ মডেল আর্মির সঙ্গেই থাকলেন ও রাজাকে তাদের শর্ত মেনে নেওয়ার দাবী জানালেন। রাজার শর্ত মেনে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। তিনি ১৬৪৭ সালে বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

এরপর গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বে রাজার সমর্থকদের সাথে আবার ক্রমওয়েলের বাহিনীর যুদ্ধ হয়। কয়েকটি যুদ্ধের পর ১৬৪৮ সালে রাজার বাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় ও রাজা চার্লস বন্দী হন। পার্লামেন্টে এরপর আলোচনা শুরু হয় রাজা চার্লস এর বিচার করা নিয়ে। পার্লামেন্টের অনেক সদস্য তখনও চার্লসএর সঙ্গে সমঝোতার পক্ষে ছিল, এতে উত্তেজিত সৈনিকরা পার্লামেন্টে এসে যারা আপোষকামী ছিল তাদের হয় বন্দী করল অথবা বহিস্কার করল। বাকী সদস্যরা বিচার করে রাজাকে মৃত্যুদন্ড দিল। ১৬৪৯ সালের ৩০ শে জানুয়ারী তা কার্যকর করা হয়।

ক্রমওয়েল ও তার সহযোগীদের সঙ্গে এরপর নিউ মডেল আর্মীর মতাদর্শ সংগঠক এবং লেভেলারদের বিরোধ হয়। ১৬৪৯ সালের বসন্তকালে ক্রমওয়েল লেভেলার নেতাদের বন্দী করেন এবং নিউ মডেল আর্মীর বিদ্রোহ দমন করেন, এর নেতাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় ও সৈন্যবাহিনীকে আয়ারল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পুনর্গঠিত সৈন্যবাহিনী ও লেভেলাররা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত এবং সংখ্যায় কম। সংখ্যায় অধিক দরিদ্র শ্রেণীর দাবী দাওয়া তারা তোলে নাই এবং তাদের সংগঠিত করে নাই। তাই তাদের পরাস্ত করা কঠিন হয় নাই।[২৩] তবে এই ঘটনাসমূহের পর সামাজিক পরিবর্তন ঘটে যায়। ১৬৪৯ সালের পর ইংল্যান্ডে ও পরবর্তীতে স্কটল্যান্ডে মধ্যশ্রেণী থেকে আগত সামরিক অফিসাররাই প্রশাসন চালাতে থাকে- যা আগে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর করায়ত্ত ছিল।

প্রায় এক দশক ক্রমওয়েল শাসন করলেন- প্রায় সম্পূর্ণই সামরিক বাহিনীর শক্তির উপর নির্ভর করে। রক্ষণশীল জেনট্রি ও পরিবর্তনকামী সামরিক অফিসারদের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ মিটে নাই। ১৬৬০ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর এই দুই পক্ষের একটা বড় অংশ একমত হয়ে আবার রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনে। রাজা চার্লস-যাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল, তার ছেলেকে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসান হয়। রাজতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত হল। লর্ডরা তাদের উপাধি ফিরে পেল, তাদের জমিও ফিরে পেল।

চার্চ অব ইংল্যান্ড আবার আগের অবস্থানে ফিরে গেল। আপাতদৃষ্টিতে নতুন রাজার রাজত্বে সব আবার আগের অবস্থানে ফিরে গিয়েছিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেছিল। রাজকীয় প্রশাসন যন্ত্র ও আমলাতন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। এই গৃহযুদ্ধ যা ঐতিহাসিক হিল বৃটেনের ইতিহাসে সবচাইতে যুগান্তকারী ঘটনা বলে আখ্যা দিয়েছেন।[২৪] সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্ট কাঠামোও ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। সর্বসাধারণের জমি ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক দখল করার অনুমোদন (endorse) পেল। কৃষিপণ্য রপ্তানী, যা আগে বন্ধ ছিল আবার চালু হল। মনোপলি (monopoly) ব্যবসা বন্ধ করা হল। সরকার দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আইন করা শুরু করল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেশীয় পণ্যের বাজার নিশ্চিত করার জন্য বিদেশী পণ্য আমদানী বন্ধ করা, যেমন- ১৬৭৮ সালে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থে ফ্রান্স থেকে সিল্ক ও লিনেন কাপড় আমদানী বন্ধ করা হল।[২৫] এইসব কাঠামোগত প্রশাসনিক পরিবর্তনের ফলে জমিতে টাকা খাটান কম লাভজনক হয়ে পড়ল। প্রশাসন পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা উৎসাহিত করতে লাগল। ফলে ব্যবসা ও উৎপাদনে পুঁজি আসতে শুরু করল। জি এইচ জর্জের মতে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে ইংল্যান্ডের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছেছিল।[২৬] এই পরিবর্তনসমূহ ইংল্যান্ডকে পৃথিবীর অর্থনীতিতে প্রাধান্য স্থাপন করার ভিত্তি স্থাপন করে। এই পরিবর্তনগুলো ছাড়া ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে বিকাশ যেভাবে ঘটেছিল তা হত কিনা সন্দেহ।

ফরাসী বিপ্লব

বৃটেনের শিল্প বিপ্লব ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিতে পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আদর্শ নুতনত্ব লাভ করে ফরাসী বিপ্লব থেকে। ১৭৮৯ থেকে শুরু করে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ইউরোপের ও কার্যত সারা পৃথিবীর রাজনীতি ছিল ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শকে কেন্দ্র করে, তার পক্ষে এবং বিপক্ষে সংঘাতের মধ্য দিয়ে। ফরাসী বিপ্লব থেকে উৎপত্তি হল উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শ। এমন কি যে সমস্ত শব্দ ও সংজ্ঞা এ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়, সে গুলির উৎপত্তি এই বিপ্লবের মধ্য থেকে। ফরাসী বিপ্লব থেকে ফ্রান্সে যে আইনের কাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কর্মকান্ডের গঠন তৈরী হল তা ইউরোপের সর্বত্র অনুকরণ করা হল। পৃথিবীর পুরাতন সভ্যতাসমূহে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা তখন পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নাই। ফরাসী বিপ্লবের নতুন আদর্শ ও চিন্তাধারা এই সব সভ্যতাকে এরপর থেকে পরিবর্তন করতে পারল।[২৭] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের অনেকগুলো দেশে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়। কোন কোন দেশে তা বিদ্রোহের পর্যায়েও পৌছে। কিন্তু এর মধ্যেও ফরাসী বিপ্লব ছিল অনন্য। একমাত্র ফরাসী বিপ্লবই ছিল সত্যিকার সামাজিক বিপ্লব। এই বিপ্লবে সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত ছিল। এই বিপ্লব ছিল অন্যান্য বিপ্লবগুলোর চাইতে অনেক বেশী মৌলিক (Radical)। পরবর্তী যুগ সমূহের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোতে এই বিপ্লবের ধরন-ধারন (pattern) আমলে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ও কমিউনিষ্ট চিন্তাধারায় এই বিপ্লবের শিক্ষাসমূহ অন্তর্ভূক্ত হয়।

বিপ্লবের ভিত্তি

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ বর্ণনায় গুরুত্ব পায়। কিন্তু বড় ঘটনাসমূহ সামাজিক শক্তিগুলির ভারসাম্য পরিবর্তন হলে ঘটে। তবে সাধারণতঃ ভারসাম্যের পরিবর্তনের পিছনে দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে এবং অনেক সময় অপ্রকাশ্য পরিবর্তন কাজ করে। ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রেও সামাজিক শক্তিগুলির পরিবর্তন অনেক কাল ধরে ঘটে আসছিল।

বিপ্লবপূর্ব ফরাসী সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ছিল রাজা ও তার পারিপার্শ্বিক অভিজাতকুল। অভিজাতবৃন্দের মধ্যে একদল ছিল সামন্ত প্রভূরা (nobelesse de epee বা nobility of the sword), এরা অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করত এবং অনেক ক্ষমতারও অধিকারী ছিল। কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রাজারা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে রাজসভা ও প্রশাসনের বিভিন্ন পদ বিক্রি করে আরেক অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল (noblesse de robe বা nobility of the robe)। এই দ্বিতীয় অভিজাত গোষ্ঠী রাজ্যের আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণভার পেয়েছিল এবং এদের হাতেই ছিল রাজকীয় আদেশসমূহ বাস্তবায়নের ভার। এছাড়া আরও এক গোষ্ঠী অভিজাত ছিল তারা হল উচ্চ পদস্থ ধর্মযাজকেরা (bishop ও abbot)। এই ধর্মযাজকদের নিয়োগ করত রাজা, যার ফলে ধর্মযাজক হওয়ার গুণাবলী নাই এমন মানুষও প্রভাবের ফলে এই সব পদ পেতে পারত। সব অভিজাতরাই বড় বড় জমিদারীর মালিক ছিল এবং জমিদারী থেকে কৃষি উৎপাদনের উপর আরোপিত

কর পেত এবং কৃষি ভূমির খাজনা পেত। এ ছাড়াও ধর্মযাজকেরা কৃষকদের উপর ধার্য করা কৃষি উৎপাদনের একটা অংশ উপাসনালয়ের জন্য পেত (church tithes)।

বিলাসী জীবন যাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে, খরচ মেটানর জন্য অভিজাত শ্রেণী তাদের এলাকাভুক্ত কৃষকদের উপর করের বোঝা বাড়াতে থাকে। তাছাড়া রাজস্ব, প্রশাসন ও উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকদের লাভজনক নিয়োগগুলি নিজেদের দখলে রেখে আয় বাড়াতে থাকে, এতে ধনবান ব্যবসায়ীরা যারা এই পদগুলি কিনে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারত তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ধনী ব্যবসায়ীরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্রমবর্ধমান আয় দিয়ে আরও সংখ্যায় বেশী ও ধনবান হতে থাকে। অনেকে অভিজাত শ্রেণীর লোকের চাইতেও বেশী ধনবান ছিল। তাদের নিচে মাঝারী ব্যবসায়ীরা ছিল। এরা সবাই জমি কিনে সেখান থেকে আয় করতে পারত। আবার রাজ্যের ও প্রশাসনের লাভজনক পদ কিনে নিতে পারত। কিন্তু আইনগত ভাবে সামাজিক মর্যাদায় এরা অভিজাতশ্রেণীর নীচে বলে মনে করা হত। এতে তারা ক্রুদ্ধ ছিল। কিন্তু রাজার শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অবস্থান নেওয়ার মত পরিস্থিতি ছিল না। এর নিচে ছিল ছোট ব্যবসায়ী ও কারিগররা। ঐতিহ্যগতভাবে তারা রাজ্য নিয়ন্ত্রিত guild বা কারিগরদের সমিতির উপর নির্ভর করত। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে তাদের আয় সুরক্ষা করত। প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকার কারণে তাদের আয় রক্ষা করার ব্যবস্থাও কার্যকর থাকল না। ১৭৮০ এর দশকে ও ১৭৯০ এর দশকের প্রথমদিকে কৃষি পণ্য উৎপাদন কমে যাওয়ায় কারিগরদের প্রায় অভূক্ত থাকার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

ফ্রান্সের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল কৃষি নির্ভর। এর মধ্যে অল্পসংখ্যক ছিল বড় ভূস্বামী এবং আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিছু ছিল ক্ষুদ্র ভূস্বামী -যারা স্বল্প পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করত, আবার সুতা তৈরী করা ও কাপড় বোনার মাধ্যমে তাদের আয় বাড়াত। সবচাইতে বেশী সংখ্যায় ছিল ভূমিহীন কৃষকেরা, এরা জমির মালিকদের কাছ থেকে উৎপাদিত পণ্য ভাগ করে নেওয়ার শর্তে জমি লীজ (Lease) নিত । এদের অনেকের অবস্থা মধ্যযুগের ভূমিদাসদের মতই ছিল। এরা অনেকভাবে শোষিত হত। জমির মালিকদের দিতে হত উৎপাদিত পণ্যের ভাগ এবং জমির জন্য খাজনা। তাছাড়াও দিতে হত গীর্জার পাওনা (tithe) যা অনেক ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদনের এক দশমাংশ পর্যন্ত ছিল। এর উপর ছিল রাজার ধার্য করা কর। কোন কারণে কৃষি উৎপাদন কম হলে তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ত।

সামাজিক স্তরগুলির জটিলতার কারণে কোন কোন গবেষক মনে করেন শ্রেণীবিভাজন ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণ নয়। তাদের মতে যেহেতু ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিক শ্রেণী বিপ্লব পূর্ব সমাজব্যবস্থায় সুবিধা ভোগ করত, তাদের জন্য রাজা ও অভিজাত শ্রেণীর বিপক্ষে গিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য বিপ্লব করার কারণ ছিল না। এর পক্ষে তারা যুক্তি দেখান যে, বিপ্লবের নেতাদের মধ্যে খুবই কম ছিল উঠতি পুঁজিপতি। বরং ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ রাজার পক্ষ নিয়েছিল।

তবে অনেক বিশ্লেষকের মতে এই ধারণা ঠিক নয়।[২৮] অভিজাত শ্রেণী এবং উঠতি পুঁজিপতি ও বণিক শ্রেণীর স্বার্থ অনেক বিষয়ে এক হলেও তারা বিপ্লবের সময় বিপরীত অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় উঠতি পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর অনেক সুবিধা থাকার জন্য তারা বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে নাই, সমাজ পরিবর্তনের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করেছে। বিপ্লবের সময় পরস্পর বিরোধী যে দুই শক্তির দ্বন্দ্ব তৈরী হয়েছিল, তা ব্যবসায়ী- উঠতি পুঁজিপতিদের সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টার জন্য নয়। বরং তা হয়েছিল রাজা, অভিজাত শ্রেণী ও ভূস্বামীদের তাদের সুযোগ সুবিধা রক্ষা করার চেষ্টার ফলে।

রাজার সম্পদ প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল ১৭৮০ এর দশকে। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ পর্যন্ত স্থায়ী বৃটেন ও প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে "সাত বৎসরের যুদ্ধ" এবং তারপর আমেরিকায় বৃটেনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে ফরাসী সাহায্য ও সমর্থন দানের ফলে বিরাট ব্যয়ভার ফ্রান্সকে প্রায় দেওলিয়া করে ফেলে। সাধারণ মানুষের উপর কর বাড়ান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। গ্রামের মানুষের গড় জীবন যাত্রার মানের অবনতি হয়েছিল। শহরের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার খরচও

বেড়ে গিয়েছিল। বেশী কর দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কর আদায়ের পদ্ধতি ছিল অকার্যকর। কর আদায়ের দায়িত্বে যারা ছিল তারা আদায় করা অর্থের অনেকটা নিজেরাই নিয়ে নিত।

কর ব্যবস্থা সংস্কার করার জন্য রাজা ১৭৮৬ সালে মন্ত্রীদের দায়িত্ব দেন। তারা একটি প্রস্তাব দেয় যাতে কর ব্যবস্থা কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত শ্রেণী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর কর ধার্য করার কথা বলা হয়- যেগুলো এ পর্যন্ত কর মুক্ত ছিল। এতে অভিজাত শ্রেণী বিক্ষুব্ধ হয়। প্রস্তাব কিছুটা পরিবর্তন করে যখন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন অভিজাত শ্রেণীর যে সমস্ত উচ্চ কর্মকর্তা প্রশাসনে ছিল, তারা এটা কার্যকর করতে অস্বীকার করে। এ সত্ত্বেও মন্ত্রীবর্গ যখন এটা কার্যকর করতে চেষ্টা করে তখন অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে বিভিন্নস্থানে বিক্ষোভ দেখানর ব্যবস্থা করে। কোন কোন স্থানে তা সহিংস হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেয় কারণ তারা এমনিতেই অর্থনৈতিক দূরবস্থার মধ্যে ছিল, তারপর কর বাড়ানর প্রস্তাব তাদের কাছে সঙ্গত মনে হয় নি।

অভিজাত শ্রেণী ধরে নিল তারাই সমাজের নেতৃত্ব দিতে পারে- কারণ তারা দেখল কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সাধারণ মানুষ তাদের নির্দেশনা মেনে নিচ্ছে। তারা রাজার কাছে Estates General এর সভা ডাকার দাবী জানাল। এই সভা ১৬১৪ সালের পর অর্থাৎ প্রায় দু'শ বছর ধরে হয় নি। কিন্তু এই সভা সাধারণ মানুষের দাবীর কারণে ডাকা হয় নাই- এটা ডাকা হয়েছিল অভিজাত শ্রেণীর চাপের মুখে। Estates General ছিল একটি পরিষদ যাতে তিন শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকার বিধান ছিল। প্রথম শ্রেণী হল অভিজাতরা, দ্বিতীয় শ্রেণী হল উচ্চ পর্যায়ের ধর্মযাজকেরা, তৃতীয় শ্রেণী (the third estate) হল সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা।

কিন্তু সভা ডাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়ন ও সংগঠন শুরু হল- কারণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে। শহরে ও গ্রামে কৃষক, কারিগর, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হল। প্রতিনিধিরা তাদের পক্ষে কি কি দাবী তুলে ধরবে তা আলোচনা হতে লাগল। এই প্রথমবারের মত দরিদ্র মানুষরা তারা সমাজের কাছে কি চায় তা ভাবতে শিখল ও দাবী দাওয়ার তালিকা তৈরী করা হল। যদিও তাদের হয়ে কথা বলার জন্য তারা মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ, বিশেষত আইনজীবীদের বেছে নিল, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় প্যারিসের দরিদ্র এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক কর্মীদের গোষ্ঠী তৈরী হল। এরাই ১৭৮৯ এর জুলাই মাসে বাস্তিল দখল করে এবং অক্টোবর মাসে ভার্সাই প্রাসাদে অভিযান চালায়। গ্রামে এই কর্মীগোষ্ঠী গ্রামের অভিজাতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়।

তথ্য সূত্রঃ

১. Hobsbawm E. The Age of Revolution. New York, 1996 p 29
২. Hobsbawm E. p 30
৩. Wadsworth AP and Mann. J Del. The Cotton Trade and Industrial Lancashire 1600-1780. Manchester. 1965 chapter-VII.
৪. Hobsbawm E. p 35
৫. Hobsbawm E. p 35
৬. Van Houtte JA. An Economic History of the Low Countries, 800-1800. New York, 1977 p 70
৭. Nicholas D. Town and Countryside: Social, Economic ad Political Tensions in Fourteenth Century Flanders. Bruges,1971 p 302
৮. Dobb M. Studies in the Development of Capitalism. New York,1963 p 156
৯. Lambert A. The making of the Dutch Landscape. London, 1971 p 171
১০. de Vries J. The Dutch Rural Economy in the Golden Age,1500-1700. Yale,1994 p 26,55
১১. Van Houtte JA. p 68
১২. Koenigsberger HG and Moose G. Europe in the Sixteenth Century. London, 1968 p 50
১৩. de Vries J. p 152
১৪. Van Houtte JA. p. 133-135
১৫. Lambert A. p 171
১৬. Lambert A. p 173,187
১৭. Davis R. The Rise of the Atlantic Economies. Cornell, 1973 p 193
১৮. Russel C. The Crisis of Parliaments. Oxford, 1971 p 26
১৯. Clarkson L. The Pre Industrial Economy of England, 1500-1750. London, 1971 p 62
২০. Clarkson A. p 62
২১. Tawney RH. The Agrarian Problem in the Sixteenth Century. London, 1912 p 46
২২. Dobb M. p 143
২৩. Harman C. A Peoples History of The World. London, 2008 p 216
২৪. Hill C. From Reformation to Industrial Revolution. London, 1967 p 76
২৫. Tawney RH. p 394
২৬. George CH. The Making of the English Bourgeoisie, 1500-1750. Science and Society, 1971, 35,394
২৭. Hobsbawm E. p 53
২৮. Harman C. p 288

সপ্তম অধ্যায়

পুঁজিবাদের বিস্তার

ঊনবিংশ শতকের শেষ নাগাদ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্থানেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভাব পড়ে-এক মাত্র দুর্গম স্থান (যেমন আমাজনের দুর্গম জঙ্গল, অ্যানটার্কটিকার বরফাচ্ছাদিত অঞ্চল) ছাড়া। তবে তার প্রভাব পৃথিবীর দুই অঞ্চলে ছিল দুই রকম। বেশির ভাগ অঞ্চলে মানুষ কায়িক পরিশ্রম করত পৃথিবীর অন্য প্রান্তে অবস্থিত পুঁজির মালিকদের জন্য পণ্য উৎপাদন করতে। আর পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটল শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও কৃষিতে।

এক শতাব্দী আগে বৃটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল বস্ত্র উৎপাদনের একটি অংশে - তুলা থেকে সুতা তৈরীতে (cotton spinning)। এরপর থেকে প্রায় সব ধরণের উৎপাদনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু হল - সাবান তৈরী, কাগজ তৈরী, জাহাজ তৈরী, ছাপাখানা ইত্যাদি। বিদ্যুতের আবিষ্কার ও ইলেক্ট্রিক বাল্ব তৈরীর ফলে মানুষ কৃত্রিম আলো সৃষ্টি করতে পারল। তাই দিন শেষ হওয়ার পরও এই কৃত্রিম আলো দিয়ে উৎপাদন চালু রাখা সম্ভব হল। আগে শিল্প উৎপাদন শক্তির উৎসের (যেমন বাষ্প ইঞ্জিন) কাছাকাছি করতে হত। বৈদ্যুতিক মটর এর আবিষ্কার শিল্প উৎপাদনকে সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের আবিষ্কার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত উৎপাদনের অংশ গুলির সমন্বয় করা সম্ভব করল। যুদ্ধকালীন বিভিন্ন এলাকার যুদ্ধক্ষেত্রের যোগাযোগও এগুলির মাধ্যমে সহজতর হল। রেলপথের বিস্তার দূর - দূরান্তের এলাকার সঙ্গে শহরসমূহের যোগাযোগ স্থাপন করল। কারখানা, রেল যোগাযোগ, বাস্পচালিত সমুদ্রযান এগুলোর জ্বালানী সরবরাহের জন্য কয়লাখনির সংখ্যা ও আকার বাড়তে থাকল। লোহার কারখানা স্থাপিত হতে থাকল এবং কারখানা গুলোকে ঘিরে শহর গড়ে উঠল।

একটি শিল্পের বৃদ্ধি অন্যসব শিল্পের চাহিদা সৃষ্টি করল এবং সেগুলোও বাড়তে থাকল। শহরের মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় খাদ্যের চাহিদাও বাড়ল। কৃষিকাজ শিল্প উৎপাদনের আদলে শুরু হল। আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের তৃণভূমিতে বড় আকারে শস্য উৎপাদন শুরু করা হল। আর্জেন্টিনায় মাংসের জন্য বিরাট আকারে গোচারণ ভূমি তৈরী করা হল। অষ্ট্রেলিয়ায় উৎপাদিত হল পশম। এগুলো হাজার হাজার মাইল দূরে অন্য মহাদেশের শহরে চালান দেওয়ার ব্যবস্থাও হল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবস্থাপন্ন শ্রেণীর মানুষরা দরিদ্র মানুষদের জীবনযাত্রার নিম্নমান উন্নতির কোন উদ্যোগ নেয় নাই। কিন্তু এই কালে নিম্ন মানের জীবনযাত্রার ফলে যে রোগের উদ্ভব হয় এবং সেই সব রোগ যে দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত এলাকা থেকে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর এলাকায় ছড়াতে পারে এই চেতনা আসল। এর ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে অবস্থাপন্ন শ্রেণীর মানুষরাই দরিদ্র মানুষদের বাসস্থানের ও পয়ঃব্যবস্থার উন্নতি, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের দিকে নজর দিল। গ্যাস সরবরাহ করে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ও শীতকালে বাড়ি ঘরে উত্তাপের ব্যবস্থাও করা হল।

শহরাঞ্চলের মানুষের সংখ্যা এই সময় বাড়তে থাকে। ১৯০০ শতাব্দী নাগাদ বৃটেনের তিন - চতুর্থাংশ মানুষ শহরে বসবাস করত। মাত্র এক দশমাংশ মানুষ কৃষিতে নিয়োজিত ছিল। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অবশ্য এতটা নগরায়ন হয় নাই। ফ্রান্সে ৩০ শতাংশ মানুষ এই সময় কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল এবং জাপানে এটা ছিল ৩৮ শতাংশ। তবে শিল্পোন্নত দেশসমূহে নগরায়নের ধারা বাড়তে থাকল। এর ফলে অধিক সংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রার ধারা বদলাতে থাকল।

এই বদলের ফলে পুঁজিপতিদের সামনে নতুন সুযোগ আসল। বিনোদনের প্রয়োজনে মদ্য প্রস্তুতকারীরা দেশের সর্বত্র Pub (মানুষের একত্রিত হয়ে মদ্যপান করার স্থান) স্থাপন করল। পত্রিকা প্রকাশ করে খবর ও বিনোদনমূলক লেখা ছেপে ব্যবসা শুরু করল। Harmsworth নামে একজন পুঁজিপতি Titbits নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করে সাফল্য লাভ করেন। খেলাধূলাকে সংগঠিত করে ব্যবসা করাও এ সময়ে শুরু হল। শিল্প শহর এমনকি এক একটি বড় কারখানা কেন্দ্র করে খেলার দল গড়া হল। এই দলগুলোর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্থ আয় করার সুযোগ হল। পুঁজিবাদী উৎপাদন শুরু হয়েছিল মানুষদের সময়ের একটা অংশ উৎপাদনে লাগিয়ে মুনাফার মধ্য দিয়ে। কারখানায় তারা দিনের একটা অংশ পুঁজিপতিদের জন্য সময় দিত। মানুষের জীবনের প্রায় সব দিক - কাজ কর্ম থেকে বিনোদন - সব ক্ষেত্রেই ব্যবসা বাণিজ্য করে লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি করলো পুঁজিপতিরা।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রথম যুগে শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল অবহেলিত। শিশু ও মহিলাদের দিয়েও কঠোর পরিশ্রম করান হত। কারণ তাদের মজুরী কম দেওয়া যেত এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগান যেত। পুঁজিবাদের প্রথম যুগে তুলা থেকে সুতা তৈরীর কারখানা গুলোতে ঠাসাঠাসি করে মহিলা ও শিশুদের কাজ করান হত। তাদের স্বাস্থ্যের উপর এর বিরূপ প্রভাব উপেক্ষা করা হত। মুনাফার জন্য শ্রমিকদের মানবেতর জীবন যাপনও ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। ১৮৫০ সাল নাগাদ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পুঁজিপতিরা কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। গ্রামের জনসংখ্যা কমে যাওয়ায় গ্রাম থেকে কাজ করতে আসা মানুষের সংখ্যা কমতে থাকে। আর শহরে বসবাসকারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত অবনতি তাদের ভাবিয়ে তুলল। ভবিষ্যতে যথেষ্ট সংখ্যায় শ্রমিক পাওয়া যাবে কিনা এবং যাদের পাওয়া যাবে ক্ষীণ স্বাস্থ্যের কারণে তাদের কর্মদক্ষতা কেমন থাকবে, তা সমস্যা বলে তারা মনে করল। ১৮৭১ সালে একটি রিপোর্টে বলা হয় দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেদের কেউই চার ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চির বেশী উচ্চতা অর্জন করছে না। ১৮৯৩ সালে ম্যানসন হাউস কমিটি বলে "লন্ডনের কর্মজীবী শ্রেণীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাড়ান দরকার"।[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কতকগুলি আইন প্রণয়ন করে এই অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করা হল। এর মধ্যে ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কাজ করার সময় সীমিত করা, ক্ষতিকর শিল্পে মেয়েদের কাজ করতে না দেওয়া, স্কুলে বিনামূল্যে খাবার দেওয়া ইত্যাদি।

শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়ানর জন্য এই সময় একটা বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়। শ্রমিকেরা যত বেশী উৎপাদন করতে পারবে, ততই পুঁজিপতিদের লাভ বাড়বে। দুই বা তিন shift এ কাজ চালু করে ২৪ ঘন্টা উৎপাদন করা প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হল। একজন শ্রমিক সর্বোচ্চ কতটা কাজ করতে পারে তা হিসাব করে সেই অনুযায়ী উৎপাদন হিসেব করে মজুরী দেওয়ার জন্য পরিদর্শক ও সময় হিসাব এর ব্যবস্থা করা হল।

শিল্প উৎপাদনের প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাজ করার জন্য শ্রমিকদের শিক্ষার দরকার হয়ে উঠল। প্রাক পুঁজিবাদী কালগুলোতে শিক্ষা-দীক্ষা মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পুঁজিবাদী শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার জটিলতার জন্য শিক্ষিত শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দিল। শুধু মাত্র যন্ত্রপাতি চালানর নির্দেশনাবলী পড়া ও কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের প্যাকেজ এর লেবেল পড়ার জন্যও স্বাক্ষরতার দরকার ছিল। গণনা করার জন্যও ছিল শিক্ষার প্রয়োজন। বৃটেনে পুঁজিবাদ শুরু হয়েছিল যদিও স্বাক্ষর শ্রমিক ছাড়াই, কিন্তু ক্রমেই এর প্রয়োজন অনুভূত হল। ১৮৭০ সালের পর দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হল। যেসব দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদন পরে চালু হল (যেমন জার্মানী), সেসব দেশে বৃটেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে শুরু থেকেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে। পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পূর্ণ বিকশিত হয় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগে। এই সময়ে এসে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়ে যায়। পুঁজিবাদের প্রথম দিকে গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে শহরের শিল্পকারখানার শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে এসে মানুষ ধাক্কা খেত। জীবনযাপনের পদ্ধতির ও নতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তি (যেমন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি) দেখে তারা আশ্চর্য হত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এসে তারা পূঁজিবাদী জীবনযাত্রার উৎপাদন সমূহ, যেমন প্রতিযোগিতা ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, লোভ ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু তারা দেখে নাই। তাই তাদের কাছে এটাই ছিল "মানব স্বভাব"। তাদের পূর্ব পুরুষরা এই আচরণ দেখার সুযোগ পেলে এটাকে উদ্ভট বলে মনে করত।

চিন্তার জগতে পরিবর্তন

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা আগের চাইতে আরামদায়ক হয়ে উঠল। শ্রমিকদের অনেকের অবস্থারও উন্নতি হতে থাকল। তাদের মধ্যে এই ধারণা গড়ে উঠল যে এই উন্নতি হতেই থাকবে এবং মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধানও হয়ে যাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করতে সাহায্য করল। লর্ড কেলভিন নিউটনের মেকানিকস এর ধারণা ব্যবহার করে বিশ্বব্রহ্মান্ডের একটা মেকানিকাল মডেল দাঁড় করালেন। জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল মেকানিকস এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রিসিটি ও ম্যাগনেটিজম এর যোগসূত্র বিশ্লেষণ করলেন। ডারউইন ও ওয়ালেস জীবজগতে বিবর্তনের ব্যাখ্যা

দিলেন। ডারউইন এটাও দেখালেন কিভাবে মানবজাতি বানর সদৃশ্য স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। রসায়নবিদেরা অজৈব পদার্থ থেকে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ জীবন্ত প্রাণীতে পাওয়া যায় তা তৈরী করতে সমর্থ হলেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও যাজকেরা বিজ্ঞানের ধারণা গুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। অক্সফোর্ডের এ্যাঙ্গলিয়ান বিশপ ডারউইনের শিষ্য হ্যাক্সলির নিন্দা ও সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফার সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় বিজ্ঞান, যুক্তি ও মুক্তচিন্তা অতীতের মত দমন করা যায় নাই।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অভ্যুদয়

মধ্য উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গণতন্ত্র শাসক শ্রেণীর কাছে ছিল ঘৃণিত। ম্যাকঅলে নামে একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছিলেন "সার্বজনীন ভোটধিকার সরকারের সমস্ত কর্মকান্ডের জন্য মারাত্নক ক্ষতিকর" এবং সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য বিপদজনক। নিম্নবর্গের জনগণের চাপের মুখে যখন শাসকশ্রেণী ভোটের অধিকার আরও বেশী মানুষকে দিতে বাধ্য হল, তখনও তারা যতটা সম্ভব মানুষকে এর বাইরে রাখার জন্য আইন করল, কিছু সম্পত্তি না থাকলে ভোটাধিকার পাবে না। বৃটেনের ১৮৩২ সালের সংশোধিত আইনে ২ লক্ষ মানুষ থেকে বেড়ে ১০ লাখ মানুষ ভোটাধিকার পেল। এটা ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের মাত্র এক - পঞ্চমাংশ। ১৮৬৭ সালে আন্দোলনের চাপে আইন সংশোধন করা হয় - তারপরও পুরুষদের অর্ধেক ভোটাধিকার পায়। প্রুশিয়া ও আরও কয়েকটি জার্মান রাজ্যে তিন স্তরের ভোট দেওয়ার প্রথার প্রচলন হল। এর মাধ্যমে সংখ্যায় কম কিন্তু বিত্তবান শ্রেণী সবচাইতে বেশী সংসদীয় আসন অধিকার করত। এ ছাড়াও, শাসক শ্রেণীরা সংসদে একটি অনির্বাচিত দ্বিতীয় কক্ষের ব্যবস্থা রেখেছিল (যেমন হাউস অফ লর্ডস) - যারা সব সিদ্ধান্তের উপর ভেটো দিতে পারত। আরও ছিলেন রাজা, যিনি সরকার প্রধানকে নিয়োগ দিতেন। ফলে শাসক শ্রেণীর প্রাধান্য সংসদ ও সরকারে থেকেই যেত। কার্ল মার্কস প্যারী কমিউনের সময় বলেছিলেন, লুই বোনাপার্টের একনায়কত্ব শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাই করছিল -এটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ছিল না।

তবে সময়ের সাথে সাথে শাসক শ্রেণী উপলব্ধি করল গণতন্ত্র তাদের স্বার্থের জন্য হুমকি নাও হতে পারে। যদি তারা এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। লুই বোনাপার্ট নিজেই ১৮৫১ সালে তার ক্ষমতা দখল বৈধতা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সার্বজনীন ভোটাধিকার এর মধ্যেও কিভাবে ভোট নিয়ন্ত্রণ করে নিজের পক্ষে আনা যায় তা দেখিয়েছিলেন। অধিকাংশ ফরাসী ভোটার ছিল কৃষক। তারা রাজনীতির খবর এর জন্য নির্ভর করত স্কুল শিক্ষক ও ধর্মযাজকদের উপর। বোনাপার্ট দেখল তথ্য যদি এই ভাবে পৌছানো যায় যাতে বিপক্ষ দল ভোটে জিতলে তাদের কি ক্ষতি হবে, তাহলে স্কুল শিক্ষক ও যাজকেরা প্রতিপক্ষের (রিপাবলিকান) চাইতে তাকেই ভোট দেওয়ার জন্য কৃষকদের প্রভাবিত করবে। এই পন্থায় জার্মানীতে বিসমার্ক প্রুশিয়ার রাজাকে জার্মানীর সম্রাট বানিয়ে দেয়।

বৃটিশ শাসক শ্রেণী আবিষ্কার করে ছিল যে ক্রমান্বয়ে ভোটাধিকার এর আওতায় বেশী সংখ্যক মানুষকে নিয়ে এসেও নীতি নির্ধারণে তাদের নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব। এর কারণ হল, বেশীর ভাগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই সরাসরি সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। অনির্বাচিত কর্তৃপক্ষ চালাতেন সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বিচার বিভাগ, বেসামরিক প্রশাসন। এই কর্তৃপক্ষ সমূহ সংসদের কর্মপরিধি নির্ধারণ করত এবং তাদের স্বার্থবিরোধী কোন আইন প্রণীত হলে তা প্রত্যাখান করতে পারত।[২] এই ব্যবস্থায় সংসদ জনগণের পক্ষে শাসক শ্রেণীর উপর চাপ প্রয়োগ করার বদলে জনগণের দাবী দাওয়া সীমিত রাখার কাজ করত। বৃটেন ছাড়া অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও একই অবস্থা ছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে সংবাদপত্র যাতে সাধারণ মানুষের হাতে না পৌছায় সেজন্য এর উপর উচ্চ কর ধার্য করা হয়েছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এসে পুঁজিপতিরা অনূভব করল সংবাদপত্রের ব্যবসাও লাভজনক হতে পারে। মালিকরা তাদের সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রিত খবরের মাধ্যমে জনমত প্রভাবিত করে। বৃটেন বুয়র যুদ্ধের একটি ছোট ঘটনা Mafeking এর অবরোধকে বড় করে প্রচার করে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। ফ্রান্সে ক্যাপ্টেন ড্রেইফাস নামে একজনকে জার্মান চর হিসেবে মিথ্যা প্রচার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে উগ্র ইহুদী বিরোধিতা জাগিয়ে তোলে। জার্মানীতে যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ১৯০৭ সালের নির্বাচনে সংবাদ মাধ্যম সমাজতন্ত্রীদের পরাজয়ে সাহায্য করে। শাসক শ্রেণী জাতীয়তার শ্লোগান দিয়ে শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রেণীকে তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত করত। সরকার, পুঁজিপতি, সংবাদমাধ্যম জাতীয়তার শ্লোগান তুলে বোঝাতে সক্ষম হল যে, শ্রমিকদের স্বার্থ ও তাদের স্বার্থ একই। এসবের ফলে যে শাসকশ্রেণী উনবিংশ শতাব্দীর

মধ্যভাগে সার্বজনীন ভোটাধিকার তাদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করত, তারা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণের উপায় খুঁজে বের করল। তাই ভোটাধিকার দেওয়াতে তাদের আপত্তি থাকল না। তবে এই প্রক্রিয়াতে সময় লেগেছে। বৃটেনে ১৮৩২ সালে শাসকশ্রেণী শুধু মধ্যবিত্তদের ভোটাধিকার দিয়েছিল। আর সার্বজনীন ভোটাধিকার দিল ৯৫ বৎসর পর। জার্মানীতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অনেক আন্দোলন সংঘর্ষের পর ১৯১৮ সালে শাসক শ্রেণী সার্বজনীন ভোটাধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিল। মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়ার ব্যাপারেও শাসকশ্রেণীর প্রতিরোধ ছিল। শিল্প উৎপাদনমুখী অর্থনীতি গড়ে ওঠার সাথে সাথে অধিক সংখ্যায় মহিলারা শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল। শ্রমজীবী মহিলাদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত এমনকি ধনী শ্রেণীর মহিলারাও ভোটাধিকার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

সমাজতন্ত্রের আন্দোলন

সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারা ও কর্ম তৎপরতা ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালে পরাজয়ের ফলে ঝিমিয়ে পড়েছিল। শিল্পায়নের দ্রুত প্রসার এবং তার সাথে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সমাজতন্ত্রের জন্য অনুকূল ক্ষেত্র এনে দিল। কিন্তু কোথাও শ্রমিকদের সংগঠন ধনী শ্রেণী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র যন্ত্রকে বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তনের চেষ্টা করার মত শক্তি অর্জন করতে পারেনি। জার্মান সমাজতন্ত্রীরা এই সময় বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সাংগঠনিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়ার কৌশল নেয়। আরও বেশী সংখ্যক মানুষ এই সময়কালে ভোটাধিকার পায়। নির্বাচনী ব্যবস্থায় ধনী শ্রেণীর প্রাধান্য রক্ষা ছিল নিশ্চিত, কিন্তু সংগঠন করার অধিকার পাওয়ায় শ্রমিকেরা নিজেদের সংগঠন করে রাজনীতিতে অংশ নেওয়া শুরু করল। অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী মানুষও এই ধারা অনুসরণ করতে লাগল।

জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দল রাজনীতিতে বেশ সফলতার মুখ দেখেছিল। এর সদস্য সংখ্যা বাড়তে বাড়তে প্রায় দশ লক্ষে পৌঁছে। প্রায় ৯০টি স্থানীয় পত্রিকা চালাত এই দল। নির্বাচনে তারা শিল্পপতিদের সমর্থিত দল এবং জমিদার শ্রেণীর সমর্থিত দলের চাইতে বেশী ভোট পেত। সমাজতান্ত্রিক দল নিষিদ্ধ হওয়ায় ১২ বৎসর বে আইনী থাকার পরও এই দল টিকে ছিল। তাদের কাছে মনে হয়েছিল পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা যাবে।

জার্মানীর এই উদাহরণ ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী এমনকি বৃটেনেও অনুসরণ করা হয়। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস এর সুপারিশে Jules Guesde ও Paul Lafargueএর নেতৃত্বে ফ্রান্সের ওয়ার্কাস পার্টি এই নীতি মেনে নেয়। স্পেনে Pablo lglesias এই পদ্ধতিতে শ্রমিকদের দল গড়ে তোলে। এমনকি বৃটেনে শ্রমিকেরা ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির জন্য শাসকশ্রেণীর প্রতি সহনশীল ছিল। তারপরও ১৮৮৩ সালে ছোট আকারে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন তৈরী করে। ১৮৮৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনগুলির ফেডারেশন (দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত) যখন গঠিত হল, তখন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলই সেখানে প্রাধান্য পায়। এই দলগুলির ঘোষিত আদর্শ ছিল বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদ উৎখাত। কিন্তু বাস্তবে তারা পুঁজিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই চাপ প্রয়োগ করে এই ব্যবস্থা সংস্কার করার কাজ করছিল। এই দ্বন্দ্ব ১৮৯০ এর দশকে প্রকট হয়ে ওঠে।

জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের একজন অগ্রণী নেতা ছিলেন এডুয়ার্ড বার্নষ্টেইন (Eduard Bernstein)। তিনি নব্বই এর দশকের মধ্যভাগে ঘোষণা করলেন মার্কস ও এঙ্গেলস এর তত্ত্ব সঠিক নয়। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সংকট আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত উপাদান নয় এবং শ্রেণীসমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতও অবধারিত নয়। তিনি লিখেন, "সমস্ত উন্নত দেশেই পুঁজিপতি শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ও সুযোগ-সুবিধা গণতান্ত্রিক সংগঠন গুলোর কাছে ধাপে ধাপে কমে আসছে। সর্বসাধারণের স্বার্থের উন্নতি হচ্ছে, ব্যক্তি স্বার্থ পিছু হটছে, মৌলিক অর্থনৈতিক শক্তির একাধিপত্য কমছে"।[৩] বার্নষ্টেইন যুক্তি দিলেন, আধুনিক রাষ্ট্রের উৎখাতের প্রয়োজন নাই, যেটা মার্কস প্যারী কমিউন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রসার ঘটাতে হবে। ক্রমবর্ধমান সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ অর্জিত হবে। কার্ল কাউৎস্কি (Karl Kautsky) ছিলেন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের মূল তাত্ত্বিক, তিনি কিছুটা ভিন্ন মত দিয়েছিলেন। তাঁর মত ছিল, পুঁজিবাদকে সংস্কার করে রূপান্তর ঘটান যাবে না। কোন এক পর্যায়ে পৌছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। তবে সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। এক পর্যায়ে তা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে পুঁজিবাদী শক্তির পক্ষে সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা দখল করে সমাজ বদল আটকে রাখা সম্ভব হবে না। তবে সেটা একটা দূরবর্তী লক্ষ্য। বর্তমানের জন্য এমন কোন তৎপরতা চালান ঠিক হবে না, যা পুঁজিবাদীদের প্রত্যাঘাত করার সুযোগ দেয়।[৪]

বার্নষ্টেইন ও কাউৎস্কি দুজনই বিশ্বাস করতেন পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বার্নষ্টেইন মনে করতেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গণতন্ত্র চর্চা পুঁজিবাদী সমাজকে রূপান্তরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কাউৎস্কি মনে করতেন এই প্রক্রিয়া দূর ভবিষ্যতে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে পরিবর্তিত হবে এ ব্যাপারে তারা দুজনই নিঃসন্দেহ ছিলেন।

জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের নেতৃত্ব বার্নষ্টেইনের মতবাদকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু বাস্তবে তারা তার নির্দেশিত নরমপন্থী (moderate) পথ অবলম্বন করল, শ্রমিক সংগঠনের নেতারাও এই পথে চললেন। তবে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি ছিল পুঁজিবাদী সমাজের স্থিতিশীলতার উপর নির্ভরশীল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বই এর দশকে জার্মান পুঁজিবাদ ছিল স্থিতিশীল। এই স্থিতিশীলতা স্থায়ী হবে এই ধারণা থেকেই বার্নষ্টেইন তার মতামত দিয়েছিলেন।

একমাত্র পোলিশ জার্মান তরুণ বিপ্লবী রোজা লুক্সেমবার্গ এই নরমপন্থী মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে প্রক্রিয়ার ফলে পুঁজিবাদ ১৮৯০ এর দশকে স্থিতিশীল ছিল, সেই প্রক্রিয়ার ফলেই ভবিষ্যতে দেখা দিবে অস্থিতিশীলতা।[৫] তিনি আরও একটি বিষয়কে স্বীকৃতি দিলেন যা ইংরেজ অর্থনীতিবিদ হবসন কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং যেটা ১৯১৬ সালে রাশিয়ান বিপ্লবী নিকোলাই বুখারিন ও ভ্লাদিমির লেনিন পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেন। সেটা হল দ্রুত পুঁজিবাদী প্রবৃদ্ধি বৃহৎ শক্তিগুলোর সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের সঙ্গে ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সাম্রাজ্যের বিস্তার

১৮৭৬ সালে আফ্রিকার মাত্র ১০ শতাংশ ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর শাসনাধীন। কিন্তু ১৯০০ সালে আফ্রিকার ৯০ শতাংশ তারা দখলে নিয়েছিল। বড় অংশ গুলো বৃটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম দখল করেছিল, জার্মানী ও ইতালী পেয়েছিল ক্ষুদ্র অংশ। ফ্রান্স দখল করেছিল ইন্দোচীন (ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস)। জাপান দখল করল কোরিয়া ও তাইওয়ান; বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানী চীনে বড় বড় এলাকায় আধিপত্য স্থাপন করল; আমেরিকা স্পেনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল ফিলিপাইন ও পোর্টোরিকো। বৃটেন ও রাশিয়া অনানুষ্ঠানিক ভাবে ইরান ভাগাভাগি করে নিল। ইউরোপ ও আমেরিকার বাইরে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন দেশ ছিল মাত্র কয়েকটিঃ অটোমান সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ, থাইল্যান্ড, ইথিওপিয়া ও আফগানিস্তান।

তৎকালীন সভ্য সমাজে এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে ইউরোপের বাইরের সমাজগুলি ছিল আদিম ও অশিক্ষিত। কিন্তু লিভিংষ্টোন ও ষ্ট্যানলী ১৮৫০ ও ১৮৬০ এর দশকে আফ্রিকায় পরিভ্রমণ করতে পেরেছিলেন তা সম্ভব হয়েছিল আফ্রিকায় সংগঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্তিত্ব ছিল বলেই। ইউরোপীয় দেশ সমূহের আগ্রাসী অভিযানগুলোকে প্রথম দিকে আফ্রিকার এই রাষ্ট্রগুলো সহজেই প্রতিহত করেছিল। যদিও ১৮৮০ সাল নাগাদ পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলো প্রায় ৪০০ বৎসর ধরে নৌপথে আফ্রিকার সঙ্গে সংযোগ রেখে আসছিল, কিন্তু এই সময় তারা মাত্র অল্প কিছু উপকূলীয় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করত। তুলনায় আরব, ভারতীয় ও তুর্কীরা এর চাইতেও অনেক আগে থেকেই আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে আরও অনেক বেশী জায়গায় বিচরণ করত। ব্রুস ভ্যান্ডারভোর্ট বলেছেন,"আধুনিক যুগের প্রথম দিকে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় ইউরোপের প্রযুক্তিগত পার্থক্য বেশী ছিল না (শুধু সামুদ্রিক শক্তি ছাড়া)"। আর ইউরোপীয় আবিষ্কার স্থানীয় জনগণ দ্রুত আয়ত্ত করে নিত।[৬]

ইউরোপীয় শক্তিগুলির আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল জয় করার চেষ্টা আফ্রিকার দেশগুলি প্রতিরোধ করেছিল এবং অনেক যুদ্ধে ইউরোপীয়রা পরাজিত হয়েছিল। ১৮৭০ এর দশকে আশান্তিদের (Ashanti) সঙ্গে যুদ্ধে বৃটিশরা হেরে গিয়েছিল। তারা ১৮৮৪ সালে সুদানে মাহদীর সৈন্য বাহিনীর হাতেও পরাজিত হয়েছিল এবং ১৮৭৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুদের হাতেও পরাজিত হয়েছিল। ইতালীয়রা ১৮৯৬ সালে ইথিওপিয়ান সৈন্যবাহিনীর হাতে শোচনীয়ভাবে হেরেছিল।

১৮৮০ সালের পর পরিস্থিতি বদলে গেল। শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ইউরোপীয় শক্তিগুলি নতুন ও আগের চাইতে অনেক শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র হাতে পেল। এর মধ্যে ছিল রাইফেলের পেছন দিকে গুলি ভরার ব্যবস্থা (breech loading rifles), Gatling মেশিন গান, লোহার পাতে মোড়া বাস্পচালিত জাহাজ ইত্যাদি। এছাড়া অধিক পরিমাণে উৎপাদিত

শিল্পদ্রব্য আফ্রিকার মিত্রদের "ঘুষ" দেওয়া সহজতর করল। সুদানে যুদ্ধরত "বৃটিশ" সৈন্যদের একটা বড় অংশ ছিল মিশরীয় ও সুদানী। যে বিভাজন ও শাসন (divide and rule) নীতি ভারতে শুরু করেছিল বৃটিশরা - তা তারা বড় আকারে সারা আফ্রিকায় প্রয়োগ করা শুরু করল।

ইউরোপীয়দের দাবী ছিল তারা অসভ্য জাতিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে কিন্তু তাদের নিজেদের পদ্ধতি ছিল বর্বর। ১৮৯৮ সালে সুদানের ওমদুরমানে লর্ড কিচেনার এর নেতৃত্বে বৃটিশরা সুদান জয় করার সময় মেশিন গান দিয়ে দশ হাজার সুদানী সৈন্যকে হত্যা করেছিল। বৃটিশ পক্ষে মারা গিয়েছিল মাত্র ৪৮ জন। হাজার হাজার সুদানী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আহত অবস্থায় পড়েছিল, বৃটিশ সৈন্যরা তাদের কোন সাহায্য করেনি। লর্ড কিচেনার সুদানীদের নেতা মাহদীর মাথার খুলি দিয়ে কলমদানী বানিয়েছিলেন।[৭] একই ধরনের বর্বরতা দেখিয়েছিল লর্ড লুগার্ড নাইজেরিয়াতে। সেখানে সাতিরু নামে একটি এলাকায় বিদ্রোহ দমন করতে তিনি দুই হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করেছিলেন। তার পক্ষে একজনও নিহত হয়নি। সব বন্দীদের হত্যা করে তাদের মাথা বর্শার আগায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।[৮] বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড আফ্রিকার একটা বিরাট এলাকা কঙ্গো-জয় করে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল। একটি এলাকায় তার সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রাম লুট করে বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল। এলাকার সমস্ত মানুষকে হত্যা করে তাদের হাত কেটে নিয়ে গিয়েছিল প্রমাণ করার জন্য যে তারা গুলি নষ্ট করেনি।[৯] অন্যান্য দেশ জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তার করার এই কর্মকান্ড ছিল সম্পূর্ণ লাভের জন্য। রাজা লিওপোল্ড লন্ডনে বেলজিয়ান রাষ্ট্রদূতের কাছে লিখেছিলেন, "আমরা আফ্রিকার মত একটা লোভনীয় কেকের একটা অংশ নেওয়ার কোন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনা"।

পৃথিবীকে এভাবে ভাগ করে দখল করে নেওয়ার প্রয়োজন বোঝা যাবে তখনকার ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানলে। ১৮৭০ ও ১৮৮০ এর দশকে পুঁজিবাদী দেশগুলো, বিশেষত: বৃটেনে চলছিল অর্থনৈতিক মন্দা। বেচা কেনা কমে গেছিল, দ্রব্য মূল্যও কম ছিল। সেই সঙ্গে কম ছিল মুনাফা। দেশের বাইরে টাকা খাটানর কোন বিকল্প ছিল না। পুঁজিবাদীরা তাই টাকা খাটানর জন্য ও লাভের জন্য দেশ দখল করে সাম্রাজ্য বাড়ান শুরু করল। বিদেশী স্টকে (stock) লগ্নি করা টাকা ১৮৮৩ সালে সাড়ে নয় কোটি থেকে বেড়ে ১৮৮৯ সালে হল ৩৯.৩ কোটি পাউন্ড। অল্প দিনের মধ্যেই এটা বৃটেনের মোট জাতীয় আয়ের (GDP) আট শতাংশ এবং সঞ্চয়ের অর্ধেক হল। টাকাটা লগ্নী করা হল স্টকে (stock)। এই স্টক সমূহ বিদেশে রেলপথ, সেতু, বন্দর ইত্যাদি তৈরীতে অথবা সরকারী খাতে টাকা খাটিয়ে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিত। এই সুদের হার ছিল বৃটেনে যে হারে এই টাকা থেকে আয় করা সম্ভব হত, তার চাইতে বেশী। এছাড়াও এই টাকা খাটানর ফলে বৃটিশ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজার বাড়ত। যেমন বিদেশে রেলপথ, সেতু ইত্যাদি তৈরীর জন্য ইস্পাতের প্রয়োজন হত, এইভাবে বৃটিশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসারের একটি নতুন সুযোগের সৃষ্টি করেছিল। যে সমস্ত দেশে বৃটিশ পুঁজি বিনিয়োগ করা হল তারা যাতে টাকা ঠিক মত দেয় সেজন্য সেসব দেশে অস্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হল। এইভাবে উপনিবেশের প্রয়োজন হল।

১৮৭৬ সালে মিশর তার দেনা পরিশোধে অক্ষম হয়। বৃটেন ও ফ্রান্স যুক্তভাবে মিশরের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে নেয়। ১৮৮০ এর দশকের প্রথম দিকে বৃটেন সামরিক বাহিনী দ্বারা মিশরকে "আশ্রিত রাজ্যে" পরিণত করে। বাস্তবে মিশর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয় এবং এতে সুয়েজ খাল থেকে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হল ও ভারতে বৃটেনের আরও বড় বিনিয়োগ এর জন্য যোগাযোগের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হল। একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সোনা ও হীরার খনি আবিষ্কার হওয়ার পর ডাচ ভাষাভাষী বুয়র (buer) দের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেখানে বৃটিশ আধিপত্য স্থাপন করে।

উপনিবেশসমূহ যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর নিরাপদ বিনিয়োগের স্থান ছিল তাই নয়, এগুলো তাদের সামরিক ঘাঁটি ছিল যার দ্বারা তারা আরও দূরবর্তী উপনিবেশ এবং সেখানে যাতায়াতের পথ রক্ষায় সাহায্য করত। যেমন মাল্টা, সাইপ্রাস, মিশর, দক্ষিণ ইয়েমেন যে শুধু ব্যবসা ও মুনাফার ক্ষেত্র ছিল তাই নয়, এগুলো বৃটেন থেকে ভারতে যাবার পথ সুরক্ষা করত। ভারত ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের "মুকুটের রত্ন", উপনিবেশ ছাড়াও ভারত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার টিন ও রাবার বাণিজ্য,চীনের বাজার, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড যাবার পথে। এইভাবে সারা পৃথিবীতে মালার মত উপনিবেশগুলো একে অপরের রক্ষার কাজে ও ব্যবসার কাজে বৃটেন ব্যবহার করত।

বৃটেনের মত ফ্রান্সও বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল। ইন্দোনেশিয়া ছিল হল্যান্ডের দখলে। বেলজিয়াম আফ্রিকার একটা বিরাট অংশ দখল করেছিল। রাশিয়ার জার তার দেশের পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত আর দক্ষিণে প্রায় ভারতের সীমানা পর্যন্ত বিরাট এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত।

ইউরোপের সবচাইতে দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকা শিল্প প্রধান দেশ জার্মানীর ছিল না কোন সাম্রাজ্য। জার্মানীর ভারী শিল্প গুলি সংগঠিত হয়েছিল একটি বিশেষ ধরনে-যা trust নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে তৈরী শেষ হওয়া পর্যন্ত একটি পণ্য উৎপাদনে যত ধরনের কোম্পানী কাজ করে তারা একযোগে কাজ করত। তারা রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করত এবং আশা করত রাষ্ট্র আমদানী শুল্ক আরোপ করে বিদেশী পণ্য সীমিত করে তাদের পণ্যের বাজার দেশে নিশ্চিত করবে। বৃটেনের কিছু পুঁজিবাদীদের রাষ্ট্র সম্পর্কে যে অবিশ্বাস ছিল, তা জার্মানীতে ছিল না। জার্মানীর পুঁজিবাদীরা এটাও আশা করত যে রাষ্ট্র তাদের বিদেশের বাজার অধিকার করতেও সাহায্য করবে।

চীনে জার্মানী চুক্তি করে একটি বন্দর দখলে নিল। আফ্রিকাতে তারা টাঙ্গানিকা, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি ও দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা জয় করল। মরক্কোর দখল নিয়ে জার্মানী বিবাদে জড়িয়ে পড়ল ফ্রান্স ও স্পেনের সঙ্গে। কিন্তু পৃথিবীর যে অঞ্চলে জার্মানী উপনিবেশ ও বাজারের সন্ধানে নামল, তারা দেখল অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আগেই সেখানে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী এই শক্তিগুলির নেতারা জানতেন যে সাম্রাজ্য দখল করা ও নিয়ন্ত্রণ রাখা নির্ভর করবে সামরিক শক্তির উপর। জার্মানী তাই বৃটেনের নৌশক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সামর্থ্য তৈরী করার জন্য যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ শুরু করল। বৃটেনও তার নৌজাহাজের উন্নয়ন শুরু করল। ফ্রান্স তার অধিবাসীদের বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে চাকুরীর মেয়াদ দুই বৎসর থেকে বাড়িয়ে তিন বৎসর করে সৈন্যসংখ্যা বাড়াল। রাশিয়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমরাস্ত্র কারখানা চালু করল আর রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন শুরু করল। এইভাবে সাম্রাজ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির প্রয়োজনে সমর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। কাজেই আপাত দৃষ্টিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুর কালকে প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার সময় বলে মনে হয়েছিল - যা বার্নষ্টেইন ও তার সহযোগী সমাজতন্ত্রীদের প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এই স্থিতিশীলতা সম্ভব হয়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তার ও তার ফলে মুনাফার বৃদ্ধির কারণে। এরপর সাম্রাজ্য বিস্তার এর স্থানও কমে আসল। এক সাম্রাজ্য অপর এক সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতের উপক্রম হল - সমর প্রস্তুতি শুরু হল।

শ্রেণী সংগ্রাম

এই সময় কালে শ্রমজীবীদের সংগ্রাম থেমে থাকে নাই। কোন কোন স্থানে এই সংগ্রাম নির্বাচনী রাজনীতির পরিসরে স্থান নিয়েছিল। বিশেষ করে জার্মানীতে। কিন্তু অধিকাংশ দেশে শ্রমিক আন্দোলন তীব্র আকারে দেখা গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৮০ এর দশকে শ্রম দিবস নিয়ে ধর্মঘট, রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট (১৮৯৪ সালের স্ট্রাইক), ১৯০২ সালের পেনসিলভানিয়ার খনি ধর্মঘট এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সশস্ত্র পুলিশ ও বেসরকারী নিরাপত্তাকর্মীদের দিয়ে মালিকেরা এই ধর্মঘটগুলো দমন করে। বৃটেনে ১৮৮৯ সালে ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট ও পূর্ব লন্ডনে মহিলা দিয়াশলাই শ্রমিকদের ধর্মঘট হয়, এদেশেও ধর্মঘট কঠোর হাতে দমন করা হয়। ফ্রান্সে ১৮৮৬ সালে ডেকাজুভিল খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটে সেনাবাহিনী মোতায়েন ও অনেক শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। উত্তর ফ্রান্সে বস্ত্র কারখানার শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষন করা হয়েছিল।[১০]

কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলি যে লাভ করেছিল এবং এতে তাদের শ্রমিকদের, বিশেষতঃ কারিগরী দিক থেকে দক্ষ শ্রমিকদের, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ফলে শ্রমিক আন্দোলন গুলো বিপ্লবের পথে না গিয়ে সমাজ সংস্কার সংগ্রামে সীমিত থেকেছে। তবে সেই সময়কার শ্রমিক আন্দোলন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বৃটেনে (বৃটেন ছিল তখন সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি) দক্ষ শ্রমিকরাও মজুরী কমানর বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেছে। অন্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় পুঁজিবাদ সেই সময়কালে স্থিতিশীলতার কারণ হল তারা বার বার অর্থনৈতিক সংকটের প্রবণতা কমাতে পেরেছিল। যার ফলে সমাজ সংস্কার সম্ভব মনে করা যায় এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বাড়তে থাকল ও শ্রমিকদের সংগঠনে পরিবর্তন আসল। খনি শিল্প, লোহা ও ইস্পাত শিল্পের পরিসর বাড়ল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিল্প যেমন রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির শিল্পও গড়ে উঠল। বৃটেনে শিল্প বিপ্লবের সময় ছিল বস্ত্র শিল্প শ্রমিকদের প্রাধান্য- এই যুগে ভারী শিল্পের শ্রমিক শুধু বৃটেন নয়, সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে প্রধান হয়ে উঠল। এই সময় শিল্পে assembly line এর মাধ্যমে mass production গড়ে উঠে। ১৯০১ সালে হেনরী ফোর্ড বিখ্যাত মডেল টি মটর গাড়ী সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রির জন্য বাজারজাত করেন। ১৯১৩ সালে ডেট্রয়েটে ফোর্ড কোম্পানীর বড় কারখানা চালু করেন, যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক assembly line পদ্ধতিতে মটর গাড়ী উৎপাদন শুরু করে। দুই দশকের মধ্যে দশটিরও বেশী দেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এই পদ্ধতিতে বড় বড় কারখানায় উৎপাদন করতে থাকে। তবে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই সময় অস্থিতিশীলতা শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উৎপাদনকারী দেশগুলোতে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমতে থাকে। তার ফলে শুরু হয় শ্রমিক আন্দোলন, যা এই দেশগুলিতে অনেকগুলো শ্রমিক ধর্মঘটের রূপ নেয়। এর আগের সময়কালের শ্রমিক আন্দোলন, যা মালিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দর কষাকষির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সংসদীয় পদ্ধতিতে কর্মকান্ড পরিচালনা করত, তার বদলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রমিক নেতা তৈরী হল। আমেরিকায় ১৯০৫ সালে, Industrial Workers of the World নামে সংগঠন তৈরী হল, যা প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠন The American Federation of Labour এর চাইতে আরও জঙ্গীভাবে খনি শ্রমিক, বস্ত্র শ্রমিক, বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিচালনা করেছিল। তারা মহিলা ও সংখ্যালঘু শ্রমিকদের সংগঠনের মধ্যে নিয়ে আসল। এদেরকে অতীতে শ্রমিক সংগঠন গুলো গুরুত্ব দেয় নাই। ফ্রান্সে Confederation General deTravail (CGT) একই রকম জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ না নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিপ্লবের নীতিতে বিশ্বাস করত। তাদের মতবাদ syndicalism নামে পরিচিতি পায়। স্পেন, আয়ারল্যান্ড এমনকি বৃটেনেও একইভাবে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়।

সংসদীয় রাজনীতির বিকল্প হিসেবে বিপ্লব বেছে নেওয়ার চিন্তা রাশিয়াতে ১৯০৫ সালের বিপ্লব ঘটায় আরও শক্তি পায়। পশ্চিম ইউরোপে পুরনো শাসকগোষ্ঠীসমূহকে ১৮১৪ - ১৫ সালে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বড় ভূমিকা রাখায় জার (Tsar) শাসিত রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবী শক্তি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি ছিল। ১৯০৫ সালে জারের শাসন প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। রাশিয়ার রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গে জারের সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলত এমন একটি সংগঠনের শ্রমিকরা জারের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায়। সৈন্যরা তাদের উপর গোলাবর্ষণ করে। এই ঘটনার পর শ্রমিকদের আন্দোলন জঙ্গী আকার ধারণ করে। বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক ধর্মঘট ডাকা হয়। একটি নতুন ধরনের সংগঠন গড়ে উঠে সেন্ট পিটার্সবার্গে। যার নেতৃত্ব দেন ২৬ বৎসর বয়স্ক লিও ট্রটস্কী। প্রতিটি কারখানা বা শিল্প থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে উঠা এই সংগঠনের নাম হয় "সোভিয়েত" (এই শব্দ council শব্দের রুশ প্রতিশব্দ)। এই সোভিয়েতই হয় আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। কৃষ্ণসাগরে অবস্থিত নৌবাহিনীতে "পটেমকিন" নামের যুদ্ধজাহাজের নাবিকদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মস্কো শহরে ডিসেম্বর মাসে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বলশেভিক নামে এক অংশ বিপ্লব ঘটানর চেষ্টা করে। এর নেতৃত্বে ছিলেন ভ্লাদিমির লেনিন।

শ্রমিকদের সংগঠন হিসেবে সোভিয়েত ছিল অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। ফরাসী বিপ্লব ছিল এলাকা ভিত্তিক সংগঠন, আর প্যারী কমিউন ছিল ছোট ছোট শিল্পের প্রতিনিধিভিত্তিক, সোভিয়েত ছিল বৃহৎ শিল্পের শ্রমিকদের প্রতিনিধিভিত্তিক।[১১] সেন্ট পিটার্সবার্গ ছিল এরকম বৃহৎ শিল্প কারখানার শহর, যদিও সামগ্রিকভাবে রাশিয়া ছিল পশ্চাদপদ। অধিকাংশ রাশিয়ান ছিল কৃষক, যাদের উৎপাদন পদ্ধতি ছিল মধ্যযুগীয়। জারতন্ত্রের ভিত্তি ছিল রুশ অভিজাত শ্রেণী, রাশিয়ান পুঁজি মালিকেরা নয়। তাই ১৯০৫ সালের বিপ্লবের লক্ষগুলো ছিল মূলতঃ পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে যাওয়ার প্রচেষ্টা। যা সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের বিপ্লব ও অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের বিপ্লবের মত ছিল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র তৈরী ও রেলপথ তৈরীর প্রয়োজনে রাশিয়ায় কয়েকটি স্থানে (যার মধ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গ ছিল অন্যতম) বৃহৎ শিল্প স্থাপন করেছিল। এতে শিল্প শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, যার সংখ্যা ছিল প্রায় বিশলক্ষ। এই শ্রমিকশ্রেণীর উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ রুশ বিপ্লবের চরিত্র বদলে দিয়েছিল। রুশ বিপ্লবের চরিত্র ও শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা নিয়ে যারা এতে অংশগ্রহণ করছিল তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। একদল মনে করত রাশিয়ার পুঁজিবাদী স্তরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার দরকার নাই -সরাসরি সমাজতন্ত্রে যাওয়া সম্ভব, যা হবে কৃষক ও গ্রাম ভিত্তিক। প্রয়োজন শুধু সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা ভেঙ্গে দেওয়া। এরা পরিচিত ছিল নারোদনিক (যার

অর্থ জনগণের বন্ধু) নামে এবং এরা সোশ্যাল রেভুলিউশনারী দল গঠন করেছিলেন। কিছু সংখ্যক মার্কসপন্থী মনে করতেন এই বিপ্লব পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে রূপ নেবে। তাদের এক অংশ (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের মেনশেভিক অংশ নামে পরিচিত) মনে করতেন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণই তখনকার লক্ষ্য। এই দলের বলশেভিক অংশও তখন পর্যন্ত এই মত পোষণ করত। কিন্তু লিও ট্রটস্কী মনে করলেন এই বিপ্লব আরও এগিয়ে যেতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের দাবীও তোলা সম্ভব।[১২] ১৯১০ সালের পরেও ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন ঘটতে থাকে। পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাম্রাজ্য বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরও তাদের নিজেদের দেশে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় একটি পুঁজিবাদী দেশ অন্যটির সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। এটা প্রথম দেখা গেল ১৯০৪ সালে। রাশিয়ার সাম্রাজ্য সীমানা পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত করার চেষ্টা করায় তারা জাপানের সাম্রাজ্য কোরিয়ার মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে বিস্তার এর চেষ্টার মুখোমুখি হয়। দুই পক্ষের যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মরক্কোতে প্রভাব বিস্তার নিয়ে দুইবার যুদ্ধের উপক্রম হয় ১৯০৬ ও ১৯১১ সালে। কিন্তু সবচাইতে বিস্ফোরণম্মুখ এলাকা ছিল বলকান উপদ্বীপ। এখানকার ছোট ছোট দেশগুলির সঙ্গে এক একটি পুঁজিবাদী দেশের সংযোগ ছিল। আর এই ছোট দেশগুলির মধ্যে সংঘাতও হত প্রায়ই। দুইবার চুক্তি হওয়ার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় নাই।

২০১৪ সালের জুলাই মাসে অষ্ট্রীয়ার আর্চ ডিউক সারায়েভো (Sarajevo) শহর পরিদর্শনে আসেন। এই শহরটি ছিল অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের অধীন বসনিয়া প্রদেশের রাজধানী। সেখানে একজন সার্বীয় (Serbian) আততায়ী তাকে হত্যা করে। সার্বীয়া চাইছিল অষ্ট্রীয়া থেকে বসনিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে সার্বীয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে। এই ঘটনার পর অষ্ট্রীয়া সার্বীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সার্বীয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক থাকায় রাশিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয়। অষ্ট্রীয়ার মিত্র জার্মানী তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স মনে করে জার্মানী রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারলে জার্মানী আরও শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হবে। তাই ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ইংল্যান্ডও জার্মানীর বিরূদ্ধে ফ্রান্সের সমর্থনে যুদ্ধে যোগ দেয়। অল্পদিনের মধ্যেই অনেকগুলো রাষ্ট্র দুই পক্ষের কোন এক পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। শুরুতে central powers (অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী ও জার্মানী) ছিল এক দিকে আর allied powers (বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া) ছিল অপরদিকে। কয়েক মাসের মধ্যে জাপান allied powers এর সঙ্গে যোগ দেয় আর তুরস্ক যোগ দেয় বিপরীত দিকে। ১৯১৫ সালে ইতালী ও ১৯১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র allied powers এ যোগ দেয়। যুদ্ধ শুরুর ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে ছোট মনে হতে পারে। কিন্তু এর পিছনে ছিল একটি বিস্ফোরণম্মুখ পরিবেশ। আর এই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তার এর দ্বন্দ্বের কারণে।[১৩] অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখন এলাকা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপ নেয়।

যুদ্ধের শুরুতে সব পক্ষই মনে করেছিল যুদ্ধ হবে স্বল্পস্থায়ী। জার্মানীর যুবরাজ অল্পদিনেই বিজয় আশা করেছিলেন। বৃটিশরাও মনে করেছিল তারা অল্প দিনেই জয়ী হবে। প্রথমদিকে সাধারণ মানুষ যুদ্ধের পক্ষে ছিল। বার্লিনে মানুষ রাজপথে যুদ্ধের পক্ষে শোভা যাত্রা বের করে। কফি হাউসগুলিতে দেশাত্মবোধক গান চলতে থাকে। ট্রেনগুলো উৎসাহী সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়। ফ্রান্সে যুদ্ধ করতে যাওয়া সৈন্যদের মধ্যে একই ধরনের উদ্দীপনা দেখা যায়।[১৪] রাশিয়াতেও মানুষ অল্প কিছুদিন আগের শ্রমিক ধর্মঘট ভুলে গিয়ে যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়ায়। তবে যুদ্ধের পক্ষে এই উৎসাহ শ্রমিকদের অনেক অংশের মধ্যে ছিল না। জার্মানীর শিল্প অঞ্চল Ruhr এ যুদ্ধের সমর্থনে প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা দেখা যায় নি। দেখা যায়নি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের কারখানাগুলিতে।[১৫] ইউরোপের শাসকশ্রেণী তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজ নিজ দেশের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষদের এর সমর্থনে নিয়ে আসার জন্য পত্রপত্রিকা, শোভাযাত্রার আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করে। এ সত্ত্বেও যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে লন্ডন, প্যারিস ও বার্লিনে যুদ্ধবিরোধী সমাবেশে হাজার হাজার মানুষ যোগ দেয়।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেখা গেল যুদ্ধ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এই ধারণা সঠিক নয়। প্রথম কয়েক মাসে জার্মান বাহিনী বেলজিয়াম ও উত্তর ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে প্যারিসের ৫০ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। পূর্ব দিকে রাশিয়া জার্মান

সীমান্ত পেরিয়ে অনেকটা ভেতরে চলে এসেছিল। দুই দিকেই এই বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। ফ্রান্স ও বৃটেনের সম্মিলিত বাহিনী Merne এর যুদ্ধে জার্মান বাহিনীকে ৩০ মাইল পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল। জার্মানরা সেখানে প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে তুলল। রাশিয়ানরা Tannenberg এর যুদ্ধে বিরাট ক্ষয় ক্ষতি হওয়ার পর পরাজিত হয়ে জার্মানীর সীমানার বাইরে বিতাড়িত হয়। এরপর থেকে এই যুদ্ধ পরিণত হয় শক্তি ক্ষয়ের যুদ্ধে। দুই পক্ষই চেষ্টা করতে থাকে অপর পক্ষের প্রতিরক্ষা ভেদ করে এগিয়ে যেতে কিন্তু উভয় পক্ষই ব্যর্থ হয় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ। অনেকেই মনে করেছিল যুদ্ধ চার মাসেই শেষ হবে-তা শেষ পর্যন্ত চার বৎসরের বেশী স্থায়ী হয়। যুদ্ধ পূর্বে ছড়িয়ে পড়ে তুরস্ক, উত্তর গ্রীস ও মেসোপটেমিয়ায়।

এর আগের যেকোন যুদ্ধের চাইতে এই যুদ্ধে বিস্তৃতি আরও অনেক বড় এলাকা জুড়ে ছিল। তাছাড়া গুণগতভাবেও এযুদ্ধ ছিল নতুন ধরনের। সমুদ্র, আকাশ ও স্থলে নূতন মারণাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করা হয়। সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজ দিয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের সরবরাহ বন্ধ করার জন্য বন্দর অবরোধ করে। সামরিক বিমান প্রথম ১৯১১ সালে ইতালীয়রা অটোম্যানদের বিরুদ্ধে উত্তর আফ্রিকায় প্রথম ব্যবহার করে। কিন্তু এই যুদ্ধে প্রথমবারের মত ব্যাপকভাবে যুদ্ধ বিমান ব্যবহার করা হয় এবং যুদ্ধ বিমানের আক্রমণ যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও এবারই প্রথম করা হয়। স্থলযুদ্ধে যন্ত্রযানের ব্যবহার অনেক বাড়ে। রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র পরিবহনের জন্য ঘোড়ার চাইতে মটরলরীর গুরুত্ব বাড়তে থাকে ও যুদ্ধ শেষের দিকে দুটোই সমান ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। অস্ত্রের মারণ ক্ষমতা ভীতিপ্রদভাবে বেড়ে গেল। ১৯১৪ সালে প্রত্যেক বাহিনীর রাইফেল, মেশিন গান ও ফিল্ড গান (কামান) ছিল, যাদের ধ্বংসাত্নক ক্ষমতা ও লক্ষবস্তুতে আঘাত করার নির্ভুলতা আগের অস্ত্রের চাইতে অনেক বেশী ছিল। এ কারণে হতাহতের সংখ্যাও অনেক বাড়ে। ১৯১৪ সালে একজন বৃটিশ সৈন্য যে রাইফেল ব্যবহার করত তা দিয়ে আধা মাইল দূর পর্যন্ত একজন মানুষকে গুলি করা যেত। যে মেশিন গান ব্যবহার করা হত তা মিনিটে ৬০০ রাউন্ড গুলি ছুঁড়তে পারত। ফিল্ড গানগুলি মিনিটে তিন থেকে চার বার ১০০০০ গজ দূরত্বে গোলা নিক্ষেপ করতে পারত। আরও বড় কামান ছয়-সাত মাইল দূরের লক্ষ্য বস্তুতে গোলা নিক্ষেপ করতে পারত। [১৬]

এই উন্নত মারণাস্ত্রের ব্যবহার যুদ্ধে অনেকদিন অচলাবস্থা থাকার একটি বড় কারণ। অনেক গোলা নিক্ষেপের পর যখন এক পক্ষ আক্রমণে এগিয়ে যেত, তখনও দেখা যেত প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ টিকে আছে এবং মেশিন গানের দ্বারা আক্রমণকারীদের থামিয়ে দিতে পারছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ১৯১৬ সালের পর জার্মানরা U-boat বা সাবমেরিন ব্যবহার করা শুরু করল। তারা বৃটেনের বন্দরগুলির চারদিকে জাহাজগুলোকে কোন রকম সাবধান না করেই সাবমেরিন আক্রমণ করে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে লাগল। জাহাজগুলো বৃটিশের না অন্য দেশের, যুদ্ধ জাহাজ না বাণিজ্যিক জাহাজ তা তারা দেখত না। উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে বৃটিশ বন্দরগুলো অবরোধ করা। আমেরিকার জাহাজ ডুবানর পর আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগ দেয়। রাশিয়ার বিপ্লব ঘটায় সেদিক থেকে জার্মানীর আক্রমণের ভয় ছিল না। কিন্তু ১৯১৮ সাল নাগাদ অন্য সব যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মানী হারতে থাকে। ১১ই নভেম্বর ১৯১৮ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়।

মানবজাতির ইতিহাসে এই যুদ্ধ ছিল সবচাইতে বেশী রক্তক্ষয়ী। প্রায় এককোটি সৈন্য মারা যায়। আরও দুই কোটি সৈন্য গুরুতর আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ১৮ লক্ষ ছিল জার্মানীর, ১৭ লক্ষ রাশিয়ার, ১৪ লক্ষ ফ্রান্সের, ১৩ লক্ষ অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর, সাড়ে সাত লক্ষ বৃটিশ ও ছয় লক্ষ ইতালীর। প্রত্যক্ষ যুদ্ধের কারণে অসামরিক মৃত্যুর সংখ্যাও ছিল প্রায় এক কোটি এবং আর দুই কোটি অসামরিক মানুষ দুর্ভিক্ষ ও রোগে মারা যায়।[১৭] Verdun এর যুদ্ধে পাঁচ মাসে ২০ লক্ষ মানুষ অংশ নেয় এর অর্ধেকই নিহত হয়। কিন্তু কোন পক্ষই এই যুদ্ধে এগোতে পারেনি। ১৯১৬ সালে Sonne এর যুদ্ধে চার মাসে দশ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এই যুদ্ধের প্রথম দিনেই বৃটেনের ১০ হাজার মানুষ মারা যায়।

যুদ্ধের ফলে সমাজে সামগ্রিক কর্মকান্ড আমূল বদলে গিয়েছিল। ১৯১৫-১৯১৬ সাল নাগাদ দুই পক্ষই উপলব্ধি করে যে তারা একটি মরনপণ যুদ্ধে জড়িত হয়েছে। জনমানুষের কথা না ভেবে তারা তখন সমস্ত জাতীয় সম্পদ যুদ্ধের কাজে লাগানর ব্যবস্থা করল। ভোগ্যপণ্যের বদলে শিল্প-কারখানা অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর জন্য বদলে ফেলা হল। এজন্য শ্রমিকদের এক ধরনের কাজ ও দক্ষতা থেকে অন্য ধরনের কাজ ও দক্ষতা অর্জন করতে হল। বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষকদের সৈন্য হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হলে তাদের পরিবর্তে কাজ করার মানুষ সব সময় পাওয়া যেত না। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন কমে গেল। জার্মানীর শ্রমিকেরা গড়ে এই সময় ১৩১৩ ক্যালরির সমান খাবার পেত, যা জীবনধারনের জন্য যা প্রয়োজন

তার চাইতে এক-তৃতীয়াংশ কম। অপুষ্টিতে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ মারা যায়।[১৮] বড় দেশগুলির শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক মানুষকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এদের জায়গা পূরণ করল মহিলারা। অতীতে মহিলারা কখনই এত সংখ্যায় শিল্পকারখানায় কাজ করে নাই। বৃটেনে শুধু গোলাবারুদ তৈরীর কারখানাগুলোতে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে হল ৮ লাখ। জার্মানীতে বড় কারখানাগুলোতে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে হল ২০ লাখ। মহিলাদের এতে কাজ দ্বিগুণ হয়ে গেল। কল কারখানায় কাজের সঙ্গে সঙ্গে ঘর বাড়ীর দায়িত্ব পালন ও ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করা। কিন্তু মহিলারা এর ফলে পুরুষদের সঙ্গে নিজেদের সমান ভাবাও শুরু করলেন। যুদ্ধে জড়িত প্রায় সব দেশই টাকা ধার নিয়ে ও টাকা ছাপিয়ে খরচ চালানর ব্যবস্থা করল। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল ও দ্রব্যমূল্য বাড়ল। যুদ্ধ শেষে ১৯১৪ সালের তুলনায় আমেরিকায় জিনিস পত্রের দাম বাড়ল আড়াই গুণ, বৃটেনে তিন গুণ, ফ্রান্সে সাড়ে পাঁচ গুণ এবং জার্মানীতে ১৫ গুণ। এই অসমান দাম বাড়ার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও সমস্যা হল। যুদ্ধের ফলে ঘরবাড়ী, ক্ষেত-খামার, খনি, কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হল। বেশী ক্ষতি হল উত্তর ফ্রান্স, উত্তর ইতালী, পূর্ব ইউরোপ ও বেলজিয়ামে। সমুদ্র পরিবহনের খুব ক্ষতি হল। এর বড় কারণ ছিল সাবমেরিন যুদ্ধের ফলে অনেক জাহাজ ডুবে গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হল। যুদ্ধের আগে বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স ও আমেরিকা পৃথিবীর সবচাইতে বড় শিল্প প্রধান দেশ হিসেবে একে অপরের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী পণ্য লেন দেন করত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর সঙ্গে আমেরিকা ছাড়া অন্য দেশগুলির বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। আমেরিকা বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। বৃটেন জার্মান বন্দর গুলো অবরোধ করে শুধু জার্মানীর জাহাজই নয়, অন্যান্য দেশের জাহাজও আসা যাওয়া বন্ধ করে দিল। জার্মানরা সম্মুখ নৌ যুদ্ধে টিকতে না পেরে সাবমেরিন দিয়ে জাহাজ ডোবান শুরু করল যাতে বৃটেনে পণ্য পৌঁছাতে না পারে। যুদ্ধের ফলে ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের পণ্যের বাজার হারাল। জার্মানী প্রায় তার সমস্ত বাজার হারাল। এটা তার পরাজয়ের একটা কারণ। জার্মানীর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা দ্বারা তারা অনেক বিদেশী পণ্যের বিকল্প তৈরী করেছিল। এমনকি বৃটেনের মত একটি নৌ শক্তিও অনেক বাণিজ্য কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হল। ১৯১৮ সাল নাগাদ বৃটেনের রপ্তানী ১৯১৪ সালের তুলনায় অর্ধেক কমে গেল। ইউরোপের দেশগুলো অনেক জিনিস - যা তারা আগে অন্য ইউরোপীয় দেশের কাছ থেকে কিনতে পারত - ইউরোপের বাইরের দেশ থেকে কিনতে বাধ্য হল। আমেরিকা অনেক ইউরোপীয় বড় দেশে পণ্য সরবরাহকারী হিসেবে আবির্ভূত হল। জাপানও ইউরোপের বাজারে একটা বড় স্থান করে নিল।

বিদেশে পুঁজিলগ্নিও ইউরোপীয় দেশ গুলোর আয়ের একটা বড় উৎস ছিল। বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর অনেক পুঁজি বিদেশে বিনিয়োগ করা ছিল। বৃটেন যত জিনিস রপ্তানী করত তার চাইতে অনেক বেশী আমদানী করত। এই ঘাটতি পূরণ করা হত বিদেশে লগ্নি করা পুঁজির আয় হতে। যুদ্ধের ফলে কোন কোন দেশ এই পুঁজি যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর জন্য খরচ করল। কিছু পুঁজির দাম কমে গেল মুদ্রাস্ফীতির জন্য। আর কারও কারও পুঁজি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। জার্মানীর বিদেশে লগ্নি করা পুঁজি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। ফ্রান্স, রাশিয়ায় যে বিনিয়োগ করেছিল, রুশ বিপ্লবের পর সেটা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।যুদ্ধ শেষে বৃটেনের পুঁজির প্রায় ১৫ শতাংশ, ফ্রান্সের প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেল আর জার্মানীর বিনিয়োগ করা পুঁজির সবটাই চলে গেল। আমেরিকা যুদ্ধের আগে ছিল অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের কাছে দেনাগ্রস্ত- যুদ্ধের সময় পণ্য বিক্রি করে ও অন্যদের বিনিয়োগ কিনে নিয়ে হয়ে গেল ঋণদাতা দেশ।

যুদ্ধরত সবগুলো দেশই অর্থনীতির একটি বড় অংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসল। এসব দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও সমরনায়কেরা অনুধাবন করল,যুদ্ধে সফলতার জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে একচেটিয়া পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। যুদ্ধশেষে দেখা গেল বৃটেনের আমদানীর ৯০ শতাংশ, খাদ্য সরবরাহের ৮০ শতাংশ ও প্রায় সব পণ্যের মূল্য সরকার নিয়ন্ত্রণ করে।[১৯] জার্মানীতে যুদ্ধের শেষের দিকে জেনারেল হিন্ডেনবার্গ ও লুন্ডেনডর্ফ একচেটিয়া শিল্পপতিদের সঙ্গে মিলে অর্থনীতির পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করত।[২০] বাজার অর্থনীতি বলতে কিছু ছিল না যুদ্ধরত দেশগুলিতে।

প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব প্রায় সবদেশেই সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছিল। যদিও জীবন যাত্রার মান ক্রমেই কমে আসছিল। জার্মানীতে ১৯১৭ সাল নাগাদ অসামরিক কারখানাগুলির শ্রমিকদের আয় আগের তুলনায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল।[২১] তারপরও শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিল। যারা এটা মানতে চাইত না-তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত, বৃটেনে তাদের দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হত আর জার্মানীতে

তাদের ধরে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু যতই শ্রমিকদের আয় কমতে থাকল, কাজের সময় বাড়তে থাকল, কর্মস্থল আরও বিপদজনক হয়ে উঠতে থাকল ততই শ্রমিকদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে থাকল। মহিলা শ্রমিকরাও এই প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯১৬-১৭ সালে জার্মানীর বিভিন্ন শহরে খাদ্য স্বল্পতার বিরুদ্ধে শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছিল। বৃটেনের গ্লাসগোতে ১৯১৫ সালে বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে মহিলা শ্রমিকদের নেতৃত্বে মাসাধিককাল ব্যাপী তীব্র ও সফল আন্দোলন হয়।[২২] দক্ষ শ্রমিকদের যুদ্ধে পাঠানো হত না। কারণ তারা অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরিতে ছিল অপরিহার্য। সংখ্যায় কম হলেও তারা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করলেও তাদের নেতাদের (shop stewards)মধ্যে যোগাযোগ ছিল। ধীরে ধীরে সাধারণ শ্রমিক ও দক্ষ শ্রমিকদের প্রতিবাদ সংযুক্ত হতে শুরু করল এবং যুদ্ধের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল। এই প্রতিবাদের নেতৃত্বে অনেক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রীরা ছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে যারা যাচ্ছিল তারা যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করছিল, যার জন্য তারা তৈরী ছিল না। প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি থাকা, মৃত ও আহতদের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া, দৈনন্দিন জীবনে জীবনযাত্রার কঠিন অবস্থা (যেমন, দূষিত পানি ও খাবার, নোংরা বাসস্থান) এগুলোর কারণে যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের মোহ কাটতে লাগল। বিপরীতে তারা দেখল উচ্চপদস্থ অফিসারদের ভাল থাকার জায়গা, ভাল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা।

বড় সেনা বিদ্রোহ প্রথমে তুরস্কে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে হল। একটি যুদ্ধে আড়াই লক্ষ সৈন্য মারা যাওয়ার পর ৬৮টি ডিভিশন (ফরাসী সেনাবাহিনীর প্রায় অর্ধেক) যুদ্ধে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। কোন কোন স্থানে সৈন্যরা লাল পতাকা তুলে বিপ্লবের গান International গাইল। বিদ্রোহ দমন করার জন্য ৪৯ জন সৈন্যকে হত্যা করা হয়। ১৯১৭ সালে ইতালীতে ৫০০০০ সৈন্য সেনা বিদ্রোহ করে। বৃটেনের প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) সৈন্য বুলনের (Boulogne)কাছে বিদ্রোহ করে। দাবী মেটানোর আশ্বাস দিয়ে বিদ্রোহ থামানোর পর বিদ্রোহের নেতাদের মেরে ফেলা হয়।[২৩]

যুদ্ধ করার জন্য লক্ষ লক্ষ কৃষককে গ্রাম থেকে নিয়ে এসে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। জার্মানী, ইতালী, রাশিয়া, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী এসব দেশে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে মানুষদের ধরে আনা হয়। সেনাবাহিনীতে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার মুখোমুখি হয়, যা তাদের গ্রামের জীবনে কোনদিনই তারা পেত না। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ভাষাভাষি, বিভিন্ন জাতীয়তার মানুষ, ধর্মীয় চিন্তা, গণতন্ত্র এমনকি সমাজতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এমন বিভিন্ন মতের মানুষদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধের জীবন কাটাতে হত।

উত্তাল ইউরোপ

ব্রেস্ট লিটোভস্ক এ কঠোর শর্ত আরোপ করে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার পর জার্মানীর উপর চাপ কিছুটা কমল। কিন্তু তা ছিল অল্প সময়ের জন্য। ১৯১৮ সালের মার্চে জার্মানী আক্রমণ চালিয়ে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে আরও কিছু এলাকায় অগ্রসর হতে পারল। কিন্তু ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে আরেকটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর জার্মানী পিছু হটতে বাধ্য হলো। জার্মানীর জনশক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসছিল। এ দিকে মিত্রশক্তির সঙ্গে আমেরিকা যোগ দেওয়ায় সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ অনেক বাড়ল। জার্মান ক্ষমতাসীনরা বুঝতে পারল তাদের শান্তিচুক্তি করার বিকল্প নাই। জার্মানীর রাজা কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম একটি নতুন সরকার নিয়োগ দেন। কিন্তু তাতে যুদ্ধের ব্যাপারে মিত্রশক্তির মনোভাব নমনীয় হয়নি। মিত্রশক্তি ফ্রান্স ও বেলজিয়াম থেকে জার্মান বাহিনীকে হঠিয়ে দিতে থাকল। বলকান উপদ্বীপেও মিত্রশক্তি অষ্ট্রীয়ার বাহিনীকে তাড়িয়ে দিল। জার্মান সমরনায়করা বৃটেনে নৌবাহিনীর আক্রমণ চালানর সিদ্ধান্ত নিলেও নৌসেনাদের বিদ্রোহের জন্য তা ঘটে নাই। কিয়েল শহরে নৌসেনারা ডক শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে শহরে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে একটি সেনা কাউন্সিল গঠনের ঘোষণা দিল। বিদ্রোহ এরপর ব্রেমেন, হামবুর্গ, হ্যানোভার, কলোন, ড্রেসডেন, লিপজিগ শহরে ছড়িয়ে পড়ল। ৯ই নভেম্বর বার্লিনে হাজার হাজার সৈনিক ও শ্রমিক শহরে শোভাযাত্রা করে জার্মানীকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করল। তারা সদ্য কারামুক্ত বিপ্লবী কার্ল লিবনেকট (Karl Liebknecht) কে নেতা হিসাবে মেনে নিল। তবে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের একজন নেতা (যে যুদ্ধ চলাকালীন একজন মন্ত্রী ছিল) Scheidemann ও নিজেকে সরকার প্রধান বলে ঘোষণা করল। কাইজার উইলহেম (রাজা) পালিয়ে হল্যান্ড চলে গেলেন। সৈন্য ও শ্রমিকদের ১৫০০ প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি সংসদের কাছে অনুমোদনের জন্য সোশ্যাল ডেমক্র্যাট দলের দুই অংশ মিলে একটি সরকারের প্রস্তাব পেশ করল। জার্মানী ও জার্মানী অধিকৃত বেলজিয়ামে সৈনিক- শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের কাউন্সিল এই সময় রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল।

উত্তর সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিরাট এলাকায় যুদ্ধের শেষ সময়ে এই শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কাউন্সিল (বা সোভিয়েত) বিপ্লবের প্রতিভূ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিল। কিন্তু শ্রমিক সৈনিকদের প্রতিনিধিরা শাসনক্ষমতা এমন সব লোকের হাতে তুলে দিল যারা বিদ্যমান শাসন কাঠামো বজায় রাখতে ছিল বদ্ধপরিকর। নতুন প্রধানমন্ত্রী এবার্ট (Ebert) দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সামরিক বাহিনীর কর্ণধারদের সঙ্গে শ্রমিক সৈনিকদের মোকাবিলা করার জন্য আলোচনা শুরু করেছিলেন। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের নেতারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংস্কার এর পক্ষপাতী ছিলেন। তারা যুদ্ধের শুরু থেকেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমর্থন করে আসছিলেন। তারাও পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য তৎপর হলেন।

বিপ্লব ও পরিবর্তনের নেতা ছিলেন কার্ল লিবনেকট ও রোজা লুক্সেমবার্গ । লিবনেকট এর বার্লিন এর শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে শক্ত ভিত্তি ছিল। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নেতারা সামরিক কমান্ডের সঙ্গে মিলে বার্লিনে একটি অভ্যুত্থান উস্কিয়ে দিল।[২৪] তারপর বাহির থেকে সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসে এই অভ্যুত্থান দমন করল। এই সংঘর্ষের দায় চাপিয়ে দিল লিবনেকট ও লাক্সেমবার্গের উপর, এবং তাদের দুজনকে হত্যা করল। এরপরও বিপ্লব দমন করা সহজ হয়নি। কোন কোন ঐতিহাসিক এর মতে জার্মান বিপ্লব তেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না এবং বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।[২৫] প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব ১৯২০ সালের আগে সম্পূর্ণ দমন করা যায়নি এবং ১৯২৩ সালে বিপ্লবের আরেকটি ঢেউ উঠেছিল।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসের বিপ্লবে জার্মানীর জনসংখ্যার একটা বড় অংশ রাজনীতিতে আগ্রহী হল। অতীতে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শুধু সচেতন শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনা হত। এখন তা সমস্ত কর্মজীবী মানুষ ও নিম্ম মধ্যবিত্তদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অনেক মানুষ আগে মধ্যপন্থী ক্যাথলিক দল ও অন্যান্য দলের সমর্থক ছিল। যুদ্ধের সময় তারা যুদ্ধবিরোধী শ্রমিকদের সংস্পর্শে এসে সমাজবদলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নেতারা বিপ্লবী স্লোগানের আড়ালে পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে এর মধ্যেই সংস্কারের কথা বলছিল। লিবনেকট ও লুক্সেমবার্গ উগ্রপন্থা অবলম্বন করে সমাজবদলের প্রচেষ্টা বিঘ্নিত করেছে-এটা ছিল তাদের বক্তব্য। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সম্মন্ধে মানুষের মোহ কাটতে লাগল। বার্লিনে এরপরও একাধিকবার শ্রমিক সৈনিকদের অভ্যুত্থান হয়। অন্যান্য শহরেও শ্রমিক ধর্মঘট হল। ১৯১৮ সালের শেষ দিক থেকে ক্ষমতাসীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলীয়) সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় Freikorps নামে ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনী গঠন করল। ১৯১৯ সালের প্রথম ভাগে এই বাহিনী জার্মানীতে শ্রমিকদের সংগঠনগুলোতে আক্রমণ চালান শুরু করল। অনেক জায়গায় এদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ হয়েছিল। বাভারিয়াতে এপ্রিল মাসে অল্পদিন স্থায়ী হলেও শ্রমিকদের সোভিয়েত রিপাবলিক স্থাপিত হয়েছিল।

জার্মানীতে এই উত্তাল সময় যখন চলছিল, তখন ইউরোপের অন্যান্য অনেক জায়গায় একই ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তখনকার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেনসু এর কাছে লিখেছিলেন, "সারা ইউরোপ বিপ্লব চেতনায় পূর্ণ- ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের ব্যাপক জনমানুষ বিদ্যমান, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্মন্ধে প্রশ্ন তুলেছে"।[২৬] হাঙ্গেরীতে বেলাকুনের নেতৃত্বে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও কমিউনিষ্ট দলের সমন্বয়ে একটি সোভিয়েত সরকার শাসন ক্ষমতা নেয়। তারা আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সংস্কার করে ও চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া সেই সময় হাঙ্গেরীর কিছু অংশ দখল করে নিচ্ছিল। তবে এই সরকার ভূমি সংস্কার না করায় কৃষকদের সমর্থন হারাল। তারা শ্রমিকদের সংগঠনের উপর নির্ভর না করে সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে ১৩৩ দিনের মাথায় তাদের অপসারণ করে এ্যাডমিরাল হোর্থি একনায়কের শাসন শুরু করে। অষ্ট্রীয়ায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা বিপ্লবের পক্ষে কথা বলছিল। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে আগ্রহী ছিল না। ভিয়েনার শ্রমিক অভ্যুত্থান দমন করতে তারা ভূমিকা রেখেছিল এবং পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখল।[২৭]

বিপ্লবের ঢেউ শুধু পরাজিত রাষ্ট্রগুলিতে সাড়া তুলছিল তা নয়। বিজিত দেশগুলিতেও এর প্রভাব পড়েছিল। তবে কম মাত্রায়। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যবাহিনীর যেসব অংশের সৈনিকদের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমান রাখা হয়েছিল তাদের মধ্যে বিদ্রোহ হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠান বৃটিশ, ফরাসী ও আমেরিকার সৈন্যরাও কয়েক জায়গায় যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়।[২৮] বৃটেনে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের ধর্মঘট হয় গ্লাসগো ও বেলফাস্টে। লিভারপুল ও লন্ডনে পুলিশ ধর্মঘট হয়। রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘটের জন্য নয়দিন রেলপথ বন্ধ থাকে। স্পেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

কিন্তু দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির জন্য ১৯১৭ সালে পর থেকে বড় আকারের শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিল। দক্ষিণ স্পেনে ১৯১৮-১৯২০ সালে পর্যন্ত সময়কে "তিনটি বলশেভিক বছর" বলা হয়। এই অঞ্চলে বৃহদাকার খামারগুলির কৃষিশ্রমিকেরা খামার দখল করে "বলশেভিক" ধরনের শাসন ব্যবস্থা কয়েকটি শহরে স্থাপন করল। এই বিদ্রোহ দমন করতে ২০০০০ সৈন্য পাঠাতে হয়েছিল।[২৯] উত্তর স্পেনেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। ভ্যালেন্সিয়ায় ধর্মঘটের সময় শ্রমিকেরা শহরের রাস্তার নাম পরিবর্তন করে "লেনিন", "সোভিয়েত" ইত্যাদি নাম দিল। কাটালোনিয়ায় ১৯১৯ সালের শুরুতে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল। সৈন্য পাঠিয়েও দমন করা যাচ্ছিল না। ভাড়াটে গুন্ডাদের দিয়ে মালিকপক্ষ শ্রমিক নেতাদের গুপ্তহত্যা করে ও নেতৃত্বে ভাঙ্গন ধরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ইউরোপব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল ১৯২০ সালে। অভ্যুত্থানের পরিণতি নির্ধারিত হয়েছিল জার্মানী ও ইতালির সংগ্রামে। জার্মানীতে আঞ্চলিক অভ্যুত্থানগুলিতে শ্রমিকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়-প্রায় বিশ হাজার শ্রমিক মারা যায় বলে হিসাব করা হয়। ১৩ই মার্চ সৈন্যরা বার্লিনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট সরকারকে উৎখাত করে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের শাসকশ্রেণী আর প্রয়োজনীয় মনে করছিল না। আর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের তৈরী ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনী তখন তাদের উপরই আক্রমণ শুরু করল।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা অতীতে জেনারেলদের সহযোগিতায় শাসন করেছিল। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলো যৌথভাবে সেনা শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। অনেক স্থানে তারা যে শুধু ধর্মঘটই করেছিল তাই নয়, তারা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল। অনেক শ্রমিকই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে ছিল। কাজেই তাদের অভিজ্ঞতা ছিল। জার্মানীর সবচাইতে শিল্প সমৃদ্ধ Ruhr অঞ্চলে হাজার হাজার শ্রমিক লালফৌজ গঠন করে সেনাবাহিনী হটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সহযোগিতায় এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

ইতালিতে ১৯১৯ ও ১৯২০ সাল "লাল বৎসর" অ্যাখ্যা পেয়েছে। শ্রমিক ধর্মঘট ব্যাপক আকারে দেখা দিল ও শ্রমিকেরা সংগঠিত হতে লাগল। তুরিনে ধাতব শিল্পের শ্রমিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে মিলানে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকরা কারখানা দখল করে নিল। কয়েকদিনের মধ্যে সারা ইতালীতে প্রায় সব ধাতব শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকেরা একইভাবে কারখানা দখল করল। সোয়া চার লক্ষ শ্রমিক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তারা কারখানায় অস্ত্র তৈরী করে মজুদ করা শুরু করল। অন্যান্য শিল্পের এক লক্ষ শ্রমিক এদের সঙ্গে যোগ দিল।[৩০] দক্ষিণ ইতালীতে যুদ্ধফেরত কৃষকেরা জমিদারদের জমি দখল করে ভাগ করে নেওয়া শুরু করল। সরকার এই সময় প্রায় অচল ছিল। কিন্তু শ্রমিক প্রতিনিধিদের বৈঠকে সামান্য ভোটের ব্যবধানে সিদ্ধান্ত হল বিপ্লব নয়, মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা। ধাতব শিল্পের শ্রমিকরা যারা ছিল এই অভ্যুত্থানের চালিকাশক্তি, তারা এই সিদ্ধান্তে হতাশ হল ও মনোবল হারিয়ে ফেলল। তারা বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামান্য বেতন বৃদ্ধি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই পেল না।

পশ্চিম ইউরোপে বিপ্লব

রাশিয়ার বলশেভিকরা মনে করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। অনেকে মনে করেন এই সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। তবে জার্মানীর সবচাইতে শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা Ruhr এ লাল বাহিনী গঠন ও ইতালীর শ্রমিকদের সমস্ত কলকারখানা দখল এই মতের বিপক্ষে যায়। ১৯২০ সালে পশ্চিম ইউরোপের একটা ব্যাপক এলাকার শ্রমিক শ্রেণী, যারা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছে এবং এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে জীবন যাপন করছিল-তারা সংগ্রাম শুরু করল। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাদের বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ হল এবং তারা সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ১৯২০ সালে পশ্চিম ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারত। রাশিয়ার মত এই বিপ্লব এই দেশগুলিতে কেন হল না তা নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ আছে। এর একটা কারণ রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে বাস্তব অবস্থার পার্থক্য। বেশীরভাগ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে পুঁজিবাদ রাশিয়ার চাইতে অনেক বেশী সময় ধরে গড়ে উঠেছিল-যার ফলে সমাজে বিভিন্ন কাঠামো গড়ে উঠেছিল এবং জনসাধারণকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিল। এছাড়া পশ্চিম ইউরোপের কৃষকদের কোন কোন দেশে জমি দেওয়া হয়েছিল (যেমন ফ্রান্স ও দক্ষিণ জার্মানী) এবং কোন কোন দেশে তাদের সংখ্যা এত কমে গিয়েছিল যে (যেমন বৃটেনে) তারা বিদ্যমান সমাজকাঠামো পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট

শক্তি ধারণ করত না। রাশিয়াতে একটা বিরাট কৃষক শ্রেণী ছিল যাদের জমি ছিল না। এছাড়া পশ্চিম ইউরোপের বেশীরভাগ দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র রাশিয়ার চাইতে বেশী শক্তিশালী ছিল যা যুদ্ধের ফলেও পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েনি।

তবে শুধুমাত্র এই উপাদানগুলি বিপ্লব ও তার পরিণতি বিশ্লেষণ এর জন্য যথেষ্ট মনে হয় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাজ পরিবর্তনের চেতনা ধারণ করে বিপ্লবী কর্মসূচীতে নেমে পড়েছিল। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে এটি যথেষ্ট ছিল না। বিপ্লবী আন্দোলনে সংগঠন দরকার হয় যে সংগঠন এমন মানুষদের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, যারা পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর এবং যারা পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া জানে। এ ধরনের সংগঠন ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় দেখা গেছে নিউ মডেল সামরিক বাহিনীর মধ্যে ও ফরাসী বিপ্লবের সময় রবসপিয়ার এর জাকোবিনদের মধ্যে। পশ্চিম ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে জার্মানী ও ইতালীতে ক্রান্তিকালে এমন সংগঠন ও নেতৃত্ব ছিল না।

ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ১৮৭১ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত, যখন সামাজিক পরিস্থিতি ছিল শান্ত। সাধারণ মানুষ সমাজে শ্রেণী বৈষম্য লক্ষ্য করে বঞ্চনা অনুভব করত, আর এর থেকেই সমাজ পরিবর্তনের মতবাদ অনেকেই সমর্থন করত। কিন্তু এই সমর্থন বেশির ভাগই সক্রিয় ছিল না। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেমন, শ্রমিক সংগঠন, সমাজসেবী কল্যাণ সংস্থা, সমবায়ী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলি বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী হলেও এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই কাজ করত। এই কর্মধারায় আন্দোলনের নেতৃত্ব অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শাসকশ্রেণীও তাদের সীমিত পরিসরের কাজকর্ম মেনে নিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের আগের বছরগুলিতে যে বড় আকারের শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল তাতে বিপ্লবী স্রোতধারা সৃষ্টি হল এবং এই বিদ্যমান ভারসাম্যকে নাড়া দিয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালে এই স্রোতধারা আরও বেগবান হয়েছিল। যুদ্ধের শেষে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনটি ধারা দেখা গেল।[৩১]

প্রথম ধারাটি হল প্রচলিত আপোষপন্থী ধারা যারা বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কার করে বৈষম্য নিরসনের পক্ষপাতী ছিল। এরা সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধের সমর্থক ছিল। দ্বিতীয় ধারায় ছিল সংখ্যায় কম সমাজ পরিবর্তনের পক্ষের মানুষ। যারা যুদ্ধকে পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার পরিণতি হিসাবে চিহ্নিত করেছিল এবং বিপ্লবকেই এর থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তৃতীয় ধারা ছিল বিরাট সংখ্যক মানুষ যারা মধ্যপন্থী নামে পরিচিত। জার্মানীতে এরা "স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এরা সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের বক্তব্য দিলেও কর্মকান্ডে ছিল সংস্কারপন্থী। যুদ্ধের সময় এই মধ্যপন্থী সমাজতন্ত্রীরা ব্যাপক আন্দোলনের বিরোধিতা করে, যুদ্ধরত পক্ষগুলির আলোচনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ করার পক্ষপাতি ছিল। যুদ্ধ শেষে এদের নেতৃত্ব সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য অর্জন করার কথা বললেও প্রথাগত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবী আদায়ের চেষ্টার পথ অনুসরণ করতেন। জার্মানীর স্বতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দল শ্রমিকদের আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে বারে বারেই আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে আন্দোলনের ধারা বদলে দেন, যা পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর পক্ষেই কাজ করেছিল। এ সত্ত্বেও স্বতন্ত্রদের দলে সুপরিচিত সংসদীয় নেতা থাকার জন্য আর তাদের বিপ্লবী বাগাড়ম্বরের কারণে একটা বড় অংশকে তাদের অনুসারী করতে পেরেছিল। ইতালির সোশ্যালিষ্ট দলের চরিত্রও ছিল একই রকমের। এই দলও ইতালির শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের যথাযথ নেতৃত্ব দেয়নি। পিয়েত্রো নেনি (Pietro Nenni) যিনি পরবর্তী ৬০ বৎসর যাবৎ সোশ্যালিষ্টদলের একজন অন্যতম নেতা ছিলেন, বলেন "যদিও দল তাত্ত্বিকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র অস্বীকার করত কিন্তু বাস্তবে দল ছিল সংসদীয় আন্দোলন ও নির্বাচনের জন্য"।[৩২]

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ডান ও মধ্যপন্থী অংশের এই দুর্বলতা গুলো দেখে দেশগুলিতে নতুন কমিউনিষ্ট দল গঠন করে তাদের সমন্বয়ের জন্য কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক তৈরী করার আহবান জানিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে প্রথম আন্তর্জাতিক এর সভা হয়। এই সভায় প্রতিনিধিদের উপস্থিতি কম হয়েছিল। ১৯২০ সালের জুলাই ও আগস্টে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে প্রতিনিধিদের উপস্থিতি যথেষ্ট ছিল বলে মনে করা হয়। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে যে জোয়ার সেই সময়ে এসেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির বড় বড় সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর এই আন্তর্জাতিকে প্রতিনিধি পাঠনোতে। আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর বিপ্লবী চরিত্র নিশ্চিত করার জন্য কর্মকান্ড ও নেতৃত্বের কিছু পরিবর্তন করার জন্য শর্ত দেওয়া হয়। এতে যে সব দল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। জার্মানীর স্বতন্ত্র সোশ্যাল

ডেমোক্র্যাট দল ও ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট দলের বড় অংশই এই নীতিমালা মেনে নিয়ে নতুন ধরনের কমিউনিষ্ট দল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ততদিনে জার্মানী ও ইতালির জনগণের সংগ্রামের পরিণতি নির্ধারিত হয়ে গেছিল।

১৯২৩ সালে ফ্রান্সের সৈন্যরা জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধ Ruhr অঞ্চল দখল করে। জার্মানীতে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি হয়। রক্ষণশীল দলীয় সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘট হয়। Thuringia ও Saxony নামে দুইটি রাজ্যে কমিউনিষ্টরা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে মিলে শ্রমিক সরকার গঠন করে আন্দোলন সমস্ত জার্মানীতে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এরপর তারা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা বাতিল করে যদিও শ্রমিকদের অধিকাংশ এর পক্ষে ছিল।[৩৩] যে সমস্ত সংস্কারপন্থী সমাজতন্ত্রীরা বিপ্লবের বিপক্ষে অবস্থান নিল তাদের ধারণা ছিল অভ্যুত্থান বিফল হবার পর পুঁজিবাদী গণতন্ত্র আবার ফিরে আসবে। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে তাদের ধারণা ভুল ছিল।

তথ্যসূত্র

১. Harman C. A People's History of the World. London, 2008 p 383
২. Harman C. p 387
৩. Bernstein E. Evolutionary Socialism. London,1909 p 159
৪. Harman C. p 392
৫. Luxemburg R. Social Reform or Social Revolution. Colombo, 1996
৬. Vandervort B. Wars of Imperial Conquest 1830-1914. London,1998 p 27
৭. Packenham T. The Scramble for Africa. London, 1992 p 546
৮. Packenham T. p 562
৯. Packenham T. p 600
১০. Derfler L. Paul Lafargue and the Flowering of French Revolution. Harvard,1998 p 48
১১. Harman C. p 401
১২. Harman C. p 402
১৩. Harman C. p 404-405
১৪. Serge V. Memoirs of a Revolutionary. London, 1963 p 47
১৫. Shlyapnikov A. On the Eve of 1917. London, 1982 p 18
১৬. Roberts JM. A Short History of the World. New York, 1993 p 431
১৭. Cameron R. A Concise Economic History of the World. New York, 1997 p 346
১৮. Blackbourne D. The Fortuna History of Germany. 1780- 1918. London,1977 p 475
১৯. Maclntyre D. The Great War,Courses and Consequences. Glasgow,1979 p 63
২০. Blackbourne D. p 488
২১. Harman C. p 409
২২. http://libcom.org/history/1915-the Glasgow–rent strike.accessed 08 march 2013
২৩. Allison W and Fairley J. The Monocled Mutineer. London, 1984 p 81-111
২৪. Harman C. p 432
২৫. Hobsbawm E. The Age of Extremes. London, 1994 p 68
২৬. Quoted in Carr EH. The Bolshevik Revolution-vol-3. Harmondsworth,1966 p 135
২৭. Harman C. p 435
২৮. Carr EH. p 134
২৯. Meaker EH. The Revolutionary Left in Spain 1914-1923. Stamford,1974 p 142
৩০. Spriano P. The Occupation of Factories, Italy1920. London,1975 p 21,60
৩১. Harman C. p 440
৩২. Spriano P. p 129
৩৩. Harman C. The Lost of Revolution: Germany 1918 to 1923. London, 1982 p 272

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর

যুদ্ধের পর গুরুত্বপূর্ণ শান্তি চুক্তিটি হয় প্যারিস এর শহরতলী ভার্সাই-এ। এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স Alsace-Lorraine অঞ্চল ফেরত পেল, এবং জার্মানীর কয়লা সমৃদ্ধ Saar অঞ্চল ১৫ বৎসর দখলে রাখার অধিকার পেল। নতুন সৃষ্ট রাষ্ট্র পোল্যান্ডকে পশ্চিম প্রুশিয়া ও সাইলেশিয়ার এক অংশ দেওয়া হল। আরও কিছু ক্ষুদ্র অংশ জার্মানীর হাত ছাড়া হল। এতে জার্মানী তার যুদ্ধপূর্ব এলাকার প্রায় ১৩% হারাল ও জনসংখ্যা কমল ১০% । খনিজ সম্পদের মধ্যে লৌহ আকরের তিন চতুর্থাংশ, কয়লার এক চতুর্থাংশ, প্রায় সম্পূর্ণ দস্তা এবং প্রায় ১৫ শতাংশ চাষযোগ্য জমি জার্মানী হারাল। যুদ্ধকালেই আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জার্মানীর যেসব উপনিবেশ ছিল তা মিত্রশক্তির সদস্য রাষ্ট্রগুলি (জাপান সহ) দখল করে নিয়েছিল। শান্তিচুক্তি এগুলোকে অনুমোদন দিল। এছাড়াও জার্মানীকে তার নৌবাহিনী ছেড়ে দিতে হল মিত্রশক্তির হাতে। আরও ছেড়ে দিতে হলো তার অসামরিক নৌবহরের প্রায় সবটাই, ৫০০০ রেল ইঞ্জিন, দেড় লক্ষ রেল বগি, ৫০০০ ট্রাক এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র।[১] মিত্রশক্তিকে রাইনল্যান্ড পনের বছর দখল করে রাখতে দেওয়ার অঙ্গীকার করতে হল জার্মানীকে। জার্মানীকে তার সৈন্যবাহিনীকেও সীমিত করে রাখার অঙ্গীকার করতে হল। জার্মানীর জন্য সবচাইতে অবমাননাকর ছিল চুক্তির একটি অংশ যেখানে জার্মানী ও তার মিত্রদের যুদ্ধের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী করা হলো। মিত্রশক্তি জার্মানীর কাছ থেকে যুদ্ধের জন্য যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করেছিল, তার যৌক্তিকতা দেখানর জন্য এই অনুচ্ছেদের দরকার ছিল।

কিন্তু ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে মিত্রশক্তির দেশগুলির মধ্যে বড় মতপার্থক্য ছিল। এই কারণে মিত্রশক্তির দেশগুলি চুক্তি সই করার সময়ে এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারে নাই। এজন্য একটা কমিশন (Reparation Commission)গঠন করে দেওয়া হয় এবং ১লা মে ১৯২১ এর মধ্যে সুপারিশ দিতে বলা হয়। এতে জন মেইনার্ড কেইনস (John Maynard Keynes) যিনি বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন তিনি পদত্যাগ করেন। তারপর তিনি একটি বিখ্যাত বই লিখেন "The Economic Consequence of Peace"। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এর শর্তগুলি বদলানো না হলে তা ইউরোপের জন্য আবার বিপর্যয় নিয়ে আসবে বলেন তিনি। পরবর্তী বছরগুলিতে তার ভবিষ্যৎ বাণী অনেকার্থে সঠিক প্রমাণিত হয়।

যুদ্ধের শেষে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী নামে দুটো নতুন দেশের সৃষ্টি হয়। এ দুটো এলাকা ছিল আগে এই নামে সাম্রাজ্যের ভিতরে অবস্থিত অংশের অনেক ছোট। চেকোশ্লোভাকিয়া এই সাম্রাজ্যের প্রদেশ নিয়ে তৈরী করা হয়। পোল্যান্ড সৃষ্টি করা হয় জার্মানী, অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়ার কিছু কিছু অংশ নিয়ে। সার্বিয়া অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ও মন্টেনিগ্রো সমন্বয়ে যুগোস্লাভিয়া নামে নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করল। ইতালী অষ্ট্রীয়ার কয়েকটি প্রদেশ পেল । অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপে ইস্তাম্বুলের আশেপাশের কিছু জায়গা ছাড়া তার সমস্ত এলাকা হারাল।

যুদ্ধের আগে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের একটা সুবিধা ছিল। এই সাম্রাজ্যের ভিতরে বাণিজ্য ছিল অবাধ। এই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে কয়েকটা দেশের সৃষ্টি হওয়ায় এই দেশগুলোর মধ্যে পণ্য আদান প্রদানে শুল্ক আরোপ করা হল। অবিশ্বাস এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ট্রেন ও মালগাড়ী এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে দিচ্ছিল না- বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া প্রত্যেকটা দেশই যতটা সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করছিল। দেশগুলো ছোট ছোট হওয়াতে এই চেষ্টা তাদের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন কঠিন করে তুলল।

নিজ নিজ জাতির অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টায় শুধু নতুন নতুন রাষ্ট্রগুলোই যুদ্ধের পর ব্যবস্থা নিয়েছিল তাই নয়, আগের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলোও সংরক্ষণমূলক অর্থনীতি চালু করে। রাশিয়ায় বিপ্লবের পরে তা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই দেশে রাষ্ট্রই হয় অন্যান্য দেশের পণ্যের ক্রেতা। রাষ্ট্রই নির্ধারণ করে দেশের জন্য কি পণ্য কেনা উচিত। অন্যান্য অনেক দেশ যারা যুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করত, তারাও বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করল। এর মধ্যে ছিল আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ, আমদানী পণ্যের পরিমাণ সীমিত করে দেওয়া এবং কোন কোন পণ্যের আমদানী পুরাপুরি বন্ধ করে দেওয়া। অন্যদিকে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য

রপ্তানী যোগ্য পণ্যে ভর্তুকী দেয়া হতে লাগল। গ্রেট বৃটেন ছিল যুদ্ধের আগে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বড় সমর্থক। যুদ্ধের সময় রাজস্ব বাড়ানো প্রয়োজন ও অন্যান্য কারণে বিদেশী পণ্যের বাণিজ্যের উপর গ্রেট বৃটেন কর আরোপ করেছিল। যুদ্ধের পর কর তো থাকলোই, অনেক ক্ষেত্রে তা বাড়ান হল। এটা প্রথম বৎসর গুলিতে সাময়িক বলা হলেও ১৯৩২ সালের পর তা স্থায়ী সংরক্ষণমূলক বাণিজ্য নীতি হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের আগেও আমদানীর উপর তুলনামূলকভাবে উচ্চ শুল্ক ছিল। যুদ্ধের পর তা এতটা বাড়ানো হল যা অতীতে কোন সময়ই ছিল না। ১৯২১ সালে নতুন আইন করে জার্মানীতে তৈরী dyestaff (রাসায়নিক রং) আমদানী বন্ধ করা হল। যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের আগে কোন dyestaff তৈরী হত না। যুদ্ধের পর জার্মানীর রং এর patent এর বা সত্ত্বাধিকার ছিনিয়ে নিয়ে dyestaff তৈরী শুরু করা হয়। আর এই বাজার প্রতিযোগিতামুক্ত রাখতে আমদানী বন্ধ করা হয়। ১৯২২ সালে একটি শুল্ক আইন (The Fordney-McCumber Tariff Act) আমদানী করা পণ্যের উপর গড়ে প্রায় ৩৮.৫ শতাংশ বাড়িয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার কৃষিপণ্য ও অন্যন্য পণ্যের বাজার ও মূল্য নিশ্চিত করা। পাঁচ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স মটরগাড়ীর উপর শুল্ক বাড়াল। জার্মানী ও ইতালি আমেরিকার গমের উপর শুল্ক বাড়াল।[২] ১৯৩০ সালে আবার শুল্ক বাড়ান হল (The Smoot Hawly Tariff Act)।[৩] পৃথিবীর অর্থনীতিতে যখন মন্দা শুরু হচ্ছিল, তখন আমেরিকা তার নাগরিকদের চাকুরী ও কৃষকদের খাদ্য রক্ষা করার জন্য এই আইন করে। এই আইনে সই না করার জন্য এক হাজার এর বেশি অর্থনীতিবিদ প্রেসিডেন্ট হুভার এর কাছে আবেদন করে। অল্প দিনের মধ্যেই অন্যান্য দেশ পাল্টা শুল্ক বৃদ্ধি করে। ১৯৩০ সালের মে মাসে আমেরিকার সঙ্গে সবচাইতে বেশী পণ্য আদান প্রদান কারী দেশ কানাডা প্রায় ১৬টি জিনিষের উপর শুল্ক বাড়ায়। ফ্রান্স ও বৃটেনও প্রতিবাদে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ায়। আমেরিকার রপ্তানী ১৯২৯ সালে ৫.৪ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ১৯৩৩ সালে ২.১ বিলিয়ন ডলার হয় (৬১% কম)। আমদানী ১৯২৯ সালে ৪.৪ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ১৯৩৩ সালে ১.৫ বিলিয়ন ডলার হয় (৬৬% কম) । ম্যাডসেন ১৭টি দেশের বাণিজ্যের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৩৩% কমে যায়।[৪] বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের দুই দশকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দুইগুণ বেড়ে ছিল। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশকের বেশীর ভাগ সময়েই এর পরিমাণ বিশ্বযুদ্ধের আগের পরিমাণের চেয়ে কম ছিল। বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যে এই সংরক্ষণ নীতির ফলে দেশগুলিতে উৎপাদন বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে ও মানুষের আয় বাড়বে-এটাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত ফল হল।[৫]

আর্থিক ও মুদ্রা ব্যবস্থার যে গোলযোগ যুদ্ধের ফলে দেখা দিল, এবং যে সমস্যা শান্তি চুক্তির ফলে আরও তীব্র হল-তাতে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ল। এর একটা অন্যতম কারণ ছিল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বা reparation। ক্ষতিপূরণের সঙ্গে জড়িত ছিল মিত্রশক্তির একটি দেশের সঙ্গে অপরটির আরোপিত দেনা এবং আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা। আমেরিকার সরকার এই উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্ক আছে, তা মানতে রাজী ছিল না। এতে বিপর্যয় বাড়ে।

১৯১৭ সাল পর্যন্ত মিত্রশক্তির যুদ্ধের খরচের বড় অংশটাই দেয় বৃটেন। ঐ সময় পর্যন্ত বৃটেন তার মিত্রদের প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়। বৃটেনের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা এই সময় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর আমেরিকা টাকা ধার দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। বৃটেন ধার দিয়েছিল সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার, যা বৃটেনের আমেরিকার কাছে ধার নেওয়া টাকার দ্বিগুণ। ফ্রান্স ধার দিয়েছিল আড়াই বিলিয়ন ডলার আর নিয়েছিল প্রায় সমপরিমাণ টাকা। ইউরোপে মিত্রশক্তির একটি দেশ অপর দেশকে যে টাকা ধার দিয়েছিল তাদের ধারণা ছিল যুদ্ধশেষ হলে তা বাতিল হয়ে যাবে। আমেরিকার কাছ থেকে নেওয়া ধারও বাতিল হবে-এটা তারা মনে করেছিল। এটা মনে করার আরও কারণ হল আমেরিকা অনেক পরে যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় তাদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় তাদের মানুষ ও অন্যান্য সম্পদ ও অনেক কম দিতে হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা এই টাকা ঋণ বলেই গণ্য করল যদিও যুদ্ধের পরে তারা সুদের হার কমাল ও পরিশোধের সময় বাড়িয়েছিল। কিন্তু ঋণের টাকা পুরোটাই শোধ দিতে হবে বলে তারা বলল।

যুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণ (reparation) এর সঙ্গে ঋণের সম্পর্ক প্রকাশ পেল। ফ্রান্স ও বৃটেন দাবী করল জার্মানী তাদের যে ক্ষতিপূরণ দিবে তা শুধু বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির জন্যই নয় (reparation proper), এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যত খরচ হয়েছে তাও দিতে হবে (indemnity)। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন জার্মানীর কাছে এই দাবী করেন নি- এবং অন্যদেরও এতটা দাবী না করার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু তিনি আমেরিকার ঋণ ফেরৎ দেওয়ার দাবী ছাড়লেন না। কিছুটা

আপোষ করে ইউরোপীয় মিত্র রাষ্ট্রগুলি জার্মানীর যতটা দেওয়ার ক্ষমতা আছে মনে করল, তাই ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করতে সিদ্ধান্ত নিল।[৬]

জার্মানীর কাছ থেকে শান্তিচুক্তি হওয়ার আগেই ক্ষতিপূরণ নেওয়া শুরু হয়ে ছিল। টাকা ও পণ্য (কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য, অন্যান্য) দুইভাবেই ক্ষতিপূরণ আদায় হচ্ছিল। ১৯২১ সালে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে জার্মানীকে Reparation Commission জানায় যে ক্ষতিপূরণ বাবদ তাকে ৩২ বিলিয়ন ডলার দিতে হবে। এটা ছিল জার্মানীর জাতীয় আয়ের দ্বিগুণ। আন্তর্জাতিক ও ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনীতি তখন এমন দুর্বল অবস্থায় ছিল যে, জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পেলেই কেবল বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে আমেরিকার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব ছিল। আবার জার্মানী যদি উৎপাদিত পণ্য রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারত তবেই ক্ষতিপূরণ দিতে সক্ষম হত। কিন্তু জার্মানীর উৎপাদনের দূর্বলতা ছাড়াও রপ্তানী বাণিজ্যের উপর বিভিন্ন নিষেধ আরোপ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯২২ সালে ক্ষতিপূরণের চাপে জার্মানীর মুদ্রামূল্য বিপদজনকভাবে কমে গেল। সেই বছরের শেষে জার্মানী ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হল। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সৈন্যরা ১৯২৩ সালের জানুয়ারীতে জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধ Ruhr অঞ্চল দখল করে নেয়। তারা জার্মানীর খনি ও রেল শ্রমিকদের জার্মানী থেকে বেলজিয়ামে কয়লা পাঠাতে বাধ্য করে। জার্মান সরকার Ruhr অঞ্চলের মালিক ও শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা ছাপল, এইভাবে শুরু হল মুদ্রাস্ফীতি। যুদ্ধের শুরুতে জার্মানীর মুদ্রা মার্ক এর মূল্য ছিল ৪.২ ডলার প্রতি। যুদ্ধের শেষে তা হয়েছিল ১৪ ডলার প্রতি। ১৯২২ সালে সেটা হয় ৪৯৩ আর ১৯২৩ সালে জানুয়ারীতে হয় ১৭৭৯২, এরপর অর্থনীতি এতই দ্রুত অবনতি হয় যে, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৩ শেষ রেকর্ড করার সময় ডলার প্রতি মার্ক হয় ৪,২০০,০০০,০০০,০০০। যে কাগজে মার্ক ছাপা হত সে কাগজের দামের চাইতেও এর দাম অনেক কম ছিল। এই সময় নতুন মার্ক চালু করা হয়। এক মার্কের মূল্য ছিল আগের এক লক্ষ কোটি মার্কের সমান।

মুদ্রাস্ফীতি জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাবেক অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রগুলিতেও (বুলগেরিয়া, গ্রীস, পোল্যান্ড) নিয়ন্ত্রণহীন মুদ্রাস্ফীতি হল। কেইনসএর ভবিষ্যৎবাণী অনেকটা সত্য প্রমাণ করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। ফ্রান্স ১৯২৩ সালের শেষদিকে Ruhr অঞ্চল থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করল। যদিও এর উদ্দেশ্য (জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা) সফল হল না। তাড়াহুড়া করে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করে সমঝোতা করা হলো। ক্ষতিপূরণের বাৎসরিক কিস্তি কমান হলো। আর জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে সাহায্য করার জন্য আমেরিকা ২০ কোটি ডলার ধার (Dawes loan) দিল। এর পর থেকে আমেরিকার বেসরকারী ব্যক্তি পুঁজি জার্মানীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পৌর সভা এগুলিকে ব্যাপকভাবে ধার দেওয়া শুরু করল। জার্মানী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা পেল। ১৯২৪ সালে জার্মানীর মুদ্রা স্বর্ণমানে (gold standard)ফিরে আসল।

বিপর্যয়কারী মুদ্রাস্ফীতি জার্মান সমাজে একটা বিরাট প্রভাব ফেলল। জনসংখ্যার বেশীরভাগ মানুষ, যেমন নিম্নবিত্ত ও নির্দিষ্ট বেতনে চাকুরী করা লোক ও পেনশনভোগীদের জীবনের সঞ্চয় অল্পসময়ের মধ্যে মূল্যহীন হয়ে পড়ল। তাদের জীবনযাত্রার মান কমে গেল। অলস কিছু ফাটকাবাজ (speculator) মানুষ রাতারাতি অনেক টাকার মালিক হল। এই পরিবর্তন বেশিরভাগ মানুষকে চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ সমূহের সমর্থক হওয়ার ক্ষেত্র তৈরী করল। এটা পরবর্তীতে নাৎসী দলের প্রতি তাদের সমর্থনের পটভূমি। ১৯২৮ সালের নির্বাচনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা জয়ী হল। হিটলারের নাৎসী দল পেল মাত্র শতকরা ২ ভাগ আর কমিউনিষ্ট দল পেল শতকরা ১০.৬ ভোট।

গ্রেট বৃটেনেও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের আগে বৃটেনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা ও যে সব শিল্প অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছিল সেগুলো ধরে রাখার চেষ্টার জন্য বিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি বাধা পাবে তা অবধারিত ছিল। যুদ্ধের সময় বৃটেন তার বিদেশের বাজার হারাল, বিদেশের বিনিয়োগ করা পুঁজিও অনেকটা হারাল, অনেক বাণিজ্যিক জাহাজ নষ্ট হল এবং অন্যান্য বৈদেশিক আয়ের সূত্রও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামালের জন্য বিদেশ থেকে আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা কমেনি। উপরন্তু ইউরোপে যুদ্ধে বিজয়ীদের প্রধান শক্তি হওয়ায় তার অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করতে হল। শিল্পকারখানা পুরোপুরি উৎপাদন করতে পারছিল না, আবার বেকার মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল। ১৯২০ এর দশকে বেকারত্বের হার বেশীরভাগ সময়ই ১০ শতাংশের বেশী ছিল। বেকারদের ভাতা দেওয়া হত, কিন্তু তা

জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। অর্থনীতিকে গতিশীল করার সরকারী প্রচেষ্টা ছিল অকার্যকর। সরকারী ব্যয় কমিয়ে ফেলা হল, তাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গঠন ব্যহত হল। রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল অপ্রতুল রইল। প্রধান যে পদক্ষেপ নেওয়া হলো, তাতে বিপর্যয় আরও বাড়ল।

১৯১৪ সালে যুদ্ধের শুরুতেই বৃটেন স্বর্ণমান (gold standard)থেকে বের হয়ে এসেছিল। কারণ যুদ্ধের খরচ যোগান দেওয়ার জন্য অর্থের ব্যবস্থা স্বর্ণমানে থেকে করা যেত না। বৃটেন যেহেতু তৎকালীন পৃথিবীর financial market এর কেন্দ্র ছিল, তাই যুদ্ধের পর স্বর্ণমানে ফিরে আসার জন্য চাপ ছিল। এজন্য প্রয়োজনীয় মজুদ স্বর্ণ (gold reserve) ১৯২৫ সাল নাগাদ জোগাড় হয়েছিল। তবে যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতির কারণে বৃটিশ মুদ্রার মান আমেরিকান ডলার এর তুলনায় কমে গিয়েছিল। আমেরিকান মুদ্রা যুদ্ধের সময়ও স্বর্ণমানএ ছিল। বৃটিশ মুদ্রা যুদ্ধের আগের স্বর্ণমানে ফিরে গেলে আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ যারা স্বর্ণমান ছেড়ে যায় নাই-তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৃটেন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হত। তৎকালীন বৃটিশ অর্থমন্ত্রী (Chancellor of Exchequer) উইনস্টন চার্চিল এরপরও বৃটিশ মুদ্রা যুদ্ধপূর্ব স্বর্ণমানে ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু বৃটিশ শিল্পজাত পণ্য অন্য দেশের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য পণ্যের দাম কমাতে, শ্রমিকদের মজুরী কমানরও সিদ্ধান্ত নিলেন। এর সামগ্রিক ফল হল শ্রমের ফসল শ্রমিকদের কাছে না গিয়ে পুঁজিপতিদের ঘরে উঠল।

কয়লাখনি শ্রমিকেরা এই মজুরী কমাতে বেশী বিক্ষুব্ধ হল। ১৯২৬ সালে ১লা মে তারা ধর্মঘট করল ও অন্যান্য শ্রমিক ইউনিয়নকেও তাদের সমর্থনে ধর্মঘট করতে রাজী করাল। সারা বৃটেনের শ্রমিক ইউনিয়ন সদস্যদের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ধর্মঘট করল। সরকার শক্ত অবস্থান নেওয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ায় ঝুঁকি দেখা দিল- শ্রমিকেরা পিছিয়ে আসল। আন্দোলনের নেতাকর্মীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেমে আসল আর একটার পর একটা শিল্প কারখানায় শ্রমিক সংগঠনগুলো ভেঙে দেওয়া হলো। কিন্তু এতে শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে যে তিক্ততা সৃষ্টি হল, তাতে সরকারের পক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে ঐক্যমতের সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল।

এরপরও ইউরোপ ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মুখ দেখেছিল। যুদ্ধের ফলে যা ধ্বংস হয়েছিল তা পুনর্গঠন করা হল, উৎপাদন বাড়ল। আমেরিকা ও প্রায় সব ইউরোপীয় দেশে আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুরু হল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ mass production পদ্ধতিতে নতুন নতুন ভোগ্যপণ্য পেলেন-এরকম একটা ধারণা হল শ্রমিক শ্রেণী সুফল পাবে। রাজনীতিকেরা বলা শুরু করলেন, সামাজিক সংঘাতের দিন শেষ। এমনকি সমাজতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক এডুয়ার্ড বার্নষ্টেইন বল্লেন, একচেটিয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা সরকারী মালিকানায় চলে আসবে।[৭] শ্রমিক আন্দোলনে পরাজয়ের পরও বৃটেনে শ্রমিক নেতারা সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রমিকদের উন্নতির জন্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও অনুরূপ ধারণা করলেন। ১৯২৫ সালে দুইজন নেতা জোসেফ ষ্ট্যালিন ও নিকোলাই বুখারিন বলেন পশ্চিমা দেশগুলিতে organized capitalism চলছে এতে এই দেশগুলিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে ও অর্থনৈতিক সংকটের সম্ভাবনা কমে যাবে। এটা দীর্ঘমেয়াদী বলে তারা মনে করলেন। এটা তাদের এক দেশে সমাজতন্ত্র গড়া সম্ভব, এই মতবাদের পক্ষে একটা যুক্তি হল।[৮]

এক দশকের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ, বিপ্লব ও অর্থনৈতিক দুর্দিনের পর ১৯২৭ সাল থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলোর শাসক শ্রেণীর বিশ্বাস হল যে দুঃসময় শেষ। ১৯২৮ সালে আমেরিকার প্রেসিডন্ট কুলিজ (Coolidge)বলেন, "এখন যে সুখকর ভবিষ্যতের দিকে আমরা যাচ্ছি তা আমেরিকার আর কোন কংগ্রেস পায় নাই"। তার সঙ্গে দ্বিমত করার মত লোক তখন তেমন ছিলনা। কিন্তু সমস্ত প্রবৃদ্ধিও প্রক্রিয়া একটা দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল, তা হল অব্যাহতভাবে আমেরিকা থেকে জার্মানীতে অর্থ বিনিয়োগ।[৯] সমস্ত পৃথিবীর মোট পুঁজি রপ্তানীর প্রায় অর্ধেকটাই ১৯২৮ সালে জার্মানীতে পাঠান হয়েছিল। জার্মানী ২০ হাজার বিলিয়ন মার্কের বেশী ধার করেছিল এই সময়, যার অর্ধেকটাই ছিল স্বল্পমেয়াদী ঋণ।[১০] খুব কম মানুষই ধারণা করতে পেরেছিল কি বিপর্যয়ের সম্মুখীন ছিল পশ্চিমা দেশগুলি।

বিরাট বিশ্বমন্দা ১৯২৯

ইউরোপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধ শেষে অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী হিসাবে আবির্ভূত হয়। যুদ্ধের আগেও আমেরিকার অবস্থান ভাল ছিল। ১৯১৩ সালেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে গেল আমেরিকা- পৃথিবীর মোট শিল্প উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ ছিল সেই দেশের । ১৯২৯ সাল নাগাদ তার শিল্প উৎপাদন দাঁড়াল সারা পৃথিবীর ৪২ শতাংশ। সেই সময় বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর যৌথ শিল্প উৎপাদন ছিল মোট পৃথিবীর ২৮ শতাংশ।[১১]

যুদ্ধের শুরুতে আমেরিকা অন্যান্য দেশের কাছে ঋণগ্রস্ত ছিল। যুদ্ধের পর আমেরিকা হল ঋণদাতা দেশ। ইউরোপীয় দেশগুলির বাজার দখল করল আমেরিকা। দ্রুত নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বিশাল বাজার এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল যে স্থায়ী প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি পাওয়া গেছে। ১৯২০-২১ সালে কিছুটা মন্দা হলেও তা কাটিয়ে উঠে আমেরিকার অর্থনীতি বাড়তে থাকে। গ্রাম ও শহরে দরিদ্র জনগণের চিত্র, ক্রমেই বাড়তে থাকা সামাজিক অসাম্য, এগুলোর কথা কেউ তুললেও বিত্তশালী শ্রেণী তা গুরুত্ব দেয়নি।

১৯২০ এর দশকের শেষের দিকে অর্থনীতির বৃদ্ধি হলেও এর ভিত্তি ছিল দুর্বল। আমেরিকায় কৃষিতে মন্দা চলছিল, শ্রমের মজুরি বাড়েনি বল্লেই চলে।[১২] এর ফলে উৎপাদনের মুনাফার বড় অংশ বিত্তশালীদের কাছে যাচ্ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় না বাড়ায়, পণ্যসামগ্রীরও চাহিদা বাড়ছিল না। উৎপাদন ও চাহিদার এই ব্যবধান অর্থনীতিতে মন্দা নিয়ে আসল। চাহিদা বাড়ানর জন্য ব্যাংকগুলো বাড়ি, গাড়ি ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য কেনার জন্য ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ও আকারে মানুষকে ধার দেওয়া শুরু করল। এই ঋণের একটা বড় অংশ দেয়া হয়েছিল এমন লোকদের যাদের শোধ করার ক্ষমতা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ব্যাংকগুলো নতুন ঋণ দেওয়া কমিয়ে দিল আর পুরাতন ঋণও refinancing কমিয়ে ফেলল। ১৯৩৩ সালে বাড়ি কেনার জন্য ঋণ নিয়েছিল এমন অর্ধেক মানুষই ঋণ খেলাফি হল। প্রতিদিনই প্রায় এক হাজার বাড়ি ঋণ শোধ দিতে না পারার জন্য ব্যাংক দখলে নিচ্ছিল। এরপরও টাকার অভাবে হাজার হাজার ব্যাংক বন্ধ হয়ে যেতে লাগল।[১৩] (আমেরিকার নিয়মনীতির কারণে সেই সময় সারা দেশব্যাপী শাখা আছে এমন বৃহৎ ব্যাংক ছিল না। বেশিরভাগ ব্যাংক ছিল স্থানীয় ভিত্তিক আর কিছু ছিল রাজ্য (state) ভিত্তিক- তাই তাদের পুঁজি ছিল কম।)

১৯২৮ সালে আমেরিকার ব্যাংক ও অন্যান্য বিনিয়োগকারীরা ইউরোপের দেশসমূহের (বিশেষতঃ জার্মানী) বন্ড কিনে টাকা খাটান প্রায় বন্ধ করে দিল। এর বদলে তারা নিউইয়র্কের স্টক মার্কেটে টাকা খাটান বাড়িয়ে দিল। ফলে নিউইয়র্কে স্টকের দাম দ্রুত বাড়তে থাকলো। এই "bull market" বা চাঙ্গা বাজারে অনেকেই টাকা ধার করে বিনিয়োগ করতে লাগল। বছর খানেকের মধ্যেই ইউরোপে বিনিয়োগ খুব কমে গেল ও ব্যবসার জন্য দরকারী টাকা পেতে কষ্ট হতে লাগল। আমেরিকার অর্থনীতির গতিও ধীর হয়ে গেল। ১৯২৯ সাল থেকে আমেরিকার মোট জাতীয় আয় কমতে লাগল। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে আমেরিকা গাড়ি তৈরী করেছিল ৬২২০০০টি, সেই বছর সেপ্টেম্বর মাসে তৈরী গাড়ির সংখ্যা কমে হল ৪১৬০০০টি। বৃটেন, জার্মানী ও ইতালীতে অর্থনীতির বৃদ্ধি আগেই কমতে শুরু করেছিল। কিন্তু স্টকের দাম তখনও বাড়ছিল। আমেরিকার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকরা বা বিনিয়োগ কারী কেউই এই বিপদ সংকেত আমলে নেয়নি। ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর ছিল বৃহস্পতিবার-এটা ইতিহাসে "কালো বৃহস্পতিবার" নামে পরিচিত। সেদিন কিছু বিনিয়োগকারী স্টকের দাম কমে যাবে এই আশংকায় বিক্রি করা শুরু করল। স্টকের দাম সত্যিই কমতে শুরু করল। আরও অনেকে ভয় পেল এবং ব্যাপকভাবে স্টক বিক্রি করা শুরু হল, তাতে দাম আরও কমতে থাকল। এর পরের সপ্তাহে "কালো মঙ্গলবার" এ আরও বিক্রি শুরু হল। স্টকের দামের সূচক ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ ছিল ৩৮১ (১৯২৬ সালের দাম ১০০ ধরে) -১৩ই নভেম্বর হল ১৯৮ এবং আরও পড়তে থাকল।[১৪] যারা স্টক কিনেছিল এমন বহু মানুষ অল্পদিনের মধ্যে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। অনেকেই তাদের জীবনের সঞ্চয় হারিয়ে ফেলল। যারা টাকা ধার নিয়ে স্টক কিনেছিল, তাদের আর টাকা শোধ দেওয়ার উপায় থাকল না। ব্যাংকগুলো তাদের ধার দেওয়া টাকা ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকল। তাতে যারা টাকা ধার নিয়েছিল তারা শোধ দেওয়ার জন্য তাদের স্টক বিক্রি করতে বাধ্য হলো। যে সব আমেরিকান ইউরোপে টাকা বিনিয়োগ করেছিল, তারা তা ফিরিয়ে আনতে লাগল; নতুন বিনিয়োগ বন্ধ করে দিল আর তাদের সম্পদ বিক্রি করে ফিরিয়ে আনা শুরু করল।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা আগেই শুরু হয়েছিল- স্টক মার্কেটের ধ্বস মন্দার কারণ নয়, তবে এটা মন্দার একটা পরিষ্কার বহিঃপ্রকাশ ছিল। মধ্য ইউরোপের সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক ভিয়েনার Austrian Creditanstalt ১৯৩১ সালের মে মাসে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিল। অষ্ট্রীয়ার সরকার ব্যাংকের সব সম্পদ অবরুদ্ধ (frozen) করল। তা সত্ত্বেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য দেশে। জার্মানী, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, এইসব দেশে ব্যাংকে যাদের টাকা ছিল তারা তা তুলে নেওয়া শুরু করল। অনেক ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে জুলাই এর ১ তারিখ জার্মানীর এক কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা ছিল। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হুভার প্রস্তাব করলেন, এক বৎসরের জন্য সব ক্ষতিপূরণ বন্ধ রাখার জন্য। কিন্তু আতঙ্ক দূর করা সম্ভব হল না। ফ্রান্স গড়িমসি করলেও বৃটিশ সরকার ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডকে স্বর্ণের মাধ্যমে প্রদেয় শোধ বন্ধ করার অনুমতি দিল।

কাচাঁমালের দাম কমে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ও চিলি স্বর্ণমান পরিত্যাগ করেছিল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে আরও ২৪টি দেশ স্বর্ণমান ছেড়ে দিল। আরও কয়েকটি দেশ প্রকাশ্যে স্বর্ণমান না ছাড়লেও প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণের মাধ্যমে কোন আদান প্রদান করছিল না। আন্তর্জাতিক মানদন্ড এভাবে চলে যাওয়ায় প্রতিটি দেশের মুদ্রামান চাহিদা ও সরবরাহ অনুযায়ী বিশৃঙ্খলভাবে উঠানামা করতে লাগল। বিনিয়োগ তুলে নেওয়া হতে থাকল, প্রায় প্রত্যেক দেশই নিজেদের পণ্যের বাজার রক্ষা করার জন্য শুল্কের দেয়াল তুলে দিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পতন হল। ১৯৩১ সালের প্রথম ভাগে মোট বহির্বাণিজ্য ১৯২৯ সালের তুলনায় প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কমে গেল। সাথে সাথে কমে গেল পণ্য উৎপাদন, চাকুরী ও মাথাপিছু আয়। ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত পণ্য উৎপাদনের গড় বাৎসরিক উৎপাদন ১০০ ধরে ১৯৩২ সালে তা দাঁড়াল আমেরিকায় ৬০ এর নীচে আর জার্মানীতে ৭০ এর নীচে। ১৯৩৭ সালের চাকুরীরত মানুষের সংখ্যাকে ১০০ ধরে ১৯৩২ সালে আমেরিকায় তা হল ৭৫ ও জার্মানীতে ৭০ এর কম। এই সময়ে মাথাপিছু গড় আয় আমেরিকায় কমল ২৫ শতাংশ ও জার্মানীতে ২০ শতাংশ।[১৫]

একে অপরের সঙ্গে আলোচনা না করে রাষ্ট্রসমূহ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করা ও আমদানী রপ্তানীর উপর শুল্ক আরোপ করার ফলে বিশৃঙ্খলা বাড়ছিল ও পরিস্থিতির অবনতি ঘটছিল বলে মনে করা হল। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো ১৯৩২ সালের জুন মাসে সুইজারল্যান্ডের লুসান শহরে সভা ডাকল। সেখানে আলোচনা হল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ জার্মানী কখন কতটা দিবে আর ইউরোপীয় দেশগুলো আমেরিকার কাছে তাদের দেনা কিভাবে শোধ করবে। এখানে ইউরোপীয় দেশগুলো ও আমেরিকার মতপার্থক্য হয়।

সংকট উত্তরণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার শেষ চেষ্টা হয় ১৯৩৩ সালে। লীগ অব নেশনস এর প্রস্তাবনায় World Monetary Conference ডাকা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল স্বর্ণমানে ফিরে যাওয়া, আমদানী শুল্ক কমান এবং নানাভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়ান। তখন আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে যাচ্ছিল। দুজন প্রার্থী, হুভার ও রুজভেল্ট কেউই এই সময় আগাম কোন অঙ্গীকার করতে রাজী ছিলেন না। ফলে সম্মেলন পিছান হল। নির্বাচনে রুজভেল্ট জিতলেন এবং তাকে প্রশাসন গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সময় দিতে আবার পিছান হল। শেষ পর্যন্ত যখন ১৯৩৩ সালের জুন মাসে লন্ডনে সম্মেলন হল তখন রুজভেল্ট না এসে খবর পাঠালেন, তার নিজের দেশের অর্থনীতি পুর্ণগঠন করাই তার প্রাথমিক কাজ। তিনি অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গীকার করতে চান না। ফলে অর্থহীন বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হল।

মন্দার কারণ

পুঁজিবাদী অর্থনীতির গতি কখনোই মসৃণ হয় না। অর্থনীতির উঠানামা এই ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা উঠানামার ব্যপ্তি ও দৈর্ঘ্য হয় বিভিন্ন। কখনও কখনও তা তীব্র আকার ধারণ করে।[১৬] ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবসায়ীরা trade cycle অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যে চাঙ্গা ভাব ও মন্দার সঙ্গে পরিচিত ছিল। বলা হত প্রতি সাত থেকে এগার বছর ব্যবধানে মন্দা দেখা দেয়। আরও কিছুটা দীর্ঘসময় অন্তর অন্তর ঘটতে থাকা চক্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ করা যায়। ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ সালে পর্যন্ত স্থায়ী এক বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ মন্দা চলছিল। এরপর আবার প্রবৃদ্ধি শুরু হয়েছিল। কোনদ্রাতিয়েভ নামে একজন রাশিয়ান অর্থনীতিবিদ "long wave" নামে ৫০ থেকে ৬০ বৎসর স্থায়ী প্রবৃদ্ধি ও মন্দা চক্র বর্ণনা করেন।

অতীতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মন্দা ব্যবসায়ীরা ভালো বা খারাপ আবহাওয়ার মতোই মনে করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এর কারণ জানা ছিল না। এগুলো হয় উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করতো অথবা বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসত। তবে কার্ল মার্কস বলেছিলেন এই প্রবৃদ্ধি-মন্দা চক্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত এবং এই দ্বন্দ্বের ফলে শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা গভীর সংকটে পড়বে যা উত্তরণ করা সম্ভব হবে না। সমস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই এই অর্থনৈতিক মন্দা ঝুঁকিতে ফেলবে এটা তিনি ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রীরা মনে করতেন। এর আগের ১০০ বৎসরে প্রবৃদ্ধি মন্দা চক্র ঘটতে থাকা স্বত্বেও সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর অর্থনীতি অগ্রসর হয়েছে। পুঁজিবাদের ইতিহাসে এবারই প্রথম পুরো ব্যবস্থাই মন্দার কারণে ধ্বংসের সম্মুখীন হলো। "বিরাট বিশ্ব মন্দার" আশি বৎসর পরেও এর কারণ সম্বন্ধে ঐক্যমত্যে পৌছানো যায় নাই। অনেকের মতে কারণ ছিল একাধিক। আমেরিকায় পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় ব্যাংক সমূহের খেলাপী ঋণের বোঝা, স্টক মার্কেটের অবাস্তব স্ফীতি শেষ পর্যন্ত স্টকের মূল্য পতন ঘটায়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের কারণে জার্মানী, ও আমেরিকার কাছে যুদ্ধের ঋণ শোধ দেওয়ার জন্য ইউরোপের অন্যান্য দেশ, আমেরিকার উপর নির্ভরশীল ছিল। ইউরোপ থেকে বিনিয়োগ করা অর্থ আমেরিকা তুলে নেওয়ায় ইউরোপেও ধ্বস নামল। কাচাঁমালের দাম পড়ে যাওয়ায় যেসব দেশের অর্থনীতি কাচাঁমাল রপ্তানীর উপর নির্ভরশীল ছিল সেসব দেশও মন্দার কবলে পড়ল। বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ, যার মধ্যে প্রধান ছিলেন জন মেইনার্ড কেইনস, অর্থনীতির মন্দার বড় কারণ হিসেবে ভোগ্য পণ্যের চাহিদার অভাবকে চিহ্নিত করেছেন।

মন্দা পরবর্তী

মন্দা যখন তুঙ্গে তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হল ১৯৩২ সালের শেষে। ডেমক্র্যাট দলের প্রার্থী ফ্র্যাংকলিন ডেলানো রুজভেল্ট নতুন অর্থনৈতিক নীতি (যার নাম দেওয়া হল New Deal) চালু করার অঙ্গীকার করলেন তার নির্বাচনী প্রচারণায়। তিনি জয়ী হলেন এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। সে সময় ডেমোক্র্যাটিক দল ছিল আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতকায় বর্ণবাদী ভূমিমালিক আর উত্তর এর পুঁজিবাদীদের দল। কিন্তু মন্দার মধ্যে মানুষ তখন বেপরোয়া। মোট শিল্পশ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক (দেড় কোটি শ্রমিক) তখন বেকার। জার্মানীতে বেকারত্বের হার ছিল ৪৪ শতাংশ, বৃটেনে ২২ শতাংশ, নরওয়ে ও ডেনমার্কে ৩১ শতাংশ। অনেক শিল্প কারখানা ছিল বন্ধ। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় শিল্প উৎপাদন ছিল এক-তৃতীয়াংশ কম, জার্মানীতেও প্রায় একই মাত্রায় উৎপাদন কমল। বেকার ও দরিদ্র মানুষেদের জন্য কোন ভাতা বা সামাজিক নিরাপত্তা তখনও চালু হয় নাই। হাজার হাজার লঙ্গর খানা (soup kitchen) খোলা হল ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য। ১৯৩২ সালে ১৫০০০ বেকার যুদ্ধফেরত প্রাক্তন সৈনিক ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ দেখালে জেনারেল ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে খোলা বেয়নেট নিয়ে ২৫ হাজার সৈন্য পাঠান হয় তাদের ছত্রভঙ্গ করতে। এই পরিস্থিতিতে নতুন প্রশাসন অর্থনীতিতে গতি ফিরিয়ে আনার জন্য অতীতে কখনও নেওয়া হয়নি এমন পদক্ষেপ নিল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জরুরী ক্ষমতা বলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেন।[১৭] এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ছিল: ফেডারেল রিজার্ভ ফান্ড সমস্ত ব্যাংকের আমানতের গ্যারান্টি দেবে; সরকারী টাকায় শস্য কিনে তা বিনষ্ট করে ফেলা যাতে দাম না কমে; ২৩ লক্ষ বেকার মানুষকে কাজে লাগানর জন্য সরকারী অর্থ মঞ্জুরী, শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার সীমিত অধিকার দেওয়া যাতে তারা মজুরী বাড়াতে পারে এবং তাতে বাজারে পণ্য চাহিদা বাড়তে পারে। শিল্প উৎপাদনকারীদেরও সীমিত ভাবে পণ্য ভিত্তিক গোষ্ঠী করে উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেওয়া হল।

দ্রুততার সঙ্গে এই সব নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করা হল। যদিও অত্যন্ত কম মজুরীতে কাজ দেওয়া হল, তারপরও অনেকেই রুজভেল্ট এর পদক্ষেপের প্রশংসা করলেন। তবে এই পদক্ষেপ গুলো যতটা কার্যকর হবে বলে মনে করা হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত হয় নাই। রুজভেল্ট একটি জায়গায় রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন-তা হল তিনি ঘাটতি বাজেট দিয়ে অর্থ খরচ করে অর্থনীতি চাঙ্গা করার চেষ্টা করেন নাই। বরং তিনি সরকারী খাতে চাকুরীর সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধফেরত শ্রমিকদের অবসর ভাতা কমিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থ বিনিয়োগ ১৯২৯ সালে ছিল ১৬ বিলিয়ন ডলার-১৯৩২ সালে তা কমে হয়ে গিয়েছিল এক বিলিয়ন ডলার। রুজভেল্ট ধারণা করেছিলেন এত নিম্ন পর্যায় থেকে এটা এক সময় বাড়বেই। তা আসলেই বাড়া শুরু করেছিল। শিল্প উৎপাদন ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ছিল শতকরা ৫৯ ভাগ (মধ্য ১৯২০ এর দশকের তুলনায়)- জুলাই মাসে বেড়ে হল শতকরা ১০০ ভাগ। বেকার মানুষের সংখ্যা ১৯৩৩ সালে ছিল ১ কোটি ৩৭ লক্ষ, ১৯৩৫ সালে হল ১ কোটি ২০ লক্ষ। অনেকেই মনে করলেন রুজভেল্ট এর New Deal আশ্চর্যজনকভাবে কার্যকর হয়েছে।

অনেকে এখনও তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে যখন উৎপাদন ১৯২৯ সালের পরিমাণে আবার উন্নীত হল, তখনও বেকারত্বের হার শতকরা ১৪ ভাগের উপরে ছিল। ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে আমেরিকার ইতিহাসে সবচাইতে দ্রুত অর্থনৈতিক অবনতি ঘটল। ১৯৩২ সাল থেকে অর্থনীতি যতটুকু পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল-তার অর্ধেক আবার কমে গেল।[১৮] চার মাসের মধ্যে ইস্পাত উৎপাদন কমে গেল দুই-তৃতীয়াংশ, সূতীবস্ত্র উৎপাদন কমল শতকরা ৪০ ভাগ। কোন কোন ক্ষেত্রে New Deal উন্নতি আনলেও অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিকার হিসেবে তা ইউরোপীয় দেশগুলোর গ্রহণ করা ব্যবস্থার মতই অকার্যকর প্রমাণিত হল।[১৯]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলির মধ্যে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ফ্রান্স। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্সের সবচাইতে সমৃদ্ধ অঞ্চলে-যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সের শিল্প উৎপাদনের বড় অংশ (ইস্পাত শিল্পের ৬০ শতাংশ ও কয়লা শিল্পের ৭০ শতাংশ) এবং কৃষি উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা গুলো ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। জীবনহানিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কর্মক্ষম পুরুষদের প্রায় অর্ধেক (১৫ লক্ষ) যুদ্ধে নিহত হয়। আরও ৭ লক্ষের উপর মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়। কাজেই এটা আশ্চর্য নয় যে ফ্রান্স জার্মানীর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করবে। কিন্তু জার্মানী দাবী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে পারেনি। আদায় করার জন্য ফ্রান্স জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধ Ruhr অঞ্চল দখল করে নিল। তাতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব তো হলই না, উপরন্ত এই দখল করা ও দখলে রাখার খরচও হল অনেক। যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের মুদ্রার মূল্য যা কমেছিল তার চাইতে অনেক বেশী কমে যুদ্ধ পরবর্তী সাত বৎসরে। শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ সালে ফ্রান্সের মুদ্রা ফ্রাঙ্কের এর মূল্য যুদ্ধপূর্ব মূল্যের এক - পঞ্চমাংশ স্থির করা হল। কর বাড়ান হল অনেক। ধনী ব্যক্তিদের সম্পদের মূল্য চার-পঞ্চমাংশ কমে গেল। শ্রমিক শ্রেণী অধিক কর দিতে বাধ্য হল। দুই শ্রেণীই হল ক্ষুদ্ধ। এতে উগ্র বাম ও ডান উভয়েরই সমর্থন বাড়ার সুযোগ হল। ১৯৩৬ সালে তিনটি বাম দল (কমিউনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট ও র‍্যাডিক্যাল) যুক্ত ভাবে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করল। শ্রমিকদের জন্য সহায়ক কিছু আইন প্রণয়ন করা হল। যেমন সপ্তাহে ৪০ ঘন্টার কাজ সীমিত করা, শ্রমিকদের সঙ্গে বিরোধ হলে বাধ্যতামূলক সালিশ নিস্পত্তির ব্যবস্থা, শ্রমিকদের পূর্ণ বেতনে ছুটি। তারা Bank of France ও রেলওয়ে জাতীয়করণ করেছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বিফল হওয়ায় ১৯৩৮ সালে সরকার ভেঙ্গে যায়। এই সময় বৈদেশিক সম্পর্ক আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে এবং স্পেনে রাজনৈতিক ঘটনাবলী - বিশেষতঃ ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্রের উত্থান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাইতে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ফ্যাসীবাদের উত্থানেরও অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল।।

১৯১৯ ও ১৯২০ সাল ইতালীর ইতিহাসে “the two red years” নামে পরিচিত। অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে শ্রমিক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল এবং কারখানায় ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়তে থাকল। শ্রমিক সংগঠন ও সমাজতন্ত্রপন্থী দলগুলোর সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকল। ১৯১৯ সালে বিপ্লবী রাশিয়ার সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করে তিনদিন সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হল। ১৯২০ সালে তুরিন এ metal worker রা মালিক পক্ষ তাদের ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিক এই দাবীতে ধর্মঘট পালন করল। কিন্তু সফল হয়নি। সেই বছরই মিলানে lock out এর প্রতিবাদে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকরা কারখানা দখল করে। কয়েকদিনের মধ্যেই আন্দোলন সারা দেশে metal worker দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। চার লক্ষ metal worker এবং এক লক্ষ অন্যান্য শ্রমিক তাদের কারখানা দখল করে। কারখানা রক্ষার জন্য তারা অস্ত্র তৈরী করে এবং জমা করে রাখে। দক্ষিণাঞ্চলে যুদ্ধ ফেরত সৈন্যরা কৃষি ভূমি দখল করে নিতে লাগল। পরিস্থিতি বিপ্লবের অনুকূলে ছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ শ্রমিক সংগঠন গুলিকে সমর্থন দিল না। এই অবস্থায় প্রধান শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সভায় বিপ্লবের পথে যাওয়ার প্রস্তাব অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয় এবং কারখানা মালিকদের সঙ্গে আপোস করার সিদ্ধান্ত হয়।

এই সময় মুসোলিনী যদিও জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিল কিন্তু তার সমর্থক বা অনুসারী বেশী ছিল না। সে সমাজতান্ত্রিক দল থেকে বেড়িয়ে এসে কিছু উগ্র জাতীয়তাবাদী ও বিক্ষুব্ধ যুদ্ধফেরত সৈন্য নিয়ে Fascio decomattimento নামে একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করেছিল। ১৯১৯ সালের নির্বাচনে তারা খুব কম সমর্থন পেয়েছিল। শ্রমিকদের আন্দোলনে ভাটা পড়ায় মুসোলিনীর ভাগ্য খুলে গেল। পুঁজিপতি শ্রেণী চাইছিল শ্রমিকদের সংগঠন ও আন্দোলনের মানসিকতা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিতে যাতে তারা ভবিষ্যতেও বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরী করতে না পারে। প্রধানমন্ত্রী Giolitti বামদলগুলোর একটি প্রতিপক্ষ দাঁড় করতে চাইছিলেন। মুসোলিনী তাদের এই প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে এলেন। Giolitti সরকার গোপনে আর পুঁজিপতিরা প্রকাশ্যে মুসোলিনীকে তহবিল সরবরাহ করল। সরকার ঘোষণা দিল সামরিক

দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া ৬০০০০ যুদ্ধফেরত সৈন্য যদি মুসোলিনীর দলে যোগ দেয় তাহলে তারা সামরিক বাহিনীতে থাকা অবস্থায় বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ পাবে। Giolitti মুসোলিনীর দলকে সঙ্গে নিয়ে ১৯২১ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন করে তাদের ৩৫টি সংসদীয় আসন পাবার ব্যবস্থা করল। বিনিময়ে মুসোলিনীর দলের সশস্ত্র সদস্যরা পরিকল্পিত ভাবে সারা দেশে শ্রমিক সংগঠন গুলো ও বামপন্থী দলগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করল। পঞ্চাশ ষাট জনের সশস্ত্র দল এক একটি এলাকায় গিয়ে অফিস ভাংচুর ও শ্রমিক বা বামপন্থী দলগুলোর কর্মীদের মারপিট করে চলে আসত। পুলিশ আসত তারা চলে যাবার পর, এমনকি তারা হত্যাকান্ড, নিয়ম অনুযায়ী তদন্ত ও অপরাধী ধরার ব্যবস্থা নিত না।[২০] আক্রমণকারী ফ্যাসিষ্ট দলগুলোর সংখ্যা অক্টোবর ১৯২০ সালে ছিল ১৯০, ১৯২১ সালের অক্টোবরে তা হল ২৩০০। শ্রমিক সংগঠনগুলো ও বামপন্থী দলগুলো এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করল। তারাও সশস্ত্র দল গড়ে তুলল arditi del popolo নামে। এই সশস্ত্র দলগুলোর পাল্টা আক্রমণে ফ্যাসিষ্টরা প্রথমে কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন ও বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে বিভক্তি তাদের আবার সুযোগ এনে দিল। তারা আবার আক্রমণ শুরু করল। সোশ্যালিষ্ট দলের এক অংশ এবং প্রধান শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশন ফ্যাসিষ্ট দলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করল। কমিউনিষ্টদের নেতা বলল ফ্যাসিষ্ট ও অন্যান্য ডানপন্থী দলগুলো একই। তারা নিষ্ক্রিয় রইল। সোশ্যালিষ্টদের আর এক অংশও কোন অবস্থান না নিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকল।

শেষ পর্যন্ত বামপন্থী দল ও শ্রমিক ইউনিয়ন গুলো একত্রিত ভাবে ফ্যাসিষ্টদের প্রতিহত করার উদ্যোগ নিল। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট দলগুলোকে পরাজিত করার মতো যথেষ্ট সংখ্যায় শ্রমিকদের সংগঠিত করে রাস্তায় নামাতে তারা পারল না। ফলে মুসোলিনীর শক্তি বাড়তেই থাকল। শক্তিশালী হয়ে ওঠায় Giolitti তাকে সরকারে স্থান দিতে চাইল। এবার মুসোলিনী তাদের পরাজিত করতে চাইল। সে দাবী করল তাকে ক্ষমতা না দিলে সে তার ফ্যাসিষ্ট বাহিনী নিয়ে রোম দখল করবে। পুঁজিপতিরা চাইলে সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করে তখনও মুসোলিনীকে আটকাতে পারত। কিন্তু তারা সেটা করল না। রাজা মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করল-আর মুসোলিনী বিজয়ীর বেশে মিলান থেকে রোমে প্রবেশ করল। লিবারেল দল যারা এর আগে ক্ষমতায় ছিল, তারা মুসোলিনীকে সমর্থন দিয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দিল। তারা তার প্রথম মন্ত্রী সভায় পদও গ্রহণ করল। সমস্ত রাজনৈতিক দল এমনকি সোশ্যালিষ্ট দল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মনে হল হানাহানি ও গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটবে। একমাত্র কমিউনিষ্টরা তা মনে করেনি।[২১] বাস্তবে দুঃস্বপ্নের শুধু সূচনা হল। মুসোলিনী ক্ষমতায় থাকায় পুলিশ ও ফ্যাসিষ্টরা সমবেত ভাবে শ্রমিক সংগঠন গুলো ভেঙ্গে দিল। ফ্যাসিষ্টদের কর্মকান্ড প্রতিরোধ করার মত আর কোন শক্তি থাকল না। ১৯২৪ সালে মুসোলিনীর দুর্বৃত্তেরা একজন সোশ্যালিষ্ট সংসদ সদস্য মাত্তেওত্তিকে হত্যা করল। দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। সম্ভাবনা ছিল ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ালে মুসোলিনী ক্ষমতাচ্যুত হত। বিরোধী সংসদ সদস্যরা শুধু সংসদ অধিবেশন বর্জনেই তাদের প্রতিবাদ সীমিত রাখলেন, কিছুদিন পর আবার ফিরেও গেলেন। মুসোলিনী তখন অপ্রতিহত একনায়কতন্ত্র চালু করলেন। বৃটিশ রক্ষণশীল নেতা উইনষ্টন চার্চিলও মুসোলিনীর প্রশংসা করেছিলেন। ইউরোপের অন্যান্য নেতারাও মুসোলিনীর পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন মিউনিখের উঠতি জাতীয়তাবাদী এডলফ হিটলার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি

জোসেফ ষ্ট্যালিন এর "এক দেশে সমাজতন্ত্র" (socialism in one country) এর নীতির ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির কর্ম পদ্ধতি প্রভাবিত হয়। বৃটেনে মিত্র সৃষ্টির জন্য বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা TUC র সঙ্গে Anglo-Soviet Trade Agreementকরা হয়, যদিও TUC শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের সঙ্গে প্রতারণামূলক আচরণ করেছিল।[২২] প্রাচ্যদেশে চিয়াং কাইশেক এর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করার জন্য চীনের কমিউনিষ্টদের তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলা হয়। যদিও এর আগে চিয়াং কাইশেক শ্রমিক সংগঠন গুলোর উপর হামলা করেছিল।

১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্রুত শিল্পায়নের কর্মসূচি শুরু করা হল। অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট দলগুলিকে আবার কর্মপদ্ধতি বদলাতে বলা হল। এতদিন যাদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছিল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলসমূহের ভিতরে বাম অংশগুলিকে এখন শত্রুপক্ষ বলা হল। এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে অতি ডানের মত বিপদজনক আখ্যায়িত করে

তাদের সঙ্গে রাজনীতি না করার উপদেশ দেওয়া হল। অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট দলগুলোর নেতৃত্ব এই উপদেশ না মানলে নেতৃত্বে পরিবর্তন করা হল।

১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর এক অংশ আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে এবং পুঁজিবাদের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে কমিউনিষ্টদের প্রচারণার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর মধ্যে বেকার ও বয়োকনিষ্ঠ শ্রমিকরাই ছিল প্রধান। কিন্তু শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পুঁজিবাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেও এই দুঃসময়ে তারা প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের ছত্রছায়ায় থাকা নিরাপদ মনে করল।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরবর্তী বৎসর গুলোতে জঙ্গি আন্দোলন হয় দেশে দেশে। স্পেনে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন হয় ও রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। ফ্রান্সেও আন্দোলনের ফলে popular front সরকার ক্ষমতা নেয়। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রচন্ড আন্দোলন হয় এবং অনেক শ্রমিক ইউনিয়নের গোড়া পত্তন হয়, এক আন্দোলনের ফলে তখন পৃথিবীর সব চাইতে বড় মোটর গাড়ি কারখানা জেনারেল মোটরস শ্রমিকরা সাময়িকভাবে দখল করে। কিন্তু প্রায় সব দেশেই সোশ্যাল ডেমক্র্যাট দলগুলি শ্রমিকদের উপর তাদের প্রভাব বজায় রাখল। জনপ্রিয় বামপন্থী স্লোগান দিয়ে অনেক দেশে তারা প্রভাব বাড়াতে পারল। ফলে কমিউনিষ্টরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের বড় অংশের সমর্থন হারাল। কমিউনিষ্ট পার্টিগুলো ছয় বৎসর এই নীতি অনুসরণ করেছিল। অনেক স্থানেই তারা আন্দোলন শুরু করে, কিন্তু শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ততা না থাকায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়। তাতে তাদের সমর্থকদের সংখ্যা কমতে থাকে। ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ১৯২৮ সালে ছিল ৫২০০০, ১৯৩১ সালে তা হয় ৩৬০০০। আমেরিকায় কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা এই সময়ে ১৪০০০ হাজার থেকে কমে ৮০০০ হয়। বৃটিশ পার্টির সদস্য সংখ্যা ৫৫০০ থেকে কমে ২৫০০ হয়।[২৩]

জার্মানীতে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা বাড়ে। ১৯২৮ সালে ১২৪০০ থেকে ১৯৩১ সালে ২০৬০০ হয়। অর্থনৈতিক বিপর্যয় সমাজকে এখানে আমেরিকার চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনেকেই সাত বৎসর আগে মুদ্রাস্ফীতির জন্য তাদের সারা জীবনের সঞ্চয় হারিয়েছিল। তারা এখন চাকুরীও হারাল। কিন্তু এখানেও কমিউনিষ্টরা হিটলারের নাৎসী উত্থান রুখে দিতে চাইলেও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সহযোগিতা না পাওয়ায় কার্যকর কিছু করতে পারল না।

হিটলারের ক্ষমতা দখল

১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে যখন অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়, তখন জার্মানীতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের নেতা মুলার অন্যান্য দলের সমন্বয়ে ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৩০ সালে মন্দা শুরু হয়-সরকারের এই মন্দা থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় তার কোন ধারণাই ছিল না। বেকারদের সংখ্যা বাড়ায় তাদের ভাতা দিতে খরচ বেশী হতে লাগল। অন্য দিকে শিল্প উৎপাদন কমায় সরকারের কর হতে আয় কমতে থাকল। সরকারের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ বাড়তে থাকল। আমেরিকা যে অর্থ Dawes plan এর আওতায় জার্মানীকে দিয়েছিল তা ফেরত নিতে চাইল। এই টাকাই জার্মান অর্থনীতিকে গতিশীল করে রেখেছিল, তাই জার্মান অর্থনীতি ও শ্লথ হয়ে গেল। ফলে সরকারের পতন ঘটল।

অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের তুলনায় জার্মানীর অর্থনৈতিক সংকট আরও তীব্র ছিল। তুলনায় দেখা যায় বৃটেনের চাইতে জার্মানীতে ঐ সময় বেকারত্বের হার পঞ্চাশ শতাংশ বেশী ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীও সংকটের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে হিটলারের National Socialist Party বা নাৎসী পাটির সমর্থন বাড়তে থাকল। ১৯২৭ সালের দিকে এই দল আট লক্ষ ভোট পেয়েছিল। ১৯৩২ সালে তা হল ৬০ লক্ষেরও বেশী। ১৯৩৪ সালে তা ৮০ লক্ষের উপরে গেল। তবে নাৎসী পার্টি সাধারণ রাজনৈতিক দল ছিল না। এদের ছিল একটি আধা-সামরিক সংগঠন যার নাম ছিল "Storm Troopers"। এই সশস্ত্র সংগঠনের সদস্যরা অর্থনৈতিক সংকটের জন্য নেতারা যাদেরকে দায়ী বলে চিহ্নিত করতেন, তাদের আক্রমণ করত। সাধারণতঃ ইহুদী ব্যবসায়ী ও সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন শ্রমিক সংগঠন গুলো ছিল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। ইতালীতে মুসোলিনী যেভাবে সশস্ত্র সংগঠনের মাধ্যমে তার দলকে শক্তিশালী করছিল, হিটলার তারই অনুসরণ করেছিল। তবে ইতালীর ফ্যাসিষ্ট দল শুরুতে ইহুদী বিরোধী ছিল না। ১৯৩০ এর দশকের শেষের দিকে হিটলারের সঙ্গে মৈত্রী করার পর তারা ইহুদী বিরোধী হয়।

১৯২৩ সালে ফ্রান্স জার্মানীর Ruhr অঞ্চল দখল করে নেওয়ার সময় হিটলারের দল প্রাধান্য অর্জন করে। বাভারিয়ার মিউনিখ শহরে উগ্র ডানপন্থী সন্ত্রাসী দলগুলোর মধ্যে এটি ছিল একটি। কিন্তু ১৯২৩ সালে মিউনিখের মেয়র এর পদ দখল করার চেষ্টা বিফল হওয়ার পর এই দলটি শক্তি হারায়। অর্থনৈতিক সংকট ঘটায় এটা আবার প্রাণ ফিরে পায়। মধ্যপন্থী দলগুলো এই সময় ক্ষমতায় ছিল। অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে না পারায় এই দল গুলো থেকে মানুষ নাৎসী দলে আসতে থাকে। অর্থনৈতিক সংকটে শুধু যে শ্রমিক ও দরিদ্রশ্রেণীর মানুষ দুর্ভোগে ছিল তাই নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও অর্থকষ্টে ছিল এবং অনেকে দেওলিয়া হয়ে যাচ্ছিল। ইতালীর ফ্যাসীবাদের মত জার্মানীর নাৎসী দল ছিল মূলতঃ মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত। শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম।[২৪] প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা নিজেদের শ্রমিকদের চাইতে শ্রেয় মনে করত এবং শ্রমিকদের আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ঘৃণা পোষণ করত। এটা নাৎসী দলের প্রতি মধ্যবিত্তদের একটা আকর্ষণের কারণ ছিল। আর একটা কারণ ছিল বামদলগুলোর ভ্রান্ত ধারণা। এই দলগুলোর নেতৃবৃন্দ মনে করতেন জার্মানীতে ইতালীর মত উগ্র ডানদলের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা ছিল কম। ১৯২৭ সালে কার্ল কাউৎস্কী বলেছিলেন জার্মানীর মত শিল্পোন্নত দেশে যথেষ্ট সংখ্যায় নিম্নবর্গের মানুষকে পুঁজিপতিদের স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।[২৫] ১৯৩৩ সালের জানুয়ারীতে হিটলারের ক্ষমতা দখলের অল্প কিছুদিন আগেও হিলফারদিং বলেছিলেন- সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা শাসনতান্ত্রিক রাজনীতি অনুসরণ করে নাৎসীদেরও এই পথে থাকতে বাধ্য করেছে এবং নাৎসীদেরও পতন ঘটবে। ১৯৩০ সালে ক্ষমতা হারানোর পর পরবর্তী সরকার গুলোর আমলে অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি সত্ত্বেও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নেতারা সহনশীল মনোভাব দেখাচ্ছিলেন। যদিও এই সরকার গুলো ক্রমেই শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর শোষণের মাত্রা বাড়াচ্ছিল। এই বিক্ষুব্ধ শ্রেণীগুলির সমর্থন পাওয়ার পথ করে দিয়েছিল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের নিষ্ক্রিয়তা।

নাৎসীদের সশস্ত্র হামলা প্রতিরোধ করার জন্য সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা Reichsbanner নামে একটি আত্মরক্ষামূলক সংগঠন করেছিল। এই সংগঠনকে ব্যাপক জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নাৎসীদের হামলা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের নেতারা এই সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিলেন না। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা প্রুশিয়া রাজ্যে সরকারের ক্ষমতায় ছিল এবং এই রাজ্যের ছিল একটি অস্ত্রসজ্জিত পুলিশ বাহিনী। বার্লিনে ১৯২৯ সালের মে দিবসে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে শোভা যাত্রায় গুলি চালানর জন্য তারা এই পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করেছিল। এতে ২৫ জন নিহত হয়েছিল। তারা নাৎসীদের কর্মকান্ড প্রুশিয়াতে বন্ধও করেছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করায় নিজেদের টিকিয়ে রেখে নাৎসীদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৩১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তারা কোন প্রার্থী দেয়নি। তারা হিন্ডেনবার্গকে সমর্থন দিয়েছিল। হিন্ডেনবার্গ তার প্রতিদান দিয়েছিল নাৎসীদের সহযোগীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, প্রুশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট সরকারকে বরখাস্ত করে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেয়। এতে নাৎসীরা আরও অপ্রতিহত ভাবে তাদের নিপীড়ন মূলক তৎপরতা চালানর সুযোগ পায়। এতে এরকম মনে হয় যে, তারা একমাত্র ক্ষমতাধর এবং তারাই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম এটা মনে করেছিল। ১৯৩৩ এর জানুয়ারীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, যখন নাৎসীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল, তখন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা কোন সভা করেনি। কাজেই মানুষ বিভ্রান্ত হল, এটা আশ্চর্য নয়।

কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিষ্ক্রিয়তা হিটলারকে একছত্র ক্ষমতা দিয়েছিল তা নয়। হিটলার চ্যান্সেলর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন পীড়ন করার পরও ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের নির্বাচনে নাৎসীরা ভোট পেয়েছিল ৪৩.৯ শতাংশ। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হিটলার তখনই পেল যখন পুঁজিপতিরা এটা তাকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। অনেক আগে থেকেই তারা শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর জন্য নাৎসীদের অর্থ দিয়ে আসছিল। কিন্তু ১৯৩২ সাল পর্যন্ত পুঁজিপতিরা বড় সমর্থন দিয়ে আসছিল দুটি দলকে, যারা ছিল তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা সমর্থন করত জার্মান পিপলস পার্টিকে আর বড় ভূ-স্বামীরা সমর্থন করত জার্মান ন্যাশনাল পার্টিকে। এই দুই গোষ্ঠীর অনেকেই নাৎসী দলের উপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারত না। কারণ শ্রমিক সংগঠনগুলো ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে আক্রমণ করার সাথে সাথে নাৎসীরা বড় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা যতই তীব্র হতে থাকল ততই উচ্চ শ্রেণীর নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে, ভার্সাই চুক্তি বাতিল করতে হবে, ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করতে হবে আর শ্রমিক সংগঠন গুলোর ক্ষমতা খর্ব করতে হবে, তা না হলে মন্দা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। ১৯৩১ সালের গ্রীষ্মকালে পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরা মনে করেছিল জার্মান প্রজাতন্ত্রের তখনকার অবস্থা ছিল "অবমাননাকর" এবং "জাতীয় একনায়কতন্ত্র" স্থাপন করার আহবান জানিয়েছিল।[২৬]

Ruhr অঞ্চলের শিল্পপতিরা, বড় ভূস্বামীরা ও সেনাবাহিনীর অধিকাংশ অফিসার এর সঙ্গে একমত ছিলেন। নাৎসীদের মধ্যে যে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ছিল, Otto Strasser,তাকে হিটলার বহিষ্কার করল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলার National Party, Peoples Party,পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের সঙ্গে হার্জবার্গ (Harzberg) এ মতবিনিময় করল। ১৯৩২ সালে হিটলার Ruhr এর শিল্পপতিদের সঙ্গে সভা করল। এভাবে হিটলার পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, ভূস্বামীদের আশ্বস্ত করতে লাগল যে নাৎসীরা তাদের সাহায্যই করবে।

১৯৩২ সালে পুঁজিপতিরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল যে তাদের পক্ষে সরকারের নীতি পরিচালনার জন্য নাৎসীদের সরকার তারা চায়। কিন্তু কতটা ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে সে ব্যাপারে দ্বিধা ছিল। বেশীরভাগই তাদের আস্থাভাজন মধ্যপন্থী দলগুলোকে ক্ষমতার প্রধান অংশীদার করে হিটলারকে ছোট অংশীদার রাখার পক্ষে ছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন Von Schleicher এর সরকার তাদের চাহিদা মেটাতে যতই ব্যর্থ হল, ততই তারা হিটলারের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল, যদিও অনেকেই এই সাবেক কর্পোরাল, যার বক্তব্য প্রায়ই ছিল উচ্ছৃঙ্খল, তার উপর তারা আস্থা রাখতে পারছিল না। পুঁজিপতি ও বড় ভূ-স্বামীদের নেতৃত্বের চাপে প্রেসিডেন্ট হিনডেনবার্গ হিটলারকে চ্যান্সেলর নিয়োগ দেন। শিল্পপতিদের অনেকেরই এতে পুরো সম্মতি না থাকলেও তারা কোন বাধা দেয়নি। বরং হিটলার চ্যান্সেলর হয়ে সংসদে তার শক্তি বাড়ানর জন্য যে নির্বাচন ডাকল তাতে তারা আর্থিক সমর্থন দিল। হিটলার মধ্যবিত্তদের তার সমর্থনে নিয়ে আসতে পেরেছিল বলেই শাসকগোষ্ঠী তাকে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছিল। শাসক গোষ্ঠীর কাছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার চাইতে হিটলারের ক্ষমতায় আসাও ছিল ভাল, জার্মানীর রাজনীতিতে বামপন্থীদের উত্থানের চাইতে ভাল তো অবশ্যই। নির্বাচনে নাৎসীদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নাই, তারা শতকরা ৪৪ ভাগ ভোট পেল। অন্যান্য মধ্যপন্থীদলগুলোর সহযোগিতায় তারা সরকার গঠন করল।

জার্মানীর কমিউনিষ্টরা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাৎসীদের মোকবিলা করে নাই। তারা ধরে নিয়েছিল নাৎসীরা স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে পারবে না ও তাদের পতন হবে।[২৭] তারাও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাজনীতির পথে চলছিল। কিন্তু নাৎসীরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করছিল না। শ্রমিক শ্রেণীর নেতাদের আক্রমণ করা, বিরোধীদের খুঁজে বের করে তাদের শায়েস্তা করা, পুলিশের সহযোগিতায় বিরোধীদের নির্যাতন করা, এসব নাৎসীদের নিত্যদিনের কাজ ছিল। ক্ষমতা নেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে নাৎসীদের আধা-সামরিক সংগঠনগুলিকে সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করে ফেলা হল। ১৯৩৩ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী জার্মানীর সংসদ ভবন (Reichstag) এ আগুন ধরে যায়। কমিউনিষ্ট পার্টিকে এইজন্য দোষারোপ করে এই দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই দলের সব সংসদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে ঐ আসনগুলি শূন্য করা হয়। ফলে হিটলারের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করতে পারে । কমিউনিষ্ট পার্টির প্রায় দশ হাজার সদস্যকে concentration camp এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের নেতারা তখনও মনে করছিলেন তাদের উপর আক্রমণ আসবে না। এমনকি দলের মধ্যে যারা প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল তাদের বহিষ্কার করা হয়। শ্রমিক সংগঠনের নেতারা ১লা মে উদযাপনে সহায়তা করে। তার পরদিন এদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে concentration camp এ দেওয়া হয়। ক্ষমতা দখল থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রায় ২২৫০০০ মানুষকে রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ করা হয়। প্রায় দশ লাখ জার্মানকে concentration camp এ পাঠানো হয়। এরপর মধ্যপন্থী দুটি দল যারা পুঁজিপতি ও ভূ-স্বামীদের স্বার্থ দেখাশোনা করত (ন্যাশনাল পার্টি ও পিপলস পার্টি) তাদের বিলুপ্ত করা হল। সকল পেশাজীবী সংগঠন এমনকি বয়স্কাউটদেরও স্বায়ত্তশাসন বিলুপ্ত করা হল। কেউ আপত্তি জানালে তাকে গেষ্টাপোরা (জার্মান গুপ্ত পুলিশ বাহিনী) ধরে concentration camp এ পাঠিয়ে দিত। এইভাবে হিটলার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। এক বৎসর পর হিটলার প্রেসিডেন্টের পদও দখল করল। শুধুমাত্র পুঁজিপতিরা ও সামরিক অফিসাররা তার নির্যাতনের বাইরে রইল।

আমেরিকার সংকটকাল

১৯৩৩ সালের পর আমেরিকায় শিল্প উৎপাদন বাড়ল, বেকারত্বের হারও কমল। অনেকেই মনে করলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নেওয়া পদক্ষেপের ফলেই অর্থনীতি আবার প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। কিন্তু ১৯৩৭ সালে আবার অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিল। আমেরিকার অর্থনীতির ইতিহাসে সবচাইতে গভীর মন্দা ছিল এটি।[২৮] অর্থনীতি যতটুকু পুণরুজ্জীবিত হয়েছিল

তার অনেকটাই আবার হারিয়ে গেল।[২৯] ইস্পাতের উৎপাদন চার মাসের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের বেশী কমে গেল, তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ কমল।

অর্থনীতি কম সময়ের জন্য আবার সচল হয়েছিল। এই সময় শ্রমিকরা সংগঠন করার অধিকার কিছুটা ফিরে পেয়েছিল। শ্রমিক ইউনিয়ন সদস্য সংখ্যাও বেড়েছিল। কিন্তু ধর্মঘট করলে মালিকপক্ষ ও পুলিশ তখনও শ্রমিকদের উপর হিংস্র হামলা করত। রুজভেল্টের New Deal আমলের প্রথম ছয় মাসে ১৫ জন ধর্মঘটকারী শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছিল, ২০০ জন আহত হয়েছিল আর শত শত গ্রেফতার হয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকরা সাহস হারায়নি তা ১৯৩৪ সালে তিনটি ধর্মঘটে বোঝা গেলঃ তলেদোর গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানায়, সান ফ্রানসিসকোতে বন্দর শ্রমিকদের আর মিনেয়াপলিসে ট্রাক শ্রমিকদের ধর্মঘটে। তারা কোর্টের আদেশ উপেক্ষা করে পুলিশ ও গুন্ডাদের আক্রমণ প্রতিহত করল ও দাবী আদায় করল। তিন ক্ষেত্রেই বামপন্থীরা (কমিউনিষ্ট ও ট্রটস্কীপন্থী) ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

বড় শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত বোধ করলেন। এর আগের দশকে তাদের সংগঠনগুলোর সদস্য সংখ্যা প্রায় অর্ধেক কমে এসেছিল, ১৯২০ সালে চল্লিশ লক্ষ থেকে ১৯৩৩ সালে তা বিশ লক্ষ হয়। এতে সরকারী সিদ্বান্তের উপর প্রভাব খাটানর ক্ষমতা তাদের অনেক কমে যায়, পুঁজিপতিরাও তাদের অবজ্ঞা করতে থাকে। শ্রমিকদের শিল্পভিত্তিক ইউনিয়নে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে সংগঠনগুলোর উদ্যম ফিরে আসতে শুরু হয়। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালে গুডইয়ার ও ফায়ার ষ্টোন কোম্পানীর আকরন (Ohio) এর রাবার কারখানার শ্রমিকেরা অবস্থান ধর্মঘট করে। অন্যান্য শ্রমিকেরা কারখানা ঘিরে রাখে পুলিশ ও গুন্ডা বাহিনীকে আটকানর জন্য। অন্যান্য শিল্পেও ধর্মঘট হয়। সেই বৎসর প্রায় ৪০ টি অবস্থান ধর্মঘট হয় । সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট হয় জেনারেল মটরস এর ফ্লিন্ট (Michigan) এর কারখানায়। এক পর্যায়ে কোম্পানীর ১৫০০০০ শ্রমিকের মধ্যে ১৪০০০০ শ্রমিকই ধর্মঘট করেছিল। তারা কোর্টের আদেশ অমান্য করে ও সশস্ত্র পুলিশকে প্রতিরোধ করে ধর্মঘট চালায়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়। ক্রাইসলার ও ওয়েষ্টার্ন ইউনিয়ন এসব বড় কোম্পানীর শ্রমিকদের থেকে শুরু করে রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক এমনকি আবর্জনা সংগ্রাহকরা ধর্মঘট করে।[৩০] এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে। শ্রমিক সংগঠন গুলোর সদস্য সংখ্যা চার বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ থেকে ৭০ লক্ষ হয় ।

এই শ্রমিক আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে আমেরিকার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় যে পরিবেশ তখন ছিল তা বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যেখানে ধর্মঘট সফল হয়েছিল সেখানেই শ্রমিকদের মধ্যে যৌথ সংগ্রামের মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছিল এবং বর্ণবাদ কমে যাচ্ছিল।[৩১] একটা সমস্যার কারণে এই সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত পূরণ করা গেল না। এই সময়ের আগে শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে সবচাইতে ভাল মেনে নিয়ে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের সাথে সমঝোতা করে অবস্থান করতেন। ১৯৩৩ পরবর্তী শ্রমিক নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে মিত্রতাই শ্রমিক স্বার্থের অনুকূল।[৩২] প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নির্বাচনে শ্রমিকদের সমর্থন নিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে যেতে রাজি ছিলেন না, তা বোঝা গেল ১৯৩৭ সালের শেষ দিকে ইস্পাত শ্রমিকদের ইউনিয়নভুক্ত করা নিয়ে। জেনারেল মটরস এ সফল ধর্মঘটের পর ছোট ছোট শিল্প মালিকেরা শ্রমিকদের ইউনিয়নভুক্তি মেনে নিলেও বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাতে রাজী ছিল না। ১৯৩৭ সালের মে মাসে প্রায় ৭৫০০০ ইস্পাত শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ধর্মঘট করল। মালিক পক্ষ পুলিশ ও গুন্ডাদের দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে ১৮ জন শ্রমিককে হত্যা করল। আর অনেক আহত ও গ্রেফতার হল। শ্রমিক নেতাদের ধারণা ছিল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে নির্বাচিত গভর্নর, মেয়র এরা তাদের পক্ষে, শ্রমিকদের তাই ধারণা দেওয়া হয়েছিল।[৩৩] এ রকম দমন পীড়নের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। তাদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। শ্রমিক নেতারা যখন রুজভেল্টের সমর্থন চাইলেন, তিনি শ্রমিকদের নিন্দা করলেন। অর্থনৈতিক মন্দা আবার শুরু হওয়ার সময়ই এইভাবে শ্রমিকদের সংগঠিত করার একটা বড় উদ্যোগ ব্যর্থ হল। পরবর্তী দুই বছরে ইউনিয়নগুলোতে মাত্র ৪ লক্ষ সদস্য যোগ হল। ১৯৩৯ সাল নাগাদ ধর্মঘটের সংখ্যা ১৯৩৭ সালের তুলনায় অর্ধেক কমে গেল। শ্রমিক নেতারা পুঁজিপতিদের সঙ্গে সহযোগিতা করা শুরু করল এবং শ্রমিকদের দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন কমিয়ে আনল। কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৩৪-৩৭ সালের শ্রমিক আন্দোলন গুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের সাহসী ভূমিকার জন্য তারা অনেক শ্রমিককে তাদের মতবাদে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কমিউনিষ্টদের বক্তব্য ছিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পুঁজিপতিদের প্রতিভূ আর তার "New Deal" কর্মসূচী হল ধোঁকাবাজী।

এরপর হঠাৎ তারা নীতি পরিবর্তন করে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যৌথ ফ্রন্ট গঠন করে এবং শ্রমিক আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করে। এই নীতি দশ বৎসর স্থায়ী থাকে। ইউনিয়ন নেতারা ধীরে ধীরে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে থাকে এবং ১৯৪০ এর দশকে তাদের প্রভাব একদমই বিনষ্ট হয়।

এইসব ঘটনাবলির একটা আদর্শগত প্রতিফলন হল। ১৯২৯ সালে শুরু হওয়া বিশ্বমন্দা শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মীদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। যে শাসকশ্রেণী ছিল আত্মবিশ্বাসী, এই সময়ে তাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখা গেল। অর্থনৈতিক সংকটের আঘাতে শ্রমিক, মধ্যবিত্ত সবারই জীবনধারা বিপর্যস্ত হল। এই সময় ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নাড়া দেয়। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা কমে আসতে লাগল। নতুন মূল্যবোধের খোঁজে সাহিত্য ও শিল্পকর্মের ধারা পরিবর্তন হল। John Steinbeck, Richard Wright, John Dos Passos, Ralph Ellison প্রমূখ লেখক, Charlie Chaplin, Joseph Losey,Nicholas Ray, Eliza Kazan প্রমূখ চলচ্চিত্র নির্মাতা, Paul Robson, Aaron Copeland, Woody Guthrieপ্রমুখ সঙ্গীত শিল্পী তাদের সৃষ্টিতে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ভাঙ্গন তুলে ধরার সাথে সাথে নতুন পথ খোঁজার সূচনা করলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের New Deal তাদেরকে পুরনো চিন্তাধারার পরিবর্তনের একটা সুযোগ করে দিয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা সরকারী প্রকল্পে চাকুরী, পত্রিকায় ও রেডিওতে প্রচার এর সুবিধা, হলিউডের চিত্রজগতে সুযোগ পেতে পারতেন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই প্রলোভন অধিকাংশ শিল্পী, সাহিত্যিক প্রত্যাখ্যান করলেন। তাদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে যে দৃষ্টিভঙ্গী তারা তুলে ধরলেন তার সঙ্গে রুজভেল্টের লক্ষের পার্থক্য পরিষ্কার ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম, সাধারণ মানুষের দূঃখ কষ্ট ও প্রত্যাশা গুলো তাদের কাজে ফুটে উঠল। এসবই ধাক্কা খেল যখন কমিউনিষ্ট পার্টি রুজভেল্টকে সমর্থন করা শুরু করল। যেসব সংস্কৃতিকর্মীরা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলতে শুরু করেছিলেন তাদেরকে নিরুৎসাহিত করে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বলা হল। কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল শিল্পী, সাহিত্যিকদের তাদের দৃষ্টিভঙ্গী নমনীয় করে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান গুলোতে কাজ করার জন্য উপদেশ দেয়া হল। সংস্কৃতির ধারা বদলানোর যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল তার অগ্রগতি শ্রমিকদের আন্দোলনের মতই বন্ধ হয়ে গেল।[৩৪]

তথ্যসূত্র

১. Cameron R. A Concise Economic History of the World. New York,1997 p 349
২. http//en.wikipedia.org/wiki/Fordney/E2/80/93/McCumber_Tariff. Accessed 18 March,2013
৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Smoot/E2/80/93/Hawley-Tariff-Act accessed 18 March 2013
৪. Madsen JB. Trade Barriers and the Collapse of World Trade During the Great Depression. Southern Economic Journal, 2001;67:,848-868
৫. Cameron R p 351
৬. Cameron R. p 352
৭. Harman C. A People's History of The World. London, 2008 p 466
৮. Day RB. The "Crisis" and the"Crash". London, 1981 p 80-81
৯. Cameron R. p 355
১০. Hobsbawm E. The Age of Extremes. London, 1994 p 91
১১. Hobsbawm E. p 97
১২. Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970, part Ic, Washington DC,1975 p 105
১৩. Hobsbawm E. p 100
১৪. Cameron R. p 356
১৫. Cameron R. p 357
১৬. Hobsbawm E. p 86
১৭. Harman C. p 513
১৮. Kindelberger CP. The World of Depression. London, 1973 p 272
১৯. Cameron R. p 360
২০. Rossi A. The Rise of Italian Fascism. London,1938 p 82,99,126
২১. Carrocci O. Italian Fascism, Harmondsworth. 1975 p 27
২২. Harman C. p 479
২৩. Harman C. p 481
২৪. Noakes J and Pridham G. Nazism 1919-45.Volume-1. The Rise to Power 1919-34 Exeter,1983 p 84
২৫. Beetham D. Marxists in the Face of Fascism. Manchester, 1983 p 248
২৬. Schweitzer A. Big Business in the Third Reich. Bloomington, 1963 p 95
২৭. Merson A. Communist Resistance in Nazi Germany. London,1986 p 29
২৮. Kindelberger CP. p 272
২৯. Harman C. p 514
৩০. Preis A. Labor's Giant Step. New York,1982 p 61
৩১. Widick BJ. Detroit, City of Race and Class Violence, Chicago,1972 p 74
৩২. Harman C. p 516
৩৩. Preis A. p 57
৩৪. Harman C. p 518

নবম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ার বিপ্লব

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লব এর ফলে ইউরোপের দেশগুলিতে শিল্প কারখানায় বড় আকারে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন হতে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রকৃতিই হল আরও বেশী উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রীর লভ্যাংশ দিয়ে আরও উৎপাদনের জন্য কল-কারখানা তৈরী করা, যাতে লাভ আরও বাড়ান যায়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য মহাদেশের দেশগুলিকে ব্যবহার করা হত কমদামে কাঁচামাল কেনার উৎস হিসাবে আর বেশী দামে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করার বাজার হিসাবে। এই দেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এভাবে তাদের ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না, তাই তাদের শাসনভার পুঁজিবাদী দেশগুলো নিয়ে নিয়েছিল তাদের উপনিবেশে পরিণত করে। উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলো তাদের উপনিবেশ বাড়ানর প্রতিযোগিতা শুরু করল। পৃথিবীর সব মহাদেশে তারা জোর করে এক একটা দেশ দখল করতে থাকল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউরোপের বাইরে মাত্র কয়েকটি হাতে গোনা দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন ছিল। পৃথিবীতে যখন আর নতুন উপনিবেশ করার আর সুযোগ রইল না, তখন পুঁজিবাদী দেশগুলো একে অন্যের উপনিবেশের উপর নজর দিল।

এই সময় ইংল্যান্ড ছিল পৃথিবীর সবচাইতে শিল্পোন্নত দেশ, আর তার ছিল সবচাইতে বড় সাম্রাজ্য। জার্মানী ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র শিল্পে প্রভূত অগ্রগতি করে ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। তাদের উৎপাদিত পণ্য ইংল্যান্ডের চাইতে দামেও কম ছিল। ফলে ক্রমেই তারা বাজার দখল করে নিচ্ছিল। জার্মানী শিল্প বিজ্ঞান ও শিক্ষায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিল, একটা শক্তিশালী সামরিক বাহিনীও গড়ে তুলেছিল। জাহাজ তৈরীতেও তারা উন্নতি করেছিল। জার্মানীর বাণিজ্যিক জাহাজগুলো জার্মানীর নিজস্ব পণ্য বহন তো করতই অন্যান্য দেশের পণ্য নিয়ে পৃথিবীর বড় বড় বন্দরগুলিতে যাওয়া আসা শুরু করেছিল। জার্মানী যুদ্ধ জাহাজও তৈরী করতে শুরু করল। জার্মানীর উপনিবেশও তেমন ছিল না। আর অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপনিবেশ দখল না করলে তার সাম্রাজ্য বাড়ানর সুযোগও ছিল না। আর সাম্রাজ্য না বাড়লে কাঁচামালের উৎস ও পণ্যের বাজারও বাড়ান যেত না-যেটা তার শিল্পের অগ্রযাত্রার জন্য ছিল প্রয়োজন।

উপনিবেশের প্রতিযোগিতায় শিল্পোন্নত দেশগুলি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছিল। দেশগুলি দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। একদিকে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া- আর একদিকে ছিল জার্মানী, অষ্ট্রীয়া ও ইতালী (ইতালী পরবর্তীতে অন্যপক্ষে যোগ দেয়)। যুদ্ধ প্রস্তুতিতে লাভবান হচ্ছিল অস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্পগুলি। সব দেশেই এই সব শিল্পের মালিকানায় অনেক রাজনীতিবিদের অংশ ছিল। রাজনীতিবিদরাও তাই যুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা করছিল।

এই সময় বলকান উপদ্বীপে সংঘাতময় পরিস্থিতি ছিল। এখানে ছিল বিভিন্ন জাতীয়তা-আর তাদের ছিল বিরোধ। বসনিয়া ছিল অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অংশ, সার্বিয়া ছিল পৃথক রাজ্য-তাদের মিত্র ছিল রাশিয়া। ১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে আততায়ীর হাতে নিহত হন। অষ্ট্রীয়া এটার জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করল। ২৮ শে জুলাই অষ্ট্রীয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। রাশিয়া শুরু করল যুদ্ধ প্রস্তুতি। ১ লা আগষ্ট জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করল রাশিয়া আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধের ফল হল বিপ্লব, বিশেষভাবে রাশিয়ার বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়া একটি পশ্চাদপদ দেশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচাইতে সংগঠিত ও শক্তিশালী বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এর মাধ্যমে, যা চল্লিশ বছরের মধ্যেই মানব জাতির এক তৃতীয়াংশকে সংগঠিত করে তার প্রভাব বলয়ে নিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রের কাঠামোই ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেম কাজ করলেও যতই যুদ্ধ সব রাষ্ট্রের মানুষকে হত্যা, ধ্বংস ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন করল ততই মানুষ যুদ্ধ বিমুখ হতে লাগল। দেশগুলিতে যারা যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন, যুদ্ধের শুরুতে তাদের পক্ষে কোন সমর্থন ছিল না। ১৯১৬ সাল নাগাদ তাদের পক্ষে অনেকেই এসে গেল। যুদ্ধের প্রয়োজনে সব যুদ্ধরত দেশেই বড় বড়

সমরাস্ত্র তৈরীর কারখানা তৈরী হয়েছিল, এখানে কর্মরত দক্ষ শ্রমিকেরা, যারা যুদ্ধ চালানর জন্য অপরিহার্য ছিল, তারা সংগঠিত হয়ে যুদ্ধবিরোধী অবস্থান নিয়েছিল। সমাজতন্ত্রী দলগুলো শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন নিয়ে পুঁজিবাদী যুদ্ধ বন্ধ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে এরকম সম্ভাবনা অনেক দেশেই আছে বলে মনে হচ্ছিল।

যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও পরাজয়ের কাছাকাছি রাশিয়া ছিল সমাজ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। প্রথম রাশিয়াতেই বিপ্লব শুরু হয়। "এই লুণ্ঠনের যুদ্ধের কারণে সামনের বছর গুলোতে ইউরোপে সর্বহারাদের গণজাগরণ ঘটবে" জুরিখে শ্রমিকদের এক সভায় লেনিন ১৯১৭ সালের জানুয়ারীতে একথা বলেন। ছয় সপ্তাহ পরে প্রথম অভ্যুত্থান ঘটে রাশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাদে। রাশিয়ার জারের ক্ষমতা এর দু সপ্তাহ আগেও একচ্ছত্র বলে মনে হচ্ছিল। তিনি ১৯১৭ সালের ২রা মার্চ সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হলেন। নভেম্বরের মধ্যে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। ১৯১৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ঘটবে তা কেউ মনে করেনি। ঐদিন "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মহিলাদের দিবস" পালিত হচ্ছিল। পেট্রোগ্রাদের গোপন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলি এই উপলক্ষে প্রচারপত্র ছেপেছিল ও সভার আয়োজন করেছিল, কিন্তু ধর্মঘট কেউ ডাকে নি, কারণ পরিস্থিতি জঙ্গী আন্দোলনের জন্য অনুকূল তা কেউ মনে করেনি।[১] যুদ্ধজনিত খাদ্য ঘাটতির জন্য মহিলারা ছিল বিক্ষুব্ধ, তারা ধর্মঘট করল ও অন্যান্য শ্রমিকদের যোগ দিতে আহ্বান জানাল। পরদিন এই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল। পেট্রোগ্রাদের চার লক্ষ শ্রমিকের প্রায় অর্ধেকই যোগ দিল। যুদ্ধ বন্ধ ও খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন শুরু হল। জারের সরকার এটা দমন করার জন্য সশস্ত্র পুলিশ পাঠাল আর যুদ্ধে যাওয়ার অপেক্ষায় যে সৈন্যদল ছিল তাদের পাঠাল। কিন্তু ধর্মঘটের চতুর্থ দিনে সৈন্যরাও বিদ্রোহ করল। শ্রমিক ও বিদ্রোহী সৈন্যরা সম্মিলিতভাবে পুলিশ ও সরকারী কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করা শুরু করল। বিদ্রোহ দমন করার জন্য অন্যান্য শহর থেকে সৈন্য আনার উদ্যোগ নিলে রেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করে তাতে বাধা দিল। যে সব সৈন্য আসতে পারল তারাও বিদ্রোহে যোগ দিল। রাশিয়ার অন্যান্য শহরেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। জারের সেনাধ্যক্ষরা তাকে বলল সিংহাসন না ছাড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। জার ২রা মার্চ সিংহাসন ছাড়লেন। শাসনকাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য দুটো সমান্তরাল সংগঠন দাঁড়িয়ে গেল। একটা হল জারের আমলের রাষ্ট্রীয় দুমার (duma) একটা অংশ। দুমা ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা-যদিও নির্বাচন সীমিত ছিল বিত্তশালী শ্রেণীর মধ্যে, তারাই দুমাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। অপর সংগঠনটি ছিল শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগোষ্ঠীগুলি যা ছিল সোভিয়েত (বা কাউন্সিল) নামে পরিচিত।[২] সোভিয়েতগুলির সম্মতি নিয়ে দুমা সরকার গঠন করল। দুমার অনেক সদস্যই জারের সরকারের সহযোগী ছিল এবং শিল্প কারখানার মালিক হিসাবে সরকারের কাছে যুদ্ধ সরঞ্জাম বিক্রি করে লাভ করছিল। কিন্তু জার এর পারিষদদের দুর্নীতিতে তারা ছিল বিক্ষুব্ধ। তারা চাচ্ছিল সংস্কার, বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা উৎখাতের কোন চিন্তা তাদের ছিল না। নতুন সরকার এই অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরী হল। অন্যদিকে "সোভিয়েত" গড়ে তোলা হয়েছিল প্রথমে বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার জন্য। বিদ্রোহী সৈন্যদের প্রতিনিধিরা যখন এতে যোগ দিল, তখন তা হয়ে দাঁড়াল সবধরনের বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তারা সৈন্য বাহিনীর খাদ্য সরবরাহের কাজ করতে লাগল। এছাড়া শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, জারের আমলের পুলিশ ও সরকারী কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার, জনসাধারণকে ঘটনা প্রবাহ সম্মন্ধে অবহিত রাখার জন্য পত্রিকা প্রকাশ করা, এগুলোও তারা করতে লাগল। দেশের অন্যান্য স্থানেও এই আদলে সোভিয়েত গড়ে উঠল এবং তারা পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েতের নির্দেশাবলী মেনে কাজ করতে লাগল। কার্যত এরাই সরকারের সব কর্মকান্ড চালাচ্ছিল কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের দায়িত্ব না নিয়ে তা দুমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। শ্রমিকদের সোভিয়েতগুলো জারের আমলে নিষিদ্ধ ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর দ্বারা কমবেশী প্রভাবিত ছিল। এই দলগুলোর নেতাকর্মীরা অনেকেই ছিলেন কারাবন্দী, অনেকে আত্মগোপন করে ছিলেন, অনেকে ছিলেন নির্বাসনে। কিন্তু তাদের নেতাদের আদর্শ ও ভাবমূর্তি শ্রমিকদের অনেককেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এই দলগুলোর কোনটাই এই সময় দুমার ক্ষমতা নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানায় নাই বা শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করে নি। আন্দোলনের কৌশল নিয়ে এই দলগুলোর মধ্যে মত পার্থক্য ছিল তবে একটা বিষয়ে মোটামুটি সবাই একমত ছিল-এই বিপ্লব হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। রাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র স্থাপন করা হবে-যদিও এই গণতন্ত্রে মুখ্য ভূমিকা থাকবে ধনিক শ্রেণীর। পুঁজিবাদ বিকশিত হবে। পেট্রোগ্রাদে বলশেভিক দলের প্রথম যে দুজন নেতা এসে পৌঁছুলেন, ষ্ট্যালিন ও মলোটভ, তারা দুমার সমর্থিত অন্তর্বর্তী সরকারকে মেনে নিলেন। একজন নেতা দ্বিমত পোষণ করেছিলেন-তিনি ছিলেন লিও ট্রটস্কী। তাঁর মতে এই বিপ্লব সর্বহারাদের বিপ্লব হতে পারে, কিন্তু তিনি তখন ছিলেন বলশেভিক দলের বাইরে এবং আমেরিকায়

নির্বাসনে। দুমার সরকারকে সোভিয়েত সমূহের শ্রমিক প্রতিনিধিরা তাদের স্বার্থের অনুকূল মনে করে নি। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে তারা যেতে পারেনি। বিপ্লবী সৈন্যরা অবশ্য আরও সহজে দুমার সরকার মেনে নিয়েছিল।

পশ্চাদপদ সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়ান সাম্রাজ্যকে জারতন্ত্র জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। জার্মানী ছিল তৎকালীন বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে। ফল হয়েছিল যুদ্ধে ব্যাপক হতাহত, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলে শহরে খাদ্য ঘাটতি ও শহরের শ্রমজীবী মানুষের দুর্গতি। অথচ শাসক শ্রেণী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাচ্ছিল, কারণ পুঁজিপতিরা যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদন করে প্রচুর মুনাফা করছিল, আর যুদ্ধের মাধ্যমে নতুন সাম্রাজ্য জয় করে উৎপাদিত পণ্যের বাজার বাড়াতে চাচ্ছিল। শহরের দরিদ্র মানুষের দাবী ছিল খাদ্য, শ্রমিকদের দাবী ছিল বেতনবৃদ্ধি। আর রাশিয়ার শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ ছিল কৃষিজীবী, তাদের দাবী ছিল জমি। এরা সবাই চাইছিল যুদ্ধ শেষ করতে।

ফেব্রুয়ারী মাসে বলশেভিকরা সংখ্যায় কম ছিল, তাদের চাইতে সোশ্যাল রিভলিউশনারী দল (Social Revolutionary) এর সমর্থন ছিল বেশী।[৩] দুমার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং রিভলিউশনারী দলের বড় অংশ এতে সমর্থন দেয়। বলশেভিকরা যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষে দাঁড়ায়। বলশেভিক দলের সঙ্গে অন্যান্য দলের একটা পার্থক্য ছিল, সেটা হল বিপ্লবের প্রায় ১৫ বছর আগে থেকে তারা শ্রমিকদের মধ্যে একটা অংশের সমর্থন তৈরী করেছিল। রাশিয়া শিল্পে পশ্চাদপদ হলেও পেট্রোগ্রাদে অনেকগুলি কারখানা ছিল-যার মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ। এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন সুইজারল্যান্ডে নির্বাসন থেকে রাশিয়া ফিরে আসেন এপ্রিল মাসে। ১৯০৬ সাল থেকে লেনিনের মত ছিল রাশিয়ার বিপ্লব হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। কিন্তু রাশিয়া সহ ইউরোপের অনেক দেশে বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতিতে তাঁর মত পরিবর্তন হল।[৪] লেনিন এসে যে অবস্থান নিলেন তা হল এই পুঁজিবাদ রাশিয়ায় সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। শ্রমিকশ্রেণী জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সবচাইতে গণতান্ত্রিক পন্থা ব্যবহার করেছে, তারা ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের চাইতেও সংখ্যায় বেশী কৃষকশ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে। কাজেই ক্ষমতা হাতে নেওয়া দরকার। লেনিনের বক্তব্যের বিরোধিতা করল বেশীর ভাগ বলশেভিক। দু সপ্তাহের মধ্যে লেনিন তার পক্ষে নিয়ে আসলেন দলের অধিকাংশ মানুষকে, তবে শ্রমিকদের বড় অংশকে পক্ষে নিয়ে আসতে সময় লাগল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান, শ্রমিকদের প্রতিটি আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ, ও বড় ভূস্বামীদের কাছ থেকে কৃষি জমি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিতরণের দাবীর সাথে বলশেভিকরা দাঁড়ানতে তাদের সমর্থন বাড়তে থাকল। ১৯১৭ সালের মার্চে তাদের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার, কয়েকমাসের মধ্যেই তা বেড়ে আড়াই লক্ষের উপরে চলে গেল। লেনিন ও বলশেভিকদের প্রধান হাতিয়ার ছিল জনগণ কি চায় তা সঠিকভাবে বুঝতে পারা ও তার পক্ষে অবস্থান নেওয়া। যেমন বলশেভিকরা যখন বুঝতে পারল কৃষকেরা চায় জমি তখন তারা এটার পক্ষে দাঁড়াল, যদিও এটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাশিয়া ছিল অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নতির দিক দিয়ে পশ্চাদপদ দেশ। মার্কস ও তাঁর অনুসারীরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি স্থাপনের যে সব পূর্বশর্ত প্রয়োজন বলে বর্ণনা করেছিলেন তা তৎকালীন রাশিয়াতে ছিল না। রাশিয়ান বিপ্লবের নেতারা ধারণা করেছিলেন রাশিয়ার বিপ্লব ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাতে স্ফুলিঙ্গের কাজ করবে।[৫]

দুমার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাস্তবতা বুঝতে পারে নি। পুঁজিবাদীরা কারখানার শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য আইন খাটানর চেষ্টা করল। সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। ১৯১৭ সালের জুন মাসে যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে নতুন আক্রমণ শুরু করার চেষ্টা করল তখন সৈন্যরা সৈন্যবাহিনী ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে বড় ভূস্বামীদের জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া শুরু করল। বলশেভিকদের প্রভাব ও সমর্থন বাড়তে লাগল। বড় দুটি শহর পেট্রোগ্রাদ ও মস্কোতে তারা হয়ে গেল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সৈন্যবাহিনীতেও তাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হয়ে গেল দুর্বল। আগষ্ট মাসে একজন জারতন্ত্রপন্থী জেনারেল (জেনারেল কর্ণিলভ) সরকার উৎখাত করার জন্য বাহিনী নিয়ে পেট্রোগ্রাদের দিকে অভিযান চালান। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিরোধ করার জন্য বিপ্লবীদের সাহায্য নিতে বাধ্য হলেন, এরপরও ক্ষমতা নেওয়া অবধারিত ছিল না। ২৫ শে অক্টোবর নিখিল রাশিয়া সোভিয়েতের কংগ্রেস এর সভায় ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে সংখ্যাধিক্য ছিল। কিন্তু জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের নেতৃত্বে

একটি অংশ এর বিরোধিতা করে। লেনিন ও ট্রটস্কী (যিনি আগেই বলশেভিক দলে যোগ দিয়েছিলেন) ক্ষমতা নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। দেরী করলে জনগণ বিভ্রান্ত হবে এবং এর সুযোগে ধনিকশ্রেণী শ্রমিকদের আন্দোলন ও সংগঠন ধ্বংস করবে এটা তারা বল্লেন।

২৫শে অক্টোবর (পুরনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) সোভিয়েত সমর্থকরা দুমার অন্তর্বর্তীকালীন (Provincial) সরকারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে ক্ষমতা দখল করল। ফেব্রুয়ারী মাসের বিপ্লবের চাইতে অক্টোবর বিপ্লবে সংঘর্ষ ও রক্তপাত কম হয়েছিল। এই কারণে ডানপন্থী ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ বলেন যে এটা বিপ্লব ছিল না, ছিল অল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা অভ্যুত্থান, জনসাধারণের সমর্থন এতে ছিল না।[৬] কিন্তু সংগঠিত প্রতিনিধিসভা সোভিয়েতের মাধ্যমে ব্যাপক জনসমর্থন থাকা, শ্রমিক, সৈন্যবাহিনী ও জনসমর্থন থাকার কারণেই অক্টোবর বিপ্লবে সংঘর্ষ ও রক্তপাত কম হয়েছিল।

বিপ্লবী সরকার কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। জনগণ যুদ্ধ চাচ্ছিল না। শহরের মানুষ চাচ্ছিল খাদ্য। গ্রামের মানুষ চাচ্ছিল জমি, দেশের সংখ্যাধিক জনগণ যারা ছিল কৃষক-তারা সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছিল এই কারণে যে তারা জমি পাবে। শহরের মাথাপিছু খাদ্য ছিল তখন প্রায় ১৫০০ ক্যালরী। শহরের কারখানাগুলোতে উৎপাদন বাড়িয়ে গ্রামের কৃষকদের চাহিদা পূরণ করতে পারলে তবেই কৃষকদের শহরে খাদ্য সরবরাহ করতে রাজী করান যেত। এটা ছিল বেশ কঠিন। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিপ্লব হয়ে সেখানকার সাহায্য না পেলে এটা সম্ভব ছিল না। ১৯১৮ সালে লেনিন বলেছিলেন জার্মানীতে বিপ্লব না হলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।[৭] নবগঠিত সোভিয়েত সরকার রাশিয়াকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। প্রায় ছয়মাস স্থায়ী আলোচনার পর ৩রা মার্চ ১৯১৮ সোভিয়েত রাশিয়া তাদের দিক থেকে অবমাননাকর ও ক্ষতিকর শান্তি চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হল। বলশেভিক দলের একটা অংশ এবং তাদের সহযোগী সোশ্যাল রিভলিউশনারী দল এই রকম ক্ষতিকর চুক্তির বিপক্ষে ছিল। লেনিন যুক্তি দিলেন রাশিয়ার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার শক্তি নাই। অন্যান্য দেশে বিপ্লবী আন্দোলন সফল হল না। অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী ও জার্মানীতে ১৯১৮ সালের জানুয়ারীতে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন হল, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত দমন করা হল। এদিকে জার্মান বাহিনীও রাশিয়ার অভ্যন্তরে এগিয়ে যেতে লাগল। লেনিন বলশেভিক দলের অধিকাংশকে শান্তিচুক্তি মেনে নিতে রাজী করাতে পারলেন। এই চুক্তির ফলে পূর্বতন রাশিয়ান সাম্রাজ্যের এক চতুর্থাংশ জনসংখ্যা হারাতে হল, এক চতুর্থাংশ শিল্প কারখানাও হারাতে হল আর কয়লা খনির নয় দশমাংশ হারাতে হল।[৮] এছাড়া এই অঞ্চল হতে রাশিয়ার অধিকাংশ খাদ্যশস্য আসত। রাশিয়ার শিল্প উৎপাদন যুদ্ধ বিপর্যস্ত তো ছিলই (যুদ্ধের আগের তুলনায় ১৯২১ সালে রাশিয়ার অর্থনীতির আকার ছিল এক দশমাংশ), এর পর জ্বালানীর অভাবে তা আরও সংকুচিত হল। শহরগুলিতে খাদ্য সংকট আরও বাড়ল। পেট্রোগ্রাদে মাথাপিছু রুটির বরাদ্দ কমিয়ে ২৭শে জানুয়ারীতে করা হল ১৫০ গ্রাম, ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে আরও কমিয়ে করা হল ৫০ গ্রাম। পেট্রোগ্রাদের শ্রমিক শ্রেণীর উপর এর প্রভাব ছিল ধ্বংসাত্মক। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসের পর তিন মাসে মানুষ শতকরা ৬০ ভাগ কমে গেল। ১৯১৮ সালের প্রথম ছয় মাসে খাদ্যের অভাবে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ পেট্রোগ্রাদ ছেড়ে চলে গেল। কয়েক মাসের মধ্যেই পেট্রোগ্রাদের সাহসী শ্রমিক শ্রেণী যারা বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল তাদের একটা বড় অংশ হারিয়ে গেল।[৯] শ্রমিকশ্রেণীর যে অংশ শিল্প উৎপাদনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল তারা আর থাকল না। তাদের গড়া সোভিয়েতগুলো থাকল কিন্তু শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ হারিয়ে গেল। বিপ্লবের উদ্দীপনা তার পরেও থাকল, আরও অনেক শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক বলশেভিকদের দলে যোগ দিল। লিও ট্রটস্কী প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যের লাল ফৌজ (Red Army) গড়ে তুললেন। কিন্তু সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণী আগের মত সোভিয়েত সমূহ, বলশেভিক দল ও লালফৌজের অংশ থাকল না।[১০]

দীর্ঘমেয়াদে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল ও রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্থাপন নির্ভর করছিল "বিশ্ব বিপ্লব" বা অন্ততঃপক্ষে ইউরোপীয় দেশসমূহে বিপ্লব হওয়ার উপর। যতদিন তা না হয় ততদিন বলশেভিকদের ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে, লক্ষ হচ্ছে সমাজতন্ত্র স্থাপন, এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল আর শ্রমিকদের কল-কারখানার নিয়ন্ত্রণ নিতে বলা হয়েছিল। এছাড়া বিপ্লবী সরকার সমাজতন্ত্র স্থাপন করার জন্য বড় কোন পদক্ষেপ নেয় নাই।[১১]

সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল কয়েকটা ডানপন্থী গোষ্ঠী, এর মধ্যে ছিল জারপন্থীরা, বলশেভিকদের বামপন্থী বিরোধীরা,ও বিদেশী সমর্থনে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর (চেক, পোলিশ) বাহিনী। ১৯১৮ সালের জুন ও জুলাই মাসে ফ্রান্স ও বৃটেন সোভিয়েত বিরোধী বাহিনী সংগঠিত করল। ত্রিশ হাজার চেকোশ্লোভাক সৈন্য ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেল পথের অনেকটা এলাকা দখল করে রাশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। এদের ছত্রছায়ায় দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও মেনশেভিকরা Saratov এ সরকার গঠন করল। বলশেভিক সন্দেহ হলেই এরা তাদের হত্যা করা শুরু করল।[১২] জাপানী সৈন্যরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ভ্লাদিভষ্টক দখল করল। বৃটিশরা উত্তরে মুরমানস্ক ও দক্ষিণে বাকু দখল করল। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী এই আভ্যন্তরীন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে সবচাইতে কঠিন সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ একটা ক্ষুদ্র এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল, যা ছিল ভূ-বেষ্টিত-সমুদ্রে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ দুটো মিলিয়ে বিপ্লবী সরকারের চরিত্রে পরিবর্তন আনল। ভিক্টর সার্জ নামে এক বলশেভিকের ভাষায় -প্রজাতন্ত্রের সমস্ত ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীন গণতন্ত্র ছিল। তখনও দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বা দলে কয়েকজন নেতার একনায়কত্ব হয় নাই। ধনী কৃষকদের বিদ্রোহ, বলশেভিকদের সাথে বামপন্থী সোশ্যাল রিভলিউশনারীদের মৈত্রীর অবসান এবং একই সময়ে মিত্র শক্তির (বৃটেন, ফ্রান্স), ইত্যাদির আক্রমণ প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করল। সর্বহারাদের একনায়কত্ব গণতান্ত্রিক ও যে পদ্ধতিগুলো ছিল তা বাদ দিতে হল। দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতার ফলে রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল। ষড়যন্ত্রের ফলে আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হল।[১৩] অন্যান্য দলের সঙ্গে মৈত্রী ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে একছত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা আসল। এই সময় প্রথম বারের মত বিপ্লবী সরকার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সন্ত্রাস ব্যবহার করতে বাধ্য হল। প্রতিবিপ্লবীরা বিপ্লবের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সন্ত্রাস এর আগে থেকেই ব্যবহার করা শুরু করেছিল ("শ্বেত সন্ত্রাস")। বিপ্লবের সমর্থকরা মনে করল তাদের সন্ত্রাস প্রয়োগ করার বিকল্প নাই। যাদের প্রতিবিপ্লবী সন্দেহ করা হত তাদের মেরে ফেলা হত। ধনিক শ্রেণীর সদস্যদের জিম্মি করা ও অন্যান্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিরোধীদের দমন করা বৈপ্লবিক কর্মধারার অংশ হয়ে পড়ল।[১৪] এটা ছিল সত্যিকারের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা ব্যবস্থা। গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯২১ সালে এটাও শেষ হয়।

জার্মান আক্রমণ ও কঠোর শর্তে সন্ধি চাপিয়ে দেওয়া, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক ধ্বস, গৃহযুদ্ধ ও প্রতিবিপ্লব, অনেকগুলো বিদেশী শক্তির সামরিক হস্তক্ষেপের পরও সোভিয়েত রাশিয়া টিকে গেল। অনেকেই মনে করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে পড়বে। টিকে গেল প্রধানতঃ তিনটি কারণে- প্রথমতঃ তার ছিল প্রায় ছয় লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত কমিউনিষ্ট পার্টি, বিপ্লবের পর এর শক্তি আরও বেড়েছিল ও সংহত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ যারা কমিউনিষ্ট সমর্থক নয় কিন্তু দেশপ্রেমিক এমন রাশিয়ানরাও বুঝতে পেরেছিল একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই রাশিয়ার ঐক্য ধরে রাখতে পারে ও অরাজকতা রোধ করতে পারে। তৃতীয়তঃ দরিদ্র কৃষকরাও বিপ্লবের মাধ্যমে জমি পেয়েছিল, দেশের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী ও যারা সোভিয়েত রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী ও রাষ্ট্রযন্ত্রে বড় অংশ ছিল, তারাও বিপ্লবের পক্ষে ছিল।[১৫]

গৃহযুদ্ধের ফলে ব্যাপক ধ্বংস ও ক্ষতি হয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল, বিশেষত রেলপথ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রেলপথে খাদ্য ও জ্বালানী বহন অনেক কমে গিয়েছিল। শহরের অধিবাসীদের প্রথমে জ্বালানী তৈল সরবরাহ তারপর কয়লা সরবরাহ কমে গেল। শহর ছেড়ে মানুষ চলে যেতে লাগল। উত্তরাঞ্চলের শহরগুলিতে (যে গুলো ছিল খাদ্য ও জ্বালানী থেকে দূরে) জনসংখ্যা গড়ে এক চতুর্থাংশ কমে গেল।[১৬] উত্তরাঞ্চলের শহরগুলোর অধিবাসীরা দক্ষিণে (যেখানে খাদ্য উৎপাদন হত) চলে যেতে লাগল। বিশেষ করে শহরের শ্রমিকরা খাদ্যাভাবের কারণে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে লাগল। শ্রমিকের অভাবে শিল্প উৎপাদন কমে গেল। এ ছাড়া শহরের শ্রমিক শ্রেণী ছিল বলশেভিক দলের মূল সমর্থক। তাদের সংখ্যা কমে গেল ও যারা থাকল তাদের মধ্যেও বলশেভিকদের সমর্থন কমে গেল। মানুষ তাদের ব্যক্তিগত মূল্যবান জিনিষ বিক্রি করে খাবার কিনা শুরু করল। কালো বাজারে জিনিষপত্রের লেন দেন হতে থাকল। এর উপর ১৯২০-২১ সালে অনাবৃষ্টির কারণে খাদ্যাভাব হয়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ভলগা অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেল। ১৯২১ সালে মস্কো শহরে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করা শুরু করল।[১৭] ১৯১৩ সালের তূলনায় (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে) ১৯২০ সালে কৃষি উৎপাদন ছিল শতকরা ২০ ভাগ আর শিল্প উৎপাদন ছিল শতকরা ১৩ ভাগ।[১৮]।

এই পরিপ্রেক্ষিতে লেনিন ১৯২১ সালে New Economic Policy (NEP) ঘোষণা করলেন।[১৯] এটা নিয়ে সোভিয়েত নেতৃত্বে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল, অনেকেই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এটা সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মনে করেছিলেন। লেনিন বেশীরভাগ নেতাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন ও নিখিল রাশিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে এটা গৃহীত হয়।[২০] শিল্প উৎপাদনে ব্যক্তি মালিকানায় ছোট ছোট শিল্প কারখানা স্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হল। বৃহৎ শিল্প, ব্যাংক, ও বৈদেশিক বাণিজ্য থাকল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। কৃষকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক শস্য নিয়ে নেওয়া বন্ধ করা হল। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য কৃষকরা রাষ্ট্রকে দিতে বাধ্য থাকল- বাকী শস্য তাদের বাজারে বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হল। NEP-র একটা প্রধান লক্ষ ছিল খাদ্যশস্য উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করা। এটা করা হল যেহেতু কৃষকরা তখনও যৌথ খামার গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। NEP-র ফলে সরকারী পদগুলোতে দক্ষ পেশাজীবীদের যেমন-প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক ইত্যাদি, নেওয়ার ব্যবস্থা হল। এতে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একটা আলাদা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হল। আরও ছিল ছোট শিল্পের মালিকেরা, সমৃদ্ধ কৃষক, যারা অন্য মানুষদের তাদের জমিতে কাজ করাত, এরা সবাই ছিল সমাজতন্ত্রের বিরোধী। এরা NEP-র এর লোক (NEP-men) নামে পরিচিত ছিল।

NEP- র ফলে কৃষি উৎপাদন পরের বছরই (১৯২২-২৩) শতকরা ৪০ ভাগ বাড়ল। দেশের বড় শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ছিল এবং সে গুলোর উৎপাদন বাড়ানর আলাদা উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই, তাই তুলনামূলকভাবে পরবর্তী বৎসরগুলিতে কৃষি উৎপাদন বেশী বাড়ল। প্রথম মহাযুদ্ধ ও পরবর্তীতে গৃহযুদ্ধের ফলে যে ব্যাপক ধ্বংস ও ক্ষতি রাশিয়ার হয়েছিল তা পূরণ করতে NEP সক্ষম হল। ১৯২৮ সাল নাগাদ প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ১৯১৩ সালে রাশিয়ার কৃষি ও শিল্প উৎপাদন যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায়ে ফিরে গেল।

সমাজতন্ত্র গঠনের ব্যাপারে দুজন প্রভাবশালী নেতা লিও ট্রটস্কী ও যোসেফ ষ্ট্যালিন এর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। ট্রটস্কী ও তাঁর সমর্থকরা মনে করতেন রাষ্ট্রকে সব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। উদ্বৃত্ত সম্পদ দ্রুত শিল্পায়নের কাজে লাগাতে হবে। এছাড়া সোভিয়েত রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারবে না। ষ্ট্যালিন ও তার সমর্থক রক্ষণশীলরা NEP- র সমর্থক ছিলেন ও মনে করতেন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প থাকবে, কিন্তু সব শিল্প এবং কৃষি উৎপাদন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া সময় সাপেক্ষ।

লেনিনের মৃত্যুর সময় সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি অনুগত ছিল এই কারণে যে, যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন ও সিদ্ধান্ত দিতেন তাদের এই আনুগত্য ছিল। কিন্তু বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেছিল। দল নির্ভর করতে লাগল রাষ্ট্রযন্ত্রের আমলাদের উপর ও যাঁরা অর্থনীতি পরিচালনায় সহযোগিতা দিতেন NEP-men দের উপর। শ্রমিকদের স্বার্থ কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছিল। ট্রটস্কীর নেতৃত্বে দলের একটি অংশ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন, এদের বক্তব্য ছিল শিল্প কারখানা তৈরী করার দিকে জোর দিতে হবে, তাতে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বাড়বে। সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন গণতন্ত্র ভিত্তিক হতে হবে। দলে আমলাদের প্রভাব কমাতে হবে। যতদিন বিপ্লব অন্যান্য দেশে সফল না হচ্ছে ততদিন শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র এভাবে টিকিয়ে রাখতে হবে।[২১] দলের নেতৃত্বে প্রভাবশালী অংশে ছিল ষ্ট্যালিন, বুখারিন, কামেনেভ, জিনোজিয়েভ। এরা ট্রটস্কীর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করলেন। ট্রটস্কীকে "লালফৌজ" এর প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। এই পর্যায়ে ষ্ট্যালিন ও তার সহযোগীরা এক দেশে সমাজতন্ত্র (socialism in one country) এই মত প্রকাশ করেন। এর আগে বলশেভিক নেতাদের মত ছিল শ্রমিকরা একটি দেশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে কিন্তু পূর্ণ সমাজতন্ত্র অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিপ্লব না হলে সম্ভব হবে না। ষ্ট্যালিন নিজেও এ কথা ১৯২৪ সালে প্রকাশিত "লেনিন ও লেনিনবাদ" নামক বইয়ে লিখেছিলেন।[২২] এইমত পরিবর্তন করে তারা এক দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপনের লক্ষ্য ঘোষণা করলেন। এর বিরোধীদের তারা দল থেকে বহিষ্কার করলেন। অনেককে দেশের দূরবর্তী অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর ট্রটস্কীকে নির্বাসনে পাঠান হল।

এরপরও ১৯২৮ সালে দেশের আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি নিপীড়নমূলক ছিল না। গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সন্ত্রাস বিরোধী ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হয়েছিল। শান্তিকালীন পরিস্থিতি ফিরে এসেছিল, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা হচ্ছিল, সব ব্যাপারেই আইনের শাসন প্রচলন করা হয়েছিল।[২৩] কিন্তু অর্থনীতি নির্ভর করছিল কৃষি উৎপাদনের উপর। বড় কৃষকেরা (Kulak নামে পরিচিত) শহরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করত কিন্তু তাদের চাহিদা মেটানর জন্য যথেষ্ট শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছিল না। ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি তারা শহরে খাদ্য সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানাল। এদিকে সোভিয়েত সরকারকে উৎখাত

করার আন্তর্জাতিক চক্রান্ত থেমে যায় নি। এই সময় গ্রেট বৃটেন ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সবচাইতে বড় অংশীদার। গ্রেট বৃটেন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বাণিজ্য বন্ধ করে দিল। সোভিয়েত রাশিয়া সংকটে পড়ল।[২৪] দলে অস্থিরতা দেখা দিল। নেতাদের ক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ হল। দল দুই মতে ভাগ হয়ে গেল। বুখারিন ও তার সঙ্গীরা আগের নীতিতেই চলতে চাইল, এতে ধনী কৃষকদের হাতে আরও ক্ষমতা দিতে হত-আর আন্তর্জাতিক চাপের মোকাবিলা করার শক্তিও কমে যেত। ষ্ট্যালিন প্রথমদিকে দোদূল্যমান ছিলেন। কিন্তু তিনি কৃষকের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে শস্য নিয়ে দ্রুত শিল্প কারখানা গড়ে তোলার নীতিগ্রহণ করলেন, যা ছিল ট্রটস্কীর নীতি। এ নীতির পক্ষে ছিল আমলারা আর শিল্প কারখানার ম্যানেজাররা। এরা অনেকেই তখন দলের সদস্য হয়ে গেছে। এই নীতির ফলে পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলির মত বেশী সংখ্যক উন্নত ধরনের যুদ্ধাস্ত্র যেমন ট্যাংক, উড়োজাহাজ, যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি বানানও সম্ভব ছিল। ষ্ট্যালিন বললেন- আমরা উন্নত দেশগুলির চাইতে ৫০ বা ১০০ বছর পিছিয়ে আছি। দশ বৎসরের মধ্যে আমরা যদি তাদের সমকক্ষ হতে না পারি তা'হলে তারা আমাদের ধ্বংস করবে।[২৫]

যে সমস্ত শিল্প কারখানা অন্যান্য শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি তৈরী করতে প্রয়োজন হয় সেগুলোতে বেশী বিনিয়োগ করা শুরু হল। এই ধরনের উৎপাদনমূলক শিল্পে বিনিয়োগ ১৯২৭-২৮ সালে ছিল ৩২.৮ শতাংশ তা ১৯৩২ সালে হল ৫৩.৩ শতাংশ, আর ১৯৫০ সালে হল ৬৮.৮ শতাংশ।[২৬] ভোগ্যপণ্য তৈরীর কারখানায় বিনিয়োগ কমে গেল। ফলে কৃষকেরা খাদ্য শস্যের বিনিময়ে যে ভোগ্য পণ্য পেত তা কমে গেল। ষ্ট্যালিনের সরকার কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য আদায় করার জন্য তাদের জমি অধিগ্রহণ করে "যৌথ খামার" স্থাপন করল। লক্ষ লক্ষ ছোট ও মাঝারি কৃষকের জমি নিয়ে নেওয়া হল। এই নীতি জোর খাটান ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। জমি অধিগ্রহণে কৃষকদের চরম দুর্ভোগ হল। খাদ্যশস্য নিয়ে নেওয়ার ফলে অনেকেরই খাদ্যাভাব হল। যারা প্রতিরোধ করল তাদের দমন করা হল। অনেককে দূর অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। শ্রমিকদের মজুরী আরও কমিয়ে দেওয়া হল-পাঁচ বছরে তাদের আয় আগের তুলনায় অর্ধেক হয়ে গেল।[২৭] শ্রমিকদের অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শ্রমিক সংগঠণগুলোকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হল। অনেক প্রতিবাদীকে নির্বাসনে labour camp এ পাঠান হল। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে নির্বাসনে labour camp এ পাঠান মানুষের সংখ্যা বিশগুণ বেড়ে গেল। আমলাতন্ত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও এই নীতির সমালোচনা দমন করা হল। দলের মধ্যেও বিতর্ক বন্ধ করা হল। দ্বিমত পোষনকারীদের কারাগারে পাঠান হল। অনেককে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল। ১৯২১ সালে যত মানুষকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল ১৯৩৭ সালে তার চাইতে ৪০ গুণ বেশী মানুষকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাল যখন লেনিনের সময়কার (১৯১৭ সাল) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যে কয়জন সদস্য অবশিষ্ট ছিল তাদের ১৯৩৬-৩৭ সালে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল, ষ্ট্যালিন, কোল্লোনতাই ও ট্রটস্কী ছাড়া।[২৮] আলেকজান্দ্রা কোল্লোনতাই তখন সুইডেনে রাষ্ট্রদূত ছিলেন আর ট্রটস্কী ছিলেন নির্বাসনে। ১৯৪০ সালে ট্রটস্কীকে ষ্ট্যালিনের এজেন্টরা নির্বাসনে হত্যা করে। লেনিনের প্রদর্শিত নীতি ষ্ট্যালিন পরিচালনা করেছিলেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে ১৯২০ সালে বলশেভিক দলের সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে মাত্র ছয়জনে একজন ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। বাকীদের অনেককে শ্রমশিবির (labour camp) এ পাঠান হয়েছিল, অনেককে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল।[২৯]

শিল্পোন্নয়নে পশ্চিমা দেশগুলির সমপর্যায়ে আসার জন্য ষ্ট্যালিন পুঁজি সংগ্রহের জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করে মোট উৎপাদন কমে গেলেও সরকার যে অংশ নিতেন তা বাড়ান হল।। লক্ষ লক্ষ কৃষক শহরে আসতে লাগল, তাদের কারখানার শ্রমিক হিসাবে কাজ করান গেল। শ্রমিকদের আয় কমিয়ে ও সুযোগ সুবিধার জন্য সংগঠন করার ক্ষমতা খর্ব করে আরও বেশী কাজ আদায় করা হল। বৃটিশ পুঁজিবাদ পুঁজি তৈরীর সময় তাদের কৃষকদের জমি নিয়ে, enclosure এর মাধ্যমে, শহরে আসতে বাধ্য করেছিল। তারাও শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ না করে দিনে ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা খাটাত, এমনকি নারী ও শিশু শ্রমিকদেরও। বৃটিশ পুঁজিবাদ ভারত, আফ্রিকা ও অন্যান্য উপনিবেশে লুটপাটের মাধ্যমে যে পুঁজি আহরণ করে দেশে আনত, রাশিয়া উপনিবেশ থেকে পুঁজি সংগ্রহের সুযোগ ছিল না। বৃটেনের পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ে প্রথমে ছোট ছোট শিল্প কারখানা কাজ শুরু করে কয়েকশত বৎসর ধরে বড় বড় শিল্পে রূপান্তর ঘটেছিল । ষ্ট্যালিনের সেই সময় ছিল না। সামরিক শক্তিতে পশ্চিমা দেশগুলির সমকক্ষ হতে হলে সেই দেশগুলোর মত বড় বড় শিল্প কারখানা ও অবকাঠামো দরকার ছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল দুই দশকের মধ্যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিতভাবে

শিল্প কারখানা গুলোতে কৃষি উৎপাদনের উদ্বৃত্ত আহরণ করে, শ্রমিকদের কঠিন শ্রম ও সমস্ত দেশের বিশাল দুঃখ কষ্টের মাধ্যমে।[৩০]

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু করা হয় ১৯২৮ সালে। উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে শিল্প, সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা। প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়া হয়। অবিশ্বাস্য রকমের উচ্চ লক্ষমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল, কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমনঃ সামগ্রিক শিল্প উন্নয়ন শতকরা ২৫০ ভাগ বেশী, ভারী শিল্প উৎপাদন শতকরা ৩৩০ ভাগ বেশী। এ সত্বেও উল্লেখযোগ্য অর্জন হয়েছিলঃ[১৮]

সূচক	১৯২৯ সাল	১৯৩২ সাল
ইস্পাত উৎপাদন	৪ মিলিয়ন টন	৫.৯ মিলিয়ন টন
কয়লা উৎপাদন	৩৫.৪ মিলিয়ন টন	৬৪.৩ মিলিয়ন টন
জ্বালানী তৈল উৎপাদন	১১.৭ মিলিয়ন টন	২১.৪ মিলিয়ন টন
বিদ্যুৎ উৎপাদন	৫.০ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা	১৩.৪ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এক বছর আগেই ১৯৩২ সালে সমাপ্ত করা হয়। এই পরিকল্পনার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ভারী শিল্পে আরও অগ্রগতি আনে। ইস্পাত উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর কাছাকাছি চলে যায়। রেলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত ও কার্যকর হয়। তবে কয়লা ও জ্বালানী তেল উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি। ভারী শিল্প অগ্রাধিকার পাওয়ায় ভোগ্যপণ্য সরবরাহের পরিমাণ ও গুণগতমান কমে যায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৩৮ সালে শুরু হয় ও জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের কারণে ১৯৪১ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন বাড়ান হয় ও যুদ্ধ আক্রান্ত এলাকাসমূহের আরও পূর্বদিকে উরাল পর্বতমালার পর নতুন যুদ্ধাস্ত্র কারখানা গড়ে তোলা হয়। লক্ষমাত্রা সর্বক্ষেত্রে অর্জিত না হলেও পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রচেষ্টা বিপুল অর্জন এনে দেয়। ত্রিশের দশকে ১২ থেকে ১৩ শতাংশ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনা ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চলে। যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারী হিসাবে ৯৮ হাজার যৌথ খামার ধ্বংস হয়। ১৩৭,০০০ ট্রাক্টর, ৪৯,০০০ হারভেষ্টর (শস্য সংগ্রহের যন্ত্র) নষ্ট হয়, ৩৫ হাজার শিল্প কারখানা যা মোট শিল্প কারখানার ২৫ শতাংশ, ধ্বংস হয়। প্রায় ৭০,০০০ গ্রাম, ৪,৭০০ শহর (শহরের ঘর বাড়ীর প্রায় ৪০ শতাংশ) নষ্ট হয়। সরকারী হিসাবে প্রায় ৭৫ লক্ষ সৈন্য নিহত হয়, প্রায় সর্বমোট ২ কোটি মানুষ মারা যায়। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় অর্ধেক কমে যায়, ইস্পাত উৎপাদন কমে প্রায় ৪৫ শতাংশ, খনিজ উৎপাদন কমে ৪০ শতাংশ, খাদ্য উৎপাদন কমে ৬০ শতাংশ। প্রায় আড়াই কোটি মানুষ গৃহহারা হয়।[১৮]

উৎপাদন ফিরিয়ে আনার পথে একটা বাধা হয় মানব সম্পদের স্বল্পতা। যুদ্ধে এত মানুষ মারা গিয়েছিল যে শ্রমিকের স্বল্পতা হয়ে গেল। ১৯৪৬ সালে খরা হওয়াতে কৃষি উৎপাদনও কম হল। ১৯৫২ সাল নাগাদ কৃষি উৎপাদন ১৯৪১ সালের সমান হল। তবে শিল্প উৎপাদন ১৯৫২ সালে ১৯৪১ সালের চাইতে দ্বিগুণ হল।

পরিকল্পিত অর্থনীতির ফল

গৃহযুদ্ধে সোভিয়েত সরকার বিজয়ী হল, কিন্তু যুদ্ধকালীন অর্থনীতির ধারা আরও চালান যাবে, তার সম্ভাবনা ছিল না। কৃষকদের শস্য সামরিক প্রয়োজনে নিতে থাকলেও শ্রমিকদের কঠোর শ্রমে নিয়োজিত রাখলে বিদ্রোহ ঘটার সম্ভাবনা ছিল। বাস্তববাদী লেনিন এটা উপলব্ধি করে "যুদ্ধকালীন কমিউনিজম" থেকে সরে এসে তাঁর নিজের কথায় "রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ" চালু করলেন।[৩১] এই সময় দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়ন করার প্রয়োজন সরকার অনুভব করলেন এবং এটা পরিকল্পনার

মাধ্যমে করতে হবে সেটাও স্থির করা হল এবং এটাই সরকারের অগ্রাধিকার বলে গণ্য করা হল। কাজেই NEP চালু করা হলেও সামাজিক মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার উপায় হিসাবে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হল। ১৯২০ সালে বৈদ্যুতিকরণের জন্য পরিকল্পনা পরিষদ গঠন করা হল আর সামগ্রিক পরিকল্পনার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন (GOSPLAN) ১৯২১ সালে স্থাপন করা হল, এবং সেটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত চালু ছিল।

কারখানার শ্রমিকগোষ্ঠী যারা ছিল বলশেভিক দলের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি, তারা অনেকেই গৃহযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন, আর অনেকেই কারখানা থেকে প্রশাসনিক কাজে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। অনেক বিরোধিতার পর NEP গৃহীত হয়ে যখন তা বাস্তবায়িত হয় তখন তা ছিল সফল। যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা হল। কিন্তু এবারও সোভিয়েত অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর পশ্চাদপদ অর্থনীতি। শতকরা ৮২ ভাগ মানুষ ছিল গ্রামবাসী। মাত্র শতকরা ৭.৫ ভাগ কৃষির বাইরে কর্মরত ছিল। এই ব্যাপক কৃষক শ্রেণী কি উৎপাদন করত, কতটা বিক্রি করতে চাইত, বিনিময়ে কি কিনতে চাইত এটাই ছিল অর্থনীতির বড় বিষয়। রাষ্ট্রের আয় ছিল মূলত কৃষি উৎপাদন ভিত্তিক, কাজেই বিনিয়োগের উৎসও ছিল কৃষির উদ্বৃত্ত। কৃষকের উদ্বৃত্ত আহরণ করতে না পারলে শিল্পে বিনিয়োগ করার সম্পদ ছিল না। আবার শিল্প উৎপাদন না বাড়ালে কৃষকরা উদ্বৃত্ত শস্য শহরে বিক্রি করতে চাইত না। কাজেই NEP এর নীতি চলতে থাকলে শিল্পে বিনিয়োগ খুব বেশী বাড়ান সম্ভব ছিল না। NEP অথবা এ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালু রাখা সম্ভব হলেও শিল্পায়ন হত ধীরগতিতে। ১৯২৮ সালের পর যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ছকে শিল্পায়ন হাতে নেওয়া হল তাতে বিনিয়োগের সম্পদ ছিল কৃষি উদ্বৃত্ত। কৃষকদের জমি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করে যৌথ খামারে রূপান্তরিত করা ও শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করা ছাড়া ঐ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্রুত শিল্পায়ন করার বিকল্প পথ ছিল না। দ্রুত শিল্পায়নের জন্য যে নীতিই নেওয়া হত না কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপর ব্যাপক কৃচ্ছতাসাধন চাপিয়ে দেওয়া নির্মমতা ছাড়া সম্ভব ছিল না।[৩২] এটাও ছিল এক ধরনের যুদ্ধাবস্থার অর্থনীতি (war economy) এবং এর বাস্তবায়ন ছিল অনেকটা সামরিক অভিযানের মতই। লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হত এবং তা প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে পর্যন্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হত। এই অঞ্চলগুলো ছিল ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত, ককেশাস পর্বতমালা হতে মধ্য এশিয়া ও সাইবেরিয়া পর্যন্ত ছড়ান। কম শিক্ষিত অভিজ্ঞতাহীন কৃষিকাজে অভ্যস্ত মানুষদের দিয়ে প্রথমে কাজ শুরু হয়। এরপর কারিগর, কৃষিবিদ ও প্রশাসকদের দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হত। সর্ব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হত কেন্দ্রে, ফলে একটা বিশাল আমলাতন্ত্র তৈরী হল, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাস্তবায়নে-এবং সাথে সাথে সরকারী কর্মকান্ডের সব ক্ষেত্রে। পরবর্তীতে (ত্রিশের দশকের শেষ দিকে) ষ্ট্যালিনের চেষ্টা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের আধিপত্য কমে নাই। উপরন্ত তা অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃদ্ধির চাইতে প্রায় আড়াইগুণ বেশী হারে বেড়েছিল। এই ব্যবস্থার আর একটা দুর্বলতা ছিল এর অনমনীয়তা। নির্ধারিত মান ও সংখ্যার দ্রব্য উৎপাদনে এই ব্যবস্থা ছিল খুবই কার্যকর। কিন্তু উদ্ভাবন, গুণগত মানের পরিবর্তন বা এ সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন ব্যবস্থা এতে ছিল না। কোন নতুন আবিষ্কার হলে তা কাজে লাগানর কোন ব্যবস্থাও ছিল না। ভোক্তাদের পছন্দ-অপছন্দ জানানরও কোন প্রক্রিয়া ছিল না। ভারী শিল্পের উপর উৎপাদন ব্যবস্থা জোর দিয়েছিল- তা চলতেই থাকল। অর্থনীতির আকার বাড়ার কারণে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনও কিছু বাড়ল। কিন্তু সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করা হয় নি। সেবামূলক ক্ষেত্রগুলোও উন্নত করা হয় নি। কৃষিতে উন্নতি শিল্পখাতের চাইতে ছিল অনেক কম, যদিও শিল্পের উন্নতি ছিল কৃষির উদ্বৃত্ত থেকে। কৃষিতে করের হার ছিল বেশী। যখন কৃষি জমি যৌথ খামারে রূপান্তর করা হল, কৃষি উৎপাদন কমে গেল, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা কমে অর্ধেক হয়ে গেল। এজন্য ১৯৩২-৩৩ সালে বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪০ সালে যৌথ খামারে রূপান্তরের আগের অবস্থায় ফিরে আসে নি, ব্যাপক যান্ত্রিক পরিবর্তনের (mechanization) পরেও উৎপাদন ততটা বাড়েনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসে কৃষি উৎপাদন স্বভাবতই কমেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অল্প সময়ের জন্য কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল, সামান্য রপ্তানী করা সম্ভব হয়েছিল। বিপ্লবের আগে জারের আমলে রাশিয়া বড় খাদ্য শস্য রপ্তানীকারক ছিল, খাদ্য শস্যের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আমদানী নির্ভর হয়ে পড়ল। ১৯৭০ এর দশকে প্রায় এক চতুর্থাংশ খাদ্য আমদানী করতে হত। সোভিয়েত কৃষি ব্যবস্থা ছিল ব্যর্থ, কিন্তু এটাকে যৌথ খামার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ফল বলা যায় না। ১৯৮০ এর দশকের প্রথমভাগে হাঙ্গেরী প্রায় সম্পূর্ণ যৌথ খামারে রূপান্তরিত কৃষিব্যবস্থা থেকে ফ্রান্সের চাইতে বেশী কৃষিপণ্য রপ্তানী করত, যদিও হাঙ্গেরীর জমির পরিমাণ ফ্রান্সের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ছিল।

তবুও সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা জনগণের সামাজিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হল। জনগণ কাজ, খাদ্য, ও আবাস সবই নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পেত। অবসর ভাতা, স্বাস্থ্য সেবাও তখনকার অবস্থা অনুযায়ী সবাইকে দেওয়া হল। সর্বোপরি সবাইকে শিক্ষা দেওয়া হল। একটা বড় অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দেশকে আধুনিক সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিণত করা ছিল একটা বিশাল অর্জন। লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত কৃষক, যাদের ভাগ্যে ছিল সারা জীবন গ্রামে থেকে আদিম উপায়ে কৃষিকাজ করে যাওয়া, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচাইতে খারাপ সময়েও শহরে এসে শিক্ষার সুযোগ, কাজের সুযোগ ও নতুন জীবন গড়ার সুযোগ পেয়েছিল । দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষতঃ ১৯৩০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক উন্নতির হার পৃথিবীর সমস্ত দেশের চাইতে বেশী ছিল (জাপান ছাড়া)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও প্রথম ১৫ বছর সোভিয়েত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর চাইতে অনেক বেশী ছিল। নিকিতা ক্রুশ্চেভ সহ অনেক সোভিয়েত নেতা তখন মনে করতেন অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত অর্থনীতি পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যাবে। কোন কোন পশ্চিমা নেতাও (যেমন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান) একই মত পোষণ করতেন।[৩৩]

একটি পশ্চাদপদ ও কৃষি নির্ভর বৃহৎ দেশ তাদের গৃহীত নীতির ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই একটা শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে উন্নীত হল। সেই সময় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পোন্নত দেশ জার্মানী (বৃটেন ছিল প্রথম) সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে একটা বড় এলাকা দখল করে নিল, যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের এক তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করত। আক্রমণের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় অর্ধেক শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়ে গেল। এরপরও অন্যান্য মিত্রদেশের যথেষ্ট সাহায্য ছাড়াই প্রায় এককভাবে জার্মানীর মূল সমর শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হল সোভিয়েত ইউনিয়ন। যে অতুলনীয় কষ্ট, প্রাণহানি, ও ত্যাগ সোভিয়েত জনগণ সেই সময় করেছিল (এবং ত্রিশের দশকের শিল্পোন্নয়নের সময়েও করেছিল) তা অন্য কোন সরকার ক্ষমতায় থাকলে সম্ভব হত কিনা তা অনেকেই সন্দেহ করেন।[৩৪]

তথ্য সূত্রঃ

১. Trotsky L. The History of Russian Revolution. London, 1965 p 121
২. Harman C. A People's History of The World. London, 2008 p 413
৩. Harman C. p 420
৪. Harman C. p 424
৫. Hobsbawm E. The Age of Extremes. New York, 1994 p 376
৬. Harman C. p 422
৭. Lenin VI, Collected Works. Vol-8. Moscow, 1962 p 28
৮. http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty-of-Brest-Litovsk, accessed 12 May,2013
৯. Smith SA. Red Petrograd. Cambridge, 1983 p 10
১০. Harman C. p 426
১১. Hobsbawm E. p 63
১২. Serge V.Year One of The Russian Revolution. London, 1992 p 282
১৩. Serge V. p 265
১৪. Harman C. p 428
১৫. Hobsbawm E. p 64, 65
১৬. Koenker DP, Rosenberg WG, and Suny RG(ed).Party, State and Society in the Russian Civil War. Bloomington,1989 p 61
১৭. Kenez P. A Histoery of The Soviet Union from the Beginning to the End. Cambridge,2006, p 48
১৮. http://en.wikipedia.org/wiki/ Five_Year_Plan_ for_ the_ National_Economy_of_the_Soviet Union accessed 20 May,2013
১৯. Siegelbaum LH. Soviet State and Society Between Revolutions 1915-1929. Cambridge,1992 p 35
২০. http://en.wikipedia.org/wiki/ New_Economic Policy accessed 20 May,2013
২১. Harman C. p 47
২২. Harman C. p 473
২৩. Reiman M. The Birth of Stalinism: the USSR on the Eve of the "Second Revolution". London, 1987, p 2
২৪. Harman C. p 475
২৫. Deutscher I.Stalin. London,1961 p 328
২৬. Cliff T. Russia: A Marxist Analysis. London, 1964 p 33
২৭. Cliff T. State Capitalism in Russia. London, 1988 p 53
২৮. Harman C. p 477
২৯. Cliff T. State Capitalism. p 130
৩০. Harman C. p 478
৩১. Hobsbawm E. p 378
৩২. Hobsbawm E. p 380
৩৩. Hobsbawm E. p 377
৩৪. Milward A. War, Economy and Society. London,1979 p 92

দশম অধ্যায়

মহামন্দা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

অর্থনৈতিক সংকট যেমন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করছিল তেমনি বিভিন্ন দেশের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছিল। প্রত্যেক দেশই তার নিজস্ব অর্থনীতিকে অন্য দেশের শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল। নিজস্ব মুদ্রার মূল্য কমিয়ে এবং অন্য দেশের পণ্যের শুল্ক বাড়িয়ে দেশের বাজারে দেশে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা প্রত্যেকটা দেশই করছিল। প্রত্যেক দেশেই রাষ্ট্র অর্থনীতিতে আরও বড় ভূমিকা পালন করছিল। যেসব শিল্প প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছিল সেগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য করছিল। কোন কোন শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হচ্ছিল। সবই করা হচ্ছিল অনান্য শিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক রাখার জন্য। এমনকি বৃটেনের রক্ষণশীল সরকারও বিদ্যুৎ সরবরাহ, কয়লা খনির স্বত্ব, জাতীয় বিমান পরিবহন রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিল।

দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় পুঁজিকে একচেটিয়া বাজারের সুবিধা করে দেওয়া আর দেশের বাইরে প্রয়োজনীয় সম্পদ আরোহন করা-এ দুটো সমন্বয় করার পথ ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের সীমানা বাড়ান। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনে থাকা সাম্রাজ্য ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রাণাধীন রাষ্ট্র এগুলো তখন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তাদের মুদ্রাভিত্তিক প্রভাব-বলয় সৃষ্টি করেছিলঃ ষ্টার্লিং এলাকা (বৃটেনের), ডলার এলাকা (আমেরিকার), স্বর্ণ এলাকা (ফ্রান্সের), মার্ক এলাকা (জার্মানীর) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকা। প্রভাব-বলয় গুলো সমান ছিল না। বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও সোভিয়েত বলয় ছিল বৃহৎ। তুলনায় ইউরোপের সবচাইতে শিল্প সমৃদ্ধ দেশ জার্মানীর কোন সাম্রাজ্য ছিল না। বরং প্রথম মহাযুদ্ধের পর তার উপর যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, তাতে সে নিজস্ব ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে জার্মানীর শিল্পপতিরা ভার্সাই চুক্তির আরোপ করা অর্থনৈতিক শিকল ভেঙ্গে ফেলতে সচেষ্ট হল। তারা চাইছিল জার্মানী যুদ্ধের পর পোল্যান্ডের কাছে যে এলাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তা আবার ফিরিয়ে নিতে। তারা আরও চাইছিল অষ্ট্রীয়া ও চেক রাষ্ট্রের জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল জার্মানীর অন্তর্ভূক্ত করতে। হিটলারের বিজয় যে শুধু শ্রমিকদের উপর পুঁজিপতিদের বিজয় তাই নয়, এ বিজয় ছিল জার্মান পুঁজিপতি ও ক্ষমতাসীনদের সেই অংশের যারা শক্তি প্রয়োগ করে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছ থেকে সাম্রাজ্যের অংশ নেওয়ার পক্ষে ছিল। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের পরিচালনায় পুঁজিবিনিয়োগ, রাষ্ট্র কর্তৃক কাঁচামাল বন্টন এবং বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ-এ ব্যাপারে পুঁজিপতিরা একমত হল। একজন পুঁজিপতি থাইসেন আপত্তি জানাল। তার সমস্ত স্থাপনা নাৎসী দল দখল করল এবং সে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হল। অন্যান্য পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের পরিচালনায় লাভজনক ব্যবসা করতে থাকল একদম ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত-অর্থাৎ যুদ্ধ শেষে জার্মানীর পতন না হওয়া পর্যন্ত।

সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদন বাড়ানর জন্য শ্রমিকদের কাজের সময় বাড়ান হল। কিন্তু নাৎসীরা শ্রমিকদের উপর বেশী চাপ দিতে সাহস পাচ্ছিল না। দমন করা হলেও ১৯১৮-২০ সালের বিপ্লবী আন্দোলন তাদের মনে ছিল। অন্যান্য রাজ্য দখল করার চাপ ছিল এই কারণে যে সে সমস্ত রাজ্যের কাঁচামাল ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে এবং দখলকৃত এলাকার মানুষদের আরও কম পারিশ্রমিকে জোর করে কাজ করান যাবে। বিশেষ করে অষ্ট্রীয়ার কৃষিজাত পণ্য, চেক রাষ্ট্রের অস্ত্র কারখানা, পোল্যান্ডের কয়লা ও রোমানিয়ার জ্বালানী তেল-এগুলো জার্মানীর সমরশক্তি বাড়ানর জন্য খুবই দরকার বলে জার্মান পুঁজিপতিরা মনে করল। নাৎসী নেতৃত্বও এ ব্যাপারে একমত হল।[১]

জাপান এশিয়াতে জার্মানীর মত একই ধরনের নীতি বাস্তবায়ন করা শুরু করেছিল। ইতিমধ্যেই জাপান তাইওয়ান ও কোরিয়া দখল ও নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং উত্তর চীনের একটা বিরাট অঞ্চলে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করেছিল। ১৯৩১ সালে জাপান উত্তর চীনের মাঞ্চুরিয়া নামক অঞ্চল দখল করে নিল। জাপান ১৯৪০ সালে ফ্রান্স ও বৃটেনের বিব্রতকর অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইন্দোচীন দখল করে বার্মা পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

জার্মান নাৎসী সরকার সরকারের অর্থায়নে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, যা তারা সরকারে আসার আগেই শুরু করা হয়েছিল, তা বাড়িয়ে দিল। ফলে বেকারত্ব শতকরা ৪০ ভাগ এক বৎসরের মধ্যেই কমে গেল। কিন্তু সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনে বর্ধিত সম্পদ নিয়োগ করায় শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বাড়েনি। ১৯৩৩ সালের পাওয়া জরুরী আইনের বলে হিটলার শাসন চালিয়ে যেতে লাগল। উগ্র বক্তব্য দিয়ে জার্মানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বাড়িয়ে তোলা হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর যে

সমস্ত ক্ষতিকর ও অবমাননাকর শর্ত জার্মানী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, এই মনোভাব তৈরীর জন্য সহায়ক হয়েছিল। এছাড়া নাৎসীরা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করল। প্রথমে এটা জার্মান ইহুদীদের লক্ষ্য করে করা হল। জার্মান ইহুদীরা তুলনামূলক ভাবে অধিক বিত্তশালী ও ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকারী হওয়ায় এই মনোভাব তৈরী করা সহজ হল। ১৯৩৫ সালের পর থেকে আইন করে তাদের শাসনতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার খর্ব করা হল। তাদের ভূ-সম্পত্তি, ব্যবসা দখল করে নেওয়া হল। তাদের বাড়িঘর ও উপাসনালয় আক্রমণ করা শুরু হল। ১৯৩৯ সাল নাগাদ জার্মানীতে কথা বলার অধিকার, সংবাদপত্র গুলোর স্বাধীনতা, এমনকি সংসদেরও কোন স্বাধীনতা থাকল না।[২]

হিটলার পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চাইলেন। এই অঞ্চলের রাষ্ট্র গুলো ছিল স্লাভ জাতি গোষ্ঠীর। যাদেরকে হিটলার জার্মানদের চাইতে নিকৃষ্ট বলে মনে করতেন। পরিবেশ তখন তার জন্য অনুকূল ছিল। মিত্রশক্তির সৈন্যরা ১৯৩০ সালে জার্মানী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে জার্মানী ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। অন্যান্য দেশ অনেক কাল পর্যন্ত জার্মানীর কর্মকান্ডের বিরোধিতা করতে অনিচ্ছুক ছিল। খোদ বৃটেনেই অনেকে মনে করত প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর উপর আরোপ করা শর্তগুলো বেশী কঠিন হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির স্মৃতি ছিল অনেকেরই, আবার একটা যুদ্ধের দিকে যেতে তাই ছিল অনীহা। বৃটেন ও ফ্রান্স উভয় দেশেই শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিল যারা শ্রমিক শ্রেণীকে দমিয়ে রাখার জন্য জার্মানীকে তাদের মিত্র মনে করত। তারা বরং প্রগতিশীলদের সঙ্গে লড়াইয়ে জার্মানীর চাইতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বড় শত্রু মনে করল। অনেকেই মনে করেছিল জার্মানী সোভিয়েত কমিউনিষ্টদের শক্তি দমন করার জন্য একটা ভাল উপায়। আমেরিকানরা অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত হয়ে ইউরোপের ঘটনাবলীতে আগ্রহী ছিল না। মুসোলিনী প্রথম দিকে হিটলারের সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিল।

জার্মানী এই পরিস্থিতির সুযোগ নিল। জাপানও পূর্ব এশিয়ায় এই সুযোগ নিচ্ছিল। হিটলার তার পূর্বসূরীদের দাবী আবার ব্যক্ত করল। অন্যান্য দেশের মত জার্মানীকেও সৈন্য বাহিনী রাখার অধিকার দিতে হবে। ১৯৩৫ সালে হিটলার সৈন্যবাহিনীতে কাজ করা জার্মানদের জন্য বাধ্যতামূলক করল। এরপর যুদ্ধে যে সমস্ত এলাকা জার্মানী হারিয়েছিল তা আবার দখলে নেওয়া শুরু হল। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে জার্মান সৈন্যবাহিনী রাইনল্যান্ডে প্রবেশ করল। এখানে জার্মানীর সৈন্য বা সামরিক স্থাপনা চুক্তি অনুযায়ী নিষিদ্ধ ছিল। বৃটেন ও ফ্রান্স কোন আপত্তি জানাল না বা পদক্ষেপ নিল না। হিটলার এরপর ঘোষণা করল জার্মানী পশ্চিম দিকের নির্ধারিত সীমানা মানবে না। বৃটেন ও ফ্রান্স সমরসজ্জা শুরু করল।

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে অষ্ট্রীয়ায় গণভোট অনুষ্ঠান করে অষ্ট্রীয়াকে জার্মানীর সঙ্গে একত্রীকরণ করল। এটাও ভার্সাই চুক্তির বরখেলাপ ছিল। এবার হিটলার দাবী করল চেকোশ্লাভাকিয়ার জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দিতে হবে। যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ফ্রান্স ও জার্মানী আলাপ আলোচনার পর মিউনিখে চুক্তি করে চেকোশ্লাভাকিয়ার একটি বড় অংশ জার্মানীকে ছেড়ে দিল। এ ব্যাপারে রাশিয়ানদের মতামত না নেওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হল। জার্মানীর মানুষের ধারণা হতে থাকল হিটলার সবই পারে, আর হিটলারের ধারণা হল বৃটেন ও ফ্রান্সকে চাপ দিয়ে সবই আদায় করা যাবে।[৩] এই পর্যন্ত বৃটেন ও ফ্রান্স আপোষমুখী ছিল। এরপর জার্মানী চেকোশ্লাভাকিয়ার বাকী অংশ দখল করে নিল। এতে বৃটেনে জনমত জার্মানীর বিপক্ষে গেল। বৃটিশ সরকারও সামরিক বাহিনীতে কাজ করা বাধ্যতামূলক করল। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো জার্মানীর আক্রমণাত্মক আচরণে ভীত হয়ে পড়ল। বৃটেন কয়েকটা সরকারের সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল, আক্রান্ত হলে বৃটেন তাদের প্রতিরক্ষা দেবে, এর মধ্যে ছিল পোল্যান্ড।

পোল্যান্ড আক্রমণের জন্য জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করল। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান সৈন্যবাহিনী পোল্যান্ডের ভিতর ঢুকে পড়ল। হিটলারের ধারণা ছিল পোল্যান্ডের জন্য বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে নামবে না।[৪] তবে বৃটেনে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল দুইজন সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিকের নেতৃত্বে, তারা হলেন উইনষ্টন চার্চিল ও এন্থনী ইডেন। তাঁরা মনে করেছিলেন ইউরোপে জার্মান আধিপত্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। এই গোষ্ঠীর চাপের ফলে বৃটেন এবং ফ্রান্স অনেকটা কম উৎসাহ নিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ৩রা সেপ্টেম্বর। পোল্যান্ডকে সাহায্য করার জন্য তারা কিছুই করেনি। শুধু পোল্যান্ডের সৈন্যবাহিনীর একটা অংশকে কাজে লাগানোর জন্য তারা সরে আসতে সাহায্য করল। ১৯৩৯-৪০ সালের শীতকাল ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় ফিনল্যান্ড

সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। ফিনল্যান্ডকে জার্মানী সমর্থন করছিল, বৃটেন ও ফ্রান্সও সমর্থন করছিল। জার্মানী এই সময় কাজে লাগিয়েছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঝটিকা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে। এপ্রিল ১৯৪০ এ জার্মানী তার খনিজদ্রব্যের সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য নরওয়ে ও ডেনমার্ক দখল করল। প্রায় একই সময়ে বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের ভিতর দিয়ে জার্মান বাহিনী ফ্রান্সে দ্রুত অগ্রসর হল। ১৯৪০ সালের মে মাসে দুই সপ্তাহের মধ্যে জার্মান বাহিনী সম্মিলিত বৃটেন ও ফ্রান্স বাহিনীর মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। জার্মান বাহিনী ১৪ই জুন প্যারিস দখল করল। বৃটিশ বাহিনী ডানকার্ক থেকে সমুদ্রপথে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে বাঁচল। এই বিজয় মুসোলিনীকে প্রণোদিত করল জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে। হিটলার মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেলেন।

বৃটেনে এই সময় উইনষ্টন চার্চিলের নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন সরকার ছিল। বৃটেন এই সময় জার্মানীর বিরুদ্ধে অনেকটা একা হলেও সুবিধা ছিল বৃটেন ছিল সমুদ্রবেষ্টিত। বৃটেন আক্রমণের আগে বৃটিশ আকাশে বিমান আধিপত্য স্থাপনের জন্য ১৯৪০ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বৃটেনের আকাশে জার্মান ও বৃটিশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধে (Battle of Britain নামে খ্যাত) বৃটিশ বিমান বাহিনীকে পরাস্ত করা যায়নি। এরপর জার্মানীর বৃটেন দখল করার আর কোন আশা থাকল না। ১৯৪১ সালে জার্মানী যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস দখল করল। সাবমেরিন দ্বারা আক্রমণ করে এই সময় বৃটিশ নৌ বাণিজ্য জার্মানী পর্যুদস্ত করে তুলেছিল। ফ্রান্স জয় করার ১ বৎসর পর জার্মানী ভিন্ন দিকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। এবার পূর্ব দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঝটিকা আক্রমণ করে শীত শুরু হওয়ার আগেই তাকে পরাস্ত করতে চাইল।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলারের ঝটিকা আক্রমণ শুরু হল সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর। হিটলারের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বাল্টিক (Baltic) এলাকা ইউক্রেন ও মস্কো দখল করা, সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক ক্ষমতা শেষ করা, কমিউনিজম উৎখাত করা, দখলকৃত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে জার্মানদের জন্য স্থান করে দেওয়া (Lebensraum) ও সেই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ জার্মানীর অন্যান্য শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা। জার্মানী তার সৈন্যবাহিনীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এবং বিমান বাহিনীর বড় অংশটাই ফ্রান্স থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন অভিযানে লাগিয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে দ্রুত এগিয়ে গেল জার্মান বাহিনী এবং মস্কোর কাছাকাছি চলে আসল। কিন্তু শীত আসার আগে সোভিয়েত প্রতিরোধ সম্পূর্ণ শেষ করতে পারল না জার্মানরা। শীতের জন্য জার্মানরা প্রস্তুত ছিল না। আকারে অনেক বড় একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জার্মানরা আটকে পড়ল। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা ছিল সবচাইতে বড় স্থলযুদ্ধ।[৫]

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট অঞ্চল দখল করা সত্ত্বেও জার্মানী তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা রক্ষা করেছিল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী শক্তি সঞ্চয় করে একটি বিরাট প্রতিআক্রমণ শুরু করল প্রায় ১০০০ কিলোমিটার সম্মুখভাগ জুড়ে। জার্মান বাহিনী ১০০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার পিছিয়ে যেতে বাধ্য হল। সোভিয়েত নেতা ষ্ট্যালিন বার বার চার্চিল এবং তারপর রুজভেল্টকে অনুরোধ করল ইউরোপের পশ্চিম দিকে প্রতিআক্রমণ করার জন্য। চার্চিল ও রুজভেল্ট প্রস্তুতি নিতে সময় লাগবে বলে দেরী করতে থাকল। অনেকেই মনে করেন তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘাড়ে ইউরোপের যুদ্ধের প্রধান বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন পরিকল্পিত ভাবে। ইউরোপে পূর্ব দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র। যুদ্ধে পশ্চিমা মিত্রদের জীবনহানির চাইতে অনেক গুণ বেশী ছিল যুদ্ধে সোভিয়েতের লোকক্ষয় (১ কোটি ৩০ লক্ষ সৈন্য)।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে জার্মানরা সোভিয়েতের দক্ষিণাঞ্চলে ককেশাসের তেল খনি অঞ্চল দখল করল। উত্তরে তাদের অবস্থানও ধরে রাখল। শীতকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার প্রতিআক্রমণ শুরু করল। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনেক ক্ষয়ক্ষতির পর ষ্ট্যালিনগ্রাডে প্রায় আড়াই লক্ষ জার্মান সৈন্য আত্মসমর্পণ করল। পরবর্তী গ্রীষ্মে জার্মানরা খারকিভ অঞ্চলে আবার আক্রমণ করল। কিন্তু এখানে জার্মানরা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। ১২ জুলাই ১৯৪৩ সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার প্রতি আক্রমণ করল। কুরস্ক (Kursk) এ সোভিয়েত বিজয় জার্মান বাহিনীর পতনের সূচনা করল। জার্মানরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও সোভিয়েত বাহিনী তা ভেঙ্গে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ১৯৪৪ সালের মে মাস নাগাদ সোভিয়েতরা ক্রিমিয়া মুক্ত করল, ইউক্রেন থেকে জার্মান বাহিনী হঠিয়ে দিল ও রোমানিয়ায় প্রবেশ করল।

বৃটেন ও ফ্রান্সের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ১৯৪০ সালে জাপান ইন্দোচীন দখল করে বার্মা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। আমেরিকায় জনমত জাপানের বিরুদ্ধে যেতে লাগল। মার্কিন সরকার নাগরিকদের জাপানের সঙ্গে ব্যবসা করা নিষিদ্ধ করল, বিশেষ করে জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ করল। আমেরিকা তার প্রশান্ত মহাসাগর নৌবাহিনী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সরিয়ে হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবারে এগিয়ে নিল। জাপানে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে যাওয়া নিয়ে দ্বিমত ছিল। শেষে ১৯৪১ সালের শেষ দিকে তারা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। ৭ই ডিসেম্বর জাপানের বিমান বহর পার্ল হারবারে আক্রমণ করে সেখানে অবস্থিত আমেরিকান বিমান বাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলল এবং নৌবাহিনীরও ব্যাপক ক্ষতি করল। পরদিন আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ১১ই ডিসেম্বর জার্মানী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

জাপান অল্প সময়ের মধ্যে কিছু চমকপ্রদ জয় অর্জন করল। ডাচ শাসিত ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়া দখল করে নিল। বার্মার অধিকাংশ দখল করে ভারতের প্রান্তে পৌঁছে গেল। প্রশান্ত মহাসাগরে তারা নিউগিনি থেকে উত্তরে মার্শাল দ্বীপ পর্যন্ত অনেক দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে প্রতিরক্ষা ব্যুহ গড়ে তুলল। কিন্তু এই বিজয় ছিল স্বল্প কালের। ১৯৪২ সালের মে ও জুলাই মাসে কোরাল সী ও মিডওয়ের যুদ্ধে আমেরিকানরা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে উড্ডয়ন করা বিমান পাঠিয়ে জাপানী নৌবাহিনীকে পর্যুদস্ত করল। এই সময় থেকে আমেরিকার প্রতিআক্রমণের মুখে জাপানীরা ক্রমেই পিছু হটতে থাকল।

আটলান্টিক মহাসাগরে বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই চলছিল নৌ যুদ্ধ যা Battle of Atlantic নামে পরিচিত। বৃটেন আমেরিকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ নৌ জাহাজের বহরে করে যুদ্ধজাহাজের পাহারায় নিয়ে আসত। এগুলো ধ্বংস করার জন্য জার্মানরা যুদ্ধ জাহাজ ছাড়াও ব্যবহার করত সাবমেরিন ও বিমান। এতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তবে জার্মানী বৃটেনের সরবরাহ বন্ধ করতে পারেনি। ১৯৪২ সালের পর থেকে জার্মান সাবমেরিন আরও বেশী সংখ্যায় ধ্বংস করা হতে থাকল, মিত্রশক্তির ক্ষতি কমে আসল। জার্মানীর উপর বিমান আক্রমণ বাড়তে থাকল। উত্তর আফ্রিকায় মিশর থেকে বৃটিশরা প্রতিআক্রমণ করল আর বৃটেন ও ফ্রান্সের সৈন্যদের নৌপথে নামান হল। ইতালীর বাহিনী পরাজিত হল ১৯৪৩ সালে। ইতালী যে সব অঞ্চল অধিকার করেছিল সেগুলো হাতছাড়া হল। এরপর থেকে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকল না।

১৯৪৩ সালে বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যরা ইতালী আক্রমণ করল। ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন মিত্রশক্তির সৈন্যরা উত্তর ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে বিমান ও নৌপথে দেড় লক্ষের বেশী সৈন্য নামিয়ে আক্রমণ করল (এই দিন D-Day নামে পরিচিত)। অবতরণকারী সৈন্যরা ফ্রান্সের জার্মান বাহিনীকে পরাজিত করল। ইতিমধ্যেই মুসোলিনী উৎখাত হয়ে গিয়েছিল এবং জার্মানরা সব দিকে পিছু হটছিল। ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকা থেকে জার্মান সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয়েছিল এবং সোভিয়েত বাহিনী (লাল ফৌজ নামে পরিচিত) পোল্যান্ড, রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া থেকে জার্মান বাহিনীকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। এপ্রিল ১৯৪৫ সালে দীর্ঘ ও বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের পর লাল ফৌজ বার্লিন প্রবেশ করল। ততদিনে মিত্রশক্তির পশ্চিম দিকের সৈন্যরা বাল্টিক উপকূলে পৌঁছে গেছে এবং দক্ষিণ জার্মানী ও অষ্ট্রীয়া শত্রু মুক্ত করেছে। ৮ই মে হিটলার আত্মহত্যা করল এবং তার সৈন্যবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে জার্মান "Third Reich" এর পতন হল।

এদিকে জাপানও পরাজয়ের কাছাকাছি চলে এসেছিল। তার বিশাল বাহিনী ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। যুদ্ধ জাহাজের বেশীরভাগ ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপমালার উপর যে সামরিক ঘাঁটি জাপান স্থাপন করেছিল তাও হারিয়ে ফেলেছিল। মিত্রশক্তির বিমান আক্রমণে জাপানের শহরগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছিল। আগষ্ট মাসে আমেরিকা জাপানের উপর নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করল, যার ধ্বংসের শক্তি বহুগুণ বেশী। এগুলো হল আনবিক বোমা। এর একটি ফেলা হল হিরোশিমা ও আর একটা নাগাসাকি শহরে। এই দুই বোমায় ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি হল। ইতিমধ্যেই সোভিয়েত বাহিনী মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করে জাপানের সবচাইতে বড় বাহিনী Kwantung Army কে দ্রুত পরাজিত করল। জাপান ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৫ আত্মসমর্পণ করল।

মিত্রশক্তি যতই জার্মান অধিকৃত এলাকা মুক্ত করছিল, ততই নাৎসীদের বর্বরতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল। অনেক জায়গায় নাৎসী বন্দী শিবির ছিল এবং সেগুলোতে বন্দীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছিল। এগুলোতে অকল্পণীয় নির্যাতন, বন্দীশ্রম ও গণহত্যা ঘটেছিল। এই সব বন্দীরা ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা যুদ্ধবন্দী, কোন

ক্ষেত্রে শুধুই অধিকৃত এলাকা থেকে বন্দী শ্রমের জন্য ধরে নিয়ে আসা মানুষ। একটা বড় অংশ ছিল ইহুদীরা। শুধু মাত্র ধর্মের কারণে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছিল। জার্মানী এবং সমস্ত অধিকৃত এলাকা থেকে ধরে নিয়ে এসে তাদের হত্যা করা হচ্ছিল। সঠিক সংখ্যা হয়তো কোন দিনই জানা যাবে না- তবে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বার বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এ হত্যা করা হয়।

যুদ্ধের প্রকৃতি

উদার ও বামপন্থীরা পশ্চিমা দেশগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের লড়াই বলে প্রচার করেন। যুদ্ধরত দেশগুলির শাসক গোষ্ঠীর যুদ্ধে যাওয়ার কারণ ছিল ভিন্ন। উইনষ্টন চার্চিল ওমদূরমান এ হত্যা কান্ডের সময় উপস্থিত ছিলেন (সুদানের ওমদূরমান এ বৃটিশ বাহিনী ১৮৯৮ সালে মাহদীপন্থীদের নির্বিচারে হত্যা করে)। চার্চিল ১৯১০ সালে ধর্মঘটী শ্রমিকদের হত্যা করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠান ও কুর্দী বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বৃটিশ বিমান বাহিনীকে গ্যাস প্রয়োগ করার নির্দেশ দেন। বৃটিশ সরকার ত্রিশের দশকে যখন অত্যন্ত সীমিত আকারে ভারতীয়দের শাসন কার্যে অন্তর্ভূক্ত করে তখন তিনি জোর প্রতিবাদ জানান। কাজেই গণতন্ত্রের জন্য চার্চিল যুদ্ধ করেছিলেন তা বলা যায় না। বৃটিশ বাহিনী যখন ইউরোপের মূল ভূখন্ড থেকে যুদ্ধের শুরুতে বিতাড়িত হল, তখন তারা তাদের সমর উপকরণ ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বৃটেনের শাসকগোষ্ঠীর অর্ধেকই জার্মানীর সঙ্গেই আপোষ করার পক্ষপাতি ছিল এমন সব শর্তে যা চার্চিল অপমানজনক মনে করেছিলেন।[৬] চার্চিল ও তার সহযোগীরা রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটিশ শ্রমিক দলের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। সাম্রাজ্যবাদী বক্তব্য বর্জন না করলে কোয়ালিশন ধরে রাখা মুস্কিল হত। তাই গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এর কথা বলতে হল। এছাড়া রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর খাদ্য নিশ্চিত করা হল, যুদ্ধশেষে উন্নত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। তৎকালীন রক্ষণশীল নেতা কুইনটিন হগ (পরবর্তীতে লর্ড হালিশাম) বলেছিলেন, সরকার যদি সংস্কার না করে, তাহলে বিপ্লব ঘটতে পারে।

যুদ্ধের গতিধারা লক্ষ্য করলে বৃটিশ ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত (বৃটিশ সৈন্য ইতালীতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত), যখন ইউরোপে প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল ও যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারিত হচ্ছিল, তখন বৃটেন ইউরোপে যুদ্ধ না করে উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ করছিল। কারণ বৃটেন সুয়েজ খাল ও মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাচ্ছিল। ইতালী আক্রমণও ছিল ভূমধ্যসাগরে আবার কর্তৃত্ব স্থাপন করা। তখনও ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বৃটেন রাজী ছিল না। ১৯৪২ সালে হাজার হাজার বৃটিশ সৈনিক নাৎসীদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতে ব্যস্ত ছিল।

আমেরিকার সরকারও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সরব ছিল। কিন্তু তড়িঘড়ি করে আনবিক বোমা ফেলে জাপানকে দ্রুত পরাভূত করা হল, যদিও যথেষ্ট প্রমাণ ছিল যে, জাপান শর্ত ছাড়াই আত্মসমর্পণ করার জন্য তৈরী হচ্ছিল। সোভিয়েত বাহিনী দ্রুতগতিতে মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের Kwantung Army কে পরাজিত করে এগিয়ে আসছিল। তারা কাছে পৌঁছালে যুদ্ধ পরবর্তী জাপানের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা থাকত-তা বন্ধ করা হল।

তথ্য সূত্র:

১. Harman C. A People's History of The World. London,2008, p 521
২. Roberts JM. A Short History of the World. New York,1993, p 454
৩. Roberts JM. p 455-456
৪. Harman C. p 522
৫. http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_11,accessed 25 April 2013
৬. Harman C. p 526

একাদশ অধ্যায়

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে আমেরিকান পরিকল্পনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচাইতে বড় ঋণদাতা দেশ হিসেবে আবির্ভূত হল। পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের পর এই প্রথম সারা বিশ্বের বাণিজ্য এক মুদ্রার (ডলার) উপর নির্ভর করছিল এবং একটি কেন্দ্র থেকে (নিউ ইউর্কের ওয়াল স্ট্রীট) অর্থায়ন করা হচ্ছিল। এটা ছিল এমন একটা সময় যখন ইউরোপের অর্ধেক সোভিয়েত লাল ফৌজের দখলে ছিল আর ইউরোপের অনেক মানুষ প্রকাশ্যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলছিল। যারা ১৯৩২ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনা করছিল তারা দেখল তাদের সামনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিহত আধিপত্য (hegemony) স্থায়ী করার এক মহা সুযোগ উপস্থিত। তারা সেই সুযোগ আগ্রহের সাথে সদ্ব্যবহার করার উদ্যোগ নিল। এর পিছনে দুটো কারণ কাজ করছিল। যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্র অভূতপূর্ব সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হল। যুক্তরাষ্ট্র তখন সারা পৃথিবীর অর্ধেক সম্পদের অধিকারী ছিল। সারা পৃথিবীর দুই -তৃতীয়াংশ শিল্প উৎপাদন হচ্ছিল তখন যুক্তরাষ্ট্রে। পৃথিবীর সবচাইতে বড় সামরিক শক্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। পৃথিবীর দুটো বড় মহাসাগর আর পৃথিবীর সব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ছিল তার নিয়ন্ত্রণে।[১] পৃথিবীর আর সব শিল্পোন্নত দেশ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[২] যুক্তরাষ্ট্র ছিল এই ধ্বংসযজ্ঞের বাইরে, সেখানে উৎপাদন যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ের চাইতে প্রায় চারগুণ বেড়ে ছিল। কিন্তু ১৯২৯ সালের মহা অর্থনৈতিক মন্দার (depression) স্মৃতি তাদের মনে তখনও ভাস্বর। বিশেষ করে এই স্মৃতি তাদের সবচাইতে পীড়িত করছিল যে মন্দা অনেক ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার পরও পুরোপুরি চলে যায়নি। বিশ্বযুদ্ধ মন্দা থেকে তাদের মুক্তি দিলেও এটা যদি আবার ফিরে আসে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের এই আধিপত্য ধূলায় মিশে যেতে পারে, এই আশংকা থেকে তারা মুক্ত হতে পারছিল না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তাই পরিকল্পনা কার্যকর করা শুরু হল। ১৯৪৪ সালে এই পটভূমিতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা Bretton Woods এ সম্মেলন ডাকল। সেখানে একটা নতুন মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরী করা হল। মার্কিন ডলার কে মূল স্তম্ভ রেখে এই মুদ্রানীতি করা হল, তবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বিপদে পড়লে তা সামলানর জন্য ব্যবস্থা রাখা হল। এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে প্রায় ১৫ বৎসর সময় লাগল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিক থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে পুনর্গঠন করার ক্ষমতা তাদের থাকবে এবং এই সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস (যেখানে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপতিরা ও finance এর নেতারা অন্তর্ভূক্ত ছিলেন) এবং ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট এর পরিকল্পনাকারীরা এটা নিয়ে অনেক দফা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেন। তাঁরা একটা সমন্বিত বিশ্ব অর্থনীতির পরিকল্পনা করলেন যা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির চাহিদা পূরণ করবে।[৩]

ইউরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে তখনও প্রবল যুদ্ধ চলছিল। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার রাজ্যের ব্রেটন উডস শহরের একটি হোটেলে ৭৩০ জন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিকে ডাকলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বললেন, প্রত্যেকটি দেশের অর্থনীতির সুস্থতা দূরের এবং কাছের অন্যান্য দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধাররা উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতীয় পর্যায়ে পুঁজিবাদের কার্যক্রম চালান সম্ভব নয়।[৪]

আপাত দৃষ্টিতে এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল দুটি-যুদ্ধোত্তর মুদ্রাব্যবস্থার কাঠামো তৈরী করা আর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ও জাপানের পুনর্গঠন। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক মন্দা যাতে আর না হয় তার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং সেই কাঠামো কারা পরিচালনা করবে তা নির্ধারণ করা। এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা গেল দুই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে। একজন হলেন মার্কিন প্রতিনিধি হ্যারী ডেক্সটার হোয়াইট আর বৃটিশ প্রতিনিধি জন মেইনার্ড কেইনস।

যে দুটো প্রতিষ্ঠান তখন গড়ে তোলা হয়েছিল তার দুটো আজও বিদ্যমান। প্রথমটা হল ইন্টারন্যাশনাল মনিটারী ফান্ড (IMF) বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, আর দ্বিতীয়টি হল ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক অফ রিকনস্ট্রাকশন ও ডেভলপমেন্ট (বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা বিশ্ব ব্যাংক নামে পরিচিত)। IMF কে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল বিশ্বের অগ্নি নির্বাপক হিসেবে -কোন দেশে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট দেখা দিলে সেখানে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ দেওয়া তবে তা এমন শর্তে যাতে সেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণ হয়, আবার ঋণ পরিশোধ করাও সম্ভব হয়। আর বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা ঠিক করা

হয়েছিল আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক হিসেবে-যাতে করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে এমন সব প্রকল্পে-বিশেষতঃ যুদ্ধবিপর্যস্ত দেশ গুলিতে অর্থায়ন করা। তবে যে প্রতিষ্ঠানটি যুদ্ধোত্তর মুদ্রাব্যবস্থায় সবচাইতে বেশী ভূমিকা পালন করেছিল তা আর এখন নেই। সেটা হল মুদ্রা বিনিময়ের একটা পদ্ধতি যা ব্রেটন উডস পদ্ধতি নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালে এই পদ্ধতির অবসান একটা যুগের অবসান হয়ে আর একটা যুগের সূচনা করেছিল।

ব্রেটন-উডস পদ্ধতিটা ছিল আমেরিকান ডলার এর সাথে অন্যান্য মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনযোগ্য একটি বিনিময় মূল্য। শতকরা এক ভাগ কম বা বেশী এই সীমার মধ্যে বিনিময় মূল্য নির্ধারিত থাকত। বিভিন্ন দেশের সরকার প্রয়োজনে ডলার কিনে বা বিক্রি করে এই নির্ধারিত বিনিময় হার বজায় রাখত। আন্তর্জাতিক আস্থা বজায় রাখার জন্য আমেরিকা ডলার এর মূল্যমান নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমান করে বেঁধে রাখতে অঙ্গীকার করল (এক আউন্স স্বর্ণ ৩৫ ডলার এর বিনিময়ে)। যে কেউ ডলার এর পরিবর্তে স্বর্ণ দাবী করলে আমেরিকা তা এই মূল্যে দিতে চুক্তিবদ্ধ হল।

মুদ্রার নির্দিষ্ট বিনিময় মূল্যের একটা বড় সমস্যা আছে। সেটা হল এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের, এমনকি একই দেশের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বাণিজ্য বা মূলধন প্রবাহ বহু কালের জন্য অসমান থাকতে পারে। যেমন বৃটেনের বৃহত্তর লন্ডনের সাথে ইয়র্কশায়ার অঞ্চলের অথবা জার্মানির ষ্টুটগার্ট এর সঙ্গে পূর্ব ল্যান্ডার এর বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকে। যখন দুই অঞ্চল একই মুদ্রা ব্যবহার করে (যেমন একই দেশের মধ্যে উপরের উদাহরণ দুইটির মত) তখন এই ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্ত (এক অঞ্চলের জন্য) বা ঘাটতি (অপর অঞ্চলের জন্য) তে সমতা আনার জন্য একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ভাবে এর ব্যবস্থা করা যায়-উদ্বৃত্ত অঞ্চল ঘাটতি অঞ্চলে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে, অথবা সরকার উদ্বৃত্ত অঞ্চলে কর আদায় করে ঘাটতি অঞ্চলে তা সরকারের মাধ্যমে স্কুল, হাসপাতাল, তৈরী বেকার ভাতা দান ইত্যাদিতে খরচ করে সমতা আনতে পারে।[৫] আমেরিকায় এই রকম বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঘাটতি পূরণের জন্য দুইটি ব্যবস্থা কাজ করে। প্রথমটি হল উদ্বৃত্ত রাজ্য (যেমন নিউইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়া) গুলিতে প্রাপ্ত কর কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটতি রাজ্যগুলিতে স্বাস্থ্য সেবা, বেকার ভাতা ইত্যাদিতে খরচ করে। দ্বিতীয়টি হল যখন একটি বড় কোম্পানি (যেমন বোয়িং) কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ (যেমন যুদ্ধবিমান তৈরী) যখন পায়, তখন সরকার শর্ত দেয় কিছু কিছু উৎপাদন ঘাটতি এলাকাগুলোতে করতে হবে। কোম্পানিগুলো তখন তাদের এই কাজের একটি অংশ উৎপাদন করে ঘাটতি রাজ্যে-তাতে এই রাজ্যগুলোর ঘাটতি পূরণ হয়। এরকম ঘাটতি পূরণের জন্য উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা ইউরোপের "ইউরো" অঞ্চলগুলোতে নাই।

যদি দুটি ভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও মূলধন প্রবাহে অসমতা থাকে -এবং এই দুইটি দেশের পৃথক পৃথক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত না থাকে তাহলে ঘাটতি অঞ্চলের মুদ্রামান কমে গিয়ে এই অসাম্য দূর করে। ঘাটতি অঞ্চলের মুদ্রামান কম হওয়ায় তাদের রপ্তানী পণ্যের দাম অন্য দেশে কমে-তাতে চাহিদা বাড়ে ও রপ্তানী বাড়ে। আবার উদ্বৃত্ত দেশের মুদ্রার মূল্যমান বেশী হওয়ায় তাদের পণ্য দ্রব্যের চাহিদা ঘাটতি অঞ্চলে কমে যায়। ইউরোপে সাধারণ মুদ্রা "ইউরো" প্রবর্তনের আগে গ্রীস ও ইতালীর, জার্মানীর সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি থাকত। কিন্তু গ্রীস ও ইতালীর মুদ্রামান কমে গিয়ে আবার সমতা ফিরে আসত।

এই কারণে ব্রেটন উডসএ যখন যুদ্ধোত্তর বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল তখন কেইনস উদ্বৃত্ত পুনর্বন্টনের ব্যবস্থা না থাকাটা একটা বড় ত্রুটি বলে মনে করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে স্বর্ণের সঙ্গে নির্ধারিত মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা যেমন ভেঙ্গে পড়েছিল ডলারের সঙ্গে নির্ধারিত মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা পরবর্তীতেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতির টানাপোড়েন সহ্য করতে পারবে না বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।[৬] ছোটখাট সংকটও বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

যে দেশে বাণিজ্য ঘাটতি হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে দেশের সরকারের বাজেটও ঘাটতি থাকে। অর্থনৈতিক সংকট ঘটলে, সেটা যদি উদ্বৃত্ত দেশেও ঘটে, তার প্রভাবে চাহিদা কমে যায়। ক্রমে অন্যান্য দেশেও চাহিদা ঘাটতি হয়। এক সময় যে দেশে বাণিজ্য ঘাটতি আছে সে দেশে এই চাহিদার ঘাটতি পৌঁছে যায়। সে দেশের ঋণদাতারা এক পর্যায়ে মনে করে মন্দার জন্য আগের মত ঋণ দিতে থাকলে অনেক ঋণ খেলাপী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারা ঋণ দেওয়া কমিয়ে দেয়। ফলে চাহিদা আরও কমে, অনেক ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। বেকারত্ব বাড়ে, তাতে চাহিদা আরও কমে। এভাবে একটা চক্রের সৃষ্টি হয় ও ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক সংকটও বাড়ে। এদেশে সরকার যদি বাজেট ঘাটতি সরকার হয় তাহলে মন্দার জন্য সরকারকে আরও ঋণ নিতে হয় এবং খরচ কমাতে হয়। ফলে চাহিদা আরও কমে যায় আয় বাড়ানর জন্য রপ্তানী বাড়ান

জরুরী হয়ে পড়ে। সরকার মুদ্রা অবমূল্যায়ন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তার উৎপাদিত পণ্যের দাম কমিয়ে রপ্তানী বাড়ায় এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু ব্রেটন উডস এর নির্ধারিত বিনিময় হারের জন্য এই পথ আর খোলা থাকল না। তীব্র মন্দায় সরকারের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া কঠিন হবে। অন্যান্য দেশেও একই ধরনের সংকট ঘটবে। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংকটে পড়বে। এটাই শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৫ই আগষ্ট ঘটেছিল-তবে সে বর্ণনা পরে।

কেইনস প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটা International Currency Union (ICU) স্থাপন করতে হবে। এতে পুঁজিবাদী দেশ গুলিতে একটি সাধারণ মুদ্রা চালু করা হবে এবং একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকবে। ঘাটতি দেশগুলো একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত সুদবিহীন ঋণ নিতে পারবে। এর বেশী ঋণ নিতে চাইলে নির্দিষ্ট সুদে তা দেওয়া যাবে। এভাবে ঘাটতি দেশ উপরে বর্ণিত চক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। আবার কোন দেশ বেশী বাণিজ্য উদ্বৃত্ত জমা করতে থাকলে তারও একটি জরিমানা থাকবে। উদ্বৃত্ত একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে সেই দেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে উদ্বৃত্তের অনুপাতে টাকা দিবে। সেই টাকা আবার প্রয়োজন হলে ঘাটতি দেশগুলোতে ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে। এভাবে উদ্বৃত্ত অর্থ আবার সঞ্চালনে নিয়ে এসে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট এড়ানো যাবে। কেইনস এর প্রস্তাবে যারা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা চমৎকৃত হয়েছিল। বৃটিশ অর্থনীতিবিদ Lionel Robbins এর বর্ণনায় "এমন একটি কল্পনা শক্তি প্রভূত উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা আগে কখনই আলোচিত হয়নি"। সংশ্লিষ্ট সবার উপর এটা গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের চাইতে আমেরিকার স্বার্থ প্রাধান্য পেল। আমেরিকার প্রতিনিধি হোয়াইট এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন।

যুদ্ধের পর আমেরিকার অবস্থান ছিল পৃথিবীর সবচাইতে সম্পদশালী ও সর্ব্বোচ্চ শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে। যুদ্ধের সময় ইউরোপের দেশগুলো আমেরিকার কাছে বিশাল অংকের ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিল। আর বিনিময়ে তারা আমেরিকাতে পাঠিয়েছিল বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ। আমেরিকা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত ছিল। এই বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কমানর কোন পরিকল্পনা মার্কিন সরকারের নীতিনির্ধারকদের ছিল না। তাদের পরিকল্পনা ছিল ডলারকে বিশ্বমুদ্রায় পরিণত করা, ইউরোপে পণ্যদ্রব্য ও পুঁজি রপ্তানী করা। আমেরিকার রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও আমেরিকায় পুঁজি বিনিয়োগের বিনিময়ে ইউরোপ ও জাপান আমেরিকান কর্তৃত্ব মেনে নিবে এই ছিল তাদের পরিকল্পনা। আর আমেরিকা রপ্তানী উদ্বৃত্ত ব্যবসা চালিয়ে যাবে।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রথমে উদ্যোগ নেওয়া হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়ানর, আমেরিকার রপ্তানী বাড়ান ও অন্যান্য দেশে আমেরিকার পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরী করার মধ্য দিয়ে। ক্রমেই এই পরিকল্পনা আরও বড় আকার নিতে লাগল। অর্থনৈতিক মন্দার ভীতি ছিল প্রবল। তাই পরিকল্পনাকারীরা ব্রেটন উডস ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে চাইল, যাতে মন্দা প্রতিরোধ করা যায়। তারা এই ব্যবস্থার মধ্যে আরও দুটো বলিষ্ঠ মুদ্রা তৈরী করতে চাইল, যাতে অর্থনীতিতে ধ্বস নামলে প্রথমে এই দুটো মুদ্রা তার ধাক্কা সামলাবে। এর মধ্যে আমেরিকা মন্দা উত্তরণের ব্যবস্থা নেওয়ার সময় পাবে। এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছাড়া ব্রেটন উডসএ দূর্বলতা থেকে যাবে বলে পরিকল্পনাকারীরা মনে করল।[৭] তবে বলিষ্ঠ মুদ্রা হাওয়া থেকে তৈরী করা যায় না। এধরনের মুদ্রার জন্য প্রয়োজন ভারী শিল্পের শক্ত ভিত্তি, আর শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করার জন্য একটা উপযুক্ত আকারের বাজার। তাই নীতি নির্ধারকদের সামনে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল এরকম দুটো মুদ্রা ব্যবস্থা তৈরী করা। তাদের সামনে এরকম সুযোগও উপস্থিত হল। জার্মানী ও জাপান, দুটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্র। যুদ্ধের পর অর্থনীতি ধ্বংস প্রাপ্ত ছিল। এই দুটি রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে আবার শক্তিশালী করে গড়ে তুলে দুটো বলবান মুদ্রা ব্যবস্থা তৈরী করার চিন্তা করা কঠিন ছিল। কিন্তু পরিকল্পনাকারীরা সেই দিকেই এগিয়ে গেল।

যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বৃটেনের বড় ভূমিকা থাকবে না এটা অনেকেই মনে করেন নি। তবে সাম্রাজ্য আঁকড়ে ধরে থাকায় বৃটিশ নীতির বিরোধিতা যুদ্ধের আগেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট করে ছিলেন। যুদ্ধের সময় বৃটেন সামরিক ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য আমেরিকাকে বড় পরিমাণে অর্থ সম্পদ দিতে বাধ্য হয়ে ছিল। যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানী তেল সম্পদ সমৃদ্ধ দেশগুলোতে বৃটেনের অবস্থান আমেরিকা খর্ব করেছিল। তাদের যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট সাহায্য আমেরিকা তো দেয়নি, বরং পাউন্ডকে স্বর্ণের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মান ধরে রাখতে বাধ্য করে বৃটেনের অর্থ ব্যবস্থা দুর্বল করে দিয়েছিল। বৃটেনের অবক্ষয়মান শিল্প উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করাও সম্ভব হচ্ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে বৃটেনে নির্বাচনে শ্রমিক দল জয় লাভ করে এবং সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়া শুরু করল। অর্থনীতির দুর্বলতার

জন্য পাউন্ড এর বিনিময় মান নির্দিষ্ট রাখতে পারল না বৃটেন। যুদ্ধপরবর্তী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দুতে বৃটেনকে না রাখার জন্য আমেরিকা একটা অজুহাত পেল। সাইপ্রাসে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সি.আই.এ) অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাতে থাকল।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বৃটেনের কেন্দ্রীয় ভূমিকা বাতিল করার পর স্বতঃসিদ্ধভাবেই এই স্থানের জন্য জার্মানী ও জাপান বিবেচনায় চলে আসে। দুইটি দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নিয়ন্ত্রণে ছিল (জার্মানীর একটা বড় অংশ)। দুইটি দেশই ছিল শিল্পোন্নত। দুই দেশেই ছিল উচ্চমানের দক্ষ জনশক্তি, যারা পুণর্গঠনের এ সুযোগ লুফে নিবে। তা ছাড়াও এই দুই দেশের উন্নয়ন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিরোধের ভূ-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

তবে এই পরিকল্পনার যথেষ্ট বিরোধিতা ছিল। এই বিরোধিতা মূলত জার্মানী ও জাপানকে শাস্তি দেওয়ার মনোভাব থেকে এবং এই দুই দেশ যাতে ভবিষ্যতে আবার সামরিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে যুদ্ধ করতে না পারে-এই চিন্তা থেকে উদ্ভূত। বিরোধিতা ছিল মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যেও। ব্রেটন উডসএ মার্কিন প্রতিনিধি হ্যারি হোয়াইট জার্মানীর শিল্প কারখানা সরিয়ে ফেলে তার জনগণের জীবনযাত্রার মান কমিয়ে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বিরোধিতা ছিল মিত্র দেশগুলিরও। ১৯৪৬ সালে Allied Control Council এর মাধ্যমে মিত্র দেশগুলি জার্মানীর ইস্পাত কারখানাগুলো সরিয়ে ফেলে ইস্পাত উৎপাদন বৎসরে ৬০ লক্ষ টনের কমে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (এটা ছিল যুদ্ধের আগের তুলনায় প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ কম)।

জাপানের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন ছিল। জাপান ছিল মার্কিন অধিকৃত এবং একজন সামরিক কমান্ডার (জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার) এর নিয়ন্ত্রণে, তুলনায় জার্মানী ছিল চারটি অংশে-চার দেশের (যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) সামরিক নিয়ন্ত্রণে। ম্যাক আর্থার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জার্মানীতে যেভাবে নাৎসীদের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল এবং যারা অপরাধী তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল - তেমন কিছু জাপানে করা হবে না। তিনি জাপানের রাজা এবং জাপানের সামরিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্ণধারদের শাস্তি হতে দেননি। তাঁকেও প্রথম দুই বৎসর ওয়াশিংটনের কর্মকর্তাদের বাধা সহ্য করতে হয়েছিল-যারা চাচ্ছিলেন জাপানকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার শিল্পোৎপাদনের ক্ষমতা নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে আসা হোক।

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান বিরোধের কারণে জার্মানী ও জাপানের শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা খর্ব করার চাপ কমতে থাকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুম্যান ১২ই মার্চ ১৯৪৭ সালে ঘোষণা করলেন-এখন থেকে সোভিয়েত প্রভাব সীমিত করা হবে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। এই সময় থেকেই নীতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। এর প্রতিফলন দেখা যায় গ্রীসের গৃহযুদ্ধে-যেটা বৃটিশরা শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারছিল না-আমেরিকানরা এতে পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়ে। এর কয়েক মাস পরেই মুদ্রানীতি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বিরোধ ঘটায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বার্লিন অবরোধ করে। বার্লিনে বিমান সরবরাহ শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র এবং এটা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখোমুখি হয়ে যায়। এই বিরোধের সময় থেকেই ট্রুম্যানের ঘোষণা কার্যকরী হয়ে যায়। জার্মানী ও জাপানকে যুক্তরাষ্ট্রের কাজে লাগানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়। ট্রুম্যানের ঘোষণার কয়েক মাস পরই জুন মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ মার্শাল যুদ্ধোত্তর ইউরোপ পুনর্গঠনের জন্য একটা পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন-European Recovery Programme (মার্শাল প্ল্যান নামে বেশী পরিচিত)। পৃথিবীতে মার্কিন পরিকল্পনা অনুযায়ী অথনৈতিক প্রাধান্য তৈরীর প্রধান পদক্ষেপ ছিল এটা। পরিকল্পনা ঘোষণা করার সময় মার্শাল বলেছিলেন "বর্তমানে শ্রম বিভাজনের যে ব্যবস্থা চালু আছে তার উপর ভিত্তি করে পণ্যের আদান প্রদান করা হচ্ছে তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে"। এটা ছিল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে ১৯২৯ সালের মত মহামন্দা থেকে রক্ষা করারও একটা উদ্যোগ। পুনর্গঠনের একটা বিরাট আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হল। প্রথম বৎসর খরচ করা হয় ৫.৩ বিলিয়ন ডলার, আমেরিকার মোট জাতীয় উৎপাদনের (GDP) দুই শতাংশের সামান্য বেশী। মার্শাল প্ল্যান যখন ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫১ শেষ করা হয় তখন মোট খরচ করা হয়েছিল ১২.৫ বিলিয়ন ডলার। এর ফলে ইউরোপের মোট শিল্প - উৎপাদন শতকরা ৩৫ ভাগ বেড়ে যায়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল এর ফলে ইউরোপে স্থিতিশীলতা ফিরে এল, আর আমেরিকা ও ইউরোপের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি হল। এই পরিকল্পনার যে বিরোধিতা হয়নি তা নয়। মার্কিন কৃষিমন্ত্রী ও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট হেনরী ওয়ালেস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘাতে না যাওয়ার পক্ষে

ছিলেন। এমন সব শর্ত দেওয়া হয়েছে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্শাল প্ল্যানে যোগ দিতে না পারে -তারও বিরোধিতা তিনি করেছিলেন। ফলে ট্রুম্যান তাকে বরখাস্ত করেন। কয়েকজন বুদ্ধিজীবীও (যার মধ্যে ছিলেন জন কেনেথ গলব্রেইথ, ও পল সুইজি) এর বিরোধিতা করেন। এর পর সিনেটর যোসেফ ম্যাককার্থী হাউস কমিটির মাধ্যমে আমেরিকার বিরোধিতা মূলক কার্যকলাপ (Un Americn Activity) এর আওতায় নিপীড়ন শুরু করে সব সমালোচনার কণ্ঠ রোধ করেন।

বিরোধিতা করেছিল ফ্রান্সও। ১৯৪৬ সালের ২৯শে মার্চ মিত্রশক্তিগুলির চুক্তি হয় যে জার্মানীর শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা অর্ধেক কমিয়ে ফেলতে হবে। এর ফলে প্রায় ১৫০০ শিল্প কারখানা বন্ধ বা ধ্বংস করে ফেলতে হত। মিত্ররাষ্ট্রগুলোর বিরোধিতার মুখে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমদিকে খোলাখুলি জার্মানীতে শিল্প উৎপাদন পুনর্বাসনের কথা বলেনি। ১৯৪৯ সালেও জার্মানীর চ্যান্সেলর অ্যাডেনার শিল্প কারখানা ধ্বংস না করার আবেদন জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৯ সাল নাগাদ জার্মানীর প্রায় ৭০০ শিল্প কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং জার্মানীর ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা বিপুলভাবে কমে যায়। তবে মার্শাল প্ল্যানের আর্থিক সুবিধা নেওয়া, আর Organization for European Economic Co-operation (OECC) তে বড় ভূমিকা পাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স জার্মানীর পুনরুদ্ধার এর বিরোধিতা বন্ধ করে।

মার্শাল প্ল্যানে শিল্প উৎপাদন পুনরুদ্ধার করা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়। আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের আভ্যন্তরীন বাণিজ্যের বাধাগুলো দূর করে জার্মানীকে ইউরোপের কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে আসা; এজন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে জার্মানীকে এই সব সংস্থায় অন্তর্ভূক্ত করে তার পরাজিত ও ঘৃণিত অবস্থা দূর করা। ১৯৪৮ সালে প্রথম স্থাপন করা হয় Economic Cooperation Administration, তের দিন পরই গড়ে তোলা হয় OECC যার কাজ ছিল কোথায় কিজন্য তহবিল খরচ করা হবে নির্ধারণ করা। OECC ই পরবর্তীতে Organization for Economic Co-operation (OECD) এ পরিণত হয়।

মার্শাল প্ল্যান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করার প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল European Coal and Steel Community (ECSC) স্থাপন করা। ECSCকে বর্তমান ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পূর্বসূরী বলে মনে করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কয়লা ও ইস্পাতের একটি সাধারণ বাজার স্থাপন করা। এই সাধারণ বাজারে অন্তর্ভূক্ত ছিল পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ। এই দেশগুলোর মধ্যে ইস্পাত ও কয়লার পণ্য মুক্তভাবে চলাচলের ব্যবস্থা করা হল। এতে একদিকে জার্মানীকে অন্তর্ভূক্ত করে ইউরোপীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় তাকে পুর্নবাসিত করা হল, অপর দিকে সাধারণ বাজার হওয়ার ফলে এই দেশগুলোর ভারী শিল্পগুলোর মধ্যে যে বন্ধন তৈরী হল, তাতে এক দেশ ও আরেক দেশের মধ্যে অন্তর্কলহ হওয়ার সম্ভাবনা কমে গেল। কোন দেশের পক্ষে আলাদাভাবে যুদ্ধ পরিচালনার সম্ভাবনাও বন্ধ হয়ে গেল। তবে এই ইউরোপীয় দেশগুলির ভারী শিল্পের উন্নতিতে মার্কিন তদারকী উচ্চপর্যায়ের কূটনীতির কারণেই সম্ভব হয়েছিল।[৮]

একজন রাজনীতিবিদ বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ঐক্য আমেরিকার উদ্যোগে করা হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য আমেরিকার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে। নতুন ইউরোপকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করা এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি হলেন ফরাসী রাজনীতিবিদ ও ভবিষ্যত প্রেসিডেন্ট জেনারেল চার্লস দ্য গল। ফ্রান্সের পার্লামেন্টে দ্য গল ও তাঁর অনুসারীরা ECSC এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার বিরোধ এই পর্যায়ে পৌঁছায় যে পরের দশকে তিনি ফ্রান্সকে NATO র সামরিক বিভাগ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন।

বিশ্ব অর্থনীতিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিজ পরিচালনায় গড়ে তোলার দ্বিতীয় অংশ ছিল পৃথিবীর অন্য পার্শ্বে, পূর্বদিকে। জাপানের অর্থনীতি পুনর্বাসন করে তাকে আবার শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করার পরিকল্পনা জার্মানীকে পুনর্বাসনের চাইতে কম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। জাপানের অর্থনীতি বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের তুলনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়ে ছিল জাপানে উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করার বাজার ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের পরিকল্পনা ছিল চীন হবে জাপানের পণ্যদ্রব্যের একটা বড় বাজার। কিন্তু চীনের গৃহযুদ্ধে কমিউনিষ্টরা যতই কুওমিনটাং সরকারকে হারিয়ে দেওয়ার দিকে এগোচ্ছিল ততই এই পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছিল। ১৯৪৯ সালে কমিউনিষ্টদের কাছে চিয়াং কাই শেক সরকার এর পরাজয়, চীনের মূল ভূখন্ড থেকে পলায়ন ও তাইওয়ানে পশ্চাদপসরণ এর পর এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণই অবাস্তব হয়ে গেল।

যদিও জেনারেল ম্যাক আর্থার (যিনি ছিলেন অধিকৃত জাপানের মার্কিন সামরিক শাসক) জাপানের আভ্যন্তরীন বাজারের উপর নির্ভর করে শিল্প পুনর্বাসন করার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা জাপানের আভ্যন্তরীন বাজার যথেষ্ট মনে করেন নি এবং তাঁরা জাপানের শিল্প কারখানা পুনর্বাসনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিলেন।

১৯৫০ সালের ২৫শে জুন কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হল আর জাপান ও জেনারেল ম্যাক আর্থার এর ভাগ্য বদলে গেল। ট্রুম্যান doctrine এর প্রয়োগ ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়ায় নজর ফেরাল। ইউরোপে শিল্প উৎপাদন পুনর্বাসনে অর্থ বিনিয়োগ কমিয়ে জাপানের শিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগ করা শুরু হল। জাপানের শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য কোরিয়া যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাবে। ইউরোপে যে ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছিল এবং যে শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা তৈরী করা হয়েছিল নীতিনির্ধারকরা মনে করলেন, ১৯৫১ সাল নাগাদ জার্মানীর শিল্প উৎপাদন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে জার্মানীর উদ্বৃত্ত ইউরোপের শিল্পায়নের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখবে।

কোরিয়া যুদ্ধ জাপানের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এর সুযোগ এনে দিল। কোরিয়া যুদ্ধের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জাপানের শিল্প কারখানাগুলোকে কাজে লাগানো হল তা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া জাপানের উৎপাদিত পণ্য যাতে আমেরিকার মিত্র পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারে তা যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাব খাটিয়ে ব্যবস্থা করল। শুধু তাই নয় জাপানের শিল্প কারখানা পুনর্বাসনের জন্য আমেরিকা তার নিজের বাজারও খুলে দিল। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের সম্মতি ছাড়া জাপানের গাড়ী, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ঢুকতে পারত না। এর পর ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হল আর জাপানের শিল্প কারখানাগুলোকে এর চাহিদা মেটানোর জন্য আরও প্রসারিত করা হল। এবার চাহিদা পূরণ করার জন্য পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশ (তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া) শিল্পায়িত করা হল। এই দেশগুলো জাপানের শিল্প কারখানার সম্পূরক হল। এটাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে কোরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থ ব্যয় করেছিল সেটা ছাড়া এই দেশ গুলিতে শিল্পায়ন সম্ভব হত না।

জাপানে যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছিল। সেই সময় জাপানের বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশই যুক্তরাষ্ট্রের বদৌলতে হত। অর্থ বিনিয়োগই যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র কাজ ছিল না, জাপানের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজানর ব্যবস্থাও করা হল। এটা সম্ভব হল কারণ তখনও জাপান মার্কিন সৈন্য দ্বারা অধিকৃত। জাপানের নতুন সংবিধান তৈরী করা হল। জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করা হল যাতে জাপানে ব্যক্তিখাতে বহুমুখী শিল্প গড়ে তোলা যায়, কিন্তু তা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে হবে। বৃটেনের বিরোধিতা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে General Agreement on Trade and Tariff (GATT) এর অন্তর্ভূক্ত করল। এর ফলে খুব কম বাধায় জাপানে উৎপাদিত পণ্য যে সমস্ত দেশে যুক্তরাষ্ট্র পাঠান প্রয়োজন মনে করল, সেখানে পাঠান সম্ভব হল।

পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধে পরাজিত দুটি দেশকে বিজয়ী দেশ অতীতে কখনই শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে পুনর্বাসিত করেনি। যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী ও জাপানের ক্ষেত্রে তাই করল। কিন্তু সেটা করল বিশ্বব্যাপী তার নিজের অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে। জার্মানী ও জাপানের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের চাহিদাও নিশ্চিত করল যুক্তরাষ্ট্র। ডলার বিনিয়োগ করে পশ্চিম ইউরোপের দেশ গুলিতে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করল। আর পূর্ব এশিয়ায় জাপানের পণ্যদ্রব্য কোরিয়া যুদ্ধের ফলে বাজার পেল। জার্মানীর ডয়েসমার্ক ও জাপানী ইয়েনের মুদ্রাবলয় তৈরী হল যা বিশ্ব অর্থনীতিকে মন্দা থেকে রক্ষা করার জন্য কাজ করবে বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করল। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চমূল্যের পণ্য (যেমন বিমান, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি) এই দুই বলয়ে বিক্রি করাও সম্ভব হল।

বিশ্ব পরিকল্পনার ভূ-রাজনৈতিক কৌশল

অনেকেরই আশংকা ছিল যুদ্ধশেষে বিশ্ব অর্থনীতি আবার মন্দায় আক্রান্ত হবে। পল স্যামুয়েলসন (যিনি পরবর্তীতে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন) ১৯৪৩ সালে লিখেছিলেন-"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘাত শেষ হবার পর সামরিক বাহিনীর জনবল কমে গেলে প্রায় এক কোটি মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করবে"। যদি যুদ্ধকালীন চাকুরী ব্যবস্থা চালু না থাকে তাহলে "অতীতে কোন দিন হয় নাই এমন বেকারত্ব দেখা দিবে ও অর্থনীতি কক্ষচ্যুত হয়ে যাবে"।[৯] আরেক জন

ভবিষ্যত নোবেল বিজয়ী গুনার মিরডাল ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনীতি এতই বিপর্যস্ত হবে যে তার ফলে ব্যাপক সহিংসতা দেখা দিবে।

তখনকার প্রচলিত ধারণা ছিল সামগ্রিক চাহিদাই অর্থনীতির চালিকাশক্তি। সরকার সামরিক বাহিনীতে সৈন্য নিয়োগ না করলে, অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানা চালু রেখে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান না করলে, অনেক মানুষের কাজ থাকবে না, আয়ও থাকবে না, তারা খরচও করতে পারবে না। ফলে মোট ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কমবে, বেসরকারী বিনিয়োগও কমবে, অর্থনীতিতে মন্দা নেমে আসবে।

এর সঙ্গে আরও একটা উপাদান যোগ হল-বিশ্বব্যাপি অনেকগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশের অভ্যুদয়। একটা পশ্চাদপদ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে দুই দশকের মধ্যে একটি শক্তিশালী শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য পুঁজিবাদী দেশের অনেককে আকৃষ্ট করেছিল। পুঁজিবাদী বিশ্ব যখন মহামন্দায় আক্রান্ত তখন সোভিয়েত অর্থনীতিতে দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল। এরপর পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সামরিক শক্তি জার্মানী-যে প্রায় সমস্ত ইউরোপ অল্প সময়ের মধ্যে দখল করে ফেলেছিল তাকে প্রায় একক ভাবে সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব রণাঙ্গনে পরাজিত করল-এটাও পশ্চিমা জনমনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অনেকগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশের আবির্ভাব, সাম্রাজ্যবাদী দখলের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত উপনিবেশ গুলোর জনগণের সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ, এটাও বিশ্বকে প্রভাবিত করে ছিল। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষের মনে এটা ধারণা হচ্ছিল যে সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র স্থাপন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে শুরু থেকেই শত্রুর আক্রমণের মুখে জাতীয় নিরাপত্তা বিধান করা এটা বার বার তুলে ধরা হয়েছে। এই ধরনের আক্রমণের সম্ভাবনার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতি জন্মলগ্ন থেকেই প্রভাবিত হয়ে আসছে। আমেরিকার ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট জন কুইন্সি এ্যাডামস আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের (রেড ইন্ডিয়ান) সম্বন্ধে বলেছিলেন, যে সমস্ত জনগোষ্ঠী অবলুপ্ত হওয়ার পথে এবং যারা এ্যাঙ্গলো স্যাক্সনদের তুলনায় নিকৃষ্ট -তাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারাটা একটা সম্মানের ব্যাপার এবং এটা মানুষ জাতির জন্য কোন ক্ষতি নয়। এই নিকৃষ্ট জনগোষ্ঠীদের আরও সভ্য জনগণের জন্য সরে যেতে হবে।[১০] উত্তর আমেরিকা থেকে ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার পর অন্যান্য দেশের দিকে যুক্তরাষ্ট্র দৃষ্টি দিবে এটাই স্বাভাবিক। ১৮৮০ সালে নৌশক্তি বৃদ্ধির জন্য বৃটিশ, ব্রাজিলিয়ান এমনকি চীনা নৌবাহিনী কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণের ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছিল। জন লুই গ্যাডিস (John Lewis Gaddis) যিনি cold war এর অন্যতম ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত বলেন, ১৯১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নব আবির্ভূত সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ ছিল আত্মরক্ষামূলক। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লব পৃথিবীর অনেক দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করেছিল এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন করেছিল। তাই রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রক্ষার জন্য আক্রমণ করা প্রয়োজন ছিল।[১১] যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনও সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে এবং ১৯১৯ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে।

এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত বিরোধিতা কোন নতুন ঘটনা নয়। এ সম্বন্ধে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (National Security Council) এর ট্রুম্যান প্রশাসনের সময়কার শীতল যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি দলিলে (NSC 68 of April 1950), যা অনেক দিন গোপন ছিল, পরিস্কার জানা যায়।[১২] এই দলিলের মতে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মাধ্যমে ও বল প্রয়োগে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা ও সরকার ধ্বংস করা। সারা পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করা সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য। অতএব যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় হচ্ছে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নেওয়া। কোন আলাপ আলোচনা বা চুক্তিতে যাওয়া হবে অনুচিত-কারণ সেটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিকূলে যাবে। কিন্তু এই বিশ্লেষণের পক্ষে জোরাল যুক্তি এই দলিলে পাওয়া যায় না।[১৩]

জন মেইনার্ড কেইনস এর কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার নীতিনির্ধারকরা শিক্ষা নিয়েছিল যে মুক্ত বাজার অর্থনীতি অব্যাহত উন্নতি ও স্থিতিশীলতা দেয় না। এজন্য অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। অন্যদিকে "শীতল যুদ্ধ" এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতার প্রয়োজনে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতির শক্তি বৃদ্ধিরও প্রয়োজন মনে করা হল। ফলে কেইনস যেভাবে পুঁজির উদ্বৃত্ত কাজে লাগানর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখিয়েছিলেন, সেটা তারা গ্রহণ করতে

পারেনি।[১৪] কর্পোরেশন সমুহের ক্ষমতা খর্ব করার প্রচেষ্টাও যুক্তরাষ্ট্র সরকার করেনি। যুদ্ধের সময় উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য শিল্প ও কর্পোরেশন সমূহের মালিক ও সরকারের আমলাদের মধ্যে যে সহযোগিতার সৃষ্টি হয়েছিল যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে সেই সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হল। পুঁজির উদ্বৃত্ত recycle করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় রাজী না হওয়ার একটা কারণ হল এটা। মার্কিন সরকার ও কর্পোরেশন গুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য দেশে ও বিদেশে হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতা এই ব্যবস্থায় খর্ব হয়ে যেত বলে তারা মনে করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ও শেষ হওয়ার পর পরই যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচক ছিল। বৃটেনের ভারত দখল করে রাখা, ফ্রান্সের ইন্দোচীনে প্রত্যাবর্তন করা, হল্যান্ডের ইন্দোনেশিয়া দখলে রাখা, এগুলোর প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু যতই এই দখলকৃত দেশগুলোর মুক্তি সংগ্রাম শক্তি সঞ্চয় করতে থাকল ততই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার সঙ্গে এই শক্তিগুলোর অসঙ্গতি ও সংঘাত প্রকাশ পেতে থাকল। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করা ও সেই উদ্দেশ্যে জার্মানী ও জাপানের শিল্প পুনর্বাসন করে পৃথক বলয় সৃষ্টি করার পথে এই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ প্রতিবন্ধক বলে নির্ধারণ করা হল। যুক্তরাষ্ট্র, উদীয়মান জার্মানী ও জাপানের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করার পথে এই স্বাধীনতা আন্দোলনগুলো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে মনে করল যুক্তরাষ্ট্র। চীনের কমিউনিষ্টদের ক্ষমতা দখলের ফলে চীনের বাজার হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া ছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকল। এমনকি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান দল জাতীয় কংগ্রেস-যার নেতাদের বেশীর ভাগই মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিল, তারাও সমাজতন্ত্রের উপযোগিতার কথা বলছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে এই মতবাদের আদর্শিক আনুগত্য, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে শিল্পায়ন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ ও অনেক স্থানে সহায়তা করাও এই আন্দোলন গুলির সমাজতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার কারণ গুলির মধ্যে অন্যতম। বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী দেশগুলো অধিকৃত দেশসমূহ ও নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশসমূহকে কাঁচামালের উৎস ও তাদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের বাজার হিসাবে রাখার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ায় এই স্বাধীনতা সংগ্রামগুলো তাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা এই স্বাধীনতা সংগ্রামগুলো ধ্বংস করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম নেয়। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণমুখী সরকার গুলোকে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে উৎখাত করে পুঁজিবাদী দেশগুলোর তাঁবেদার গণবিরোধী সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

বিশ্ব আধিপত্য স্থাপনের পরিকল্পনায় মার্কিন আভ্যন্তরীন নীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যাতে আবার বিশ্ব মন্দা নেমে না আসে এবং যুক্তরাষ্ট্র যাতে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভুত্ব করতে পারে এই উদ্দেশ্যগুলি সামনে রেখে ইউরোপে জার্মানী ও পূর্ব এশিয়ায় জাপানের নেতৃত্বে দুটি অর্থনীতি বলয় গড়ে তোলার বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এই বলয় দুটিতে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি হল। এই পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমেরিকায় আভ্যন্তরীন নীতি প্রণয়ন করা হল। তিনটি উপায়ে দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক প্রণোদনা দেওয়া হলঃ প্রথম-আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি (Intercontinental Ballistic Missile Programme); দ্বিতীয়ঃ কোরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধ; তৃতীয়ঃ প্রেসিডেন্ট কেনেডীর New Frontier ও প্রেসিডেন্ট জনসনের Great Society কর্মসূচি।

প্রথম দুটি কর্মসূচি আমেরিকার বড় কর্পোরেশনগুলোর কর্মকান্ড ও লাভ বাড়ায়। ফলে জার্মানী ও জাপানের শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে তারা আপত্তি করেনি। সবচাইতে বেশী লাভবান হয়েছিল সামরিক সমরাস্ত্র তৈরী, মহাশূন্য কর্মসূচি ও এ সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরীর শিল্প-প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যাদের military industrial complex (MIC) নাম দিয়েছিলেন। এরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ পৃথক ও কর্তৃত্বের ভূমিকা দখল করে নিল। অর্থনীতিতে এই শিল্পগুলি এতই আধিপত্য স্থাপন করেছিল যে ১৯৬১ সালে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার (নিজে একজন প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ হওয়া সত্তেও) মার্কিন জনগণের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেনঃ "সামরিক বাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্প কারখানাগুলো যুক্তভাবে এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তারা আমাদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে"[১৫] এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল

কংগ্রেস সদস্যরা। এই শিল্পখাতে খরচের অংশ যাতে নিজ নিজ এলাকায় যায়, সেজন্য তারা MIC এর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। অর্থ বরাদ্দ করতে সাহায্যের বিনিময়ে নিজ এলাকায় কারখানা ও কাজ নিতেন।[১৬]

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যয় (২০০৫ সালের ডলার এর মূল্যমানে বিলিয়ন ডলারে)

অর্থবৎসর	মোট সরকারী ব্যয়	প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়
১৯৪৮	৪২.৩	১৩.৭
১৯৫৪	৯০	৪৫
১৯৬০	১২৪.৭	৫১.১
১৯৬৫	১৬৫.৫	৫৫.৯
১৯৭০	২৭৮.৩	৮৬
১৯৭৫	৪৭৫.৪	৯৩.৬
১৯৮০	৮২০.৩	১৪৬.৭
১৯৮৫	১৩০৩.৯	২৬৮.৯
১৯৯০	১৭৮৯.৫	৩১৩.১
১৯৯৫	২২২৯.৩	২৮৮.৫
২০০০	২১৭৮	৩১১.৭
২০০২	৩০৫০.৭	৩৭০.৯

সূত্রঃ-US Office of Management and Budget

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সুপ্রীম কোর্টের কতকগুলি সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে পরিবর্তন নিয়ে আসে, যা যুদ্ধ শেষ হবার পরও চালু থাকে। এর মধ্যে ছিল "জরুরী" অবস্থা কালে প্রেসিডেন্টের কার্যক্রম গ্রহণ করার ক্ষমতা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাহী বিভাগ গঠন করার ক্ষমতা। "জরুরী অবস্থা" কি তা প্রেসিডেন্ট নিজেই নির্ধারণ করবেন। আর একটা ছিল অনেক বিচার বিভাগীয় পদ্ধতির বদলে প্রশাসনিক পদ্ধতি চালু করা।[১৭] এর ফলে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল।

১৯৫০ সাল থেকে ষাটের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত দুই প্রধান দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি হল বিশ্বব্যাপী কমিউনিজম এর বিরোধিতা করা। এর জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তাও দ্বিপাক্ষিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে "শান্তিকালীন" সামরিক বাহিনীকে দেওয়া হত।[১৮] কিছুটা উঠানামা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতি শত্রুতার এই নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন না হওয়া পর্যন্ত চালু ছিল। প্রতিরক্ষার জন্য বড় পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য শত্রুতার এই পরিবেশ ছিল অত্যাবশ্যকীয়। তার পরও সাধারণ মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝেই এত বড় প্রতিরক্ষা ব্যয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগত-বিশেষতঃ প্রতিরক্ষা ব্যয়ের দূর্নীতি ও অপব্যয়ের ঘটনা যখনই গণমাধ্যমে প্রচারিত হত, তখনই কোন সংকট তৈরী করে জনগণকে আবার জঙ্গী করে ফেলা হত। এই সংকট প্রতিবারই হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা অথবা অনেকটা বাড়িয়ে তৈরী করা হত। [১৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেখান হয়েছিল। মধ্য পঞ্চাশ দশকে বলা হল সোভিয়েতের বোমারু বিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে অনেক বেশী হয়ে গেছে, পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে প্রচার করা হল সোভিয়েতের মিসাইল শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। পরে এ দুটোই মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ১৯৬৪ সালে ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগরে একটি ভুয়া ঘটনা প্রচার করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য কংগ্রেসের সমর্থন আদায় করা হয়। পরবর্তীতে সাবমেরিন সমূহের ক্ষমতা, আনবিক বোমার মেগাটনের স্বল্পতা, এগুলো প্রচারণা করা হয়। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের হাতে weapons of mass destruction আছে এই অজুহাতে আক্রমণ করা হল-পরবর্তীতে এটাও মিথ্যা প্রমাণিত হয়। মাঝে মধ্যেই এই ধরনের ধূয়া তুলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্বন্ধে ভীতি সৃষ্টি করে উচ্চহারে প্রতিরক্ষা ব্যয় বজায় রাখা হত। যারা এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করত তাদের কম দেশপ্রেমিক বলে আখ্যায়িত করা হত।

এছাড়া সামরিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি নিরাপত্তার অজুহাতে জনগণের দৃষ্টির বাইরে রাখা হত। তথ্য দেওয়া হলে এমন ভাবে দেওয়া হত যা প্রতিরক্ষা বিভাগের পক্ষেই যেত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই প্রতিরক্ষা ব্যয় কমে গেছিল। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে (মুদ্রাস্ফীতির জন্য adjust করে) প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ কমান হয়। ট্রুম্যান প্রশাসন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিরক্ষা বাড়ান শুরু করার পরবর্তী দুই বৎসরে তা আবার শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ান হল। কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ায় ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে আবার শতকরা ১২৬ ভাগ বাড়াল। তবে এই খরচ কোরিয়া যুদ্ধের নামে করা হলেও এর বড় অংশ পৃথিবীর সব জায়গায় সামরিক ক্ষমতা বাড়ানর জন্য ব্যবহার করা হয়, বিশেষতঃ ইউরোপ ও জাপানে। উচ্চহারে খরচের উপর আবার এক একটা সংকট সৃষ্টি হলে আবার বরাদ্দ বাড়ান হত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রায় এক দশক পরে, ২০০১ সালে সামরিক খাতে খরচ "শীতল যুদ্ধের" সময় সব চাইতে বেশী খরচ যখন হয়েছিল, তার চাইতেও বেশী ছিল। যদিও তখন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ২০০১ সালে আফগানিস্তান আক্রমণ ও ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের সময় আবার বিপুল খরচ বাড়ে। ২০১২ সালে আমেরিকা সামরিক খাতে ৬৮ হাজার ২০০ কোটি ডলার ব্যয় করে। বিশ্বে বিভিন্ন দেশের সর্বমোট সামরিক ব্যয়ের ৪০ শতাংশই ব্যয় করে আমেরিকা।[২০]

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এর আশংকা সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল প্রতিরক্ষা ব্যয় ও প্রায় স্থায়ী সামরিকীকরণ তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রকৌশল সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কতটা এবং কিভাবে এই সামরিকীকরণ প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক এখনও চলছে। তবে এই প্রভাব যে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী তা অনেকেই মনে করেন। আমেরিকার বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক আধিপত্যের পরিকল্পনার ফলে সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির উন্নতি হলেও তা সব অংশে সমান ছিল না। সামরিক-মহাশূন্য-ইলেকট্রনিক শিল্প লাভবান হলেও অনেক পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প উন্নতি করতে পারেনি। বিশ্বের অন্যান্য স্থানে (বিশেষতঃ জার্মানী ও জাপান) পুঁজিবাদী শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার প্রয়োজনে অনেক সময়ই যুক্তরাষ্ট্রের নিজের পণ্য উৎপাদন খাতের শিল্পগুলির সঙ্গে (যেগুলো সামরিক, মহাশূন্য ও ইলেকট্রনিক খাতের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না) বৈষম্যমূলক আচরণ করতে হয়েছিল। শিল্পখাত গুলোর অসমান অগ্রগতি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে আয়ের অসম বন্টনের কারণে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। বিশেষতঃ ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অর্থনীতির উন্নতির গতি কিছুটা ধীর হয়ে যায়। এর ফলে দরিদ্র শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থা বেশী প্রভাবিত হয়। এটা মোকাবিলা করার জন্য ১৯৬০ এর দশকে প্রেসিডেন্ট কেনেডি "New Frontier " নামে সামাজিক খাতে ব্যয় বাড়ানর একটা কর্মসূচি নেন। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চারুকলা, গণপরিবহন, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি খাতে ব্যয় বাড়িয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ উপশমের উদ্যোগ নেন। কেনেডী হত্যার পর প্রেসিডেন্ট জনসন একই ধারায় "Great Society" নামে কর্মসূচী চালু করেন। এর মাধ্যমে তিনি দারিদ্র ও বর্ণবৈষম্য দূর করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয় দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বাড়ানর এবং দরিদ্র ও বয়স্কদের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। দারিদ্র বিমোচনে সাফল্য পাওয়া যায় -কর্মসূচির শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ২২ ভাগ মানুষ দরিদ্র ছিল, কর্মসূচির শেষে তা শতকরা ১৩ ভাগে নেমে আসে। কিন্তু আরও উল্লেখযোগ্য হল ১৯৬০ সালে কৃষ্ণ আমেরিকানদের মধ্যে দরিদ্র ছিল শতকরা ৫৫ ভাগ। ১৯৬৮ সালে এটা শতকরা ২৭ ভাগে নেমে আসে। এসবই করা হচ্ছিল যখন প্রেসিডেন্ট জনসন ভিয়েতনামে নির্মম আগ্রাসন চালাচ্ছিলেন।

"সোনালীযুগ"

বিশ্ব অর্থনীতিকে নিজ আধিপত্যে রাখার পরিকল্পনার অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রম ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চলে। এই সময়কালকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির "স্বর্ণযুগ" বলা যেতে পারে। এই সফলতার একটা কারণ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বঅর্থনীতির যুদ্ধোত্তর পুনরুদ্ধার ও তার নিয়ন্ত্রণ।

প্রকৃত মাথাপিছু GDP (মার্কিন ডলারে approximately)

দেশসমূহ	সাল		
	১৯৪৮	১৯৬০	১৯৭১
যুক্তরাষ্ট্র	৯৫০০	১১২৫০	১৫০০০
ব্রিটেন	৬২৫০	৮২৫০	১০২০০
জার্মানী	২৬০০	৭৮০০	১০৯০০
জাপান	১৮০০	৪০০০	৯৮০০
ফ্রান্স	৪২০০	৭৭০০	১০২০০

ইউরোপ ও জাপান নিম্নপর্যায় থেকে শুরু করে দ্রুততর অগ্রগতি করেছিল। তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতির হার কম ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদিও তার নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বজায় রেখেছিল, কিন্তু সেজন্য তার উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি সমূহকে গড়ে উঠার সুযোগ তার বিনিময়ে করে দিয়েছিল। এই সময় পৃথিবীর মোট আয়ের মধ্যে জাপানের অংশ বেড়েছিল শতকরা ১৫৬.৭ ভাগ আর জার্মানীর বেড়েছিল শতকরা ১৮ ভাগ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কমেছিল প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্র এই অংশ অনেকটা পরিকল্পিত ভাবেই ছেড়ে দিয়েছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতির আরও দুটি বলয় তৈরী করার জন্য- এটা আগেই বলা হয়েছে। ইউরোপের দেশগুলোর অর্থনীতির একাঙ্গীকরন ও জাপানের রপ্তানীমুখী শিল্পোন্নয়ন, দুটোর পিছনেই ছিল ওয়াশিংটনের নীতি নির্ধারকদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন-যদিও এতে আমেরিকার বাণিজ্যের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ছিল।[২১]

যুক্তরাষ্ট্র নির্ধারিত বিনিময় হার (fixed exchange rate) বজায় রেখে পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ধরে রেখেছিল। এতে প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্রের যে বিরাট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল তার অংশ বিশেষ বিনিয়োগ বা সাহায্যের আকারে অন্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর শিল্পোন্নয়ন করা হল। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের বাজারও সৃষ্টি হল। আবার ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ায় জার্মানী ও জাপানের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সেখানে দুটি আলাদা (কিন্তু মার্কিন প্রভাব বলয়ের চাইতে ছোট) অর্থনৈতিক বলয় তৈরী হল - যা ছিল ওয়াশিংটনের নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিতে মন্দার হাত থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করার প্রতিরক্ষা বলয়।

বিশ্ব অর্থনীতিতে কর্তৃত্ব রক্ষার পরিকল্পনায় বিপর্যয়

যুদ্ধপরবর্তী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরীতে উদ্বৃত্ত অর্থ পুনরায় (recycle) কাজে লাগানর জন্য জন মেইনার্ড কেইনস ব্রেটন উডসে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা বাতিল করে দিয়েছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। এটা ছিল এক মুদ্রা ও একটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে একটি দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি সমন্বয় করা। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র ছিল বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত রাষ্ট্র। নীতিনির্ধারকদের বিশ্বাস ছিল যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই উদ্বৃত্ত থাকবে। কাজেই মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে না থেকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই থাকা ভাল। উদ্বৃত্ত অর্থ যুক্তরাষ্ট্র নিজ প্রয়োজনে অন্য দেশকে ব্যবহার করতে দিবে। কার্যক্ষেত্রে সেটাই হয়েছিল। যুদ্ধপরবর্তী বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্বৃত্ত অর্থ ইউরোপ ও জাপানে বিনিয়োগ করে সেখানকার অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও উন্নতি করে এবং তাতে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যসামগ্রীর বাজারও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যে এক সময় অকার্যকর হয়ে পড়বে, তা পরিকল্পনা করার সময় নীতিনির্ধারকরা মনে করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় খরচ আয়ের চাইতে ক্রমেই বাড়তে থাকে আর আমদানী ক্রমেই রপ্তানীর চাইতে বেশী হতে থাকায় পরিকল্পনায় বিপর্যয় ঘটে যায়।

রাষ্ট্রীয় খরচ বাড়তে থাকার প্রধান কারণ ছিল সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি। শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনাম যুদ্ধে এই ব্যয় এতই বেশী হয় যে তা বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়।[২২] পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল যুদ্ধের পর চীনে কমিউনিষ্টদের বিজয়। চীনকে জাপানের বাজার ও কাঁচামালের উৎস করার পরিকল্পনা কার্যকর করা গেল না। কিন্তু এর

পরেই কোরিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জাপানের শিল্পোৎপাদন বাড়ানর ফলে এই ব্যর্থতা মুছে ফেলা হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে যুদ্ধ শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দমন করতে ফরাসী ব্যর্থতার পর সেখানে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে যায়, কিন্তু বিশ্বের সবচাইতে বড় সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম পরাজয় স্বীকার করেনি। লিন্ডন জনসনের নেতৃত্বে আমেরিকাও ক্রমবর্ধমান প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চালাতে থাকে। যুদ্ধের একটা ফল হল পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার অর্থনীতির যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে অনুন্নত অবস্থা বদলে গেল। এই দেশ গুলো জাপানের বাজার হিসাবে কাজ করতে লাগল। এতে জাপানের পণ্যদ্রব্যের বাজার হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ কমে গেল। যুদ্ধের মানবিক বিপর্যয় ছিল ভয়াবহঃ তেইশ লক্ষ নিহত, ৩৫ লক্ষ আহত আর প্রায় দেড় কোটি মানুষ গৃহহীন। ভিয়েতনামে প্রতি মাসে যতটা বিস্ফোরক ব্যবহার করেছিল আমেরিকা, তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপ ও আফ্রিকার রণাঙ্গনেও প্রতি মাসে ব্যবহৃত বিস্ফোরকের চাইতে বেশী ছিল।[২৩] যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়ও ছিল বিশাল। প্রফেসর রবার্ট আইসনার, যিনি এক সময় আমেরিকান অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ছিলেন, তিনি একটা হিসাব দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রত্যক্ষ খরচ ছিল ১১৩ বিলিয়ন ডলার, আর আমেরিকান অর্থনীতি আরও ২২০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ভার বহন করে। যুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়ার জন্য ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় সাধারণ শ্রমিকদের প্রকৃত আয় শতকরা দুইভাগ কমে যায়। যুদ্ধের জন্য সামরিক বাহিনীতে কাজ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহতা ও অনৈতিকতা আমেরিকার যুবক-যুবতীদের ব্যাপক ভাবে বিদ্রোহী করে তোলে। অসন্তোষ ও প্রতিবাদ বাড়তে থাকে। প্রেসিডেন্ট জনসন যে গ্রেট সোসাইটি কর্মসূচি নেন তার একটা কারণ ছিল এই সামাজিক বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতি।

অর্থনীতিতে সামরিক ব্যয়ের প্রাধান্যের আরও একটা কারণ ছিল। ১৯২৯ সালের মহামন্দার পর যুক্তরাষ্ট্র New Deal কর্মসূচী চালু করার পর অর্থনীতির কিছুটা উন্নতি হলেও ১৯৩৭ সালে মন্দা আরও তীব্র ভাবে দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হওয়ার পরই কেবল মন্দা কমে যায় ও অর্থনীতিতে গতি ফিরে আসে। জার্মানীতে এটা শুরু হয় ১৯৩৫ সালে। আর যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪১ সালে যুদ্ধের অর্থনীতি চালু হওয়ার পরই কেবল মন্দা শেষ হয়। যুদ্ধের অর্থনীতিতে সরকার তার নির্ধারিত কোম্পানিগুলোতে কাঁচামাল সংগ্রহের সুযোগ দেয়। সামরিক যন্ত্রপাতির চাহিদা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং যেহেতু সরকারই ক্রেতা-তাই বাজারও নিশ্চিত থাকে। পরোক্ষ ফল হয় অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের চাহিদাও বাড়ে। অন্যান্য শিল্পও সমৃদ্ধ হয়। এই সময় সরকার শুধু যে সামরিক প্রয়োজনের শিল্প কারখানা নিয়ন্ত্রণ করে তাই না, সামগ্রিক অর্থনীতি তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। প্রয়োজনে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পও সরকার নিয়ে নেয়। ১৯৩৫ সালে নাৎসী জার্মানীতে প্রায় সব ব্যাংক সরকার নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং ব্যাংকের অর্থ সামরিক প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পে বিনিয়োগ করতে থাকে। একই ভাবে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর সমরাস্ত্র তৈরীর শিল্প নিয়ন্ত্রণে নেয়, যা মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেক ছিল। এছাড়া পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রকার ও পরিমাণও সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত দেশের শতকরা ৯০ ভাগ বিনিয়োগ সরকার করতে থাকে। অনেক নতুন সমরাস্ত্র কারখানা সরকার তৈরী করে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করে।[২৪] বাস্তবতা হল যুদ্ধকালীন অর্থনীতি সম্পূর্ণই সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়, জার্মানীতেও এবং আমেরিকাতেও মুক্ত বাজার অর্থনীতির নিয়মে তা হয়নি।

যুদ্ধকালীন অর্থনীতির আর একটা দিক হল ব্যাপক ধ্বংসের কারণে উৎপাদনে বিনিয়োগের জন্য কম সম্পদ পাওয়া যায়। এতে কর্মরত শ্রমিকশক্তির অনুপাতে বিনিয়োগ বাড়ার হার কম থাকে ফলে বিনিয়োগের উপর মুনাফার হার কমে না। ফলে অর্থনীতিতে মন্দার সম্ভাবনা কমে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এর প্রমাণ পাওয়া গেল। যদিও আমেরিকার শিল্প উৎপাদনের অর্ধেকই ছিল যুদ্ধ সংক্রান্ত, তারপরও ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ত্রিশের দশকের শেষ দিকের চাইতেও বেশী। ত্রিশের দশকের শেষ দিকের চাইতে আমেরিকার কোম্পানিগুলোর মুনাফা ছিল দ্বিগুণেরও বেশী (কর দেওয়ার পরও)।

যুদ্ধকালীন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি যুদ্ধের পরও বজায় রাখা হয়। যুদ্ধের আগে ত্রিশের দশকের শেষ দিকে যুদ্ধ সম্পর্কিত উৎপাদন ছিল আমেরিকার মোট উৎপাদনের শতকরা এক ভাগ মাত্র। যুদ্ধের পর ১৯৫০ সালে তা ছিল শতকরা ১৫ ভাগ; ১৯৬০ এর দশকে কমে গেলেও তা ছিল শতকরা ৯ ভাগ-যা মোট অসামরিক বিনিয়োগের সমান। এর সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার মোট অর্থনীতির আকার ১৯৪০ এর দশক থেকে সত্তর এর দশক পর্যন্ত তিনগুণ বেড়ে ছিল, জার্মানীর

বেড়েছিল পাঁচগুণ, ফ্রান্সের চারগুণ ও ব্রিটেনের দুইগুণ। এটা ছিল পুঁজিবাদী দেশ গুলোর জন্য "স্বর্ণযুগ"। বেকারত্বের হার এতই কমে গেল যে এটার গুরুত্বই ছিল না। বৃটেন ও জার্মানীতে বেকারত্ব ছিল শতকরা একভাগেরও কম। বহু সংখ্যক বাসস্থান তৈরী করা হল, প্রায় পুঁজিবাদী দেশেই বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা হল। অবসর ভাতার উন্নতি হওয়ায় অবসর জীবনও আরামদায়ক হল। দারিদ্র সম্পূর্ণ দূর হয়নি, তবে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল কম।

এই দীর্ঘ সময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে মন্দা পুনরায় হবার ভীতি প্রায় চলে গেল। পন্ডিতরাও বেশীরভাগ অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে উঠলেন। অনেকেই বলা শুরু করলেন, পুঁজিবাদ এখন আর আগের অবস্থায় নাই- অর্থনীতি এখন নতুন রূপ নিয়েছে যা আগের তুলনায় আরও ভালভাবে গঠিত। প্রবৃদ্ধি এখন অন্তহীন ভাবে চলবে। অনেকেই এটা লক্ষ্য করলেন না যে পুঁজিবাদী প্রবৃদ্ধি যুদ্ধকালীন অর্থনীতি চালিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। এর ভিত্তি হচ্ছে ধ্বংস আর এর যৌক্তিকতা রাখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংঘাত আর যুদ্ধ চালান অপরিহার্য, আর বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি অব্যাহত রাখা এর জন্য প্রয়োজন।

কিন্তু সমরভিত্তিক অর্থনৈতিক সংগঠনও প্রবৃদ্ধির স্থায়িত্ব এনে দেয়নি। একদিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের খরচ আর একদিকে "গ্রেট সোসাইটি" কর্মসূচির খরচ ক্রমেই আমেরিকার রাষ্ট্রীয় খরচ বাড়াতে থাকে আর বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কমিয়ে আনতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সাল নাগাদ আমেরিকার দেনা হয় ৭০ বিলিয়ন ডলার আর তার স্বর্ণ মজুদ (Gold reserve) নেমে আসে ১২ বিলিয়ন ডলার এর সমান। ডলার এর সরবরাহ বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতি ইউরোপেও পৌঁছে যায়। তাদের নিজেদের মুদ্রার মান ডলার এর তুলনায় নির্দিষ্ট বিনিময় হার (fixed exchange rate) এ রাখার জন্য তারাও মুদ্রা সরবরাহ বাড়াতে বাধ্য হয়। ইউরোপের দেশগুলো এবং জাপান আশংকা করতে লাগল যে ক্রমবর্ধমান ডলার সরবরাহ এর পটভূমিতে একসময় অনেকেই ডলার স্বর্ণের বিপরীতে তার মান রাখতে পারবে না, এটা মনে করবে। তখন তারা এক সঙ্গে এটা ভাঙ্গাতে চাইবে। এতে যুক্তরাষ্ট্র ৩৫ ডলার প্রতি এক আউন্স স্বর্ণ, এই মান ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এটা হলে যে সমস্ত দেশের ডলার এর বড় মজুত রয়েছে তাদের সম্পদের মান কমে যাবে।

১৯৬৭ সালের ২৯ শে নভেম্বর বৃটেন তার মুদ্রা পাউন্ডের মূল্যমান শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়ে দিল-যা ছিল ব্রেটন উডস চুক্তির শতকরা ১ ভাগ সীমার অনেক বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার ডলার এর মূল্যমান ধরে রাখার জন্য তার স্বর্ণ মজুত এর শতকরা ২০ ভাগ ব্যয় করতে হল। ১৯৬৮ সালের ১৬ই মার্চ সাতটি পশ্চিম দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে একটি আপোষ করেন। এতে ডলারের স্বর্ণমান আগের মতই রাখার সিদ্ধান্ত হয় কিন্তু স্বর্ণের বেচা কেনার দাম উঠা নামার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখা হয় না। কিন্তু এটাও রাখা গেল না। ১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জ পম্পিডু ডলারের বিনিময়ে সমমানের স্বর্ণ দাবী করে তা আনার জন্য আমেরিকায় একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠালেন। কয়েকদিন পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ একই অনুরোধ জানালেন (অবশ্য যুদ্ধজাহাজ ছাড়াই)। তিনি তিন বিলিয়ন ডলারের সমমানের স্বর্ণ চেয়েছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রচন্ড রাগান্বিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। চারদিন পর তিনি ঘোষণা দিলেন ডলার ও স্বর্ণের নির্দিষ্ট মানের দিন শেষ। কার্যতঃ এতে ব্রেটন উডস চুক্তি আর থাকল না। ব্রেটন উডস চুক্তি অকার্যকর হওয়ার পর পরই পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি শুরু হল। স্বর্ণের দামও বাড়তে থাকল। ১৯৭০ সালে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ৩৫ ডলার থেকে বাড়তে বাড়তে ১৯৭৩ সালের মে মাসে হল ৯০ ডলার। ১৯৭৯ সালে তা হল ৪৫৫ ডলার-এক দশকের মধ্যে প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি হল। ১৯৭১ সালের দুই বৎসরের মধ্যে ডলার এর মূল্যমাণ জার্মান মার্কের বিপরীতে প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গেল।

জ্বালানী তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর আয় ডলার এর মূল্যমান কমার সঙ্গে সঙ্গে কমে যেত লাগল। কারণ জ্বালানী তেলের দাম শোধ করা হত ডলার এ। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো তাদের সংগঠন OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) এর মাধ্যমে দাম বাড়ানর উদ্যোগ নিল। ১৯৭১ সালে নিক্সন ঘোষণা দেওয়ার সময় জ্বালানী তেলের দাম ব্যারেল প্রতি তিন ডলারেরও কম ছিল। ১৯৭৩ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধের সময় তা বেড়ে হল প্রায় ৮ ডলার। ১৯৭৯ সাল নাগাদ তা ১২ ডলার এর উপরে উঠে গেল। ১৯৮০ এর দশকে দাম হল ব্যারেল প্রতি ৩০ ডলার এর বেশী। শুধু জ্বালানী তেলই নয়, প্রায় প্রত্যেকটি প্রাথমিক পণ্যের দামও অনেক বাড়তে লাগল। এই সময়কালে

সীসার দাম শতকরা ১৭০ ভাগ, টিনের দাম ২২০ ভাগ, বক্সাইট এর দাম শতকরা ১৭০ ভাগ বাড়ল। বলতে গেলে, নির্দিষ্ট মুদ্রামান ভেঙ্গে যাওয়ায় পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনমূল্য অনেক বেড়ে গেল, মুদ্রাস্ফীতিও বিশ্বব্যাপী বাড়ল, বেকারত্বও বাড়ল। এই পরিস্থিতিকে stagflation আখ্যা দেওয়া হয়।

অনেকেরই মতে stagflation ঘটে যুক্তরাষ্ট্রের মতের বিরুদ্ধে জ্বালানী তেলের দাম অস্বাভাবিক দ্রুত বাড়ার জন্য। আসলে যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানী তেলের দাম বাড়াতেই চাইছিল। হেনরী কিসিঞ্জার (যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) দাম বাড়ানর জন্য সৌদি আরবকে চাপ দিচ্ছিল। এছাড়াও ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ভেনেজুয়েলা-যারা তখন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র তাদের প্রতিনিধিরা OPEC এর সভায় মূল্য বৃদ্ধির তো বিরোধিতা করেইনি বরং মূল্য বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য OPEC দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল।[২৫] এটা নির্দিষ্ট মূল্যমান উঠে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রভাব রাখার প্রয়োজনে পরিকল্পিত ভাবেই করা হয়েছিল। এজন্য প্রয়োজন ছিল আমেরিকান কোম্পানীগুলোকে জাপানী ও ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর চাইতে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়া, আর পুঁজির প্রবাহ আমেরিকামুখী করা। তেলের দাম বাড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের অসুবিধা তুলনামুলক ভাবে কম হল। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তেল উৎপাদন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রয়োজন মেটাত। জাপান আর পশ্চিম ইউরোপ সম্পূর্ণই নির্ভরশীল ছিল আমদানির উপর। কার্যতঃ পণ্য উৎপাদনে জ্বালানীর দাম বৃদ্ধি জাপান ও পশ্চিম ইউরোপকে আমেরিকার তুলনায় দুর্বল অবস্থানে নিল। এছাড়া তেল উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলির বেশীরভাগই ছিল আমেরিকার। কাজেই বর্ধিত মূল্য অনেকটা আমেরিকামুখী হল। তেলের দাম ডলারে শোধ হওয়ায়, আর আমেরিকায় সুদের হার বাড়ানতে, তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর বর্ধিত আয়ও আমেরিকায় আসতে থাকল। আমেরিকায় সুদের হার ১৯৭১ সালে ছিল শতকরা ছয়। ১৯৭৪ সালে তা করা হল শতকরা ৭.৮৩ আর ১৯৭৯ সালে তা করা হল শতকরা এগার। জুন ১৯৮১ সালে তা আরও বাড়িয়ে শতকরা ২০ করা হল। উদ্বৃত্ত অর্থ আমেরিকায় আসতে থাকায় আমেরিকার পক্ষে বাণিজ্য ঘাটতি ও বাজেট ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হল। আর আমেরিকার বিশাল প্রতিরক্ষা খরচ বজায় রাখাও গেল।

১৯৭১ এর পরিবর্তন এর পর রাষ্ট্রীয় ঋণ বাড়লেও ব্যবসা-কোম্পানীগুলোর মুনাফা বাড়তে থাকল। পরবর্তী দুই দশকে মুনাফা কয়েকগুণ বাড়ে। কিন্তু শ্রমিকদের আয় কমান হতে থাকে। যদিও উৎপাদনশীলতা বাড়তে থাকে, শ্রমিকদের প্রকৃত আয় প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এই সময় জাপান ও ইউরোপে শ্রমিক আয় বাড়ে। ফলে পণ্য বাজারে আমেরিকা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ আমেরিকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা এর মাধ্যমে আরও জোরদার হয়।

সাল	শ্রমিকদের গড় প্রকৃত আয়	শ্রমের উৎপাদনশীলতা
১৯৬০	৮৫	৭০
১৯৭৩	১০০	১০০
১৯৮০	৯০	১৩৫
২০০০	৯০	১৪৫
২০১০	৯৫	২০০

স্থবির শ্রমিক আয়, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা (১৯৭৩- সালকে ১০০ ধরে) [২৬]

১৯৭১ এর পটপরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে আমেরিকা তার ভূমিকা পরিবর্তন করল। যেখানে তার উদ্বৃত্ত আয় দিয়ে আমেরিকা ইউরোপ ও জাপানে বিনিয়োগ করে সেখানে শিল্পোন্নতির সাথে সাথে তার নিজের পণ্যের বাজার তৈরী করেছিল, তা এখন উল্টে গেল। আমেরিকা হয়ে গেল ঘাটতি দেশ। কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে ইউরোপ, জাপান ও তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর উদ্বৃত্ত অর্থ তার ঘাটতি মেটানোর কাজে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করল। এই উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করে আমেরিকা অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের বাজার সৃষ্টি করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪০ এর দশকের শেষের থেকে ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতিগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এসব দেশে বিনিয়োগ, উৎপাদনের হার ও শ্রমিক মজুরী অতীতের অন্যান্য সালের চাইতে বেশী হারে বাড়ে। বেকারত্বের হারও থাকে কম। এই সময়ের পর যে দীর্ঘ অর্থনৈতিক অবনতি চলতে থাকে (১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিক থেকে ১৯৯০ এ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত) তাতে বিনিয়োগ হার দ্রুত কমে যায়, উৎপাদন বৃদ্ধির হার ও মজুরি বৃদ্ধির হার কমে। বেকারত্বের হার প্রায় মন্দার সময়ের কাছাকাছি চলে যায়। পর পর কয়েকটা অর্থনৈতিক মন্দা (recession) ও সংকট এই সময় দেখা দেয়-যে রকম ১৯৩১ এর পরে দেখা গিয়েছিল। ১৯৯০ এর প্রথম ভাগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯৮০ এর দশকের চাইতে কম। ১৯৮০ এর দশকের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯৭০ এর দশকের চাইতে কম।

সূচক	আমেরিকা	জার্মানী
	উৎপাদন	
১৯৫০-৭৩	৪.৩	৫.১
১৯৭৩-৯৩	১.৯	০.৯
	শ্রমের উৎপাদনশীলতা	
১৯৫০-৭৩	৩.০	৪.৮
১৯৭৩-৯৩	২.৪	১.৭
	প্রকৃত মজুরী	
১৯৫০-৭৩	২.৬	৫.৭
১৯৭৩-৯৩	০.৫	২.৪

দীর্ঘ প্রবৃদ্ধিও সময় ও দীর্ঘ অবনতির সময়ের তুলনা (বাৎসরিক পরিবর্তনের গড় হার) [২৭]

১৯৪০ এর দশক থেকে ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল লাভের হারের প্রবৃদ্ধি। এই সময় অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে লাভের হার বাড়তে থাকে উচ্চ হারে। লাভের উচ্চহারের ফলেই একটা নির্দিষ্ট মূলধন (কারখানা ও যন্ত্রপাতিসহ) খাটিয়ে বড় ধরনের লাভ করা সম্ভব হয় এবং এই লাভ বিনিয়োগ করে উৎপাদনের উচ্চহারের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব হয়। এর ফলে লাভের পরিমাণ না কমিয়েও প্রকৃত মজুরী বাড়তে পারল। মুনাফার উচ্চহারের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশকে দ্রুত মূলধন (কারখানাসহ) তৈরী সম্ভব হয়।

আমেরিকার অর্থনীতির উন্নতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালেই শুরু হয়। এর আগে ত্রিশের দশকে মহা মন্দায় পুরান যন্ত্রপাতি বাতিল করা হয়। উচ্চ বেকারত্বের হারের কারণে শ্রমিক মজুরীও ছিল কম। আর জমে থাকা নতুন প্রযুক্তি ও আবিস্কার এর ব্যবহার উৎপাদন বাড়ানর ব্যবস্থা করে। যুদ্ধের কারণে যুদ্ধাস্ত্র ও পণ্যের চাহিদা বাড়ে বিপুল ভাবে। কাজেই যখন ইউরোপ ও জাপানের অর্থনীতি যুদ্ধে বিপর্যস্ত হচ্ছিল। তখন আমেরিকার অর্থনীতি, যা যুদ্ধের আগেই অনেক এগিয়ে ছিল, তা আরও দ্রুত বাড়তে লাগল।

তবে আমেরিকা যে সমস্ত কারণে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের চাইতে এগিয়ে ছিল, সেই সমস্ত কারণই তার অগ্রবর্তী স্থান ধরে রাখার বাধা হয়ে দাঁড়াল। আমেরিকার পুঁজিপতিরা একটা বিরাট মূলধন শিল্পে বিনিয়োগ করেছিল। আমেরিকার কৃষিতে ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ছিল কম, যারা শ্রমিক হতে পারে; আমেরিকার আন্তর্জাতিক আধিপত্যের স্থান, যার ফলে আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অন্য দেশে ব্যবসা করতে পারত; এগুলো সবই প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াল। কোরিয়া যুদ্ধের পর থেকেই আমেরিকার প্রবৃদ্ধি কমতে লাগল।

যারা শিল্পে অনেক মূলধন বিনিয়োগ করেছিল ও কারখানা স্থাপন করেছিল তারা নতুন ও উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে সমস্যায় পড়ল, কারণ তারা আগেই পুঁজি বিনিয়োগ করেছে। সেই পুঁজি থেকে যতদিন পর্যন্ত কিছু লাভ পেতে

থাকল, ততদিন তারা নতুন প্রযুক্তির কারখানায় বিনিয়োগ করতে চাইল না। এতে তাদের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি অন্যান্য পুঁজিপতি, যারা নতুন প্রযুক্তির কারখানায় উৎপাদন করছে, তাদের তুলনায় কমতে থাকল। আমেরিকার শিল্প-বহির্ভূত পেশাগুলোতে অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় মানুষ কম থাকায় শ্রমিক স্বল্পতা ছিল। ফলে শ্রমিকদের চাহিদা এবং মজুরীও বেশী ছিল। এতে দেশের বাইরে বিনিয়োগ করতে মার্কিন পুঁজিপতিরা আগ্রহী হল। বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পুনর্গঠনে যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া গেল। ফলে মার্কিন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই যুগে তুলনামূলকভাবে কম ছিল।[২৮]

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পিছনে একটা বড় ভূমিকা ছিল পশ্চিম ইউরোপের দেশ সমূহ ও জাপানের। এই দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নতি শুরু করেছিল বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং সে কারণেই তারা দ্রুততার সঙ্গে মূলধন বিনিয়োগে সাফল্য পেয়েছিল। তাদের যেহেতু আগে থেকে কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে বড় বিনিয়োগ ছিল না, কাজেই যুদ্ধের পর তারা তুলনামূলক কম দাম অথচ আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির কল কারখানা বসাতে পারল। ফলে তাদের একটা নির্দিষ্ট পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদন ক্ষমতা বেশী হল। এই দেশ গুলিতে কৃষি নির্ভর মানুষের সংখ্যাও ছিল বেশী। ফলে শহরে শ্রমিক পাওয়া সহজ হল এবং তাদের মজুরীও কম দিতে হল। এই দেশগুলির অধিকাংশের আর একটা সুবিধা হল রাষ্ট্রের সাহায্য। এই দেশগুলোর (বিশেষত জার্মানী ও জাপান) ব্যাংকসমূহ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কম সুদে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য ঋণ দিত এবং ঋণের প্রয়োগ ও তার ফলাফল লক্ষ্য করত। এছাড়া এসব দেশের সরকার তাদের শিল্প কারখানার উৎপাদিত পণ্যের আভ্যন্তরীন বাজার নিশ্চিত করার জন্য আমদানির উপর যুদ্ধের পর বহু বৎসর শুল্ক ধার্য রেখেছিল ও দেশীয় উৎপাদনে ভর্তুকি দিয়েছিল। উৎপাদিত পণ্য যাতে অন্য দেশে বাজার পায়, সে জন্য এই দেশগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা নিয়েছিল। যার মধ্যে একটা ছিল মুদ্রার মূল্যমান কম রাখা।[২৯] জার্মান ও জাপানী পণ্য উৎপাদনকারীরা রপ্তানী বাড়াতে সক্ষম হল, কিন্তু তা আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে।

মার্কিন পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে রপ্তানীতে সমস্যা ছিল দেশে উৎপাদন খরচ বেশী ছিল। আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানীগুলো খরচ কমানর জন্য অন্য দেশে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে লাগল। এজন্য মার্কিন সরকার শুধু বাণিজ্য উদারীকরণই নয়, অন্যান্য দেশে পুঁজি বিনিয়োগ সহজতর করার জন্য নীতি কার্যকর করেছিল। মার্কিন অর্থনীতি পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হারে বাড়ছিল। আমেরিকার অর্থনীতির প্রধান শক্তিগুলোর জন্য প্রবৃদ্ধির দরকার ছিল। মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ও ব্যাংকগুলোর বিদেশে লাভজনক ব্যবসা করার সুযোগ দরকার ছিল। যে সব কোম্পানী আমেরিকায় উৎপাদন করছিল, তাদেরও দরকার ছিল বিদেশে দ্রুত বাড়তে থাকা বাজার, যেখানে তাদের পণ্যের চাহিদা থাকবে। কাজেই পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের অর্থনীতির বিকাশ তাদের দরকার ছিল। আরও ছিল সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রভাব প্রতিরোধ করার প্রয়োজন। তবে সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্যের একটা অংশ ছেড়ে দেওয়া আমেরিকার জন্য কঠিন ছিল না। কারণ আমেরিকার অর্থনীতির একটা ছোট অংশ তখন রপ্তানীর উপর নির্ভর করত। আর সামগ্রিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্রুত বাড়ছিল। ফলে আমেরিকার রপ্তানীও এখানে বাড়ছিল। আমেরিকার সরকার ও তার পুঁজিপতিরা তাই অন্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনীতিতে সরকারী সমর্থন ও সহযোগিতার (বিনিময় হার কমিয়ে রাখা, আমদানির উপর শুল্ক আরোপ করা ইত্যাদি) বিরোধিতা করেনি। আমেরিকা চাইছিল অন্য পুঁজিবাদী দেশগুলোতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকুক আর তাদের আভ্যন্তরীন বাজার আরও প্রসারিত হোক।

১৯৬৫-৭৩ অতিরিক্ত উৎপাদনের সূচনা এবং মুনাফার সংকট

১৯৫০ এর দশকের শেষ দিক থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্রুত বাড়তে থাকল। পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান এই সময় তাদের রপ্তানী বাড়াতে পারল ও বিশ্ববাজারের আরও বড় অংশ দখল করল। যেসব পণ্যদ্রব্য তারা রপ্তানী করতে থাকল তার অনেকটাই আমেরিকার পণ্যের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াল। ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে উন্নত প্রযুক্তি ও স্বল্প মজুরির শ্রমশক্তি ব্যবহার করে জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশ সমুহ (বিশেষতঃ জার্মানী) বিশ্ববাজারে তাদের পণ্য কম

মূল্যে সরবরাহ করে বাজারও দখল করল আবার পণ্য মূল্যও কমিয়ে দিল। আমেরিকার পণ্য উৎপাদনকারীরা ক্রমেই তাদের পণ্যের মূল্য কমাতে বাধ্য হল। আমেরিকার এই সব পণ্য উৎপাদনকারী পুঁজিপতিরা উৎপাদন পদ্ধতি বদলে নতুন প্রযুক্তি নিতে পারল না। কারণ তারা পুরনো পদ্ধতির কল-কারখানায় বিরাট অংশের মূলধন বিনিয়োগ করেছে। শ্রমিকদের মজুরিও কমাতে পারল না। ফলে কিছু উৎপাদনকারী ক্রমেই কমে যেতে থাকা লাভ মেনে নিতে বাধ্য হল। আর কিছু পুঁজিপতি উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে লাগল। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকায় সামগ্রিক বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্রমেই চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বাড়তে থাকল আর লাভের পরিমাণ ক্রমেই কমতে থাকল। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে আমেরিকার পণ্য উৎপাদনকারীদের পুঁজির উপর মুনাফার হার প্রায় ৪৩.৫ শতাংশ কমল। আর জি-৭ দেশ গুলোতে কমল প্রায় ২৫ শতাংশ।[৩০] পণ্য উৎপাদন ও মূল্যের প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং তার বাণিজ্য ঘাটতি বাড়তে থাকে ও current account balance কমতে থাকে। এর সাথে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের খরচ ও আমেরিকার বাইরে পুঁজি বিনিয়োগ বাড়তে থাকায় balance of payment এর ঘাটতি দ্রুত বাড়তে থাকে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থবিরতা: মধ্য ১৯৬০ থেকে মধ্য ১৯৯০

ডলারের মান স্বর্ণের সঙ্গে নির্ধারণ তুলে দেওয়ার পর ডলারের মূল্যমান কমে এটা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যমূল্য এতটাই নিম্নমুখী ছিল যে এরপরও আমেরিকার উৎপাদনকারী শিল্পগুলো আগের মত লাভ করতে পারল না। সারা বিশ্বে এই মুনাফার হার কমে যাওয়াই ছিল বিশ্ব অর্থনীতিতে অবনতির প্রক্রিয়ার অন্যতম কারণ।[৩১] পণ্য বহির্ভূত যে সমস্ত শিল্প উৎপাদন ছিল সেগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখে ততটা পড়েনি। এই সব শিল্পে মুনাফা বৃদ্ধির হারও ততটা কমেনি (উল্লেখিত সময়ে ১৩.৯ শতাংশ)। কিন্তু পণ্য উৎপাদন খাতে মুনাফার হার কমে যাওয়া এতে পুষিয়ে নেওয়া যায়নি। উৎপাদন বৃদ্ধির হারও এই সময় কালে (১৯৬৫ -১৯৭৩) বাৎসরিক ৩.৩ শতাংশ বাড়ছিল। ১৯৫০ -১৯৬৫ সময়কালে বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার (annual rate of productivity growth) ছিল ২.৯ শতাংশ। ১৯৬৫ -১৯৭৩ সময় কালে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ছিল ১.৯ শতাংশ। যা এর আগের সময় (১৯৫৮-১৯৬৫) এর বৃদ্ধির (২.২ শতাংশ) চাইতে কম ছিল। পরবর্তী দেড় দশকে প্রকৃত মজুরি বাড়েনি।

মুনাফার হার কমতে থাকায় পুঁজি মালিকরা শ্রমের খরচ কমিয়ে উৎপাদন খরচ কমানর ব্যবস্থা করল। এ ব্যাপারে তারা পুঁজিবাদী দেশগুলোর সরকারের সমর্থনও পেল। শ্রমিক সংগঠন গুলোর শক্তি তারা কমিয়ে দিল। মজুরী বৃদ্ধি কমিয়ে দিল, আর সামাজিক খাতে সরকারী ব্যয় কমিয়ে দিল। কিন্তু এতে তাদের মুনাফার হার বাড়েনি। তবে ১৯৯০ এর দশকে এসে মুনাফার হার কিছুটা বেড়েছিল।

সমগ্র অর্থনীতিতে প্রকৃত মজুরির বাৎসরিক বৃদ্ধির হার

দেশ	১৯৬০-৭৩	১৯৭৩-৭৯	১৯৭৯-৯০	১৯৯০-২০০০
যুক্তরাষ্ট্র (প্রতিঘন্টায়)	২.৮	০.৩	০.৪	১.১
জাপান (মাথাপিছু)	৭.৭	২.৮	১.৬	০.৫
জার্মানী (মাথাপিছু)	৫.৪	২.৫	১.০	০.৯৫

সূত্র:Statistical Annex. European Economy,no.71, 2001 table-31

উৎপাদন খরচ কমানর চেষ্টা সত্ত্বেও লাভের হার বাড়ল না কেন? সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সামগ্রিক পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদার তুলনায় বেশী হয়ে গিয়েছিল। কাজেই যুক্তি সঙ্গত কাজ হত যেসব পণ্য চাহিদার চাইতে বেশী তৈরী হচ্ছিল, সেসব পণ্য তৈরী বন্ধ করে যেসব পণ্য তৈরীতে লাভের হার বেশী সেগুলো তৈরী করা। কিন্তু বাস্তবে এটা হয়নি। প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে উৎপাদনকারীরা একটা বিরাট পরিমাণ মূলধন (কল-কারখানাসহ) এই পণ্যগুলো তৈরীর জন্য কাজে লাগিয়ে ছিল। এছাড়াও এই পণ্য তৈরীতে তাদের অভিজ্ঞতা, কাঁচামাল সরবরাহকারীদের ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ-এগুলো অন্য পণ্য তৈরীতে কাজে লাগান যেতনা। কাজেই যতদিন তারা গড় লাভ করতে পারছিল, ততদিন আরও কিছু বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির উন্নতি করে এই পণ্য আরও কমমূল্যে তৈরী করার চেষ্টা করাটাই

তাদের জন্য ছিল যুক্তিসঙ্গত।[৩২] কিন্তু আরও পরে যেসব দেশ উৎপাদন শুরু করেছিল (যেমন দক্ষিণ কোরিয়া), তারা আরও উন্নত প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কম মূল্যে উৎপাদন বাড়িয়ে বাজার দখল করতে থাকল। ফলে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন আরও বাড়ল এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ঐ পণ্য গুলোর দাম আরও কমল।

এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকা ১৯৭১ সালে ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ দেওয়া বন্ধ করেছিল এবং ১৯৭৩ সালে অন্যান্য দেশের মুদ্রার সঙ্গে ডলারের নির্দিষ্ট বিনিময় হারও তুলে নিয়েছিল। ডলারের মান কমে যাওয়ায় রপ্তানী বাড়ল। এর সাথে অন্য দেশের পণ্য যাতে আমেরিকায় সহজে ঢুকতে না পারে, সে ব্যবস্থাও নিল। ১৯৭৩ সালে International Multi-Fiber Agreement এ যোগ দিয়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে বস্ত্র আমদানি সীমিত করল। এটা ছিল General Agreement on Trade & Tariff (GATT) এর বৈষম্যমূলক আচরণ না করার নীতির বিরুদ্ধে। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা অনুযায়ী এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির দুই কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ চাকুরী হারায় ও রপ্তানী হ্রাস পাওয়ায় প্রতি বৎসর ৪০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭৪ সালে Trade Act করে এর আওতায় তার বাণিজ্যিক অংশীদারদের Voluntary Export Restraints (VERS) মেনে নিতে বাধ্য করল। যে পণ্য আমেরিকা আমদানি করতে চাইবে না তা পাঠান বন্ধ না করলে আমেরিকার বাজারে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এই ভীতি প্রদর্শন করা হল এজন্য। জাপান থেকে ইস্পাত ও মোটর গাড়ি আমদানী সীমিত করার জন্য এটা প্রয়োগ করা হয়েছিল। সংরক্ষিত আভ্যন্তরীন বাজার, ডলার এর নিম্নমান ও সরকারী ব্যয় বৃদ্ধিতে চাহিদার বৃদ্ধি-এগুলো আমেরিকার পুঁজিপতিদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করল। তারা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে উৎপাদন বাড়াতে পারল আর রপ্তানীও বাড়ল। এ সত্ত্বেও ১৯৭০ এর দশকে তারা মুনাফার হার বাড়াতে পারেনি, বিশ্বের বাজারে তাদের পণ্যের অংশও বাড়তে পারেনি। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিপতিরা বাজার ধরে রাখার জন্য মুনাফার হার কমিয়ে দিল। জাপানী পুঁজিপতিরা জাপান সরকারের ও ব্যাংকগুলির সম্পূর্ণ সহযোগিতায় তাদের শিল্প উৎপাদনের ধারা বদলে ফেলল। শ্রমঘন ভারী শিল্পের বদলে কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এমন উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প কারখানা আশির দশক শেষ হওয়ার আগেই স্থাপন করল।

এই সময় কয়েকটি স্বল্পোন্নত দেশ (পূর্ব এশিয়ায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিল ও মেক্সিকো) তাদের সরকারের সাহায্যে অল্প কয়েকটি পণ্য উৎপাদনে উচ্চ প্রযুক্তির আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে ও কম মজুরির শ্রম ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বাজারের কিছু অংশ দখল করে নিল।[৩৩] এসবের ফল হল চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেল এবং পণ্যমূল্য আরও কমতে থাকল। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে (আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান সহ) লাভের হার আরও কমতে থাকল। পুঁজি বিনিয়োগ কমে গেল এবং অনেক শিল্প কারখানা দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে গেল। সত্তর এর দশকে দুই দফা জ্বালানী তেলের দাম বাড়ায় দুইবার অর্থনৈতিক recession দেখা দেয় (১৯৭৪-৭৫ এবং ১৯৭৯-৮০)। এই সময় আমেরিকার সরকারী ঘাটতি ব্যয় ও ঋণ নেওয়ার পদ্ধতি সহজ করা (যেগুলো পণ্য চাহিদা বাড়াল) এই অর্থনৈতিক মন্দা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিল। পরবর্তী দুই দশকে, সরকারী ঋণের বিরাট বৃদ্ধি ও তার সাথে মানুষের ব্যক্তিগত ঋণের ব্যাপক প্রসার-এই দুটো আন্তর্জাতিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও প্রসারে অনন্য ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু লাভের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় অনেক শিল্পে যথাযথ বিনিয়োগ হল না। ফলে পুরনো পদ্ধতির উৎপাদন ব্যবস্থা চলতে থাকল। এদিকে মার্কিন সরকারের ঋণ যতই বাড়তে থাকল ততই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল। ১৯৭৭-৭৮ সালে মার্কিন ডলারের স্থিতিশীলতার উপর আস্থা কমে গেল। ফলে মার্কিন সরকার বাধ্য হল ঘাটতি কমাতে ও ঋণ প্রবাহ কমাতে।

১৯৮০ এর দশকঃ মোট চাহিদার প্রবৃদ্ধি শ্লথ, ক্রমবর্ধমান সুদের হার ও অর্থবাজার (finance) এর গুরুত্ব বৃদ্ধি

১৯৭০ এর দশক এর শেষ দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান ও যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক "কৃচ্ছ্রসাধন" শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিপতিদের লাভের হার বাড়ান। এজন্য যেটা করা হল, তা হল কর্পোরেশন গুলো ও পুঁজিপতিদের উপর কর এর হার কমিয়ে দেওয়া, শ্রমিকদের বেতন কমান আর সামাজিক খাতে ব্যয় কমান। পুরনো প্রযুক্তির কম উপাদনশীল ও কম লাভজনক শিল্প কারখানা, যেগুলো অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও টিকে ছিল -এগুলো বন্ধ করে উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদার কাছাকাছি নিয়ে আসাও লক্ষ্য ছিল। উদ্বৃত্ত পুঁজিকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক

অর্থ বাজারে (financial sectors) লাভ করতে দেওয়াও এর উদ্দেশ্য ছিল। এর জন্য মুদ্রাস্ফীতি কমান ও পুঁজি চলাচলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও শিথিল করা হল। আমেরিকায় সামরিক খাতে ব্যয় অনেক বাড়ান হল, যদিও এটা "কৃচ্ছ্রসাধনের" সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু এই "কৃচ্ছ্রসাধন" এর নীতি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনল না। সুদের হার অনেক বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে অনেক কম লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল ঠিকই কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দা (recession) শুরু হল। ১৯৮২ সালে ডলারের ক্রমবর্ধমান মূল্যমান ও ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়ায় লাতিন আমেরিকায় ঋণ সংকট (debt crisis) দেখা দিল। লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশ ঋণ শোধের কিস্তি দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ল। এদেশ গুলিকে ঋণ দিয়েছিল আমেরিকার কয়েকটি বড় ব্যাংক-তারা দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। এতে সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধ্বস নেমে আসার সম্ভাবনা ছিল।

আমেরিকা আবার রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি করে ঘাটতিতে চলে গেল । রেগান প্রশাসনের পর বুশ প্রশাসনও রেকর্ড পরিমাণ বাজেট ঘাটতি ও বাণিজ্য ঘাটতি চালাতে থাকল। সামরিক ব্যয় বাড়ান হল বিপুলভাবে আর ধনীদের কর কমান হল। এতে চাহিদা বৃদ্ধি করে ১৯৮২ সালে মন্দা থেকে বেরিয়ে আসা গেল এবং এই দশকে অর্থনীতি কিছুটা গতি পেলেও ব্যক্তিগত খাতে মূলধন সঞ্চয় ও লাভের প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে থাকল। কম উৎপাদনশীল শিল্প কারখানা কিছুটা বন্ধ হল, শ্রমিক মজুরী ও কমল, ফলে আমেরিকা ও পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলো পণ্য উৎপাদনে আরও প্রতিযোগী হল। কিন্তু এই সময় পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ইত্যাদি) পৃথিবীর পণ্য বাজার এর অংশ ক্রমেই দখল করে নিতে থাকল, যা ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পূর্বএশিয়ার নব্য শিল্পোন্নত দেশগুলি পৃথিবীর পণ্য রপ্তানীতে তাদের অংশ ১.২ শতাংশ থেকে ৬.৮ শতাংশে বাড়াতে পারল। ১৯৯০ সাল নাগাদ তাদের অংশ দাঁড়াল ১৩.১ শতাংশ, আমেরিকার ১১.৭ শতাংশের চাইতেও বেশী। পৃথিবীর পণ্য রপ্তানীতে জার্মানীর অংশ তখন ছিল ১২.৭ শতাংশ, আর জাপানের ছিল ৮.৫ শতাংশ।[৩৪] চাহিদার তুলনায় পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ বেশীই থাকল। এর সাথে উচ্চ সুদের হার যোগ হল, লাভের প্রবৃদ্ধি বাড়ল না। ১৯৮০ এর দশকের শেষদিকে আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি, ও জাপানের পুঁজিপতিদের মুনাফার হার ১৯৮০ র দশকের প্রথম দিকের তুলনায় কিছুটা বাড়লেও ১৯৭০ এর দশকের শেষদিকের কম লাভের পর্যায়েই থাকল। এতে বিনিয়োগ কম হল, অর্থনীতি নির্ভরশীল হল সরকারী ঘাটতি ব্যয়ের উপর (বিশেষত আমেরিকার ঘাটতি ব্যয়) আর অস্থায়ী অর্থের বুদ্বুদ (financial bubble) উপর।

অর্থ বাজার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম তিন দশকে অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ (financial institutions) নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাজ করত। তারা কি কি কাজ করতে পারতো তা এবং কোন এলাকায় করবে তা প্রায় প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই নিয়ন্ত্রিত ছিল। এক দেশ থেকে আর এক দেশে পুঁজি চলাচলও নিয়ন্ত্রিত ছিল। ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে এসে ইউরোপে ডলার জমে যাওয়ার জন্য এই নিয়ন্ত্রণগুলির কার্যকারিতা কমে আসছিল।

১৯৭০ এর দশকের শেষদিকে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে দশকব্যাপী লাভের প্রবৃদ্ধি কমতে থাকার জন্য পণ্য উৎপাদনের স্থবিরতা দেখা দিল। পুঁজিপতিদের মুনাফার হার বাড়ানোর জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর সরকার অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ কমাতে থাকল। পুঁজি চলাচলের উপর শেষ পর্যন্ত সব নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। বিশ্ব অর্থনীতিতে এর ফলে ''ফাটকাবাজী'' শুরু হল। এতে একের পর এক অর্থ বাজারে ধ্বস হতে লাগল।[৩৫]

১৯৮০ এর দশক এর শেষ দিক থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে স্টক মার্কেট, বাণিজ্যিক জমি ও ভবন, এক কোম্পানী কর্তৃক আরেক কোম্পানী কিনে নেওয়া বা দুই কোম্পানী এক হয়ে যাওয়া (acquisition & merger)-এগুলোকে ভিত্তি করে অর্থের বুদ্বুদ তৈরী হতে থাকল। অনুমানভিত্তিক বাড়ানো দামে কেনা-বেচা করায় কৃত্রিমভাবে চাহিদা বাড়ল। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা মনে করল অতীতে যেভাবে সম্পদের দাম বেড়েছে, সেভাবে বাড়তেই থাকবে। ঋণ করে ক্রমবর্ধমান দামে কেনা বেচা শুরু হল। অর্থ লেনদেনে জড়িত নয় এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও বিশাল অঙ্ক ঋণ নিয়ে এই ফাটকাবাজীতে নেমে পড়ল । শত শত বিলিয়ন ডলার ব্যাংক ঋণ নিয়ে কেনাবেচা শুরু হল। কৃত্রিম দাম বৃদ্ধিরও সীমা আছে। ১৯৮৭ সালে স্টক শেয়ার বাজারে ধ্বস নামল। পুঁজিবাদী দেশ গুলোর সরকার অর্থ ছাড় করে সংকট থেকে উদ্ধার

করল। সেই অর্থই ব্যবহার করা হল "কৃত্রিম বুদ্বুদ" আবার তৈরী করার জন্য। ১৯৮০ র দশকের শেষ দিকে ও ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে আমেরিকা, জার্মানী ও জাপানের সরকার অর্থবাজার এর প্রসার সীমিত করার জন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নিল। ফলে ৬০ বৎসরে দেখা যায় নাই এমন ব্যাংক দেউলিয়া হওয়া ও অর্থ বাজার সংকট সৃষ্টি হল। এটা পরবর্তী মন্দাকে আর গভীর করল।

নব্বই এর দশকের অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা

১৯৭০ এর দশকের শুরু থেকেই আমেরিকার সরকারী ব্যয়ের এবং বহির্বাণিজ্যের বিপুল ও ক্রমবর্ধমান ঘাটতি পুঁজিবাদী পৃথিবীকে প্রতিটি অর্থনৈতিক মন্দা থেকে তুলে আনতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। এই মন্দার মধ্যবর্তী সময়ও অর্থনীতিকে সবল রেখেছে এই ঘাটতি ব্যয়, ব্যক্তি পুঁজির বিনিয়োগ ছিল তুলনায় কম।[৩৬] কিন্তু নব্বই এর দশকের প্রথমে এই ঘাটতি এতটা বড় আকার ধারণ করেছিল যে, তাতে ঋণপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ট্রেজারী সেক্রেটারী রবার্ট রুবিন, যিনি Goldman Sachs নামে একটি বহুজাতিক বিনিয়োগ সংস্থায় সেক্রেটারী হওয়ার আগে কো-চেয়ারম্যান ছিলেন, এবং সরকারী পদ ছেড়ে দেওয়ার পর সিটিগ্রুপ কোম্পানীর চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি সিটিগ্রুপ থেকে ইস্তফা দেন। সিটিগ্রুপ থাকাকালীন তিনি ১২৬ মিলিয়ন ডলার এর বেশী অর্থ ও স্টক মিলে পেয়েছিলেন। যখন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সিটিগ্রুপকে ২০০৮ সালে ধ্বসের পর তহবিল দিয়ে রক্ষা করে তখনও তিনি এই কোম্পানীতে ছিলেন। এই সময় রবার্ট রুবিন বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনার উদ্যোগ নিলেন। যেটা প্রেসিডেন্ট রেগানের আমলেও একবার নেওয়া হয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দার মুখে রেগান "কৃচ্ছসাধন" বাদ দিয়ে ব্যাপক সামরিক ব্যয় ও পুঁজিপতিদের কর রেয়াত দিয়ে অর্থনীতির নিম্নগতি রোধ করেছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে আশির দশক থেকেই সরকারী ব্যয় কমিয়ে আনা হচ্ছিল। আমেরিকার ব্যয় ও ঘাটতি বাজেট অনেকটা পুঁজিবাদী বিশ্বের অর্থনীতি সচল রেখেছিল। ৯০ এর দশকের প্রথম থেকে আমেরিকা ব্যয় সংকোচন করতে সক্ষম হওয়াতে মোট চাহিদা নিম্নমূখী হল। ব্যক্তি পুঁজি বিনিয়োগ করে এই চাহিদার শূন্যতা পূরণ হতে পারত। কিন্তু লাভের প্রবৃদ্ধি এই সময়ে যথেষ্ট না থাকায় ব্যক্তি মালিকানায় কোম্পনীগুলোও বিনিয়োগ কমাতে থাকল ও অন্যান্য ব্যয় সংকোচন করল। ফলে চাহিদা বাড়ল না। উৎপাদিত পণ্য অন্য দেশে আরও বেশী পরিমাণে রপ্তানী করার চেষ্টা শুরু হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মোট জাতীয় আয়ের অনুপাতে রপ্তানী এই সময় সবচাইতে বেশী হয়। মোট চাহিদা না বাড়ায় এক দেশ আরেক দেশের বাজার দখল করার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর ফলে জার্মানী ও জাপানেরও অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়। আমেরিকার অর্থনীতি কিছুটা সবল হলেও বেকারত্ব কমেনি। তাই এটা "jobless recovery" নামে পরিচিত। পূর্ব এশিয়ার (জাপান ছাড়া) দেশগুলো পণ্য রপ্তানী বাড়িয়ে বিশ্বের মোট রপ্তানীতে তাদের অংশ ১১.৭ শতাংশ (১৯৯০ সালে) থেকে ১৬.৪ শতাংশে (১৯৯৫ সালে) বাড়াতে পারল। এতে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য প্রতিযোগিতা আরও বাড়ে, বাস্তবে ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি এসেও চাহিদার তুলনায় পণ্য উৎপাদনের আধিক্য থেকেই যায়।[৩৭]

সাধারণ মানুষের আয় বাড়ছিল না। নতুন নতুন উৎপাদিত পণ্যের বাজারও বাড়ছিল না। ব্যাংকগুলো চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য ব্যক্তিগত ঋণের ব্যবস্থা করল। ব্যক্তি হিসাবে বাড়ী কেনার জন্য ঋণ, অন্যান্য দ্রব্য (যেমন মটর গাড়ী) কেনার ঋণ, আর ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পণ্য কেনার ঋণ এইগুলো হল ব্যক্তিপর্যায়ে ঋণ দেওয়ার পথ। অতীতে কম আয়ের মানুষেরা তার আয় বাড়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকলে ধার নিত না। এই সময়ে বাড়ীর দাম ক্রমেই বাড়ছিল। ধার নিয়ে বাড়ী কিনলে বাড়ীর দাম বাড়তে থাকলেও শোধ দিতে হত কেনার সময় যে দাম ছিল তাই। সুদের হারও ছিল কম। আর বাড়ীর দাম বাড়লে বর্ধিত দামের ভিত্তিতে আরও ঋণ নিয়ে গাড়ী বা অন্যান্য জিনিস কেনা যেত বা খরচ করা যেত। ফলে ঋণ নিয়ে বাড়ী কেনার প্রসার ঘটল। এতে বাড়ীর চাহিদা বাড়ায় দাম বাড়তে থাকল এইভাবে একটা চক্র সৃষ্টি হল। ২০০২ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে আমেরিকা, কানাডা, ও অষ্ট্রেলিয়ায় বাড়ীর দাম বাড়ল ৩০-৪০ শতাংশ, বৃটেনে বাড়ল ৬৪ শতাংশ।

তথ্যসূত্র

১. Chomsky N. World Orders, Old and New. New York,1994 p 83
২. Hobsbawm E. The Age of Extremes. London, 1994 p 258
৩. Chomsky N. p 83
৪. Varoufakis Y. The Global Minotaur. London, 2011 p 59
৫. Varoufakis Y. p 61
৬. Varoufakis Y. p 62
৭. Varoufakis Y. p 67
৮. Varoufakis Y. p 75
৯. Samuelson P. Full Employment After the War In: Postwar Economic Problems. Ed.Harris SE. New York,1993
১০. Chomsky N. p 31
১১. Gaddis JL. The Long Peace. Oxford,1987 p 43
১২. Foreign Relations of the United States (FRUS),1950,vol-1. p 234-92
১৩. Chomsky N. p 27
১৪. Varoufakis Y.p 81
১৫. Eisenhower DD. Eisenhower's Farewll Address January 17,1961, In Documents of American History vol-II since 1893,9th Ed. Commager HS. Engelwood Cliffs. P 652-654
১৬. www.independant.org/pdf/working_paper/58-government.pdf.accessed 25 June,2013.Higgs R. Government and the Economy since World War II, The Independent Institute Working Paper no.58, April,20,2005
১৭. Higgs R.
১৮. Neu CE. "The Rise of National Security Bureaucracy" in the New American State: Bureaucracies and Politics since World War II, Ed.Galamboz L.Baltimore,1987 p 85-108
১৯. Weimer T. Blank Check: The Pentagon's Black Budget. New York,1990
২০. প্রথম আলো, ৩০ শে এপ্রিল,২০১৩
২১. Varoufakis Y. p 89
২২. Varoufakis Y. p 92
২৩. Chomsky N. American Power and the New Mandarins. New York, 1969, p 299
২৪. Harman C. Economics of the Madhouse. London,1995, p 71
২৫. Oppenheim VH. (1976-1977) "Why Oil Prices Go Up: The Past: We Pushed Them. Foreign Policy, 25;32-33
২৬. Varoufakis Y. p 104
২৭. Armstrong P,Glyn A and Harrison J. Capitalism since 1945. Oxford,1991
২৮. Brenner R. Economics of Global Turbulence. London, 2006 p 49-63
২৯. Brenner R. The Boom and the Bubble. London, 2003 p 13
৩০. Armstrong P. p 352
৩১. Brenner R. The Boom and the Bubble. p 18
৩২. Brenner R. The Boom and the Bubble. p 26
৩৩. Brenner R. Economics of World Turbulance. p 149,167,173
৩৪. Brenner R. The Boom and the Bubble. p 37
৩৫. Bank of International Settlements. 71st Annual Report,1 April,2000 31st March,2001, Basel,11 June, 2001 p 123
৩৬. Brenner R. The Boom and the Bubble. p 43
৩৭. Magdoff H and Sweezy PM. Stagnation and the Financial Explosion. New York,1987 p 83

দ্বাদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের দেশগুলিতে ব্যাপক ধ্বংস, মৃত্যু ও বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল, তবে বিভিন্ন দেশে প্রতিরোধ আন্দোলনও শুরু হয়েছিল।

গ্রীসে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল। প্রথমে ইতালী ও পরে জার্মানীর দখল করার ফলে প্রায় দশ শতাংশ মানুষ মারা গিয়েছিল, যার অর্ধেক ছিল অনাহারে মৃত্যু। দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠেছিল। পরে এগুলোর সমন্বয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থাও হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল ভাল। জার্মানদের যোগাযোগ ব্যবস্থা তারা বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। গ্রীক কমিউনিষ্ট পার্টি এই কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। প্রতিরোধ বাহিনী যুদ্ধশেষে রাজতন্ত্র ও পুরাতন শাসক শ্রেণীর উৎখাত চাচ্ছিল। ইতালীতে শিল্পপতি ও ভূমিমালিকরা (যারা মুসোলিনিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল বিশের দশকে) সামরিক বাহিনী কয়েক স্থানে মিত্রশক্তির কাছে হেরে যাওয়ার পর মুসোলিনিকে সরিয়ে একজন সামরিক অফিসার জেনারেল বাদোগ্লিওকে বসাল। নতুন সরকার একদিকে মিত্রপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল অন্যদিকে জার্মানীকে সুযোগ দিল দেশের উত্তরাঞ্চল দখল করে নেওয়ার। জার্মান দখলদারীর ফলে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকল যার সংখ্যা ১৯৪৪ সালে বিশ হাজার থেকে এক বছর পর প্রায় এক লাখে পৌঁছাল। শিল্প কারখানায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠল। ১৯৪৪ সালে প্রায় সব বড় শহরের কারখানাগুলোতে শ্রমিক ধর্মঘট হল। ১৯৪৪ সালে আগষ্ট মাসে শ্রমিক ও প্রতিরোধ যোদ্ধারা মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী আসার আগেই জার্মানদের হাত থেকে ফ্লোরেন্স শহর মুক্ত করল। আট মাস পর তারা দেশের তিনটি বড় শিল্প নগরী (জেনোয়া, মিলান,ও তুরিন) একইভাবে মুক্ত করল। প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমদিকে দখলদারীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। কিন্তু শাসক শ্রেণী ও শিল্প কারখানার মালিকরা জার্মানদের সহযোগিতা করায় তারা ক্রমেই এদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে থাকল। বামপন্থী দলগুলোর দিকে তারা আকৃষ্ট হল, বিশেষতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির দিকে। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার, দুই বৎসর পর তা হল প্রায় ৪ লক্ষ। ইতালীতেও প্রতিরোধ কর্মীদের মধ্যে প্রায় সবাই চাচ্ছিল বিদ্যমান শাসকগোষ্ঠীর অপসারণ ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন।

ফ্রান্সে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রথম আহ্বান আসে শাসক শ্রেণীর একজন প্রতিনিধির কাছ থেকে-তিনি ছিলেন মধ্য পর্যায়ের একজন সামরিক অফিসার, চার্লস দ্য গল। তিনি পালিয়ে বৃটেনে চলে গিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেহেতু হিটলার-ষ্ট্যালিন চুক্তির কারণে জার্মানীর বিপক্ষে ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালের আগে অবস্থান নেয়নি, তাই কমিউনিষ্টরা প্রথমে প্রতিরোধ আন্দোলনে ছিল না। দ্য গলের বাহিনী ছিল ছোট। আমেরিকাও ১৯৪৩ সালের শেষ পর্যন্ত তাকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং জার্মান সমর্থিত ভিচি (Vichy) সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল। জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পর কমিউনিষ্টরা প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলে এবং অতি অল্প সময়ে মূল শক্তিতে পরিণত হয়। ফ্রান্সের পুরাতন শাসকশ্রেণীর বড় অংশ জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল। জার্মান দখলদারীর নিষ্পেষণ মূলতঃ ছিল দরিদ্রশ্রেণীর মানুষদের উপর। ১৯৪৪ সালে মিত্রশক্তি এসে পৌঁছানর আগেই প্রতিরোধ বাহিনী জার্মানীর হাত থেকে প্যারিস কেড়ে নেয়। প্রতিরোধ বাহিনীর মূল শক্তি ছিল কমিউনিষ্টরা। গ্রীস, ইতালী ও ফ্রান্সে প্রশ্ন ছিল একটাই, কমিউনিষ্টরা কি সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের পথে যাবে না শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতা করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় থেকে যাবে।[১]

তবে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আশা অনুযায়ী পরবর্তী কর্মকান্ড হয় নাই। মিত্রশক্তির নেতারা (আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) আলোচনা করে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলেন।[২] সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে ছিল পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি। সে গুলিতে কমিউনিষ্টদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিষ্টরা সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের পথে গেল না। ১৯৪৪ সালের শেষদিকে ইতালিয়ান কমিউনিষ্ট নেতা তোগলিয়াত্তি (Togliatti) মস্কো থেকে ইতালীতে ফিরে এলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন তার দল মুসোলিনি পরবর্তী সরকারে (যারা জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল এবং পুঁজিপতি ও পূর্বতন শাসক

শ্রেণী সমর্থিত ছিল) যোগ দিবে। ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট নেতা মরিস থোরেজ (Maurice Thorez) মস্কো থেকে সবচাইতে বড় প্রতিরোধ বাহিনীকে (যেটাতে কমিউনিষ্টরা ছিল প্রধান শক্তি-FTP) তার চাইতে অনেক ছোট বাহিনীর নেতৃত্ব (দ্য গল নিয়ন্ত্রিত FFI) মেনে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী তিনি মস্কো থেকে ফিরে এসে তার দলকে যুদ্ধ পরবর্তী ক্ষমতাসীন শক্তি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন সংগ্রামে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করলেন।[৩]

ইতালী ও ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। গ্রীসে যদিও প্রতিরোধ যোদ্ধারা সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম করে নাই, তারপরও সেখানে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের শেষদিকে জার্মান সৈন্যবাহিনী গ্রীস থেকে পশ্চাদপসরণ করল। প্রায় সমস্ত দেশই তখন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সংগঠন EAM-ELAS এর নিয়ন্ত্রণে চলে এল। তারা উদ্যোগ নিলেই রাজধানী এথেন্স দখল করতে পারত। কিন্তু তারা তা করল না। বৃটিশ সরকার যুদ্ধের আগের শাসক শ্রেণীর গণধিক্কৃত রাজনৈতিকদের সমন্বয়ে সরকার গঠন করল এবং তাদের এথেন্সে ক্ষমতাসীন করল। এই সরকার শাসন চালানর জন্য পুলিশ ও ডানপন্থী সংগঠনগুলোর সহযোগিতা নিল-যারা আক্রমণকারী জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। এদের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ যোদ্ধারা যুদ্ধের সময় সংগ্রাম করেছিল। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে এই সরকার সারাদেশে প্রতিরোধ বাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণ করার নির্দেশ দিল। সরকারের সৈন্যরা রাজধানীতে একটা বিরাট শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে মেশিনগান দিয়ে গুলিবর্ষণ করল। ২৮ জন নিহত হল। প্রতিরোধ যোদ্ধারা বাধ্য হয়ে সরকার ও তার রক্ষাকারী বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। চার্চিল বৃটিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দমন করতে। তিনি ঘোষণা করলেন এতে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন আছে।[৪] একমাস পর সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের সংগঠন ভেঙ্গে দিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গ করে সরকারী বাহিনী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা শুরু করল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রতিরোধ যোদ্ধাকে বন্দী করা হল ১৯৪৫ সালে। সরকারী বাহিনীর সঙ্গে এই কাজে দক্ষিণপন্থী আধা সামরিক সংগঠনগুলোও জড়িত হল। পুলিশ ও সামরিক বাহিনী জার্মানদের সহযোগীদের নিয়ে পুনর্গঠন করা হল। আমেরিকানরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাদের সাহায্য করল। গৃহযুদ্ধ এভাবেই গণবিরোধী শক্তি তাদের পক্ষে নিয়ে আসল। ১৯৫০ সালের পর সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখা হল। ১৯৬৭ সালে দেখা গেল নির্বাচনে প্রতারণা করে গণবিরোধী সরকারের জয় নিশ্চিত করা যাবে না-তখন সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করল।

ঐতিহাসিকদের অনেকেই এখনও মনে করেন ফ্রান্স, ইতালী ও গ্রীসের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের যুদ্ধপূর্ব শাসন ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার কোন বিকল্প ছিল না। এই দেশগুলিতে তখন বিপুল শক্তি নিয়ে আমেরিকান ও বৃটিশ সৈন্য বাহিনী অবস্থান করছিল। সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করলে এই সৈন্যবাহিনী তাদের দমন করে দিত। পল গিনসবোর্গ (Paul Ginsborg) ও এরিক হবসবম (Eric Hobsbwm) এই মত দিয়েছেন।[৫] কিন্তু ভিন্ন মতও আছে-গ্যাব্রিয়েল কালকোর (Gabriel Kalko) মতে শুধুমাত্র সামরিক শক্তি বিবেচনা করা সঠিক নয়। বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট হল যুদ্ধের পর বৃটেন ও আমেরিকার জনগণ এমন ছিল যে প্রতিরোধ যোদ্ধারা শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ নিলে তা সামরিক শক্তি দ্বারা দমন করতে গেলে বৃটেন ও আমেরিকায় ব্যাপক বিরূপ জনমতের সৃষ্টি করত। দীর্ঘস্থায়ী দমনমূলক ব্যবস্থা চালান রাজনৈতিকভাবে কঠিন হত।[৬] বৃটেনের নেতাদের ভয় ছিল গ্রীসের প্রতিরোধ যুদ্ধ ইতালীর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ না করে, ইতালীতে সংগ্রাম শুরু হলে তা ফ্রান্সেও ছড়িয়ে পড়তে পারত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিপক্ষ হিসাবে তুলে ধরল এবং তার বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বকে দাঁড় করাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে আমেরিকা ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশ একদিকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন অপরদিকে-এই দুই প্রভাব বলয় ইউরোপে নির্ধারিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে যুদ্ধশেষে উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা দিতে হবে। এই দেশগুলি কোন বলয়ে যাবে তা অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন আর সংঘর্ষে যেতে চাচ্ছিল না, তাছাড়া ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত আনবিক বোমা না থাকায় তারা এদিক থেকেও দুর্বল অবস্থানে ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপ আক্রমণ বা দখল করার কোন পরিকল্পনা কোন সময়েই ছিল না এবং পশ্চিমা দেশগুলির নেতারা তা বিশ্বাসও করতেন।[৭] তবে কয়েকটি কারণে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার বলয়ভূক্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী বিশ্বকে দাঁড় করালেন। একটা হল তাদের যুদ্ধপরবর্তী বছরগুলিতে ভয় ছিল সমাজতন্ত্রের আদর্শিক আবেদন ও নাৎসী জার্মানীকে পরাজিত করার ব্যাপারে

সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলোর জনগণ সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে সে সম্ভাবনা ছিল। আগেই বলা হয়েছে ফ্রান্স ও ইতালীতে কমিউনিষ্ট পার্টি যুদ্ধের পর শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। আমেরিকার রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল সোভিয়েত বিরোধী প্রচারণা চালানর। আমেরিকার কংগ্রেস বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সোভিয়েত ইউনিয়নকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে প্রচারণা চালান নির্বাচনে জেতার ব্যাপারে সহায়ক ছিল। এই প্রচারণার ফলে আর একটা লাভ হল সমরাস্ত্র উৎপাদন ও আমেরিকার সামরিক শক্তি দেশের বাইরে বজায় রাখার জন্য মার্কিন জনগণকে কর দিতে রাজী করান। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঘটনাপ্রবাহ দুই পরাশক্তিকে বিপক্ষে দাঁড় করালেও অনেকের মত যে প্রলয়ঙ্কর সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা আমেরিকার কারণে।[৮] যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শুধু সোভিয়েত ভীতিই যে কাজ করছিল তা নয়, ফ্রান্স ভীত ছিল পুনরুজ্জীবিত জার্মানী সম্বন্ধে। আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তিও সবাইকে শঙ্কিত করেছিল। আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থ যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে প্রাধান্য পাবে এটা মনে করা স্বাভাবিক ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান অধিকারের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর প্রতিরোধ যুদ্ধের ইতিহাস যুদ্ধ পরবর্তী সরকার ও সমাজে তাদের প্রভাব অনেকটা নির্ধারণ করে। প্রতিরোধ যুদ্ধে বামপন্থী, বিশেষতঃ কমিউনিষ্টদের ভূমিকা ছিল প্রধান। এর কারণ হল প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা করত যে বড় দলগুলি ছিল, যেগুলো ছিল পুঁজিপতি ও বড় ভূস্বামীদের প্রভাবিত, তারা নাৎসীদের চাইতে সামাজিক বিপ্লবকে বেশী ভয় করত। তারা জার্মানদের বিরোধিতা করে নাই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করেছিল। অন্যান্য সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলির যুদ্ধপূর্ব জনসমর্থন ও সংগঠন কমিউনিষ্টদের চাইতে অনেক বেশী ছিল। কিন্তু তারা সংসদীয় গণতন্ত্রে কাজ চালাতে অভ্যস্ত ছিল। প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগ না দিয়ে তাদের নেতৃত্ব আত্মগোপন করে। যুদ্ধের পরে তারা আবার রাজনীতিতে ফিরে আসে। তাদের অনুসারীরা প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও বড় ভূমিকা পালন করে নাই। ক্যাথলিক চার্চের অনুসারী রাজনৈতিক দলগুলো কট্টর কমিউনিষ্ট বিরোধী ছিল, তাদের অনুসারীরা খুব কমই প্রতিরোধে অংশ নিয়েছিল।

এছাড়া কমিউনিষ্টরা আদর্শিক বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় প্রতিরোধ যুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দেয়। বৃটিশ রাজনীতিবিদ মাইকেল ফুট কমিউনিষ্টদের "সাহসীদের মধ্যেও সবচাইতে সাহসী" আখ্যা দিয়েছেন।[৯] সবচাইতে ভাল সংগঠন থাকায় তাদের বন্দীশালায় বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও ছিল বেশী। কিন্তু সাহসিক কর্মকান্ডের জন্য তাদের হতাহতের সংখ্যাও ছিল অনেক বেশী। এই সমস্ত কারণে যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও যুব সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কমিউনিষ্টদের প্রতি উচ্চ শ্রদ্ধাবোধ ছিল এবং জনপ্রিয়তাও বেশী ছিল। ফ্রান্স ও ইতালীতে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে কমিউনিষ্টরা একটা বড় জায়গা দখল করে ছিল।

বলকান উপদ্বীপে (যুগোস্লাভিয়া ও আলবেনিয়া) প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল শক্তিশালী। সোভিয়েত ইউনিয়ন উৎসাহ না দেওয়া সত্বেও এই দেশগুলিতে কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে তারা চাইলেও কমিউনিষ্টদের ক্ষমতা দখল করার সম্ভাবনা ছিল কম, এটা অনেকেই মনে করেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে উৎসাহ দেয় নি।[১০] সোভিয়েত উপদেশ ছিল - ফ্যাসীবাদবিরোধী সব শক্তির সমন্বয়ে ঐক্যমতের সরকার প্রতিষ্ঠা করা। ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাদের এ প্রচেষ্টা বিফল হয়।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপের জনমত সমাজ পরিবর্তন ও সামাজিক বৈষম্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তিগুলির অনুকূল হয়। বৃটেনে যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হলেও তাঁর রক্ষণশীল দল পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদলের কাছে পরাজিত হয়। শ্রমিক দল স্বাস্থ্য সেবা, বেকার ভাতা সহ ব্যাপক সামাজিক সংস্কার পরবর্তী বছরগুলিতে করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঢেউ পুঁজিবাদী দেশগুলোতে আসতে পারে, এমন সম্ভাবনা যুদ্ধ পরবর্তী বছরগুলোতে সে সব দেশের শাসকশ্রেণী আশংকা করেছিল, প্রায় সব পশ্চিমা দেশেই এ সময় শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষের জন্য কল্যাণমূলক সংস্কার করা হয়।

ইউরোপের যে সমস্ত দেশ সোভিয়েত লালফৌজ মুক্ত করে, যুদ্ধের ফলে সেগুলির জনসাধারণের মতামত যুদ্ধের পর কি হয়েছিল তা বলা কঠিন। যুদ্ধের সময় ব্যাপক গণহত্যা, জোর করে জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তর, সংঘর্ষের ফলে মানুষের স্থান ত্যাগের জন্য যুদ্ধ পূর্ব ও যুদ্ধ পরবর্তী জনগোষ্ঠী এক ছিল না। এই অঞ্চলের প্রায় সব মানুষই যুদ্ধের পরে নাৎসীবিরোধী হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা সবাই প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পক্ষে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে

অবস্থান নিয়েছিল। চেকোশ্লাভাকিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টি যুদ্ধের আগেও জনপ্রিয় ছিল। যুদ্ধের পর তারা নির্বাচনে সবচাইতে বড় দল হিসাবে বেরিয়ে আসল। অল্প কিছু এলাকা ছাড়া যুগোস্লাভিয়ায় প্রতিরোধ যোদ্ধারা জনসমর্থন পেয়েছিল। গ্রীসে প্রতিরোধ যোদ্ধারা সমাজে শক্ত অবস্থানে ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। রোমানিয়া ও হাঙ্গেরীতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তৎপরতা বেশী ছিল না। পোল্যান্ডের জনসাধারণ ঐতিহ্যগতভাবে জার্মানী ও রাশিয়ার বিরোধী ছিল। বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি (লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়া) জার্মানদের পক্ষে ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ছিল। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরই সোভিয়েত কর্মকর্তারা তাদের প্রত্যক্ষ বলয়ের দেশগুলিতে বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র ও মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলার অনুমতি দিয়েছিল। ঠান্ডা লড়াই শুরু হলে কমিউনিষ্টদের ফ্রান্স ও ইতালীতে সরকারের অংশীদারিত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। কমিউনিষ্টরা কয়েক বৎসর সরকারে থেকে শ্রমিকদের আন্দোলন করা থেকে বিরত রেখেছিল। তারা এভাবে পুরস্কৃত হল।[১১] ইতালীতে ১৯৪৮ সালে পরবর্তী নির্বাচনে কমিউনিষ্টদের জয়লাভ করার সম্ভাবনা ছিল। আমেরিকানরা তাদের হারানর জন্য প্রচুর টাকা ঢেলেছিল, এমনকি তারা জিতে গেলে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করার পরিকল্পনাও করেছিল।[১২] সোভিয়েত ইউনিয়নও পাল্টা ব্যবস্থা নিল। সোভিয়েত প্রভাব বলয়ের দেশগুলিতে অকমিউনিষ্ট মন্ত্রীদের বাদ দেওয়া হল, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলিকে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে একীভূত করা হল। কমিউনিষ্ট নেতাদের মধ্যেও শুদ্ধি অভিযান চালান হল। যারা সোভিয়েত নেতা ষ্ট্যালিনের অতীতে বিরোধিতা করেছিলেন তাদের বিচারের সম্মুখীন করা হল, কেউ কেউ কারাদন্ড পেল, কারও মৃত্যুদন্ড হল। বুলগেরিয়ায় কোস্তভ (Kostov), হাঙ্গেরীতে রাক (Rajk), চেকোশ্লাভিকিয়ায় স্লানস্কি (Slansky), এদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল।[১৩] হাঙ্গেরীর কাদার (Kadar) ও পোল্যান্ডের গোমুলকা (Gomulka) কারাদন্ড পেল। দুই শিবির দুই সামরিক জোট তৈরী করল-পুঁজিবাদী শিবির ন্যাটো (NATO) এবং সোভিয়েত শিবির ওয়ারস (WARSAW) চুক্তির মাধ্যমে।

সোভিয়েত প্রভাব বলয়ে অস্থিরতা দেখা দিল কয়েক বৎসরের মধ্যেই। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে পূর্ব জার্মানীতে কাজের সময় বাড়ানকে কেন্দ্র করে নির্মাণ শ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করে। একদিনের মধ্যেই পূর্ব জার্মানীর প্রায় সব কারখানার শ্রমিকেরা তাদের সমর্থনে ধর্মঘট শুরু করে। ধর্মঘটীরা জেলখানা আক্রমণ করে এবং ক্ষমতাসীন দলের দপ্তর আক্রমণ করে। রাশিয়ান সৈন্যদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন ১৯১৮ সালের পর জার্মানীতে বার বার দেখা গেছে। কমিউনিষ্ট পার্টির অনেকেই এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল এবং পরে বহিস্কৃত হয়েছিল। বহিস্কৃতদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই হিটলার ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিল। তারা এই আন্দোলনকে শ্রমিকদের আন্দোলনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিক হিসাবেই গ্রহণ করেছিল। পূর্ব জার্মানীর এই আন্দোলনের পর পরই সোভিয়েত রাশিয়ায় বন্দী শিবিরে ধর্মঘট হয়। ১৯৫৬ সালে পজনান (Poznan) নামে পোল্যান্ডের শহরে আন্দোলন শুরু হয়ে প্রায় অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। পরিস্থিতি বিস্ফোরন্মুখ হয়ে ওঠে। দলের একজন নেতা গোমুলকা (Gomulka) ছিল কারাবন্দী। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় ও ক্যাথলিক চার্চের সাহায্যে সে শ্রমিকদের শান্ত করতে সক্ষম হয়।

পোল্যান্ডের এই বিদ্রোহ আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত হাঙ্গেরীতে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহ ছাত্রদের মধ্য থেকে শ্রমিকদের ও সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এটা শুধু বুদাপেষ্ট শহরেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। প্রায় সব শহরে বিপ্লবী কমিটি গঠন করা হল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পোল্যান্ডের মত একজন অপসারিত কমিউনিষ্ট নেতা ইমরে ন্যাগীকে coalition সরকার প্রধান হিসাবে আনা হল। ১৯৫৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর রাশিয়ান সৈন্য বাহিনী ট্যাঙ্ক সহকারে বুদাপেষ্ট শহরে ঢুকে প্রধান দপ্তরগুলো দখল করল। বিদ্রোহীরাও তীব্র প্রতিরোধ করল। অনেক মানুষ মারা গেল। প্রায় দুই লাখ মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ অষ্ট্রীয়ায় পালিয়ে গেল। বুদাপেষ্টের কেন্দ্রীয় শ্রমিক কাউন্সিল রাশিয়ানদের সমর্থিত জানস কাদার (Janos Kadar) এর সরকারের বিকল্প হিসাবে দাঁড়ানর চেষ্টা করল। দুই সপ্তাহের বেশী সময় ধর্মঘট ও সংঘর্ষের পর শ্রমিকদের দমন করা হয়। তাদের নেতাদের অনেককে হত্যা করা হয় এবং অনেককে কারারুদ্ধ করা হয়। ইমরে ন্যাগী ও তার সহকর্মীদেরও হত্যা করা হয়। পশ্চিমা দেশগুলি এই ঘটনাকে কমিউনিষ্ট শাসন ভেঙ্গে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বলে আখ্যা দেয়। কমিউনিষ্ট দেশগুলি একে পুঁজিবাদী দেশের চরদের দ্বারা সৃষ্ট অন্তর্ঘাত বলে। পরবর্তীতে প্রকাশিত কাগজপত্রে মনে হয় এই আন্দোলন ছিল কর্মজীবী মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা (যা যুদ্ধোত্তর সময়ে ছিল অনেক) সমাধানের দাবী দাওয়াকে কেন্দ্র করে। শ্রমিকদের সামাজিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কর্মজীবী মানুষদের নির্বাচিত কাউন্সিলের মাধ্যমে করে সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার কথা তাদের দাবীতে বলা হয়।[১৪]

হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী থেকে বোঝা গেল ষ্ট্যালিনের মত একনায়কের শাসনের মধ্যেও পরিবর্তনের ঢেউ উঠতে পারে। সোভিয়েত প্রভাব বলয়ে প্রতি-বিপ্লব বলে এই ঘটনাবলীকে চিহ্নিত করা হয়। পশ্চিমা দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবীরা এমনকি বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও মনে করল সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কস, এঙ্গেলস ও রোজা লুক্সেমবার্গের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করল বিদ্রোহ যদি হাঙ্গেরীতে ঘটতে পারে, তা হলে তা সোভিয়েত ইউনিয়নেও ঘটতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ একযুগ এরকম ঘটনা ঘটে নাই। তাই ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়ায় যখন আবার বিদ্রোহ শুরু হল তখন তা কেউ প্রত্যাশা করে নি। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে চেকোশ্লাভাকিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ৭ শতাংশ। অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল। ষাটের দশকের প্রথমদিকে প্রবৃদ্ধি কমতে থাকে, মানুষের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি স্থবির হয়ে যায় ও সামাজিক অসন্তোষ দেখা দেয়। চেকোশ্লাভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির জনসমর্থন ও জনসম্পৃক্ততা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির চাইতে বেশী ছিল। চেকোশ্লাভাকিয়ায় কমিউনিষ্টদের একটা বড় অংশ তাদের প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ব্যবধানে ছিল হতাশ এবং বিক্ষুব্ধ। এতে রাজনৈতিক নেতৃত্বে বিভক্তি দেখা দেয়। দেশের প্রেসিডেন্ট এবং সরকারী দলের সেক্রেটারী নোভোৎনী (Novotny) কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে সরকারী নীতির সমালোচকেরা প্রকাশ্যে প্রচারে নামে। শ্রমিক সংগঠনগুলো থেকে সরকার সমর্থকদের সরিয়ে দেওয়া শুরু হয়। চেকোশ্লাভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির সংশোধন নীতি পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিষ্ট শাসিত দেশগুলোর মধ্যে কট্টরপন্থী পোল্যান্ড ও পূর্ব জার্মানীর সরকার সমালোচনা করে অন্যদিকে হাঙ্গেরী ও যুগোস্লাভিয়া একে স্বাগত জানায়। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাসে চেকোশ্লাভাকিয়ায় শক্তিশালী সামরিক বাহিনী পাঠায়। সরকারের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করে মস্কো নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও এর উদ্দেশ্য ছিল সমালোচনা ও বিশৃঙ্খলা দ্রুত থামান, বাস্তবে তা হয় নাই। সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে বাস্তব প্রতিরোধ তেমন হয় নাই কিন্তু অক্রিয় (passive) প্রতিরোধ ছিল ব্যাপক। সোভিয়েত সরকার শেষ পর্যন্ত নেতাদের ফেরৎ পাঠায় এই শর্তে যে, তারা ভিন্নমতের বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করবে। কয়েকমাস আন্দোলন, ধর্মঘটের পরে তা করা হয়। অনেক বিদ্রোহীকে কর্মচ্যুত করা হয়, অনেকে কারাদন্ড পায়। সোভিয়েত অনুগত সরকার পরবর্তী ২০ বৎসর চেকোশ্লাভাকিয়ার কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখে। তবে এই ঘটনায় সোভিয়েত আদর্শিক মতবাদ পশ্চিমা বিশ্বে বড় ধাক্কা খায়। পশ্চিমা দেশগুলোর বুদ্ধিজীবীরা এই ঘটনার নিন্দা করে, পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিও নিন্দা জানায়। পুঁজিবাদী দেশের যুব সমাজের মধ্যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের আবেদন কমে যায়। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক বলয়ের দেশগুলিতেও যুব সমাজের মধ্যে আদর্শিক কারণে কমিউনিষ্ট পাটিতে যোগ দেওয়ার সংখ্যা কমে যায়। অনেকেই তাদের পেশা বা চাকুরীতে উন্নতির জন্য পার্টিতে যোগ দেয়। ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক বলয়ের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন ক্রমেই বাড়ছিল। ১৯৫০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার প্রতি বৎসর গড়ে ৫.৭ শতাংশ ছিল। ষাটের দশকে তা হয় ৫.২ শতাংশ, সত্তুরের দশকের প্রথমার্ধে আরও কমে হয় ৩.৭ শতাংশ, সত্তুরের দশকের শেষার্ধে তা হয় ২.৬ শতাংশ। আশির দশকের প্রথমার্ধে তা আরও কমে হয় ২ শতাংশ। এই সময়কালে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা ছিল একই ধরনের। তুলনায় ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নতির হার ১৯৭৩ সালে অর্থনৈতিক ধ্বসের আগে পর্যন্ত ভাল ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের এক দশক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রবৃদ্ধির হার পূঁজিবাদী দেশগুলোর চেয়ে বেশী ছিল। প্রবৃদ্ধির হারের ব্যবধান ক্রমেই কমতে থাকে। সংস্কারের প্রচেষ্টা সোভিয়েত ইউনিয়নেও ষাটের দশকে প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের আমলে নেওয়া হয়। এটা বেশী সফল হয় নি। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সংস্কার প্রচেষ্টা রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। সত্তুরের দশকে এসে এটা বোঝা যায় যে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটা সত্বেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সমতা আনতে পারবে না ছাড়িয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। [১৫] এর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প উৎপাদনেরও অবনতি হতে থাকল। ষাটের দশকে তার প্রধান রপ্তানী ছিল কল-কারখানা, পরিবহন যন্ত্রপাতি, ধাতব দ্রব্য। ১৯৮৫ সালে রপ্তানীর ৫৩ শতাংশ ছিল তেল ও গ্যাস, আর শতকরা ৬০ ভাগ আমদানী ছিল, কল-কারখানার ধাতব দ্রব্য ও শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিণত হয়েছিল অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ (মূলত সোভিয়েত বলয়ের পূর্ব জার্মানী, চেকেশ্লোভাকিয়া) সমূহের শক্তি (energy) উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহকারী। আরও একটা দিক হল সামাজিক সূচকের উন্নতি ধীর হয়ে যাওয়া। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার আগের বিশ বৎসরে জন্মের সময় শিশুর প্রত্যাশিত আয়ু সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীতে একেবারেই বাড়ে নি। মোট সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির চাইতে জনগণের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন

সামাজিক সূচকের অগ্রগতির জন্য বেশী প্রয়োজন-এটা সুবিদিত, কাজেই সামাজিক সূচকের উন্নতি না হওয়া সমাজতন্ত্রের প্রতি আবেদন কমিয়ে এনেছিল।

১৯৬৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়ায় বিদ্রোহের পর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে রক্ষণশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক সংস্কার এর প্রচেষ্টা থেমে যায়। কৃষি উৎপাদন কমতে থাকে। কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার করে উৎপাদন বাড়ানর চেষ্টা না করে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব বাজারে গম কিনে জনগণকে খাওয়ান সহজ মনে করল।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যের সময়কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনৈতিক লেন দেন খুবই কম ছিল। ফলে ত্রিশের দশকের মহামন্দা সোভিয়েত অর্থনীতিতে কোন বিপর্যয় ঘটাতে পারে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক লেন দেন বাড়াতে থাকল। ফলে সোভিয়েত অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির মন্দা ও ধ্বসের শিকার হয়ে পড়ল। নিয়তির পরিহাস এমন যে সত্তুরের দশকের পর পুঁজিবাদী বিশ্ব যে উপুর্যপরি অর্থনৈতিক মন্দায় পড়ে তাতে পুঁজিবাদী দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও টিকে থাকে, কিন্তু এই মন্দার আঘাত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতন তরান্বিত করে। জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া এর একটা উদাহরণ। ১৯৭৩ সালে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর সংস্থা ওপেক (OPEC-The Organization of Petrol Exporting Countries) জ্বালানী তেলের দাম বাড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জ্বালানী তেলের প্রকৃত মূল্য ছিল খুবই কম এবং তা আরও কমছিল। ১৯৭৩ সালে তা প্রায় চারগুণ বাড়ল এবং সত্তুরের দশক শেষ হওয়ার আগেই তা আবারও তিনগুণ বাড়ল। ১৯৭০ সালে এক ব্যারেল জ্বালানী তেলের দাম ছিল প্রায় ২.৫৩ ডলার, আশির দশক শেষে এসে তা হল প্রায় ৪১ ডলার। তেল উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্য খুলে গেল। তেলের দাম দিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে আমদানী করা পণ্যের দাম দেওয়া সহজতর হল। উৎপাদন বাড়ানর জন্য অর্থনৈতিক সংস্কার করার চাপ কমে গেল। সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী দেশগুলোতে তেল রপ্তানী বাড়িয়ে দিল। কারও কারও মতে এই অর্থ প্রবাহ সোভিয়েত ইউনিয়নকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাহসী করে তুলেছিল ও আমেরিকার সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামার পিছনে ভূমিকা রেখেছিল। এই প্রতিযোগিতা সোভিয়েত অর্থনীতির জন্য আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়ায়। তেলের দাম বাড়ার আর একটা ফল হল ওপেক দেশগুলো কোটি কোটি ডলার আয় করতে থাকল। এই টাকা তারা পশ্চিমা দেশের ব্যাংকগুলিতে জমা রাখল। ব্যাংকগুলো ঋণ নিতে আগ্রহীদের কাছে এই টাকা খাটাতে শুরু করল। অনেক উন্নয়নশীল দেশ ঋণ পাওয়ার এই সুযোগ নিল। এর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বলয়ের দেশগুলোর মধ্যে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরী বড় অংকের ঋণ নিয়েছিল। অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ও জনগণের জীবন যাত্রার মান বাড়ানর এটা একটা সুযোগ তারা মনে করেছিল। এতে আশির দশকের মন্দা সমাজতান্ত্রিক বলয়ের দেশগুলিকে আরও বিপর্যস্ত করল। বিশেষ করে তাদের অর্থনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কম ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের তেল ব্যবহার মন্দার কারণে ৪০ শতাংশ কমে গিয়েছিল, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তা মাত্র ২০ শতাংশের কাছাকাছি কমল। জ্বালানী তেলের দাম বাড়ার জন্য উৎপাদন খরচ অনেক বাড়ল। ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ল ও খাদ্য ঘাটতি হল। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ (হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ড ছাড়া) পণ্যদ্রব্য ও খাদ্যে কৃচ্ছতাসাধন করল এবং তারা ঋণ এর পরিমাণ অনেকাংশে (৩৫-৭০ শতাংশ) পর্যন্ত কমাতে পারল।[১৬] এতে সেই সময় একটা ধারণার সৃষ্টি হল বড় অর্থনৈতিক সংস্কার ছাড়াই প্রবৃদ্ধি বাড়ান যাবে। এই সময় মিখাইল সার্গেইভিচ গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা হলেন।

ব্রেজনেভের আমলকে "স্থবিরতার যুগ"(era of stagnation) আখ্যা দিলেও সোভিয়েত নীতি নির্ধারকদের মধ্যে এটা ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতার কাল। এটা শুধু শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত ও প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশাসক অর্থনীতি পরিচালনা করত তারাও এর মধ্যে ছিল। এ ছাড়া পরবর্তীতে গর্বাচেভ এর শুরু করা গ্লাসনস্ত (glassnost) বা মুক্ত বাতাস বা স্বচ্ছতার কার্যক্রমে যে ব্যাপক সাড়া এদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল তা সম্ভব ছিল না। প্রচলিত নীতির আলোচনা ও সমালোচনা প্রকাশ্যে বেশী হত না। তবে দু একজন সাহসী সম্পাদক (যেমন Novy Mir নামক বিখ্যাত সাময়িকী) কিছু লেখা প্রকাশ করেন। গর্বাচেভ নিজেও এই বলয়েরই লোক। যেখানে ষ্ট্যালিনের সময় কারখানা শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রকৌশল ও কৃষিতে লেখাপড়া শিখে উঠে আসাটাই ছিল নেতা হওয়ার পথ-সেখানে গর্বাচেভ ছিলেন নতুন নেতাদের একজন-যারা কারখানায় কাজ না করেই

লেখাপড়া শিখে দলে নীতি নির্ধারক হচ্ছিলেন। ব্রেজনেভ পরবর্তী নেতা ইউরি আন্দ্রোপভ গর্বাচেভ ও তার মত সংস্কারপন্থী নেতাদের শীর্ষে নিয়ে আসলেন।

নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পথ নিয়ে উদ্ভাবনের চিন্তা ভাবনা থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বেশীরভাগ সাধারণ মানুষের জন্য এই সময়কাল ছিল তাদের পিতা বা পিতামহের কালের চাইতে ভাল। সোভিয়েত সমাজ সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ছিল স্থিতিশীল। ষাটের দশকের শেষদিকে পশ্চিমা বিশ্বে যে ছাত্র যুব আন্দোলন জেগে ওঠে তা সোভিয়েত সমাজকে স্পর্শ করে নি। এমনকি গর্বাচেভ যখন সংস্কার আন্দোলন শুরু করলেন, তাতেও যুব সমাজ সক্রিয় অংশ নেয় নাই। এটা যে শুধু বহির্বিশ্বের সঙ্গে সোভিয়েত সমাজের যোগাযোগ কম থাকার কারণে হয়েছে তা নয়। সোভিয়েত সরকার ছিল জনসমর্থিত (পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মত নয়)। সোভিয়েত সরকারের ধারাবাহিকতা ছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর থেকেই। আর সোভিয়েত ভূখন্ড তারও আগে জারদের আমল থেকে এক রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। এই কারণে আশির দশকের আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা দেখা যায় নি। যে অঞ্চলগুলিতে বিচ্ছিন্নতার চেষ্টা দেখা যায় যেমন (বাল্টিক দেশগুলি), সেগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি যদিও প্রথম দিকে রাশিয়ানদের মধ্যে শক্তিশালী ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতীয়তার মানুষদের মধ্যেও একই ধরনের অনুপাতে সদস্য নেওয়া হয়েছিল। মানুষের জীবিকা ও সামাজিক চাহিদার নিশ্চয়তা ছিল, খুব উচ্চ মানের না হলেও। কাজেই সংস্কারবাদীদের শুধু যে কমিউনিষ্ট পার্টির রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছিল তা নয়, তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও তেমন সাড়া পায় নি।

পরিবর্তনের উদ্যোগ তৃণমূল পর্যায় থেকে আসে নি। তা এসেছিল উচ্চ পর্যায় থেকে। গর্বাচেভ যে পরিবর্তনের ধারা শুরু করেছিলেন-তা দুই কারণে সম্ভব হয়েছিল। প্রথমতঃ সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টিতে দুর্নীতি ক্রমেই বাড়ছিল আর তা ক্রমেই প্রকাশ হচ্ছিল, ফলে যারা ছিলেন আদর্শবাদী ও সৎ এতে তাদের ক্ষোভ ক্রমেই বাড়তে থাকল। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত শিক্ষিত ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানুষ বাস্তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির চালিকাশক্তি ছিল তারা এটা অনুভব করছিলেন যে, আমূল পরিবর্তন ছাড়া অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়বে। এটা যে শুধু এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অদক্ষতা ও অনমনীয়তার জন্য তাই নয় - বৃহৎ পরাশক্তি হওয়ার কারণে তার উপর যে সামরিক ব্যয়ভারের চাপ পড়েছে তাও মেটান ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশেষতঃ আশির দশকে আফগানিস্তানে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় এই অর্থনৈতিক চাপ আরও প্রকট হয়ে পড়ল।

গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসার পর তার একটা বড় কাজ হল পশ্চিমা বিশ্বকে আশ্বস্ত করা যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সংঘাত ও সংঘর্ষ থেকে সরে আসবে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তা করতে সক্ষম হলেন। পশ্চিমা বিশ্বে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও দেশে তার জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামল। ১৯৫০ সালের পর থেকে সব কমিউনিষ্ট সংস্কারপন্থীর লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রীভূত ও পরিকল্পিত অর্থনীতিকে বাজার দর অনুযায়ী লাভ লোকসানের আওতায় এনে নমনীয় করে তোলা। হাঙ্গেরীর সংস্কারপন্থীরা এটা করেছিল, চেকোশ্লাভাকিয়ার নেতারাও সোভিয়েত হস্তক্ষেপের আগে এ পথে কিছুটা এগিয়েছিল। তাদের আশা ছিল অর্থনৈতিক নমনীয়তা ও গতিশীলতা রাজনীতিতে রক্ষনশীলতা কমাবে ও গণতন্ত্র বাড়াবে। গর্বাচেভও এই মত পোষণ করতেন এবং নির্বাচিত হওয়ার আগেও প্রকাশ্যে এই মতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন।[১৭] যদিও হাঙ্গেরীর জানোস কোরণাই (Janos Kornai) এবং তার মত অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ যাঁরা সংস্কারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, আগেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এটা সম্ভব নয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সংস্কারপন্থী নেতারা সমাজতন্ত্র পরিত্যাগ করে এই পরিবর্তনগুলো চেয়েছিলেন তা মনে হয় না।

গর্বাচেভ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে দুইটি স্লোগান ব্যবহার করলেন। একটি হল পেরেস্ত্রাইকা (Perestroika) বা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠন ও অন্যটি হল গ্লাসনস্ত (Glassnost) বা তথ্যের মুক্ত অধিকার। যেটা বলা হচ্ছিল তা হচ্ছে স্বায়ত্তশাসিত ও অর্থনৈতিকভাবে সফল কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান (সরকারী, ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সমবায়ভিত্তিক)চালাতে হবে কিন্তু এগুলো কেন্দ্রের নির্দেশনায় থাকবে। এটা আপাতদৃষ্টিতে ভাল মনে হলেও কিভাবে একটি রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন অর্থনীতি প্রস্তাবিত রূপান্তর করবে সে সম্বন্ধে কারও ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। এ ছাড়া একটি কেন্দ্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির এককগুলি নিজ নিজ প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে - এটা কাজ করবে এমন ভরসাও ছিল না। লেনিনের সময় New Economic Policy (১৯২১-১৯২৮) চালু করে বিধ্বস্ত

অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা হয়েছিল- সেই সময়ের সংস্কার কিছুটা এই প্রকৃতির ছিল। তাছাড়া গণচীনে মাও যুগের পর সংস্কার করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সত্তুর দশকের শেষ থেকে আশির দশকে হয়েছিল। কিন্তু যে সংস্কার পশ্চাদপদ কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে কার্যকর হয়েছে তা সোভিয়েত ইউনিয়নের তখনকার শিল্পোন্নত অবস্থায় কাজ করবে তা আশা করা সঠিক ছিল কিনা সন্দেহ।

"গ্লাসনস্ত" কার্যকর করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ব্যক্তিত্ব এবং কমিউনিষ্ট পার্টির সমালোচনা শুরু হল। এর উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন বাড়ান এবং রাষ্ট্র ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিরোধ কমান। যতই সমালোচনা চলতে থাকল রাষ্ট্র ও কমিউনিষ্ট পার্টির সামগ্রিক মনোবল কমল ও তাদের কর্তৃত্বের ক্ষমতা কমল। যারা রাষ্ট্রযন্ত্র ও দল পরিচালনা করত তারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে চলে গেল- এটা তারা প্রকাশ্যে না দেখালেও তারা সহযোগিতা করল না।

বর্ধিত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল। নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব নির্ধারণ ও কর্মকান্ড শুরু স্বভাবতই কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। তারা দায়িত্বপালন শুরু করলেও পার্টির ক্ষমতা কমে যাওয়া ও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা হ্রাসের জন্য আগের তুলনায় যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সময়সাপেক্ষ ও জটিল হল। কিন্তু এই দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানগুলো পালন করতে শুরু করার আগে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে একটা শূন্যতা বিরাজ করছিল। এটা ছিল বিপদজনক।[১৮] নতুন সাংবিধানিক পরিবর্তনও কার্যকর করা হল। ১৯৮৭- ৮৮ সালে ছোট ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠান গুলোকে আইনী বৈধতা দেওয়া হল। যেসব বড় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো লোকসান দিচ্ছিল -তাদের নীতিগতভাবে দেওলিয়া হয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন সৃষ্টি হওয়ার পর এই প্রথম ১৯৮৯ সালে কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল না। পরিকল্পনা না থাকায় এবং কেন্দ্র থেকে দলীয় কোন নির্দেশনাও না থাকায় বাস্তবে কার্যকর কোন জাতীয় অর্থনীতিও ছিল না। সব জায়গায় এলাকা ভিত্তিক বা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা শুরু হল। বড় বড় শিল্প শহরের শাসনকর্তারা বিনিময় ভিত্তিতে ঐ অঞ্চলের যৌথ খামারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পণ্য আদান প্রদান করতে লাগল। এটা আগেও ছিল, এখন এটা বড় আকার ধারণ করল। কমিউনিষ্ট পার্টি দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ হলেও পার্টির নির্দেশনাই অর্থনৈতিক ঐক্য ধরে রেখেছিল, এটা না থাকায় অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু সেই স্থান পূরণ করার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয় নাই। জনগণের জীবন যাত্রার মান কমে গেল। যে সময় রাজনৈতিক উদারপন্থার প্রসার ঘটছিল, সে সময় অর্থনীতিতে দেখা দিল চরম বিশৃঙ্খলা। এ সময় গর্বাচেভ পাটির কর্তৃত্ব খর্ব করে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রধান করলেন। রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অতীতের যে কোন নেতার চাইতে বেশী অধ্যাদেশ জারী করে শাসন করার ক্ষমতাও তিনি নিলেন। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসন করার ক্ষমতাও কমে গেল। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তৃত্ব তো কমেছিল আগেই। ক্রমেই অবনতি হতে থাকা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৯০ সালের মে মাসের মধ্যে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পৌঁছে গেল। এই সময় পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সরকারের অপ্রত্যাশিতভাবে পতন হল। ১৯৮৯ সালে আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কমিউনিষ্টরা পোল্যান্ড, চেকোশ্লাভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া ও পূর্ব জার্মানীতে ক্ষমতা ছেড়েছিল বা ছাড়তে বাধ্য হল। এর মধ্যে রোমানিয়া ছাড়া আর কোথাও সহিংসতা ঘটেনি। অল্প কিছুদিন পর সোভিয়েত বলয়ের ভিতরে না হলেও সমাজতান্ত্রিক যুগোশ্লাভিয়া ও আলবেনিয়াতেও কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা হারায়। এই ঘটনাবলী অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারগুলিও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছিল। তবে এই সময় সংস্কারপন্থী আন্দোলন চীনে জেগে উঠলে নেতৃত্বের মধ্যে কিছুটা দ্বন্দ্বের পর সরকার কঠোর হয়ে এটা দমন করে। এতে সেনা অভিযানে বেইজিং এর তিয়ানআনমেন স্কয়ারে অনেক মানুষ (সঠিক সংখ্যা জানা যায় না) হতাহত হয় কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কোনটিরই সরকারকে উৎখাত করা হয়নি। একমাত্র পোল্যান্ড ছাড়া এই দেশগুলির কোনটিতেই সংগঠিত বিরোধী শক্তি ছিল না। পোল্যান্ডেও সংগঠিত বিরোধী শক্তি থাকায় আলাপ আলোচনার (Negotiation) মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল নিশ্চিত করা গিয়েছিল। "ঠান্ডা লড়াই" আর চালিয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সোভিয়েত সরকার। তারা বল প্রয়োগ করে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির কমিউনিষ্ট সরকারকে রক্ষা করার প্রয়োজন দেখছিল না এবং এটা জানিয়ে দিয়েছিল। টিকে থাকতে হলে তাদের অর্থনৈতিক সংস্কার করতে হবে এবং তা তাদের

নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েই করতে হবে। এই সরকারগুলো আসলে বিকল্প না থাকার জন্য টিকে ছিল। শিক্ষিত ও মেধাবী মানুষদের পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কাজ করার সুযোগের জন্য ও উন্নতি করার জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যেই কাজ করতে হত, ফলে বেশীরভাগ মানুষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখতে না পারলেও এটা মেনে নিয়েছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের চাইতে ভাল এবং শেষ পর্যন্ত তা জয়ী হবে এটা বিশ্বাস করার কারণ সে দেশের কমিউনিষ্টদের ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অবক্ষয় শুরু হওয়ায় এ বিশ্বাস রাখারও কোন ভিত্তি ছিল না। তারপরেও গণবিক্ষোভ শুরু হওয়ায় এসব দেশের সরকার ও শাসক দলের নেতারা আশ্চর্যই হয়েছিলেন, তারা এটা আশা করেন নি। রোমানিয়া ছাড়া আর কোথাও বিক্ষোভ দমন করার চেষ্টা হয়নি। শাসকেরা কোন প্রতিরোধ ছাড়াই সরে গেছে। হয়ত তারা বলপ্রয়োগ করে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারত কিছুকাল। চল্লিশ বছর কমিউনিষ্ট শাসনের অনেক উল্লেখযোগ্য অর্জন থাকা সত্বেও কমিউনিষ্টরা তাদের সরকার ধরে রাখার জন্য প্রতিরোধ করেনি। যদিও পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলি এটা প্রচার করে আসছিল যে, এই দেশগুলির সরকার স্বৈরতন্ত্রী এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছাড়বে না। বিক্ষোভে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল তারা শাসকদলের নেতাদের সঙ্গে আলাদা আলাপ আলোচনা করে ক্ষমতা বদলের ব্যবস্থা করল। পোল্যান্ড ছাড়া অন্যান্য দেশে বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিল কিছু সাহসী বুদ্ধিজীবী যারা শিক্ষকতার পেশা, বা সাহিত্য ও শিল্পকলার চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। পোল্যান্ডে বিরোধীরা সংগঠিত ছিল, শ্রমিক সংগঠন ও খ্রিষ্টান ধর্মের যাজকদের সংগঠনের নেতৃত্বে। ফলে দেখা যায় ক্ষমতা বদলের পর হাঙ্গেরীতে একজন দার্শনিক, চেকোশ্লাভাকিয়ায় একজন নাট্যকার এবং পোল্যান্ডে একজন ঐতিহাসিক, প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের অবক্ষয় ১৯৯১ সালের আগে পর্যন্ত ধীর গতিতে চলছিল। পেরেস্ত্রাইকা বা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সফল না হওয়ায় জনগণ গর্বাচেভের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল-যদিও পশ্চিমা বিশ্বে তিনি জনপ্রিয়। এর ফলে গর্বাচেভকে পুনর্গঠিত পার্লামেন্টের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত করে কাজ চালাতে হচ্ছিল। সংস্কার সমর্থক প্রশাসক, প্রকৌশলী ও পেশাজীবি এবং পার্টি তার প্রতি বিরূপ হয়ে গেল। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর কমিউনিষ্ট সরকারের পতন সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্বলতা আরও প্রকট করে তুলল। ১৯৯০-৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে কোন ভূমিকা রাখতে না পারায় সোভিয়েত ইউনিয়নের যে আর পরাশক্তি নাই তা পৃথিবীর কাছে প্রমাণিত হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন যুদ্ধ ছাড়াই পরাজিত দেশে পরিণত হল।[১৯]

অর্থনৈতিক সংকট শেষ বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রমেই বাড়ছিল। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা বন্ধ করে দেওয়ায় প্রতিটি এলাকা, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিটি বড় কারখানা, তাদের নিজের দায়িত্ব নিতে হল। উৎপাদন ও সরবরাহ বিপর্যস্ত হল। পণ্য ও খাদ্য সংকট দেখা দিল। যারা সংস্কার এর দায়িত্বে ছিলেন (বেশীরভাগই পন্ডিত ব্যক্তি) তারা মরিয়া হয়ে উঠলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল বিদ্যমান পরিকল্পিত কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ক্রমেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছিল। এটা সঠিক ছিল। কিন্তু তাদের সমাধান ছিল এটা পুরোপুরি ভেঙ্গে সম্পূর্ণ বাজার অর্থনীতি চালু করতে হবে। পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতিবিদরাও এরকম পরামর্শ দিচ্ছিল। কিন্তু তাদের কারও এরকম অর্থনীতি কিভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হবে তার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা তো ছিলই না, পুঁথিগত কোন প্রমাণও ছিল না। বাস্তবে এটা কাজও করে নাই।

তবে শেষ সংকটটা হল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নয়। কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পনাবিদ, সশস্ত্রবাহিনী, কেউই সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাক এটা চায় নি। অথচ নতুন সংবিধান এর ফলে ক্রমেই কেন্দ্র তার কর্তৃত্ব হারাচ্ছিল। ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে গর্বাচেভ নয়টি বড় প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে একটি "Treaty of Union" নামে চুক্তি করলেন। এতে কেন্দ্রের হাতে সামরিক বাহিনী, বৈদেশিক সম্পর্ক, অর্থনীতি সমন্বয় করা ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক আদান প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা-এই ক্ষমতা গুলি রাখা হল। কমিউনিষ্ট পার্টি ও কর্তৃত্বে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে মনে হল এটাও গর্বাচেভের আর একটি উদ্যোগ যা সফল হবে না এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবে। চুক্তি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ১৯৯১ সালের ২০শে আগষ্ট থেকে। তার দুইদিন আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় সব শীর্ষ নেতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান ও কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃবৃন্দ একটি জরুরী কমিটি (Emergency committee) গঠন করে গর্বাচেভকে ছুটি কাটান অবস্থায় গৃহবন্দী করে। এটা ছিল গর্বাচেভের হাত থেকে তাদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া। এটা কোন সামরিক অভ্যুত্থান ছিল না-

মস্কোতে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। তারা আশা করেছিল সাধারণ মানুষ একে স্বাগত জানাবে বা অন্ততঃ বাধা দিবে না। বাস্তবে সাধারণ মানুষ বাধা দেয় নাই। কোন গণঅভ্যুত্থান ঘটেনি, এমন কি এই ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে ডাকা ধর্মঘটও সফল হয় নি। হয়ত দশ বৎসর আগে এরকম পরিবর্তন ঘটলে কোন আলোড়নই সৃষ্টি হত না। হয়ত সত্যিকার সামরিক অভ্যুত্থান হলে তা সফল হত।[২০] রাশিয়ান ফেডারেশনের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন (Boris Yeltsin) ক্ষমতা দখলের জন্য এই সুযোগ নিলেন, তাঁর কয়েক হাজার সমর্থক নিয়ে তিনি তার সদর দপ্তর থেকে কমিউনিষ্ট পার্টি বিলুপ্তির ঘোষণা করলেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সব সম্পদ রাশিয়ান ফেডারেশনে বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দিলেন। যে সব নেতারা ক্ষমতা দখল করেছিলেন তাঁরা সংঘাত এড়ানর জন্য পরাজয় মেনে নিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খুব কম নেতাই ঘটনা এভাবে মোড় নেবে তা মনে করেছিল। ক্ষমতার উপর তার নিয়ন্ত্রণ শক্ত করার জন্য ইয়েলৎসিন রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের ধূয়া তুললেন, সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রক ছিল রাশিয়াই। ফলে অন্যান্য জাতীয়তার মানুষরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। রাশিয়ার বাইরের বেশীরভাগ প্রজাতন্ত্রেই বড় রাশিয়ান গোষ্ঠীর বসবাস ছিল যদিও তারা সেখানে সংখ্যালঘু ছিল। ইয়েলৎসিন হুমকী দিলেন, রাশিয়ান প্রজাতন্ত্রের সীমানা পুনঃ নির্ধারণ করা হবে। যে সব প্রজাতন্ত্র আগে বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা করে নি, এখন তারা এটা ভাবল। ইউক্রেন স্বাধীনতা ঘোষণা করল। কয়েকমাস পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেওয়ার ঘোষণা করা হল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমাজতান্ত্রিক বলয়ের রাষ্ট্রগুলির পতন এটাই প্রকাশ করে যে, এই মতবাদের অনুসারীদের বিশ্বাস কতটা দুর্বল ছিল। পৃথিবীর একটা বিরাট অঞ্চল অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাজতন্ত্রের আওতায় এসেছিল। তবে সোভিয়েত কমিউনিজম ছিল একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর (লেনিনের ভাষায় ভ্যানগার্ড Vanguard) বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গঠিত দলের। সব সাধারণ মানুষকে এই আদর্শিক বিশ্বাসে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। সাধারণ মানুষের কমিউনিজমের উপর আস্থা নির্ভর করছিল এই ব্যবস্থায় তারা জীবন জীবিকায় কেমন সুযোগ সুবিধা পায় তার উপর। যে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তে উচ্চতর সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্র স্থাপন করার পরিকল্পনা ১৯১৭ সালে বলশেভিকরা করেছিল তা সফল হয় নি। এর একটা কারণ হল-সোভিয়েত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছিল তখনকার পশ্চাদপদ রাশিয়ায় বিরাজমান পরিস্থিতির সমাধানের প্রচেষ্টা হিসাবে। বিশ্ব পুঁজিবাদের বিকল্প হিসাবে এ প্রচেষ্টা নেওয়া হয় নাই। কাজেই রাশিয়ার বিপ্লবের পর যখন অন্য উন্নত দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটল না তখন শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। কিন্তু তখনকার মার্কসবাদীদের মতেই সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অবস্থা ছিল না। এই প্রচেষ্টায় আশ্চর্য ফল হয়েছিল- যার মধ্যে একটা ছিল বিপুল ক্ষতি ও জীবনের বিনিময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীকে পরাজিত করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থনীতি একটা অন্ধ গলিতে আটকে গেল।

পরিবর্তনের পর ১৯৯৩ সালে ইউনিসেফ জরিপে দেখা যায় "নব্য উদার" (New Liberal) সংস্কারের ফলে প্রায় ৫ লক্ষ অতিরিক্ত মানুষ মারা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নে।[২১] রাশিয়ার সামাজিক নীতি বিভাগের জরিপে দেখা যায় নব্বই এর দশকের মধ্যভাগে জনগোষ্ঠীর প্রায় ২৫ শতাংশ জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনই শুধু মেটাতে পারছে অথচ বিত্তশালীদের সম্পদ বেড়েছে পর্বত প্রমাণ।

তথ্যসূত্রঃ

১. Harman C. A People's History of The World. London,2008 p 535,536
২. Kolko G. The Politics of War. New York, 1970 p 346-347
৩. Kolko G. p 297
৪. Harman C. p 538
৫. Hobsbawm E. The Age of Extremes. London, 1994, p 168
৬. Kolko G. Century of War. New York, 1994 p 306
৭. Hobsbawm E. p 232,247
৮. Hobsbawm E. p 236
৯. Foot MR. Resistnce: An Analysis of European Resistance to Nazism 1940-1945. London,1976, p 86
১০. Hobsbawm E. p 168
১১. Birchall IE. Workers against the Monolith. London,1974, p 62
১২. Hobsbawm E. p 238
১৩. Harman C. p 545
১৪. Litvan G.(ed). The Hungarian Revolution of 1956. London,1966, p 126-127
১৫. Hobsbawm E. p 400
১৬. Hobsbawm E. p 474-475
১৭. Hobsbawm E. p 480
১৮. Hobsbawm E. p 481
১৯. Hobsbawm E. p 491
২০. Hobsbawm E. p 494
২১. Chomsky N. Profit Over People. New York, 1999, p 24

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বর্তমান যুগের ঘটনা প্রবাহ

২০০৮ সালের আগের কয়েক বৎসর ছিল বিশ্ব অর্থনীতির প্রশংসার সময়। পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থনীতির আপাত সাফল্যে সাধারণ মানুষ তো বটেই বিশেষজ্ঞরাও অনেকে ছিলেন বিমোহিত। আমেরিকার মত নিয়ন্ত্রণহীন শ্রম বাজার ও অর্থবাজার অনেকের কাছে অন্তহীন উন্নতির চাবিকাঠি বলে মনে হচ্ছিল। আমেরিকার মডেল অনুসরণ করলে তার মতই সাফল্য অন্যান্য দেশের আসবে বলে অনেক বিজ্ঞজনও মত দিচ্ছিলেন। কিন্তু আর কোন দেশের পক্ষে প্রতিদিন দুই থেকে তিন বিলিয়ন ডলার এর বিশাল অর্থপ্রবাহ অন্যান্য দেশ থেকে আকর্ষণ করা যে সম্ভব ছিল না, তা তাঁরা বিবেচনায় নেন নি (এই পরিমাণ অর্থ প্রতিদিন আমেরিকায় আসত)। ২০০৮ সালে ধ্বস নামার আগে আমেরিকা পৃথিবীর পুঁজি প্রবাহের ৭০ শতাংশ নিয়ে নিচ্ছিল। অন্য কোন দেশের নেওয়ার মত কিছু ছিল না।

অর্থ প্রবাহ বাড়ার জন্য আরও ক্ষেত্র কাজ করছিল। কৃত্রিম অর্থ তৈরী করা হচ্ছিল কর্পোরেশন গুলোর একটার সঙ্গে আর একটার একত্রীকরণ (merge) করে অথবা কিনে নিয়ে (acquisition)। ১৯৯০ এর দশকে আর ২০০০ এর দশকে একত্রীকরণের ধূম পড়ে গিয়েছিল। কোন একটা কর্পোরেশনের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে তা বিক্রী করে অর্থ প্রবাহ সৃষ্টি করা হত। ১৯৯০ সালে গাড়ী তৈরীর জার্মান কোম্পানী ডেইমলার-বেনজ আমেরিকার গাড়ী তৈরীর ক্রাইসলার কোম্পানী ৩৬ বিলিয়ন ডলারে কিনল। ওয়াল স্ট্রীট একীভূত কোম্পানীর দাম ধার্য করেছিল ১৩০ বিলিয়ন ডলার । ২০০৮ সালে ধ্বস নামার আগে ডেইমলার কোম্পানী বিক্রী করল ক্রাইসলার কোম্পানী ৩৫.৫ বিলিয়ন ডলার লোকসানে। আটলান্টিকের অপর পার্শ্বে যুক্তরাজ্যে ডেবেনহাম নামে এক ডিপার্টমেন্টাল চেইন ষ্টোর একটি বিনিয়োগ কোম্পানী ২০০৩ সালে কিনে নিল। তারা কোম্পানীর প্রায় সব স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ১ বিলিয়ন ডলার পেল। এরপর প্রায় যে দামে কিনেছিল সেই দামেই বিক্রি করেছিল। ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে রয়্যাল ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড ৭০ বিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে ABN-AMRO নামে একটি ডাচ ব্যাংক কিনল। কয়েক মাসের মধ্যেই বোঝা গেল এত দাম দিয়ে কেনা ঠিক হয় নি। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে একীভূত কোম্পানীর ABN-AMRO অংশ ডাচ, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গ সরকার জাতীয়করণ করল। এর প্রায় এক বছর পরে বৃটিশ সরকার রয়্যাল ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ডকে বাঁচানোর জন্য ৫০ বিলিয়ন ডলার দিল।

১৯৭৮ সালের আগে derivatives এর ব্যবস্থা ছিল কৃষিপণ্য উৎপাদনে (derivatives হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে অর্থ সংক্রান্ত চুক্তির কাগজ, যার মূল্য নির্ভর করে যার উপর ভিত্তি করে চুক্তি হচ্ছে তার উপর)।[১] শিকাগো শহরের commodities exchange কৃষকদের পরবর্তী বৎসরের কৃষিপণ্য একটা নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করতে দিত। তাতে পরবর্তী বছরের পণ্যের দাম যদি কোন কারণে কম হত তার থেকে কৃষক কিছুটা রক্ষা পেত, এটা পরিণত হয় hedging এ। এটা এরকম- এক ব্যক্তি দশ লক্ষ ডলারে একটি বাড়ী অথবা কিছু শেয়ার কিনতে চায়, কিন্তু আশংকা আছে দাম কমতে পারে। সে আট লক্ষ ডলারের একটা ইনসিওরেন্স কিনল। অর্ধেক দাম কমে গেলেও সে আট লক্ষ ডলার পাবে। যদি বিক্রী করার সময় দাম না কমে অথবা বাড়ে তা হলে তার লোকসান হল ইনসিওরেন্স এর টাকাটাই। কিন্তু যদি দাম কমে ছয় লক্ষ ডলার হয় তা হলে ইনসিওরেন্স থাকার কারণে তার লোকসান চার লক্ষ ডলার না হয়ে হবে দুই লক্ষ ডলার। hedging অনেক আগে থেকেই ছিল - কিন্তু ২০০৮ এর আগের বছরগুলিতে এটা আকারে অনেক বাড়ল। আরও একটা জিনিষ সৃষ্টি হল - তা হল option। এটা hedging এর উল্টো। অর্থাৎ বিক্রী করার option না হয়ে এটা ছিল কেনার option। একটা নির্দিষ্ট দামে কোন একটা জিনিষ ভবিষ্যতে কেনার জন্য ইনসিওরেন্স। কোন ব্যক্তি ১০ লক্ষ ডলার এর শেয়ার কিনল এবং আরও ১০ লক্ষ ডলার এর শেয়ার একই দামে কেনার জন্য ১ লক্ষ ডলার এর ইনসিওরেন্স (option নামে পরিচিত) কিনল। পরবর্তীতে ১০ লক্ষ ডলারে ৪ লক্ষ লাভ করল আর দ্বিতীয় ১০ লক্ষ ডলার এর শেয়ার (যেটা সে কিনে নাই, কিন্তু option কিনেছে) তাতে এক লক্ষ ডলার বাদ দিলে তিন লক্ষ ডলার লাভ করল। এরপর যেটা হল শেয়ার না কিনে শুধু option কেনা শুরু হল। পূর্ববর্তী উদাহরণে ১০ লক্ষ ডলার এর শেয়ার আর ১ লক্ষ ডলার এর option না কিনে পুরো ১১ লক্ষ ডলার এর option কিনলে (তা হবে ১ কোটি ১০ লক্ষ শেয়ার এর সম মূল্যের) দাম যদি আগের মত ৪০ শতাংশ বাড়ে তা হলে লাভ হবে ৪৪ লক্ষ ডলার। এটার নাম হল leverage-ধার করা টাকা দিয়ে শেয়ার এর দামের উপর বাজী ধরা। ১৯৮০ সালের পর থেকে অর্থ বাজারে, যার কেন্দ্র ছিল ওয়াল স্ট্রীট, টাকার সরবরাহ এভাবে বাড়তে থাকল,

যে এই ধরনের অর্থবাজারের উদ্ভাবন (financial innovations) এর লেন দেন ব্যাপক প্রসার লাভ করল। আসলে "উদ্ভাবন" কিছুই নয়-এটা ঋণ করে বাজী ধরার খেলা। এটা ছিল বিপদজনক খেলা । শেয়ারের দাম পড়লেই কোটি কোটি ডলার লোকসানের সম্ভাবনা ছিল (পরবর্তীতে যা ঘটেছিল)-এবং এই ডলার ছিল ব্যাংক ও লগ্নী প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ করা। বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আমেরিকায় যে বিরাট অর্থ প্রবাহ হয়েছিল সেটা ছাড়া এই বাজী ধরার "উদ্ভাবন"গুলির ব্যবহারই থাকত না। ২০০৮ সালের ধ্বসের পর ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নিউইয়র্কে পল ভোলকার (প্রেসিডেন্ট রেগান ও কার্টারের আমলে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড এর চেয়ারম্যান) অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের এক সভায় বলেছিলেন অর্থ সংক্রান্ত উদ্ভাবন (financial innovations) অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে কোন অবদান রাখে নাই।[২]

ক্রমবর্ধমান অর্থপ্রবাহ (অন্যান্য দেশ থেকে এবং দেশের মধ্যে) ও "উদ্ভাবনী"র মাধ্যমে প্রচুর লাভের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকসমূহ আরও মুনাফা অর্জনের জন্য ঋণ সুবিধা মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষদের দেওয়া শুরু করল। এই ঋণ সুবিধা ছিল বাড়ী কেনার জন্য মর্টগেজ, গাড়ী ও অন্যান্য কাজের জন্য ব্যক্তিগত ঋণ এবং কেনাকাটার জন্য ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির জন্য। অল্প আয়ের মানুষদের বাড়ী কেনার ঋণ নিতে উৎসাহিত করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুদের হার কম রাখা হত তারপরই সুদের হার অনেক বেড়ে যেত। অল্প আয়ের মানুষদের ঋণ, যাদের সুদের হার বেড়ে পরে ঋণ শোধ দিতে না পারার সম্ভাবনা বেশী ছিল, সেগুলোকে sub-prime loan বলা হত। ঋণে বাড়ী কিনে বাড়ীর দাম বাড়ার পর সেই বর্ধিত দামের জন্য বাড়ীর বিপরীতে অর্থ ঋণ দেওয়া হত- যেটা অন্যান্য পণ্য বা ভোগে ব্যবহার করা হত। এইভাবে অর্থ প্রবাহ আরও বাড়ল। ১৯৬০ এর দশক এর তুলনায় ১৯৭০ এর দশকে ব্যক্তিগত ঋণ ও ক্রেডিট কার্ড ঋণ এর মোট পরিমাণ ছিল ২৩০ শতাংশ বেশী। ১৯৮০ দশকে ৭০ এর দশকের তুলনায় এটা বাড়ল ৩১৮ শতাংশ। ১৯৯০ এর দশকে ১৯৮০ এর দশকের তুলনায় বাড়ল ১০০ শতাংশ। আর ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৮ সালে (ধ্বসের আগে পর্যন্ত) তা বেড়েছিল ১৬৩ শতাংশ।

ঋণপ্রবাহ আরও বাড়ানর জন্য কম আয়ের জনগোষ্ঠী যাদের ঋণ নিয়ে শোধ করার ক্ষমতা ছিল না, তাদেরও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ব্যাংকগুলো চালু করল। তবে এই ঋণ গ্রহীতাদের খেলাপী হওয়ার যে বিরাট ঝুঁকি সেটা লুকিয়ে অন্যের কাছে পার করে দেওয়ার জন্য একটা অভিনব ব্যবস্থা করা হল। এটার নাম হল securitized derivatives বা collateralized debt obligations (CDO)। চালাকিটা ছিল বিভিন্ন ঝুঁকির ঋণ এক সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। কিছু ঋণ বিত্তশালী মানুষ বা কোম্পানীতে দেওয়া যেটা শোধ দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রায় নিশ্চিত, কিছু ঋণ ছিল মোটামুটি সম্পন্ন মানুষ বা ব্যবস্থাকে দেওয়া - যেটার ঝুকি ছিল কম, আর শেষে যোগ হল কিছু ঋণ যে গুলো কম আয়ের মানুষকে বাড়ী কেনার ঋণ, যেটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলোকে খন্ড খন্ড করে তিন ধরনের ঋণ এর খন্ড মিলিয়ে করা হল একটা গুচ্ছ-এটাই CDO নামে পরিচিত। এই গুচ্ছের মধ্যে কম ঝুঁকির ঋণ এর অংশের সুদ ছিল কম, আর বেশী ঝুঁকির অংশের সুদ ছিল বেশী। গুচ্ছের (CDO) বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন সুদের হার মিলিয়ে গুচ্ছের ক্রেতা মেয়াদ শেষে কত পাবে এই অঙ্কের হিসাব ছিল জটিল। আমেরিকার কয়েকটি credit ranking agency আছে (যেমন Moody's Investor's Service, Standard and Poor's) যারা বিভিন্ন ষ্টক বন্ড, CDO ইত্যাদির ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা মূল্যায়ন ও শ্রেণীবিভাগ rating করে। তারা এইসব CDO কে তাদের উচ্চতম শ্রেণী (তিনটি A) দিয়েছিল। তাদের এই রেটিং (rating) যে ভ্রান্ত তা পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছিল। ২০০৮-৯ সালে অর্থনৈতিক সংকটের সময় তাদের দ্বারা উচ্চ মূল্যায়িত security র দাম প্রায় কাগজের সমান হয়ে গিয়েছিল। ২০০৫-২০০৭ সাল পর্যন্ত বাজারে ছাড়া প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার এর CDO (ঐ সময়ের মোট CDO প্রায় অর্ধেক) এর দাম শূন্য হয়ে গিয়েছিল ২০০৮ সালে।[৩] কিন্তু এই সময়ের আগে এই credit ranking agency গুলো CDO কে উচ্চ rating দিয়েছিল। ফলে ব্যাংকসমূহ ও investment fund (যেমন pension fund) যারা উচ্চ rating না থাকলে বন্ড বা ষ্টক তাদের rule অনুযায়ী কিনতে পারত না, তারাও কিনতে থাকল। পরবর্তীতে তদন্তে দেখা গেল- ব্যাংক সমূহ fee এর নামে উচ্চ অর্থ দিয়ে এবং অন্য credit ranking agency কে নিয়োগ করবে এই সব ভয় দেখিয়ে উচ্চ rating আদায় করেছিল।[৪] ব্যাংকগুলো এই CDO তৈরী করে নিজেরা ঝুঁকিতে থাকল না। তারা এটা বাজারে বিক্রি করে দিত। বিনিয়োগ ফান্ড, যেমন পেনশন ফান্ড, ব্যক্তি বিনিয়োগকারী, অন্যান্য ব্যাংক উচ্চ সুদের জন্য এগুলো কিনে নিত। অন্যান্য দেশের ব্যাংক ও বিনিয়োগ সংস্থাও এগুলো কিনত।

এইভাবে আমেরিকার বিনিয়োগ ব্যাংকগুলি (investment bank) কম আয়ের জনগোষ্ঠীর টাকায় মুনাফা করার ব্যবস্থা করেছিল। ২০০৫ সালের মোট বাড়ী মর্টগেজের মধ্যে ২২ শতাংশ ছিল sub-prime, ২০০৭ সালে তা বেড়ে হল ২৬ শতাংশ। এগুলো সবই CDO তে রূপান্তরিত করে বিক্রি করে দেওয়া হত। ২০০৮ সালে মর্টগেজ ভিত্তিক বন্ডের মোট মূল্য ছিল ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার ছিল sub-prime মর্টগেজ ভিত্তিক। এটা ছিল আমেরিকার মোট রাষ্ট্রীয় ঋণ এর চাইতেও বেশী। সারা পৃথিবীর মোট আয়ের সঙ্গে এর তুলনা করলে এর গুরুত্ব আরও পরিস্কার হবে। ২০০৩ সালে পৃথিবীর প্রতি ডলার আয়ের বিপরীতে ১.৩০ ডলারএর derivatives তৈরী হচ্ছিল। ২০০৭ সালে এটা ৬৪০ শতাংশে বেড়ে প্রতি ডলার আয়ের বিপরীতে ১২ ডলার CDO তৈরী হচ্ছিল।[৫] Fnancial innovation করা সম্ভব হয়েছিল অর্থব্যবস্থার (financial system) দুর্বল regulation এর কারণে। অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ১৯৯০ এর দশকের শুরু থেকেই কমিয়ে আনা হচ্ছিল। ১৯৯৯ সালের Graham Leach- Blilay Act এর মাধ্যমে ১৯৩৩ সালের Glass-Steagall Act দ্বারা ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ডের যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল- তা রহিত করা হল। ফলে financial innovation বাড়ল। বিনিয়োগ ব্যাংকগুলোর (investment bank) তদারকী বাণিজ্যিক ব্যাংক (commercial bank) এর মত অত নিবিড় ছিল না। তাদের মূলধন রাখার শর্তাবলী ছিল শিথিল। তারা স্বল্প মেয়াদী ঋণ নিতে পারত এবং অল্প মূলধনের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকিপূর্ণ asset রাখতে পারত।

অর্থ ও ঋণ সংক্রান্ত এই সব "উদ্ভাবন" এতই লাভজনক হয়ে পড়ল যে, ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদন আকর্ষণ হারাতে থাকল। অনেক বড় বড় কোম্পানী, যেমন জেনারেল মটরস, প্রথমে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত দ্রব্য,(এ ক্ষেত্রে মটরগাড়ী) কেনার অর্থ ঋণ এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অর্থলগ্নী শাখা খুলল। এই শাখা পরবর্তীতে অর্থলগ্নী ব্যবসায় এত লাভ করতে লাগল যে এটাই হয়ে দাঁড়াল কোম্পানীর আয়ের মূল উৎস। সারা পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থ সংক্রান্ত বন্যায় ভেসে যেতে লাগল। অর্থলগ্নী ও ঋণ সংক্রান্ত কাগজগুলো অর্থেরও বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে লাগল। ক্লিনটন প্রশাসন যখন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করল তখন এই অর্থের বিকল্প পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অবাধে ঢুকে পড়ল। অর্থ ও তার সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় সুদের হার কমে গেল। ফলে আমেরিকা ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে ঘরবাড়ী ঋণে কেনার চাহিদা বাড়ল। এতে দামও বাড়তে থাকল এবং সম্পত্তির বুদ্বুদ (asset bubble) তৈরী হতে থাকল। যে সমস্ত দেশের, যেমন গ্রীস, বড় বাজেট ঘাটতি ছিল, তারা ঋণ নিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করা শুরু করল। বাড়ী কেনার বাজারে bubble বা বুদ্বুদের সৃষ্টি ছিল sub-prime crisis এর অন্যতম কারণ এবং অর্থনৈতিক সংকটেরও বড় কারণ। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বাড়ী কেনার জন্য ঋণ দিচ্ছিল তারা তা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছিল। এই প্রতিষ্ঠান গুলি আবার এ গুলো নতুন মোড়কে mortgage backed security (MBS) হিসাবে আবার বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করত। প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের হিসাবের খাতায় এগুলি তুলত না। আবার বিনিয়োগকারীরা আমেরিকার বাইরের পৃথিবীর অন্যান্য দেশের হওয়াতে আমেরিকায় বাড়ী কেনার বাজারের স্থিতিশীলতার উপর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অর্থনীতিও নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এই বাড়ী কেনার মর্টগেজ আগে প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেনা বেচা হত। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দূর্বল করে দেওয়ায় এখন এই mortgage গুলোর কেনা বেচার হিসাবের খাতা খোলারও দরকার থাকল না এবং তা স্টক মার্কেটের নিয়মকানুন মেনে চলারও দরকার থাকল না। অর্থনীতিতে অতিরিক্ত টাকার সরবরাহ পণ্য উৎপাদনে চহিদা ও সরবরাহে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এই সময় যে সীমাহীন অর্থ সরবরাহ পৃথিবীর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল, সে সম্বন্ধে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কোন উদ্বেগ দেখা যায়নি। এই অর্থ সরবরাহে তারা আসক্ত হয়ে পড়েছিল।

২০০৭ সালের মাঝামঝি সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০ এর দশকের পরে সবচাইতে বড় অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়। এটা পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পাঁচ বৎসরের বেশীসময় পরেও এই সংকট থেকে উত্তরণের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রে এই সংকটে যে ৮০ লক্ষ চাকুরী চলে গিয়েছিল তার ৫০ লক্ষ এখনও ফিরেনি। যদিও এই সময়ে জনসংখ্যা বেড়েছে এক কোটি। স্টক মার্কেটে স্থিতিশীলতা ফিরলেও অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ব্যাংকিং খাত, মটর গাড়ী, আবাসন ও বাণিজ্যিক ভবনের ব্যবসা, খুচরা বিক্রি, এগুলো পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ২০১২ সালের শেষ দিক পর্যন্ত বেকারত্বের হার ৮ শতাংশের উপরে ছিল। এই সংকট সারা বিশ্বকে আক্রান্ত করে। বেশীভাবে আক্রান্ত হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বৃটেন, জাপান, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো আর উন্নয়নশীল দেশসমূহ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতি ২০০৯ সালে ৪ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়, এই এলাকায় বেকারত্ব ছিল ১০ শতাংশ। বৃটেনের ব্যাংকগুলো গভীর সংকটে পড়ে। আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোও বেশী

সমস্যায় পড়ে। গ্রীস, পর্তুগাল ও আয়ারল্যান্ড এখনও তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে আছে। আগষ্ট ২০০৮ সাল থেকে পরবর্তী এক বছরে বিশ্ব বাণিজ্য ১৩ শতাংশ কমে গেছে। চীন রাষ্ট্রীয় খরচ বাড়িয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখলেও তার রপ্তানী কমতে থাকল, দারিদ্রের হার বাড়তে থাকল ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কমতে থাকল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য ১৭ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল-ব্যাংক উদ্ধার করা, নিশ্চয়তাদান (garrantee) ও ঋণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ক্রয় করে। বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ কমেছিল ১৫ শতাংশ আর বিশ্বের জিডিপি (GDP) কমেছিল প্রায় ৪ ট্রিলিয়ন ডলার-প্রায় ৬ শতাংশ। উন্নত দেশগুলিতে শিল্প উৎপাদন ১৫ শতাংশ কমে গেল। সারা পৃথিবীতে বেকারের সংখ্যা বাড়ল, যুক্তরাষ্ট্রেই এটা দ্বিগুণ হয়ে গেল।[৬]

অর্থনীতিতে ধ্বস ২০০৭ থেকে বর্তমান

বর্তমান সময়ে সারা বিশ্ব বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে সবচাইতে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। ২০০৭ সালের গ্রীষ্মে যে অর্থনৈতিক ধ্বস আরম্ভ হয় সেটা ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরও তীব্র হয়। পৃথিবীর অর্থ বাজারের কেন্দ্রস্থল ওয়াল স্ট্রীট এই সংকটের ফলে বদলে গেছে। অর্থ ব্যবস্থায় জড়িত বড় বড় কোম্পানী (financial giants) যেমন-বেয়ার ষ্টার্নস, লেম্যান ব্রাদার্স, মেরিল লিঞ্চ, আমেরিকান ইনসিওরেন্স গ্রুপ, বা এ আই জি, ফ্যানী মে, ফ্রেডি ম্যাক, সিটি গ্রুপ হয় হারিয়ে গেছে অথবা বৃহৎ আকারের সরকারী অনুদান (bail out) দিয়ে রক্ষা করা হয়েছে। বিনিয়োগ ব্যাংক (investment bank) থেকে গোল্ডম্যান-স্যাকস ও মরগ্যান ষ্ট্যানলী ব্যাংক হোল্ডিং কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে।

২০০৫ সালের মার্চ মাসে বেন বার্নাঙ্ক (Ben Bernanke), ২০০৬-২০১৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান, "বিশ্বে সঞ্চয়ের আধিক্য ও যুক্তরাষ্ট্রের current account ঘাটতি" নামে একটি বক্তৃতা দেন। এটা তিনি আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ এর চেয়ারম্যান হওয়ার আগে। এটা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সম্পত্তির দাম বাড়ার একটা কারণ পাওয়া যায়। এটার সূত্র নিহিত আছে প্রায় এক দশক আগের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে।[৭] বেন বার্নাঙ্ক বলেন নব্বইএর দশকের অর্থনৈতিক সংকটের ফলে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তন ঘটে। সংকটের আগে এই দেশগুলিতে যত সঞ্চয় হত তার চাইতে বেশী বিনিয়োগ হত, কাজেই একটা ঘাটতি ছিল। এটা তারা অন্যান্য দেশ থেকে ঋণ নিয়ে পূরণ করত। বিভিন্ন কারণে এশিয়ার দেশগুলিতে ১৯৯৭-৯৮ সালে অর্থনৈতিক সংকট হয়। এই সংকট ১৯৯৪ সালে মেক্সিকোতে, ১৯৯৮ সালে রাশিয়ায়, ১৯৯৯ সালে আর্জেন্টিনাতেও ঘটে। এর ফলে অন্যান্য দেশ ঋণ দেওয়া কমিয়ে দেয়, এই দেশগুলির স্টক মার্কেট পড়ে যায়। তাদের মূদ্রামান কমে যায় ও অর্থনীতিতে মন্দা ঘটে। এই দেশগুলি তারপর থেকে সঞ্চয় বাড়ায় ও ঋণ নেওয়া কমায়। তারাই এরপর অন্যান্য দেশকে টাকা ধার দেওয়া শুরু করে। বিশেষ করে আমেরিকাকে। ১৯৯৬ সালে যেখানে এই দেশগুলি ৮৮ বিলিয়ন ডলার ধার করেছিল,২০০৬ সালে ২০৫ বিলিয়ন ডলার বিশ্ব পুঁজিবাজারে দিয়েছিল। বার্নাঙ্কর যুক্তি ছিল এই অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগের চাপে সম্পদের (বাড়ী ও স্টক ইত্যাদি) চাহিদা বেড়ে যাওয়া এগুলোর দাম বাড়ার একটা বড় কারণ। যে পদ্ধতিতে এটা বেড়েছিল তা mortgage backed security যেমন-CDO সমূহ তৈরী করে, যে সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। আমেরিকার National Bureau of Economic Resource একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, নির্ধারণ করেছে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে অর্থনৈতিক recession শুরু হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ ঋণ নিয়ে আমেরিকা ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে বাড়ী কিনে। এর পিছনে কয়েকটা কারণ ছিলঃ আমেরিকায় বিনিয়োগের জন্য অর্থের প্রবাহ বাড়া, অর্থ ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে নিয়ম কানুন না মানা, বাড়ীর দাম ক্রমেই বাড়তে থাকবে এই ধারনা। এই ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে অনেকেই প্রচলিত নিয়মে ঋণ পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না, যেগুলোকে sub-prime loan বলা হয়। নূতন ঋণ গ্রহীতাদের মোট সংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশই ২০০৬ সাল নাগাদ ছিল sub-prime। এই প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালের মে মাস থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ফেডারেল রিজার্ভ (আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক) আন্তঃব্যাংক ঋণ (একদিনের জন্য) এর হার ১.২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫.২৫ শতাংশ করল। একটা বড় কারণ ছিল মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। আন্তঃব্যাংক ঋণ এর সুদ বাড়লে বাড়ী কেনার ঋণের সুদও বাড়ে-এতে বাড়ী কেনার সংখ্যা কমে গেল। আবার যারা আগে ঋণ নিয়ে বাড়ী কিনেছিল তাদের অনেকেই সুদের হার বাড়ার কারণে ঋণ শোধ করতে অসমর্থ হল। বেন বার্নাঙ্কর তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে যাদের adjustable rate মর্টগেজ ছিল তাদের ১৬ শতাংশ ঋণ খেলাপী হয়ে গেল। এতে বাড়ীর দাম কমা শুরু করল এবং আরও ঋণ গ্রহীতা শোধ করতে অক্ষম হল।

২০০৭ সালের জুলাই মাসে merchant bank বেয়ার ষ্টার্নস (Bear Stearns), যেটাকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখত, প্রকাশ করল তাদের দুটো Hedge fund বিনিয়োগকারীদের টাকা দিতে পারবে না। আগষ্ট মাসে এরকম একটি ফরাসী ব্যাংক (BNP-Paribas) বলল তারাও দুটো Hedge fund কে প্রাপ্য টাকা দিতে পারবে না। কারণ বোঝা গেল ব্যাংকগুলোর সম্পদ (asset) এর বড় অংশ হচ্ছে সিডিও (CDO), এবং এই CDOগুলি প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। এরপর ইউরোপীয় ব্যাংকগুলো পরস্পরের সঙ্গে লেন দেন বন্ধ করে দেয়। বাজার চালু রাখার জন্য ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমে ৯৫ বিলিয়ন ইউরো এবং কিছুদিন পর আরও ১০৯ বিলিয়ন ইউরো অর্থ (financial) বাজারে ছাড়ে। এই সময় আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ, কানাডা, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো অনেক বিলিয়ন ডলার অর্থ (financial) বাজারে ছাড়ে- যার মোট পরিমান গোপন রাখা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে আন্তঃব্যাংক ঋণের হার (London Interbank Offered Rate বা LIBOR) ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের ঋণের হারের চাইতে এক শতাংশ বেশী হল। এটা ঋণ দিতে অনীহার প্রমাণ। এরপরই নর্দান রক নামে বৃটেনের ব্যাংকে যারা টাকা জমা রেখেছিলেন তাদের টাকা তুলে নেওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। ১৯২৯ সালের পর এই রকম ঘটনা এই প্রথম। যদিও নর্দান রক সিডিও (CDO) বা এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করে নাই, কিন্তু কাজকর্মের জন্য অন্য ব্যাংকের ঋণ এর উপর বেশী নির্ভর করত। এই ঋণ নিতে সমস্যা হওয়ার কথা জামানতকারীরা জানতে পারার পরই টাকা তুলে নিতে চাইল। এই ব্যাংক বাঁচানর জন্য ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) ১৫ বিলিয়ন পাউন্ডের বেশী অর্থ দিল। ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নর্দান রক জাতীয়করণ করা হয়। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড লেন দেন সচল রাখার জন্য অর্থ বাজারে আরও ১০ বিলিয়ন পাউন্ড ছাড়ল। ফেডারেল রিজার্ভ আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর পর পর দুই মাসে সুদের হার কমাল। অক্টোবর মাসে নামকরা সুইস financial services প্রতিষ্ঠান UBS জানাল তাদের সিডিও (CDO) বিনিয়োগে প্রায় সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার লোকসান হয়েছে- ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদত্যাগ করল। আমেরিকায় সিটি গ্রুপ প্রথমে জানাল তাদের ক্ষতি ৩.৯ বিলিয়ন ডলার, ২০০৮ এর মার্চ পর্যন্ত তাদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াল একটা বিরাট অঙ্ক-৪০ বিলিয়ন ডলার। Merchant Bank মেরিল লিঞ্চ এর ক্ষতির পরিমাণ জানা গেল ৭.৯ বিলিয়ন ডলার। মেরিল লিঞ্চের প্রধান নির্বাহী পদত্যাগ করল। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের মধ্যে যিনি ছিলেন মুক্তবাজারে সরকারী হস্তক্ষেপের সবচাইতে বড় বিরোধী তিনি প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। বুশ পৃথিবীর ইতিহাসে বাজারে সবচাইতে বড় সরকারী হস্তক্ষেপ ঘোষণা করলেন। আমেরিকায় যে সব লক্ষ লক্ষ মানুষের বাড়ী ঋণ এর কিস্তি দিতে না পারার জন্য বাজেয়াপ্ত হতে যাচ্ছিল- তাদের উদ্ধার করার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। এটা ছিল রাশিয়ায় বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকারের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের চাইতেও বড়।[৮] এর কয়েকদিন পরই- আমেরিকার রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ পৃথিবীর আরও পাঁচটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে নিয়ে আলোচনায় বসল। উদ্দেশ্য ছিল আন্তঃব্যাংক টাকার আদান প্রদান যাতে সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়।

২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে নিউইয়র্ক ভিত্তিক কোম্পানী Municipal Bond Insurance Association বা MBIA ঘোষণা করল তাদের সিডিএস (CDS) ভিত্তিক বীমাতে ২.৩ বিলিয়ন ডলার লোকসান হয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভ আবার সুদের হার কমাল। ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াল স্ট্রীটের পঞ্চম বৃহত্তম ব্যাংক বেয়ার ষ্টার্নস (বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ, সিকিউরিটি ব্যবসা ইত্যাদিতে জড়িত) এও ধ্বস নামল। ২০০৭ সালে এর দাম ধরা হয়েছিল ২০ বিলিয়ন ডলার। জে,পি,মর্গান বেজ নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র ২৪০ মিলিয়ন ডলারে এটা কিনে নিল ও সরকার এতে ৩০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য করল। বৃটেনে রয়্যাল ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড ৬ বিলিয়ন পাউন্ড সিডিও (CDO) তে ক্ষতির কথা স্বীকার করল। দেওলিয়া হয়ে যাওয়া এড়ানর জন্য শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে ১২ বিলিয়ন পাউন্ড তোলার চেষ্টা শুরু করল। এই সময় বৃটেন, স্পেন ও আয়ারল্যান্ডে বাড়ীর দাম পড়তে শুরু করল। বাড়ীর দাম কমে যাওয়ার সাথে সাথে ঋণ নিয়ে বাড়ী যারা কিনেছিল তাদের অনেকেই ঋণ এর কিস্তি দিতে না পারায় বাড়ী বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকল। মে মাসে সুইস ব্যাংক UBS আরো ৩৭ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি স্বীকার করল। জুলাই মাসে আমেরিকার সরকার ফ্যানী মে ও ফ্রেডি ম্যাক নামে দুটো সবচাইতে বড় বাড়ী কেনার জন্য ঋণ দেওয়ার প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ আকারের অর্থ সাহায্য দেওয়া শুরু করল। এটা দুই ভাবে হলঃ কিছুটা টাকায় দেওয়া হল আর কিছুটা ঋণ নিশ্চয়তা (loan guarantee) আকারে। মোট পরিমাণ হল ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। সারা বিশ্বের বার্ষিক জিডিপি'র (GDP) এক দশমাংশ ছিল এটা । আগষ্ট মাসে আমেরিকা, বৃটেন, আয়ারল্যান্ড ও স্পেনে বাড়ীর দাম আরও কমে যেতে লাগল। সেপ্টেম্র মাসে লন্ডনের স্টক মার্কেটে ধ্বস নামল। আমেরিকার সবচাইতে গৃহ ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠান ফ্যানী মে ও ফ্রেডি ম্যাককে জাতীয়করণ করা হল। এই সেপ্টেম্বর মাসে

ওয়াল স্ট্রীটের চতুর্থ বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান লেম্যান ব্রাদার্স পূর্ববর্তী তিন মাসে প্রায় চার বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে স্বীকার করল। যদিও লেম্যান ব্রাদার্স আশা করেছিল বেয়ার ষ্টার্নস কোম্পানীর মত তাদের সংকট উত্তরণে সরকারী অর্থ সাহায্য আসবে-কিন্তু তা হল না। লেম্যান ব্রাদার্স শেষ পর্যন্ত দেওলিয়া ঘোষণা করল। এর থেকেই শুরু হল অর্থ বাজারের বিপদজনক ধ্বস। লেম্যান ব্রাদার্স ছিল সিডিও (CDO) তৈরীর অন্যতম বড় প্রতিষ্ঠান। লেম্যানের পতনে সাথে সাথে জামানতকারী, বিনিয়োগকারীরা ভয় পেয়ে টাকা তুলে নেওয়া শুরু করল (run on money market funds)।

এই সময় মেরিল লিঞ্চ কোম্পানীও একই সমস্যায় পড়ল। আমেরিকার ট্রেজারী সেক্রেটারী হেনরী পলসন ও ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান বেন বার্নাঙ্কর চাপে পড়ে ব্যাংক অফ আমেরিকা ৫০ বিলিয়ন ডলারে এই কোম্পানী কিনে নিল। সরকার এই কেনার ব্যাপারে বড় অঙ্কের সহায়তা দিয়েছিল।[৯] লেম্যান ব্রাদার্স দেওলিয়া হয়ে যাওয়ায় যে ভীতি অর্থ বাজারে ছড়িয়ে পড়েছিল তা মেরিল লিঞ্চ কোম্পানী পড়ে গেলে আরও বাড়বে এটা আমেরিকা সরকারের আশংকা ছিল।[১০] কিন্তু এটা ধ্বসের প্রবাহ বন্ধ করতে পারল না। লেম্যান ব্রাদার্স যে সব সিডিও (CDO) বাজারে ছেড়ে ছিল তা আমেরিকা ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিনিয়োগকারীরা কিনেছিল, এর একটা বড় অংশ ক্ষতির বিপরীতে বীমা (CDS) করেছিল AIG- American International Group। সিডিও (CDO) গুলোর দাম পড়ে যাওয়া ও লেম্যান ব্রাদার্সের দেওলিয়া হয়ে যাওয়ায় এই বীমার টাকা AIG দিতে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল। মার্কিন সরকার প্রথমে ৮৫ বিলিয়ন ডলার ও পরবর্তী তে আরও অর্থ দিয়ে (সর্বমোট ১৪৩ বিলিয়ন ডলার) এই কোম্পানীকে রক্ষা করল। আমেরিকার ইতিহাসে কোন বেসরকারী কোম্পানীকে রক্ষা করা জন্য এটাই ছিল মার্কিন সরকারের সবচাইতে বড় অঙ্কের সাহায্য।[১১] এতেও প্রবাহ থামেনি। Washington Mutual নামে আমেরিকার ৩০৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সেপ্টেম্বর মাসেই দেওলিয়া হয়ে গেল। এর ধ্বংসাবশেষ জে,পি,মরগ্যান বেজ কিনে নিল। এদিকে লন্ডনে দেশের সবচাইতে বড় গৃহ ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান HBOS ধ্বসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বৃটেন সরকার ১২ বিলিয়ন পাউন্ডে লয়েডস টি এস বি ব্যাংককে এটা কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করল। এই মাসেই ধ্বসের মুখে বৃটিশ সরকার ব্রাডফোর্ড এন্ড বিঙ্গলী ব্যাংককে ৫০ বিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে জাতীয়করণ করল। আইসল্যান্ড তার তিন ব্যাংকের একটিকে জাতীয়করণ করল এই সেপ্টেম্বরেই। Fortis নামে ইউরোপের একটা বিরাট ব্যাংকও একই কারণে জাতীয়করণ করা হল ২৮শে সেপ্টেম্বর। আয়ারল্যান্ডের ব্যাংকগুলি তাদের কেনা মর্টগেজ বন্ড ইত্যাদির দাম পড়ে যাওয়ায় দেওলিয়া হয়ে যাওয়ার অবস্থায় এসে গেল। আয়ারল্যান্ডের সরকার সে দেশের সব ব্যাংকের সব বন্ডের দাম শোধ দেওয়ার নিশ্চয়তা ঘোষণা করল। একদিনেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বৎসর গুলোতে আয়ারল্যান্ডের যে অগ্রগতি হয়েছিল তা মুছে গেল। এর ফলশ্রুতিতে ২০১০ সালের ডিসেম্বরে আয়ারল্যান্ডের সরকার দেওলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ২৯ শে সেপ্টেম্বর বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও লুক্সেমবার্গ সম্মিলিতভাবে ৬.৪ বিলিয়ন ইউরো দিয়ে Dexia নামে একটি ব্যাংককে রক্ষা করল। ২৮শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার ট্রেজারী সেক্রেটারী (অর্থমন্ত্রী) কংগ্রেসে financial sector কে সাহায্য করার জন্য ৭০০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করার প্রস্তাব পেশ করেন। এটা ট্রেজারী সেক্রেটারী পলসন এর নামে "পলসন প্ল্যান" নামে পরিচিত। কার্যত এই টাকা ট্রেজারী সেক্রেটারী এই খাতে যে সমস্ত বেসরকারী বা ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ করার জন্য তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন। ৩০শে সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস উম্মার সঙ্গে এই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। এই সংবাদে নিউ ইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জে বিরাট পতন ঘটে ও পৃথিবীর অর্থবাজার আরও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। সিডিএসের (CDS) মূল্য বাড়তে থাকে। ব্যাংকগুলোর স্বল্পমেয়াদী ঋণ পাওয়ার সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়। পলসন তার প্রস্তাব পরিবর্তন করে এতে কিছুটা অর্থব্যয়ের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করেন। যারা প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্য তাঁদের অঞ্চলভিত্তিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থাও করা হয়। কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে সভায় ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান বেন বার্নাঙ্ক বলেন "আমরা যদি এই প্রস্তাব অনুমোদন না করি তবে কয়েকদিন পর, সোমবার ৬ই অক্টোবর ২০০৮ এর পর হয়ত কোন অর্থনীতিই থাকবে না"। অক্টোবর মাসের তিন তারিখে কংগ্রেস এই Bail-out package অনুমোদন করে। এর তিনদিন পর জার্মান সরকার ৫০ বিলিয়ন ইউরো দিল হাইপো রিয়েল এষ্টেট নামে এক জার্মান ব্যাংক রক্ষা করার জন্য। আইসল্যান্ড সরকার দেশের তিনটি ব্যাংকই জাতীয়করণ করল। এই ব্যাংকগুলোতে আইসল্যান্ডের বাইরের বিশেষ করে বৃটেন ও হল্যান্ডের অনেকে জামানত রেখেছিল, এর মধ্যে বৃটেনের অনেক স্থানীয় সরকারের তহবিলও ছিল। ফলে এর প্রভাব আইসল্যান্ডের বাইরেও পড়ল। ১০ই অক্টোবর বৃটিশ সরকার ৫০ বিলিয়ন পাউন্ড অর্থবাজারে (financial market) ছাড়ল এবং আরও ২০০ বিলিয়ন ডলার স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য দিল। আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, কানাডা,

সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক- সবাই সুদের হার কমাল। ১৩ই অক্টোবর বৃটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিল বিরাট অর্থ সাহায্যের পরও সে দেশের ব্যাংকগুলো স্থিতিশীল নয়। ৩৭ বিলিয়ন পাউন্ডের আর একটি টাকার পাহাড় দেওয়া হল, রয়েল ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড, লয়েডস-টি এসবি ও HBOS ব্যাংককে। আমেরিকার ট্রেজারী ২৫০ বিলিয়ন ডলার খরচ করে বিভিন্ন ব্যাংকের অংশবিশেষ কিনে নিল। প্রেসিডেন্ট বুশ এ সম্পর্কে বললেন "মুক্ত বাজার অর্থনীতি রক্ষা করার জন্য " এর দরকার ছিল। অক্টোবরের শেষে আমেরিকা ও বৃটেনের অর্থনীতি recession এ চলে গেল।

ফেডারেল রিজার্ভ আবার সুদের হার কমিয়ে ১.৫ শতাংশ থেকে ১ শতাংশ করল। ২০০৮ এর নভেম্বর মাসে বৃটেন ও ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবার সুদের হার কমাল। Eurozone স্বীকার করল তাদের অর্থনীতিও recession এ গেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল IMF আইসল্যান্ডকে ২.১ বিলিয়ন ডলার ধার দিল। আমেরিকার সরকার সিটি গ্রুপকে ২০ বিলিয়ন ডলার দিল (সিটি গ্রুপের শেয়ারের দাম কয়েকদিনে ৬২ শতাংশ কমে গিয়েছিল)। ফেডারেল রিজার্ভ আরও ৮০০ বিলিয়ন ডলার বাজারে ছাড়ল। ইউরোপীয় কমিশনের অনুমোদনে ইউরোপের মুদ্রা বাজারে ২০০ বিলিয়ন ইউরো ছাড়া হল। চীনের সরকার অর্থনীতি চাঙ্গা রাখার জন্য ৫৮৬ বিলিয়ন ডলার দুই বছরে খরচ করার সিদ্ধান্ত নিল। এই অর্থ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক কর্মসূচীতে খরচ করার জন্য। ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার জাতীয় ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ ঘোষণা করল আমেরিকার recession শুরু হয়েছিল এক বছর আগেই ২০০৭ এর ডিসেম্বরে। ফ্রান্স ২৬ বিলিয়ন ইউরো সে দেশের ব্যাঙ্কগুলোকে দিল। ইউরোপের ব্যাংকগুলো আবার সুদের হার কমাল। ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমিয়ে প্রায় শূন্যে নিয়ে আসল (০.২৫ শতাংশ)। আমেরিকায় গাড়ী তৈরীর কোম্পানীগুলোকে ১৭.৪ বিলিয়ন ডলার সাহায্য করার ঘোষণা দিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ। এর কয়েকদিনের মধ্যেই আমেরিকার ট্রেজারী জেনারেল মটরস কোম্পানীর finance arm কে উদ্ধার করার জন্য ছয় বিলিয়ন ডলার দিল। ২০০৮ সালের জানুয়ারীর ১ তারিখ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জে ৩১ শতাংশ মূল্য হারিয়েছিল।

২০০৯ সালে বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ শুরু করেন। পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট বুশের পদ্ধতি তিনি অনুসরন করতে থাকেন। জানুয়ারী মাসে তিনি ব্যাংক অফ আমেরিকাকে ২০ বিলিয়ন ডলার দেন। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ৭৮৭ বিলিয়ন ডলার এর গেইথনার- সামার্স প্ল্যান অনুমোদন করেন- এ সম্পর্কে পরে বলা হবে। AIG এই সময় ৬১.৭ বিলিয়ন ক্ষতির কথা ঘোষণা করে-আমেরিকার সরকার এই কোম্পানীকে ৩০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়। মে মাসে ক্রাইসলার কোম্পানী (আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম গাড়ী তৈরীর কোম্পানী) দুরবস্থায় পড়ে। সরকার এই কোম্পানীকে দেওলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য করে এবং এর বেশীরভাগ সম্পত্তি অতি অল্প দামে ইতালীয়ান ফিয়াট কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মে মাসে আমেরিকার ট্রেজারী মুদ্রাবাজারে আরও ৭০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেয়। এই মাসেই ফেডারেল রিজার্ভ বিভিন্ন কোম্পানীর ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার এর খেলাপী ঋণপত্র কেনার ঘোষণা করে। জুন মাসে আমেরিকার সবচাইতে বড় গাড়ী তৈরীর কোম্পানী জেনারেল মটরস কোম্পানী দেওলিয়া হয়ে যায়। এই কোম্পানী জাতীয়করণ করা হয়। যারা এই কোম্পানীকে অর্থ দিয়েছিল তাদের বিনিয়োগের ৯০ শতাংশ বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হয়। সরকার ৫০ বিলিয়ন ডলার দেয় এই কোম্পানীকে।

২০০৯ সালে বৃটেনের জিডিপি (GDP) ১.৫ শতাংশ কমে যায়। বৃটিশ সরকার ২০ বিলিয়ন পাউন্ড দেয় ছোট ব্যবসাগুলিকে সাহায্য করার জন্য। বৃটিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে ১.৫ শতাংশ করে। জার্মানীর চ্যান্সেলর এ্যাঙ্গেলা মার্কেল ব্যবসায় ৫০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেন। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার ২ শতাংশে নামিয়ে আনে। আয়ারল্যান্ডের সরকার অ্যাংলো আইরিশ ব্যাংক জাতীয়করণ করে। আয়ারল্যান্ডের সরকার দেশের সব ব্যাংকের সব ঋণ সরকারী অর্থে শোধ দেওয়ার অঙ্গীকার করে। ফলে আয়ারল্যান্ডের জনগণ যে ঋণভার ঘাড়ে নিতে বাধ্য হয় তা পরবর্তী প্রজন্মকেও বহন করতে হবে। এপ্রিল মাসে লন্ডনে জি ২০ এর সভা হয়। তারা আই এম এফ (IMF) এর মাধ্যমে ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার বিশ্ব মুদ্রাবাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আই এম এফ (IMF) এর হিসাব মতে পৃথিবীব্যাপী সম্পদের মূল্যহ্রাসের পরিমাণ ৪ ট্রিলিয়ন ডলার। এই বৎসর পৃথিবীতে জ্বালানী তৈল ব্যবহারের পরিমাণ ১৯৯৩ সালের পর প্রথমবারের মত কমে যায়। বৃটেনে বেকারত্বের হার ৭.১ শতাংশে পৌঁছে, অর্থাৎ প্রায় ২২ লক্ষ মানুষ কর্ম সংস্থানহীন হয়।

গেইথনার -সামার্স (Geithner- Summers Plan) প্ল্যান

প্রেসিডেন্ট ওবামা ১ ট্রিলিয়ন ডলারের একটি পরিকল্পনা তৈরী করলেন ব্যাংকগুলোকে উদ্ধার করা জন্য। ব্যাংকগুলো তখন মূল্যহীন সিডিও (CDO)র ভারে ডুবে যাচ্ছিল। এই পরিকল্পনা গেইথনার-সামার্স প্ল্যান নামে পরিচিত এবং এটির শুরু ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে । নিয়ম মাফিক কাজ করলে এই সিডিও (CDO) গুলোকে খারাপ বিনিয়োগ চিহ্নিত করে ব্যাংকগুলোর ক্ষতির খাতায় তোলা উচিৎ ছিল। কিন্তু তা করলে ক্ষতির পরিমাণ ব্যাংকগুলোর সম্পদের চাইতে বেশী হত এবং সব ব্যাংককেই দেওলিয়া হতে হত। গেইথনার-সামার্স প্ল্যানের সাহায্যে ব্যাংকগুলি তাদের মূল্যহীন সিডিও (CDO) থেকে সরকারী টাকায় মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করল। ধরা যাক কোন এক ব্যাংক (ক) এর অনেক মূল্যহীন সিডিও (CDO) আছে। এই পরিকল্পনার অধীনে "ক" ইতিপূর্বে সরকারেরই দেওয়া অর্থে একটা Hedge Fund (খ) স্থাপন করল। "খ" তখন "ক" এর সিডিও (CDO) গুলোর জন্য নিলামে নতুন দর প্রস্তাব করল। যেহেতু এই সিডিও (CDO) গুলো মূল্যহীন এ গুলোর জন্য অন্য কারো দর প্রস্তাব করার সম্ভাবনা নাই। যে অর্থ দিয়ে "খ" এই সিডিও (CDO) গুলো কিনল তার একটা ক্ষুদ্র অংশ "খ" নিজে দিল (এটাও আবার আগে সরকারের সাহায্য থেকে পাওয়া)। বাকীটির একটা অংশ দিবে আমেরিকার ট্রেজারী, আর এক অংশ ফেডারেল রিজার্ভ ঋণ দিবে। "খ" যদি এই সিডিও (CDO) লাভে বিক্রি করতে পারে (সম্ভাবনা নাই বললেই চলে) তাহলে ঋণ শোধ দিয়ে বাকীটা তার লাভ। আর যদি বিক্রি করতে না পারে অথবা লোকসান দিয়ে বিক্রি করে তবে ঋণ এর টাকা আর ফেরৎ দিতে হবে না। অর্থাৎ ব্যাংক "ক" এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারী অর্থ দিয়ে তার মূল্যহীন সিডিও (CDO) গুলি থেকে রেহাই পেল।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) তার বিপদগ্রস্ত সদস্য দেশগুলির জন্য একটা ব্যবস্থা করল। এটা প্রথমে (২০১০ সালের মে মাসে) Special Purpose Vehicle (SPV) নামে অভিহিত ছিল- পরে তার নাম হয় European Financial Stability Facility (EFSF)। উদ্দেশ্য ছিল ইইউ (EU) এর পক্ষে ৪৪০ বিলিয়ন ইউরো ধার করা এবং এর থেকে দুর্দশাগ্রস্ত সদস্য দেশ গুলিকে ধার দেওয়া লক্ষণীয় হল এই ধার দেওয়া হবে দেশগুলিকে নয়- দেশগুলির দেওলিয়া হবার উপক্রম ব্যাংকগুলিকে। আর একটা লক্ষণীয় হল যে পদ্ধতিতে এই ঋণ দেওয়ার টাকা যোগাড় করা হল, তা যে সিডিও (CDO) গুলো বিপর্যের সৃষ্টি করেছিল সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেই করা হল । ফলে এগুলোও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। উদাহরণ দিলে এটা পরিষ্কার হবে। ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে আয়ারল্যান্ড দেওলিয়া হওয়ার পর্যায়ে পৌছাল, কারণ সে দেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। আয়ারল্যান্ড ঘোষণা করেছিল যে, ব্যাংকগুলোর দেনার দায়িত্ব আয়ারল্যান্ড নিবে। কিন্তু দেনা এত বাড়ল যে পরিশোধ করা ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। EFSF তখন অর্থ বাজার থেকে আয়ারল্যান্ডকে দেওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করল। এটা করা হল আবার ১৫টি ইইউ (EU) দেশের (গ্রীস বাদে-এই সময়ের আগে গ্রীস অর্থ বাজার থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল) নিশ্চয়তার (garanttee) ভিত্তিতে এবং দেশগুলির জিডিপি'র অনুপাতে। এই অর্থ তখন প্রতিটি দেশের ভাগে বিভক্ত করা হল-একভাগ ফ্রান্স নিশ্চয়তা দিবে, আর এক ভাগ জার্মানী ইত্যাদি। যেহেতু দেশগুলোর আর্থিক ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতার তারতম্য ছিল-তাই প্রতিটি দেশের ভাগের সুদের হার সেই দেশের বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিতে ধার্য করা হয়। এরপর এগুলো বিক্রি করা হয়-ক্রেতা এশিয়ার বিনিয়োগকারীরা অথবা ইউরোপের দেওলিয়া হতে বাকী আছে এমন ব্যাঙ্ক। এতে যে সমস্ত দেশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তাদেরই ঋণ এর সুদের হার হয় বেশী। তার ফলে তাদের শোধ দিতে পারার ক্ষমতাও কমে। ফটকাবাজরা দূর্বল দেশগুলোর ঋণ খেলাপী হওয়ার সম্ভাবনার উপর বাজী ধরে সিডিএস (CDS) কিনতে পারে। এতে সুদের হার আরও বাড়বে। ফলে দুর্বল দেশগুলোর খেলাপী হওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়ে। খেলাপী হয়ে গেলে বাকী দেশগুলোর আবার নতুনভাবে বাজার থেকে এই দ্বিতীয় দেওলিয়া দেশের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হতে পারে। এইভাবে ঝুঁকি ও সুদের হার বাড়তে থাকার সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার কারণে EFSF-৪৪০ বিলিয়ন ইউরো তহবিল সংগ্রহ করলেও এর মধ্যে ২৫০ বিলিয়ন ইউরো ঋণ বিতরণ করতে পারবে। বাকীটা রেখে দিতে হবে এই সম্ভাবনায় যে, আগে বর্ণিত উপায়ে দুর্বল দেশগুলো ঋণ খেলাপী হলে যেন EFSF এর শোধ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে । এটা ঋণ দেওয়ার অত্যন্ত কম কার্যকর উপায়।[১২] এছাড়া এই পদ্ধতি ঋণ শোধ দিতে পারা না পারার উপর বাজী ধরার যে ব্যবস্থা সিডিএস (CDS), তাকেই আবার কার্যকর করে তুলল। ব্যাংকগুলো ও Hedge fund গুলো এই ঋণগুলির সিডিএস (CDS) সৃষ্টি করে যে কেনা বেচার ব্যবস্থা করল এটা ২০০৮ সালের recession এর আগের মতই Private money সৃষ্টি করল। EFSF ও এই সিডিএস গুলো এই ধরনের Private money র যে বিপুল প্রবাহ সৃষ্টি করল তা আগের মতই অস্থিতিশীল।

গেইথনার- সামার্স প্ল্যান অর্থবাজার বা money market এবং শেয়ার, স্টক ও derivatives এর বাজার ওয়াল স্ট্রীটের বেসরকারী (private) অর্থ তৈরীর যে ব্যবস্থা করেছিল তাকে ধ্বংসের মুখ থেকে উদ্ধার করল। সরকারী অর্থ দিয়ে একে আবার একই রকম বিষাক্ত (toxic) বেসরকারী অর্থ তৈরী করে লাভ করার পথ করে দিল। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই ওবামা প্রশাসন পূরনো derivatives (যে গুলো প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল) সেগুলো সরকারী অর্থে ব্যাংকগুলোকে তাদের হিসাবের খাতা থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করে দিল। এ গুলোর জায়গায় একই ধরনের নূতন derivatives তৈরী করল ব্যাংকগুলি (সরকারী অর্থের সাহয্যেই)। ইউরোপের দেশগুলিও এই পথ অনুসরণ করে EFSF এর মাধ্যমে ঋণপত্র ছেড়ে ব্যাংকগুলোকে বাঁচানর ব্যবস্থা করল। ওয়াল স্ট্রীটের ব্যাংকগুলো সরকারী সাহায্যে তাদের হিসাবের খাতা থেকে মূল্যহীন derivatives মুছে ফেলার পর কিছু অর্থ সরকারকে ফেরৎ দিল। কিন্তু সরকার তাদের যে অর্থ সাহায্য দিয়েছিল তারা ফেরৎ দিল তার একটা ক্ষুদ্র অংশ। অর্থ সাহায্যের একটা বড় অংশ ছিল ঋণ-গ্যারান্টি, এর পরিমাণ প্রকাশ করা হয় নি, এটা ফেরৎও নেওয়া হয়নি। গেইথনার- সামার্স প্ল্যানের বিরাট অংকের অর্থও ফেরৎ দেওয়া হয় নি এছাড়াও ফেডারেল রিজার্ভ ওয়াল স্ট্রীটের ব্যাংকগুলির বিলিয়ন- বিলিয়ন ডলারের শেয়ার ও অন্যান্য সম্পদ কিনে নিয়েছিল (তাদের মূল্য যাতে পড়ে না যায় সে জন্য) তার পরিমাণও বলা হচ্ছে না।

১৯২৯ সালের মহামন্দা শুরু হওয়ার তিন বৎসর পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ফ্রাংকলিন ডিলানো রুজভেল্ট। তখন ব্যাংকিং খাতে ধ্বস চলছিল। রুজভেল্ট প্রশাসন তখন ব্যাংক গুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নতুন নীতিমালা প্রণয়ণ করল। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কতকগুলি কর্মসূচী নিল। তখন ব্যাংক মালিক, পুঁজিপতিরা প্রশাসনের দৃঢ়তার সামনে কোন বিরোধিতা করার সাহস পায় নি (যদিও তারা সব সময়ই তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এমন সরকারী খবরদারীর বিপক্ষে থাকে)। ২০০৮ এর অর্থনৈতিক recession এর তিন বছর পর চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন পুঁজিপতি ও ব্যাংক মালিকেরা ধ্বংসের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল তখন সরকার তাদের কর্মকান্ড, যা ছিল সঠিক অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর ও জনস্বার্থবিরোধী, তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন ও নীতিমালা প্রণয়ণ করতে পারত। তা না করে, কোন শর্ত না দিয়ে, সরকার ব্যাংক ও অর্থ খাতকে বিপুল পরিমাণ টাকা ও সমর্থন দিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করল। সরকারের সাহায্যেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এই খাত আবার শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়াল। দেওলিয়া ব্যাংকগুলোকে রক্ষা করে রাষ্ট্র তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষমতা হারাল। গেইথনার-সামার্স প্ল্যান ব্যাংকগুলোকে আবার সরকারকে ভয় দেখানর শক্তি দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারা ওবামার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমর্থন দেওয়া শুরু করল, যারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও নমনীয় করার অঙ্গীকার করছিল। ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে তাদের আরও সুবিধা হল। সুপ্রীমকোর্ট ১৯০৭ সালের Tillman Act রহিত করল। প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট সে সময় কর্পোরেশনগুলো যেন টাকা দিয়ে রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে না পারে সে জন্য এটা করেছিলেন। এটা রহিত করার ফলে কর্পোরেশনের ম্যানেজাররা কারো মতামত না নিয়ে তাদের স্বার্থরক্ষা করবে এমন রাজনীতিকদের অর্থ দেওয়ার ক্ষমতা পেল। প্রেসিডেন্ট ওবামা পল ভোলকারকে অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণের নতুন আইন প্রনয়ণের দায়িত্ব দিলেন। পল ভোলকার তখন Economic Recovery Advisory Board এর প্রধান হিসাবে নতুন নিযুক্ত হয়েছেন। এই নতুন আইন ব্যাংকগুলোকে derivatives ও অন্যান্য "উদ্ভাবন" এর ব্যবসা করতে দিত না। ভোলকার এর প্রস্তাবনা ছিল ব্যাংকগুলো মানুষের জামানত নেয় এবং তা রাষ্ট্র গ্যারান্টি দেয়। এই অর্থ নিয়ে তাদের ফাটকাবাজী করতে দেওয়া উচিৎ নয়।

কিন্তু ব্যাংকগুলো ততদিনে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে তারা প্রভাব খাটিয়ে এই আইন পাশ করতে দেয় নি। ২০০৮ সালের recession এর পর যে সব রাজনীতিবিদের সততার অভাব ছিল, তারা ব্যাংকগুলোর অর্থের মদদে পুষ্ট হয়ে নীতি নির্ধারণে মূল ভূমিকা দখল করে নিল। ব্যাংকগুলো সরকারের অর্থে নূতন জীবন পেল। আবার সেই অর্থেই রাজনীতিবিদদের প্রভাবিত করল। এই রাজনীতিবিদরা ব্যাংক গুলোকে নতুন কাগুজে বিষাক্ত derivatives তৈরী করে ফাটকাবাজী করার স্বাধীনতা দিল। কার্যতঃ সরকার এইসব ধ্বংসপ্রাপ্ত (এবং সরকারী সাহায্যে পুণরুজ্জীবিত) ব্যাংকগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করল। আমেরিকা এবং ইউরোপ দুই স্থানেই ব্যাংকগুলোর স্বার্থেই নীতি নির্ধারণ হতে থাকল।

২০০৮ সালের ধ্বসের আগেই আমেরিকার শ্রমিকদের গড় বেতন ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিকের চাইতে কম ছিল। তারা আগের চাইতে বেশী সময় কাজ করছিল এবং তাদের মাথাপিছু উৎপাদনও বেড়েছিল। ধ্বসের পর প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক বেকার হল। ২০০৮ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রতি তিন মাসে ২৫০,০০০ পরিবারকে ঋণ পরিশোধ করতে

না পারার জন্য বাড়ী ছেড়ে দিতে হচ্ছিল।[১৩] ২০১২ সালে প্রায় ৫ কোটি মানুষ আমেরিকায় যথেষ্ট খাদ্য পাচ্ছিল না। অথচ ব্যাংক ও অর্থব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক ও মালিকেরা, যাদের ফাটকাবাজীর জন্য অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি হল, তারা রাষ্ট্রীয় খাত থেকে প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন ডলার এর সমান সুবিধা পেল।[১৪] সুবিধাভোগীদের মধ্যে ব্যাংক ও financial institution ছাড়াও ছিল জ্বালানী তেল কোম্পানীসমূহ ও অস্ত্র তৈরীর সঙ্গে যুক্ত শিল্পকারখানা (যার মধ্যে ছিল ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্প সমূহ)। আমেরিকা ও ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো উৎপাদন করছে তাদের উৎপাদন ক্ষমতার চাইতে কম (চাহিদা কম থাকার জন্য)। কিন্তু বেকারত্ব ও ব্যাপক জনসংখ্যার আয় কমে যাওয়ার জন্য চাহিদা নিম্নমুখী। যদিও ওয়াল স্ট্রীটের ব্যাংক ও ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে- তারা আগের মত বেসরকারী অর্থ প্রবাহ সৃষ্টি করে আবার পণ্যদ্রব্যের ও বিনিয়োগের ফানুস তৈরী করতে পারছে না। কিন্তু আমেরিকায় পণ্যদ্রব্য ও বিনিয়োগের চাহিদা বিরাটভাবে না বাড়লে চীন, জাপান ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি (যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান) এবং জার্মানীর অর্থনীতির গতি আগের পর্যায়ে ফিরে যাবে না।

জাপান অস্তগামী সূর্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানের পুনর্গঠনের কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৫০ সাল নাগাদ জাপান হাল্কা শিল্পদ্রব্য রপ্তানী করা শুরু করেছিল। এই সময় জাপান ভারী শিল্প দ্রব্য আমদানী করত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানী করত। কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপান ভারী শিল্পদ্রব্য তৈরী করা শুরু করল। যুদ্ধোত্তর সময়ে জাপানে শ্রমজীবী মানুষের বেতন ক্রমেই বাড়ছিল- কিন্তু এই বৃদ্ধি ছিল উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চাইতে কম। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে আয় বাড়ছিল তার একটা অংশ বর্ধিত বেতন হিসাবে শ্রমিকদের দেওয়া হত। কিন্তু আর একটা অংশ জাপান সরকার ব্যয় করত ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পখাতের অবকাঠামো, যেমন রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্মাণের জন্য, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য। বড় আকারের পুঁজি বিনিয়োগ চলতে থাকায় উৎপাদন বাড়তে থাকে। উৎপাদন ছিল অল্প কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে। এদের বলা হত কাইরেৎসু (Keiretsu) যেমন-সুমিতোমো, মিৎসুবিশী, মিৎসুই ইত্যাদি। প্রতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল একটি বড় ব্যাংক ও অনেক ছোট এবং মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের কাজ ছিল প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করা, আর ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ ছিল যন্ত্রাংশ বা আধা তৈরী শিল্পদ্রব্য মূল প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা। পুরো কর্মকান্ড সমন্বয় করত সরকার। এই ব্যবস্থায় শিল্প উৎপাদন দ্রুত বাড়তে থাকে। কিন্তু মজুরী সেই অনুপাতে না বাড়ায় আভ্যন্তরীন চাহিদা বাড়ে নি। ফলে শিল্পদ্রব্য রপ্তানী ছাড়া জাপানের বিকল্প ছিল না। লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক দল ১৯৫৫ সালের পর প্রায় একটানা ২০০৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল (১৯৯৩-৯৪ সালে এগার মাস ছাড়া)। ২০১২ সালে তারা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। প্রায় একদলীয় এই শাসন ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাপানে রপ্তানী নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে আমেরিকা স্বর্ণমাণ (Gold Standared) থেকে ডলারকে সরিয়ে নিয়ে আসলে ডলারের মূল্য কমে যায়। এতে জাপানী শিল্পদ্রব্যের দাম বেড়ে যায় এবং আমেরিকায় বিক্রি কমে যায়। জাপান নতুন কৌশল নেয়। ভারী শিল্প দ্রব্যের বদলে এমন পণ্য তৈরী করতে থাকে যে গুলোর দাম বেশী কিন্তু উৎপাদনে কম বিদ্যুত লাগে যেমন- ইলেকট্রনিক্স, শিল্পে ব্যবহৃত রোবট, Integrated circuit ইত্যাদি। এছাড়া জাপানী কোম্পানীগুলো সরাসরি আমেরিকার শিল্প কারখানা গড়ে তুলে সেখানেই উৎপাদন করতে থাকে। এতে তারা আমেরিকার বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। লভ্যাংশ জাপানে ফেরৎ না নিয়ে তারা পুনরায় আমেরিকায় বিনিয়োগ করতে থাকে অথবা আমেরিকার সরকারী বন্ড কিনতে থাকে। এতে আমেরিকাও জাপানকে তার আভ্যন্তরীন বাজারে পণ্য বিক্রির সুযোগ দেয়। কিন্তু এর ফলে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি ও ঋণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। আমেরিকার বাজার ক্রমেই জাপান ও জার্মানী দখল করতে থাকে। এর থেকে উত্তরণের জন্য আমেরিকা জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেনের সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৮৫ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর Plaza Accord নামে চুক্তি করে। এই চুক্তির ফলে আমেরিকার মুদ্রা ডলারের মূল্য হ্রাস হয়। উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার আমদানী কমান ও রপ্তানী বাড়ান। ডলারের দাম কমায় জাপানে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এরপর থেকে জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমাগত কমতে থাকে। পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ ব্যাংকগুলোর উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণকে এজন্য দায়ী করে । কিন্তু বাস্তবে সরকারী নিয়ন্ত্রনে ব্যাংকগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনিয়োগ করা জাপানের যুদ্ধ পরবর্তী আশ্চর্যজনক শিল্পোন্নয়নের অন্যতম কারণ। সরকার ব্যাংকগুলোকে finance বা অর্থব্যবসায় যেতে না দিয়ে তাদের মূলধন কোম্পানীগুলো এবং তাদের সঙ্গে জড়িত

মাঝারি ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোতে পণ্য উৎপাদনে সমর্থন দিয়েছে। ১৯৮৫ সালের পর জাপানী ইয়েনের মূল্যমান বৃদ্ধির ফলে জাপানের অর্থনীতি বড় ধরনের মন্দায় পড়ে এবং এটা চলতে থাকে। মূল্যমান বৃদ্ধির ফলে আমেরিকায় জাপানের পণ্য রপ্তানী কমে যায়। বিনিয়োগ বজায় রাখার জন্য ব্যাংক অফ জাপান কাইরেৎসুগুলোকে অনেক টাকা দেয়। কাইরেৎসুগুলো পুরো টাকা উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারল না, কারণ উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে গিয়েছিল। এই টাকার একটা অংশ তারা স্থাবর সম্পত্তি (ঘর বাড়ী, জায়গা জমি) কিনতে খরচ করল। ফলশ্রুতিতে স্থাবর সম্পত্তির দাম অস্বাভাবিক বাড়তে থাকল। নব্বই এর দশকের প্রথম থেকে এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কর্তৃপক্ষ সুদের হার বাড়িয়ে দিল। স্থাবর সম্পত্তির দাম হঠাৎ অনেক কমে গেল। প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক ঋণ নিয়ে স্থাবর সম্পত্তি কিনেছিল, কাজেই দাম পড়ার পর ব্যাংক গুলো বিরাট অংকের অপরিশোধিত ঋণের বোঝা নিতে বাধ্য হল। সরকার আরও অর্থ দিয়ে তাদের উদ্ধার না করলে ব্যাংকগুলো এই ঋণের জন্য দেওলিয়া হয়ে যেত। এই অতিরিক্ত অর্থ অপরিশোধিত ঋণের শূন্যস্থান পূরণ করায় সেটাও বিনিয়োগে কাজে লাগে নি। জাপান সুদের হার কমিয়ে প্রায় শূন্যের কাছে নিয়ে আসল বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে। কিন্তু ফল হল, জাপানের অর্থ বেশী সুদের জন্য আমেরিকায় পাঠান হতে শুরু হল (Carry trade)। জাপান সরকারের আমেরিকার সরকারের বাণিজ্য ও বাজেট ঘাটতি পূরণ করার জন্য সরকারী বন্ড কেনা, জাপানী কোম্পানী গুলোর আমেরিকায় প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সঙ্গে এই Carry trade যোগ হল। ২০০৮ সালে আমেরিকা ও ইউরোপে অর্থনৈতিক recession এর পর তাদের অবস্থা হল জাপানের মত। ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে খেলাপী ঋণ দেওয়ার জন্য শাস্তি না দেওয়ায় জাপানের যে সমালোচনা আমেরিকা ও ইউরোপ করছিল এখন তারাই আবার তাদের নিজেদের ব্যাংকগুলোকে রক্ষা করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। পার্থক্য হল এই যে, জাপানের ব্যাংকগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা কম, আর আমেরিকা ও ইউরোপের ব্যাংকগুলো যেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেল, তখনই তারা বিভিন্নভাবে সরকারকে তাদের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করার মত অবস্থায় নিয়ে আসল।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিঃ আহত ব্যাঘ্রমন্ডলী

কোরিয়ার যুদ্ধ এবং তারপর ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি (তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া) জাপানের সাহায্যে শিল্পোন্নয়ন করে। এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। জাপান পুঁজি, ভারী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এই দেশগুলিতে পাঠাত, কিন্তু তাদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য যেত আমেরিকায় ও ইউরোপে। জাপানের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য ঘাটতি থাকত কিন্তু সেটা তারা পূরণ করত আমেরিকায় পণ্যদ্রব্য রপ্তানী থেকে প্রাপ্ত অর্থে। ১৯৮৫ সালে Plaza Accord এর পর ডলারের তুলনায় ইয়েনের মূল্যবৃদ্ধির জন্য জাপানে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে যায় এবং আমেরিকায় জাপানের পণ্য রপ্তানী কমে যায়। জাপানের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি (কাইরেৎসু) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কম দামে উৎপাদন করার জন্য সেখানে অবকাঠামো ও শিল্প কারখানা গড়ে তোলা শুরু করল যা প্রায় দশ বছরের বেশী সময় ধরে চলে। আমেরিকার সরকার, আইএমএফ (IMF) ও বিশ্ব ব্যাংক এই দেশগুলোর উপর চাপ দেয় জাপানকে সহযোগিতা করার জন্য। তাদের পুঁজিবাজার উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য করে। এতে জাপানের যেমন সুবিধা হল আবার আমেরিকার পুঁজিপতিরাও এই উঠতি পুঁজিবাজারগুলোতে বর্ধিত হারে বিনিয়োগ করে লাভ করার সুযোগ পেল। বাড়তি এই পুঁজিবাজারগুলোতে লাভের মাত্রা বেশী ছিল। এই চাপে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল এই দেশগুলি। Bank of International Settlement এর অনুসারে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোট ১৮৪ বিলিয়ন ডলার এশিয়ার এই দেশগুলিতে এসেছিল। সংকট শুরু হওয়ায় ১৯৯৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ১০২ বিলিয়ন ডলার আবার চলে গিয়েছিল। বিদেশী পুঁজি এত বেশী আসতে থাকল যার সবটা শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ করা গেল না। স্থাবর সম্পত্তি (দালান কোঠা, জায়গা জমি) ও শেয়ার কিনতে বাড়তি টাকা ব্যবহার হল। স্থাবর সম্পত্তি ও শেয়ারের দাম বাড়তেই থাকল। নব্বই এর দশকের শেষের দিকে শেয়ার বাজার ও স্থাবর সম্পত্তির এই বুদ্বুদ (bubble) ফাটল। এর কয়েকটি কারণ ছিল। ১৯৯০ এর দশকে আমেরিকার অর্থনীতি recession থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। সেই সময় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে দিল। ফলে আমেরিকায় টাকার বিনিয়োগ লাভজনক হয়ে দাঁড়াল। এই সময়ে চীন ও জাপানের মুদ্রার দাম ডলারের তুলনায় কমান হল। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মুদ্রা ডলারের দামের সঙ্গে বাঁধা ছিল। ফলে পণ্যদ্রব্যের দাম তাদের চাইতে চীন ও জাপানের কম হওয়াতে তাদের রপ্তানীও কমে গেল।[১৫] ব্যাপক হারে এই দেশগুলি থেকে ডলার চলে গেল। তাদের মুদ্রামান অবমূল্যায়ন করা হল। অনেক ব্যবসা দেওলিয়া হয়ে গেল। তাদের চাঙ্গা অর্থনীতির অনেকগুলো অংশ বন্ধ হয়ে গেল। স্থাবর সম্পত্তির ব্যবসায় ধ্বস নামল।

বেকারত্ব বাড়ল বিশালভাবে। সামাজিক অসন্তোষ ও আন্দোলন দেখা দিল। তার ফলে ইন্দোনেশিয়ার একনায়ক সুহার্তোর পতন ঘটল। থাইল্যান্ডের সামরিক শাসকেরও পতন ঘটল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থা (IMF) ও পশ্চিমা দেশগুলি এই বিপর্যয়ের জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকেই দায়ী করল। তাদের ব্যাংক ও শেয়ার বাজার ব্যবস্থাপনা, স্থাবর সম্পত্তির ফাটকাবাজি ইত্যাদি বলা হল। কিন্তু তাদের সুপারিশেই যে এই দেশগুলি তাদের মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেছিল, সে কথা উল্লেখ করল না। আন্তর্জাতিক পুঁজির আচরণ সম্বন্ধেও কিছু বলল না। অথচ মাত্র কয়েক মাস আগে পশ্চিমা দেশগুলি এবং বিশ্ব ব্যাংক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উন্নতি ও তাদের নীতির প্রশংসা করেছিল ও অন্যান্য দেশকে অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছিল। ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংক এই দেশগুলির উন্নতি বর্ণনার জন্য "পূর্ব এশিয়ার অসামান্য দৃষ্টান্ত" (East Asian Miracle) এই প্রশংসামূলক নাম ব্যবহার করেছিল।

এই দেশগুলির প্রায় সবগুলিই আর্থিক সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আইএমএফের (IMF) দ্বারস্থ হল। আইএমএফ তাদের উপর ঋণের বিনিময়ে কৃচ্ছ্রতাসাধনের এক কর্মসূচী চাপিয়ে দিল। এর নাম Structural Adjustment Policies। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সুদের হার বাড়ান হল, ব্যাংকের ঋণ দেওয়া কমান হল, সরকারী খরচ কমিয়ে দেওয়া হল, অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে দেওয়া হল। এতে মানুষের দুর্দশা আরও বাড়ল, আরও ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল, আরও মানুষ বেকার হয়ে পড়ল। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এটা করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্য নিয়ে যেন সরকারের খরচ কমে, আমদানীও কমে- ফলে যে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচান গেল তাই দিয়ে বিদেশী ব্যাংক গুলির ঋণ শোধ করা যাবে- এতে মানুষের যতই কষ্ট বাড়ুক। অথচ প্রায় একই সময়ে জাপানও অর্থনৈতিক মন্দায় ছিল এবং তাদের সুদের হার তখন পৃথিবীতে নিম্নতম ছিল (০.৫ শতাংশ)-কিন্তু জাপানের সুদের হার বাড়ানর কথা বলা হয় নি। আমেরিকায় ১৯৮৭ সালে শেয়ার বাজার এ ধ্বসের পর অর্থ সরবরাহ বজায় রাখার জন্য সুদের হার কম রাখা হয়েছিল। সরকারী ব্যয় বাড়ান হয়েছিল। একই পদ্ধতি আমেরিকা ২০০১ ও অর্থনৈতিক মন্দার পর এবং ২০০৯ এ বিশ্ব মন্দার সময়ও গ্রহণ করেছিল। এতে আইএমএফ (IMF) কোন আপত্তি জানায় নি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আইএমএফ (IMF) এর এই কার্যক্রমের সমালোচকদের মধ্যে রয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক মার্টিন ফেল্ডষ্টাইন (যিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অর্থ উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান ছিলেন) এবং জেফরী স্যাকস। আরও ছিলেন ব্রাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রবার্ট ওয়েড।

১৯৯৭ সাল থেকে এক বছরের মধ্যে মোট জাতীয় আয় কমল ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ৮৩ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ৪০ শতাংশ, ফিলিপাইনের ৩৭ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ার ৩৪ শতাংশ আর মালয়েশিয়ার ৩৯ শতাংশ। অনেক কৃচ্ছ্রসাধনের পর এই দেশগুলি আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়াল। এ ব্যাপারে মুদ্রার বড় ধরনের অবমূল্যায়ন তাদের সহায়ক হয়েছিল। এরপর থেকে এই দেশগুলোর মনোভাব হল তারা ডলার সঞ্চয় করবে এভাবে যেন তাদের আবার আইএমএফ ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর নির্দেশ মানতে না হয়। কিন্তু এই ডলার তারা আবার আমেরিকায় বিনিয়োগ করল।

এই সময় জাপানের মুদ্রামান বেড়ে গেল। এর একটা বড় কারণ হল-এই সময় আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে সুদের হার ছিল কম। ফলে জাপানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে অর্থ এই সব জায়গায় বিভিন্ন বিনিয়োগে ছিল তা আবার জাপানে ফিরিয়ে আনা শুরু হল। জাপানের মুদ্রামান বাড়ায় তাদের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী কমে গেল। এতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সুবিধা হল কিন্তু জাপানের মন্দা আরও তীব্র হল।[১৬]

জার্মানী- রপ্তানী নির্ভর সমৃদ্ধি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রথম পর্যায়ে (প্রায় দুই দশক) জার্মানীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল রপ্তানীর চমকপ্রদ গতিশীলতা। আগেই আলোচনা করা হয়েছে এটা সম্ভব হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আনুকূল্যে। আমেরিকা যুদ্ধের পর শিল্পোৎপাদন আবার সচল করার জন্য যেমন অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়েছিল, তেমনই উৎপাদিত পণ্যের বাজার তৈরী করে দিয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে এমনকি আমেরিকাতেও। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মহামন্দার কথা মনে রেখেই আমেরিকা তার নিজের অর্থনীতির বাইরেও বলয় সৃষ্টি করতে চাইছিল যেটা মন্দা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে।

জার্মানীর শিল্প উৎপাদনের অবকাঠামো যুদ্ধের পরও অনেকটা অক্ষত ছিল তা বলা হয়েছে। এছাড়া জার্মানীর ছিল দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকশ্রেণী। তারা আমেরিকার উৎপাদন পদ্ধতি সফলভাবে অনুসরণ করতে পেরেছিল, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া জার্মানী শ্রমিকদের মজুরী নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল এবং এটাই ছিল লাভের অংশ বেশী হওয়ার অন্যতম কারণ। ১৯৫১ সাল নাগাদ জার্মানীর উৎপাদন যুদ্ধ পূর্ব ১৯৩৮ সালের ৯৫ ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু শ্রমিক মজুরী ১৯৩৮ সালের তুলনায় ৮০ শতাংশ থাকে।[১৭] যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় মজুরী ছিল যথেষ্ট কম।

নাৎসীদের শাসনকালে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের পর প্রথমদিকে শ্রমিকেরা সংগঠিত হয়ে ওয়াকার্স কাউন্সিল গঠন করে। অনেক জায়গায় তারা মালিকদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও উৎপাদন চালু রাখে। ১৯৪৭-৪৮ সালে যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক কষ্ট ও খাদ্য সংকটের মধ্যে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পূর্ণটা অথবা একটা বড় অংশ সামাজিকীকরণের জন্য আন্দোলন ও ধর্মঘট শুরু করে। কিন্তু খুব দ্রুত দখলকারী কর্তৃপক্ষ (আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স), জার্মান সরকার ও শিল্প মালিকদের যৌথ পদক্ষেপের মাধ্যমে এগুলো দমন করা হয়। যুদ্ধের পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জার্মান পুঁজিপতিদের তাদের স্থাপনা ফিরিয়ে দিয়ে নাৎসী আমলের ব্যবসায়ী সংযোগগুলো আবার পুনরুজ্জীবিত করতে দিল দখলকারী শক্তিগুলো। ১৯৪৭ সালেই আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে স্নায়ু যুদ্ধ (cold war) শুরু করল। এরই অংশ হিসাবে জার্মানী ও জাপানকে অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়ার পূর্ব শর্ত দেওয়া হল মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করার। এটা ছিল পুঁজিপতিদের শক্তি বাড়ানর নিশ্চিত পথ। জার্মান সরকার ও পুঁজিপতিরা দুই বৎসরের মধ্যেই রপ্তানীমুখী শিল্প উৎপাদন শুরু করল- যেখানে শ্রমিক মজুরী কম আর লাভের অংশ বেশী। ব্যবসার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী করার জন্য ১৯৪৮ সালের জুন মাসে মার্কিন ও বৃটিশ অধিকৃত অংশে মুদ্রা সংস্কার করা হল। এর ফলে ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিকদের সম্পত্তির মূল্য সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা হল আর তাদের ঋণ মুছে ফেলা হল। কর ব্যবস্থা পরিবর্তন করে করের মূল অংশ কম আয়ের মানুষদের উপর আরোপ করার ব্যবস্থা করা হল।[১৮] ঋণ ব্যবস্থা সহজ করায় এবং পুঁজিপতিরা সমন্বয় করে পণ্যের দাম বাড়ানর ফলে মুদ্রাস্ফীতি হল। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে মুদ্রা সংকোচন করা হল। বেকারত্বের হার ১৯৪৮ সালে ৪.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৫০ সালে ১২ শতাংশ হয়ে গেল। শ্রমিক সংগঠনগুলোর তহবিল মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়ল। এতে শ্রমিকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রায় শূণ্য হয়ে গেল। শ্রমিকদের সংগ্রামী অংশ এতে কোনঠাসা হয়ে গেল এবং রক্ষণশীল অংশ শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব দখল করে নিল।[১৯] ১৬টি শ্রমিক সংগঠনকে তারা সংগঠিত করে ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে তারা পুঁজিপতিদের স্বার্থে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া সীমিত করে রাখার ব্যবস্থা করল।[২০]

১৯৪৮ সালের মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থনীতিতে প্রথম দিকে স্থবিরতার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে আমেরিকার পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ল এবং অর্থনীতি গতি পেল। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে বিনিয়োগ দ্রুত বাড়ল- প্রতি বছর ১১.১ শতাংশ হারে। পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ৫০এর দশকে বছরে ১০ শতাংশ বাড়ল। বাৎসরিক জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধি এই সময় ছিল ইউরোপে সবচেয়ে বেশী- ৮ শতাংশ। এই দশকে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার ছিল গড়ে ৯০ শতাংশ। শ্রমিক মজুরী অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় কম রাখা সম্ভব হয়েছিল। উৎপাদনে শ্রম বাবদ খরচ এই দশকে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও ইতালীর চাইতে ৬ শতাংশ কমে গিয়েছিল। উৎপাদন মূল্য কম থাকার কারণে পুঁজি বিনিয়োগের হার পঞ্চাশের দশকে যেমন বেশী ছিল, তেমনি রপ্তানীর প্রবৃদ্ধিও ছিল উচ্চ। এই দশকে বাৎসরিক গড় রপ্তানী প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৫ শতাংশ।

পঞ্চাশের দশকে জার্মানীর রপ্তানী বাড়ছিল। সারা পৃথিবীর অর্থনীতির আকার বাড়ছিল, কাজেই রপ্তানীর সুযোগও বাড়ছিল। কিন্তু রপ্তানীর প্রবৃদ্ধি ছিল তার চাইতেও বেশী। ফলে জার্মানী ক্রমেই অন্য দেশের (মূলত আমেরিকা ও বৃটেন) রপ্তানীর অংশ কমিয়ে স্থান করে নিচ্ছিল। রপ্তানী বৃদ্ধির ৪১ শতাংশ ছিল পৃথিবীর চাহিদা বাড়ার জন্য, আর ৫৯ শতাংশ ছিল অন্য দেশের রপ্তানী পণ্যের জায়গা দখল করে নেওয়ার জন্য।[২১] আমেরিকার বাজারে জার্মান পণ্য রপ্তানীও এই সময় বেড়েছিল। মোট জার্মান রপ্তানীর অংশ হিসাবে আমেরিকায় রপ্তানী এই দশকে ৫.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯ শতাংশ হয়। এই চাহিদা বাড়ার কারণ ৫০ এর দশকের প্রথমভাগে ছিল কোরীয় যুদ্ধ। পরবর্তীতে যখনই আমেরিকার অর্থনীতি বাড়ে তখনই জার্মানীর রপ্তানী বাড়ে। এটা ১৯৫৫, ১৯৬০ ও ১৯৬৩ সালে দেখা যায়।[২২] আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ বাবদ খরচও চাহিদা বাড়ার অন্যতম কারণ।

১৯৬০ সাল থেকে অর্থনীতিতে গতি কমে আসে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত গড় বাৎসরিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৮ শতাংশ, যা ১৯৫০ এর দশকে ছিল গড়ে প্রায় ১২ শতাংশ। বিনিয়োগও কমে যায়- গড় বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি ১৯৬০-৬৫ সালে ছিল ৪.১ শতাংশ, যা ১৯৫৫-৬০ সময়কালে ছিল ৮.৪ শতাংশ। পণ্য উৎপাদনে লাভের হার ১৯৫৫ সালের পরই কমা শুরু হয়েছিল। ১৯৫৫-৬০ সময়কালে লাভের হার প্রায় ২০ শতাংশ কমে। ১৯৬০-৬৫ সময়কালে তা আরও ৩০ শতাংশ কমে।[২৩] অর্থনীতির গতি কমে আসার বড় কারণ ছিল-জার্মানীর প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কমে যাওয়া। ১৯৫৫ সাল থেকেই ফ্রান্স, ইতালী ও জাপানের তুলনায় জার্মানীর উৎপাদনের খরচ তুলনামূলকভাবে বাড়া শুরু হয়। এতে জার্মানীর রপ্তানীর অংশ অন্য দেশের তুলনায় কমতে থাকে। ১৯৬০-৬৫ সময়কালে জার্মানীর রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার ছিল বছরে গড়ে ৬.১ শতাংশ, যা ১৯৫০-৫৫ সময়কালে ছিল ১৫.২ শতাংশ আর ১৯৫৫-৬০ সময়কালে ছিল ১১.৮ শতাংশ। লাভের হার কমে যাওয়ার আর একটি কারণ ছিল রপ্তানীমুখী অর্থনীতি। এতে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বাড়তে থাকে, চাহিদা কমিয়ে রাখা হয়, মুদ্রা সরবরাহ বাড়ে। ফলে ১৯৬১ সালে মার্কের মুদ্রামান বাড়ান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এতে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কমে পরবর্তী কয়েক বৎসরের জন্য মার্কের মুদ্রামান বাড়ানর চাপ কম থাকে। কিন্তু উৎপাদনের লাভের অংশও কমতে থাকে। ১৯৫০ এর দশকের শেষভাগে ও ১৯৬০ এর দশকে এই পরিবর্তনগুলো ছিল জার্মান অর্থনীতিতে বিবর্তনের একটা পর্যায়। এই সময়ে জার্মানী (এবং অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশ) তাদের অর্থনীতির সমৃদ্ধি ও প্রসার এর শেষ পর্যায়ে আসে এবং অবনতির শুরু হয়। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সালে এই অবক্ষয় শুরু হয়। এই সময় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আরও পিছিয়ে পড়ে জার্মানী, অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ও অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে লাভের অংশ কমতে থাকে ও বিনিয়োগ কমে যায়। এই সংকট পরবর্তীতে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে এবং এখনও চলছে।

১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সালে প্রতি বৎসর গড়ে জার্মান মুদ্রা মার্কের বিনিময় মূল্য ৬.১ শতাংশ হারে বাড়ে। লাভের অংশ বজায় রাখার জন্য জার্মান রপ্তানীকারকরা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি গড়ে বৎসরে ৩.১ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখে। যদিও মার্কের মূল্য বৃদ্ধির কারণে তাদের পণ্যের দাম বৎসরে গড়ে ৬.১ শতাংশ হারে বাড়তে থাকে। এতে পৃথিবীর মোট রপ্তানীর অংশ হিসাবে জার্মানীর রপ্তানীর অংশ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু এতে তাদের লাভের অংশ কমে যায়। ১৯৭০ এর দশকে জার্মান অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হয় নাই। উৎপাদনের যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ আগের দশকের তুলনায় কমে যায়, বেকারত্বের হার আগের চাইতে বেড়ে ৪.৪ শতাংশ হয়, শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধির হার অর্ধেক করে রাখা সম্ভব হয়। সারা পৃথিবীতে পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা চাহিদার তুলনায় বেশী হতে থাকে। উৎপাদিত পণ্যও চাহিদার তূলনায় বাড়তে থাকে। ফলে পণ্যমূল্য বাড়ান সম্ভব হয় না। লাভের হার বাৎসরিক গড় ১.৪ শতাংশ হারে কমে। তুলনায় পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত নয় অর্থনীতির এই সব শাখাগুলির বৃদ্ধি হয়। ১৯৭০-৮০ সালে পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত জনসংখ্যা ১০ শতাংশ কমে, কিন্তু অন্যান্য শাখায় ২২.৮ শতাংশ বাড়ে। আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি দ্রুত বাড়তে থাকায় মার্কিন সরকার জার্মানী ও জাপান সরকারের উপর আভ্যন্তরীন চাহিদা বাড়ানর জন্য চাপ দেয়। ১৯৭৮ সালে জাপানের মত জার্মানীও মুদ্রা সরবরাহ বাড়ানর বড় কর্মসূচী নেয়। এতে রপ্তানী প্রবৃদ্ধি আরও কমে যায়। ১৯৭৯ সালে এই কর্মসূচী বন্ধ করে, ঋণ সংকোচন করা হয়। অর্থনীতি আবার recession এ চলে যায়।

বিংশ শতাব্দীর আশি ও নব্বই এর দশকে জার্মানী তার রপ্তানীমুখী অর্থনীতিতে গতি ফিরিয়ে আনতে পারে নি। কঠোর মুদ্রানীতি, জার্মান মুদ্রা মার্কের মূল্যবৃদ্ধি, বিশ্বের মোট বাণিজ্যের সংকোচন- এ সব মিলে অর্থনীতিকে স্থবির করে রাখে। জার্মানী আগের দশকগুলোর মত আভ্যন্তরীন চাহিদা কমিয়ে রাখা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, দেশীয় উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সংহত করার চেষ্টা করতে থাকল- যাতে রপ্তানী বাড়ে আর বিনিয়োগও বাড়ে।

১৯৮০-৮২ সালে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার অনেক কমে গেল, লাভের অংশও কমতে থাকল। কিন্তু জার্মান সরকার ঋণ নেওয়া সহজ করল না। বাজেট ঘাটতিও বাড়তে দিল না। সুদের হারও হল উর্দ্ধগামী । পুরনো হয়ে যাওয়া উৎপাদন যন্ত্র ও কারখানা বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হল এবং শ্রমিক কমানও সম্ভব হল। এতে উৎপাদন খরচ কমল এবং রপ্তানীও বাড়ল এবং আশির দশকের শেষের দিকে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহারও বাড়ল। কিন্তু অর্থনীতির গতিশীলতা পুরোপুরি ফিরল না । এর কারণ হল জার্মানীতে উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নত করার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ সত্তুরের দশকের চাইতেও আশির দশকে কমে আসল। ফলে উৎপাদনের দক্ষতা অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ল। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ হল লাভের অংশ বাড়ার সম্ভাবনা বিনিয়োগকারীরা দেখছিল না। ১৯৮৪-৮৫ সালে

প্রেসিডেন্ট রেগানের প্রশাসনের সময় আমেরিকায় ব্যয় বাড়ান হয় ও ডলারের মূল্যমান বাড়ে। এতে অর্থনীতি কিছুটা চাঙ্গা হয়। কিন্তু প্লাজা চুক্তি (Plaza Accord) এর মাধ্যমে ডলারের মুদ্রামান কমান হয়। জার্মানীর রপ্তানী কমে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। উৎপাদকরা রপ্তানী মূল্য কমিয়ে রপ্তানী ধরে রাখতে পারলেও তা বাড়াতে পারেনি। ১৯৮৭-৮৮ সালের দিকে ঋণ প্রবাহ বাড়ানর ফলে চাহিদা বাড়ে, জ্বালানী তেলের মূল্য এই সময় কমে আসে। এছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী একত্রীকরণের ফলে বাজারও বেড়ে যায়। আশির দশকের শেষ দিকে রপ্তানী বাড়ে। তবে ১৯৭০ এর দশকের রপ্তানীর চাইতে তা বেশী ছিল না ও ষাটের দশকের চাইতে ছিল এক তৃতীয়াংশ কম। পৃথিবীর মোট বাণিজ্য বৃদ্ধির হার ১৯৬০-৭৩ এর তূলনায় আশির দশকে ছিল প্রায় অর্ধেক। কাজেই রপ্তানী না বাড়াটাই ছিল স্বাভাবিক।[২৪] দেশে বিনিয়োগ লাভজনক না হওয়ায় বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ে। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বাৎসরিক প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল গড়ে ১০ বিলিয়ন মার্ক। কিন্তু প্লাজা চুক্তির পর ১৯৮৫- ১৯৯০ পর্যন্ত এটা প্রায় তিন গুণ বাড়ে। উৎপাদন খাতের বাইরে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ও মুনাফার হার বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন খাতের ধীরগতি পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আশির দশকে জার্মানীতে বেকারত্বের হার সবচাইতে বেশী হয়-গড়ে ৮.৫ শতাংশ।

১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসের অর্থনৈতিক ধ্বসের পর উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো অর্থপ্রবাহ বাড়ানর জন্য ঋণ নেওয়ার শর্ত সহজতর করে। বিপদ কিছুটা কাটতেই আবার অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৯৯০ সালের মাঝামঝি আমেরিকান অর্থনীতির গতি স্বল্পকালের জন্য ধীর হয় ফলে পণ্য চাহিদা আরও কমে যায়। পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানী একত্রীকরণের পর পূর্ব অংশে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বিশালভাবে বাড়ান হয় ফলে জার্মান কোম্পানীগুলির পণ্যের চাহিদা বাড়ায় ১৯৯১ সাল পর্যন্ত অর্থনীতি গতিশীল থাকে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় জার্মান সরকার ব্যয় সংকোচন ও করবৃদ্ধি করে। সুদের হারও বাড়ান হয়। এ সবের ফলে জার্মান পণ্যের বাজার কমে যায়। উচ্চ সুদের হারের প্রভাব অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও পড়ে। জার্মান মুদ্রার মূল্য বাড়ে। ফলে জার্মান পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এতে জার্মান অর্থনীতি ১৯৫০ সালের পর সব চাইতে বেশী সময়ের জন্য মন্দায় পড়ে। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয় মাত্র ০.৯ শতাংশ, ১৯৫০ সালের পর যে কোন সময়ের চাইতে সবচাইতে কম।[২৫] রপ্তানী নির্ভরতা বাড়ল, কিন্তু অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রে লাভের মাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা না দেখায় বিনিয়োগকারীরা উৎপাদনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় আধূনিকীকরণ করল না, এতে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হল না। উৎপাদন বৃদ্ধির গতিও কমে গেল। এদিকে জার্মান মুদ্রার মান ৪ শতাংশ হারে প্রতি বৎসর বাড়তে থাকল। রপ্তানী কমতে থাকল। ১৯৯০ সালে পৃথিবীর মোট রপ্তানীর ১২.১ শতাংশ ছিল জার্মানীর, ১৯৯৫ সালে তা ছিল ১০.৪ শতাংশ। পণ্য উৎপাদন ১৯৯১ সালের চাইতে ১৯৯৫ সালে ১০ শতাংশ কম ছিল, পণ্য উৎপাদনে শ্রমিক সংখ্যা ১৬ শতাংশ কম ছিল। দেশে পণ্য উৎপাদনে এই সংকটের ফলে বিনিয়োগকারীরা বিদেশে টাকা খাটানর পরিমাণ বাড়াল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ প্রতি বৎসর গড়ে ২৫ থেকে ৩০ বিলিয়ন ডয়েস মার্ক, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হচ্ছিল-১৯৯৫ সালে তা বেড়ে হল ৫০ বিলিয়ন ডয়েস মার্ক। তুলনায় অন্য উৎপাদন বহির্ভূত খাত কম সংকটে ছিল ।

জাপানের মতই জার্মান অর্থনীতি মুদ্রামান বাড়ার কারণে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সংকটে ডুবে গেল। এর পরবর্তীতে জার্মান, জাপান ও মার্কিন সরকারের যৌথ উদ্যোগে জার্মান মুদ্রামান কমানয় অর্থনীতির গতি বাড়ে। রপ্তানী বাড়লেও পণ্য উৎপাদনের শিল্প কারখানাগুলোতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হয় না। দেশে উৎপাদন তুলনামূলকভাবে মূল্য বেশী হওয়ায় বিদেশে বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। জার্মান শ্রমিকদের বেতন এই সময় তুলনায় ছিল বেশী। ১৯৯৬ সালে জার্মান শ্রমিকদের প্রতি ঘন্টায় গড় পারিশ্রমিক ছিল ৩১.৮৭ ডলার। আমেরিকায় তা ছিল ১৭.৭৪ ডলার। জার্মান অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলো থেকেই গেল।

১৯৯২ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলি এক মুদ্রাব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার লক্ষ্যে মাসট্রিক্ট (Maastricht) চুক্তি করে। এই মুদ্রার নাম পরবর্তীতে ইউরো রাখা হয়। অংশগ্রহণ করার শর্ত ছিল দেশের বাজেট ঘাটতি জিডিপির তিন শতাংশের কম হতে হবে, ঋণ জিডিপির ষাট শতাংশের কম হতে হতে, মুদ্রাস্ফীতির হার কম রাখতে হবে, সুদের হার ইউরোপীয় ইউনিয়নের গড় সুদের হারের কাছাকাছি হতে হবে। ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্রত্যেকটি দেশের মুদ্রার সেই সময়ের বিনিময়মূল্য অনুযায়ী ইউরোর সঙ্গে মান নির্ধারণ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। ২০০২ সালের ১ লা জানুয়ারী নতুন ইউরো নোট ও মূদ্রা চালু হওয়ার পর দেশগুলোর নিজ মুদ্রা তুলে নেওয়া হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৭টি

দেশ (জার্মানী সহ) ইউরো ব্যবহার করে। ইউরো চালু হওয়ার ফলে ব্যবহারকারী দেশগুলোর মুদ্রামানের উঠানামার সম্ভাবনা থাকল না। এতে জার্মানী লাভবান হল। ইউরোপীয় দেশগুলি জার্মানীর পণ্য আমদানী কমিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের পক্ষে আনার জন্য মুদ্রামান কমাতে পারল না, যেটা ইতালী ও অন্যান্য দেশ আগে করত। অন্যান্য ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশের অভিজাত শ্রেণী বিভিন্ন কারণে এটা মেনে নিল। অনেক দেশের ধনী মানুষেরা তাদের মুদ্রার মান কমে যাক তা চাইত না। কারণ তাতে দেশের বানিজ্যের লাভ হলেও তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের দাম কমে যেত। কর্মজীবী মানুষেরাও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এই মূদ্রার শর্ত হওয়ায় তারা তাদের মজুরীর মূল্য ধরে রাখতে পারবে মনে করল।[২৬] এই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী দেশ ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী রাজী হল, কারণ এতে তারা ইউরোপে তাদের প্রভাব বাড়াতে পারবে বলে মনে করল। তাছাড়া এটা ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মজুরী নিয়ে দর কষাকষির সময় তাদের সুবিধা করে দিল; ফ্রান্স ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে শ্রমিকদের বেতন বাড়ার হার ছিল কম।

জার্মানী শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে ইউরোপের অন্যান্য দেশে রপ্তানী করত। কাজেই জার্মানীর ছিল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত। আর বাণিজ্য উদ্বৃত্ত দেশ ছিল হল্যান্ড, অষ্ট্রীয়া ও স্ক্যান্ডিনিভিয়ান দেশগুলোর। তা ছাড়া বাকী সব দেশ (ফ্রান্স ব্যতীত) ছিল বাণিজ্য ঘাটতি। ইউরো গ্রহণ করায় ঘাটতি দেশগুলোর মুদ্রামান পরিবর্তন করে ঘাটতি কমানর সুযোগ থাকল না। ফলে জার্মানী ও অন্যান্য উদ্বৃত্ত দেশগুলোর পণ্য রপ্তানী বাড়ল। বাণিজ্য উদ্বৃত্তও বাড়ল। কিন্তু ফ্রান্স ও ঘাটতি দেশগুলোর সংকট বাড়ল। ঘাটতি দেশগুলো আমেরিকায় রপ্তানী করে অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছিল। ২০০৮ সালে মার্কিন অর্থনীতিতে ধ্বস নামল। আমদানীর চাহিদা কমল- আর ইউরোপের ঘাটতি দেশগুলো আরও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল।

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর একত্রীকরণ জার্মান সরকারী ব্যয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করলেও জার্মান পুঁজিপতিদের জন্য সুযোগও তৈরী করে দিল। সত্তুরের দশকের মন্দা যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের মজুরী যে ভাবে কমিয়ে নিয়ে এসেছিল, একত্রীকরণ জার্মানীতেও সেটা করল। পূর্ব জার্মানী থেকে অত্যন্ত কম মজুরীতে শ্রমিক খাটান গেল। শুধু পূর্ব জার্মানীই নয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, থেকে শুরু করে সমগ্র পূর্ব ইউরোপের শ্রমিকেরা স্বল্প মজুরীতে জার্মানীতে কাজ করতে লাগল। কম মজুরীতে উৎপাদন আর বর্ধিত বিনিয়োগ মিলে ২০০৪ এর পর জার্মান বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বাড়তে থাকল। পুঁজিপতিদের লাভ আগের চাইতে ৩৫ শতাংশ বাড়ল।

তবে এই সমৃদ্ধি ছিল খোলস। ভিতরে ভিতরে জার্মান ব্যাংকগুলোকে ঘুণে ধরে ছিল তা ২০০৮ সালের ধ্বসের পর বোঝা গেল। জার্মান ব্যাংকগুলো প্রতি এক ইউরো গচ্ছিত অর্থের জন্য ৫২ ইউরো ঋণ দিয়েছিল-এই অনুপাত নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রীট বা লন্ডনের চাইতেও ছিল খারাপ। ফ্রান্সের অবস্থাও ছিল একই। তারা কমপক্ষে ৩৩ বিলিয়ন ইউরো আমেরিকায় সিডিওতে বিনিয়োগ করেছিল, এ ছাড়াও ইউরোপীয় ব্যাংকগুলো ইউরোভুক্ত এলাকাতে প্রায় ৮৪৯ বিলিয়ন ইউরো, পূর্ব ইউরোপে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ইউরো, ল্যাটিন আমেরিকায় প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ইউরো ও আইসল্যান্ডে প্রায় ৭০ বিলিয়ন ইউরো ঋণ দিয়েছিল। ব্যাংকগুলোকে উদ্ধার করার জন্য ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সদস্য দেশগুলো অর্থ দিল ২০০৮ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে। এই অর্থ রাষ্ট্রীয় অর্থ অর্থাৎ জনগণের প্রদত্ত কর থেকে আয় করা। দেনা চাপল জনগনের ঘাড়ে। এই সময়কালে ব্যাংক বিপর্যয়ে জিডিপি (GDP) কমল জার্মানীর ৫ শতাংশ, ফ্রান্সের ২.৬ শতাংশ, সুইডেনের ৫.২ শতাংশ, আয়ারল্যান্ডের ৭.১ শতাংশ।

ব্যাংক ও হেজ (hedge) ফান্ডগুলো কিন্তু জনগণের এই অর্থ নিয়ে আবার ফাটকাবাজিতে নামল। তারা মনে করল ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে যে গুলো দুর্বল (যেমন গ্রীস) তারা ব্যাংক উদ্ধারের জন্য অর্থ ব্যয়ের চাপে কোন না কোন সময় ঋণ পরিশোধে অপারগ হবে। বড় কারণ হল ইউরোভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় সুবিধা করার জন্য মুদ্রামান কমানো চুক্তি অনুযায়ী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমদিকে এই বাজী ধরার টাকার পরিমাণ কম হলেও ক্রমেই তা বাড়তে থাকল। লন্ডনের বাজী ধরার প্রতিষ্ঠান (Bookmaker) গুলোর পক্ষে বহু বিলিয়ন ডলারের বাজি পরিচালনা করা সম্ভব হল না। তাই এই বাজীগুলো সিডিএস CDS (Credit Default Swaps)এর মাধ্যমে করা শুরু হয়েছিল। সিডিএস হলো এক ধরনের বীমা- যেটা কেউ ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হলে বীমা কোম্পানী তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা ফান্ড (যে বীমা করেছিল) তাকে টাকা দেয় (এ সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে) । কিন্তু এর ফল হল যে দেশের ঋণ পরিশোধ করতে না পারার সম্ভাবনায় বীমা করা হল, তাদের সম্মন্ধে বাজি ধরার কারণে সে দেশের ঋণে সুদের হার ঝুঁকি

বেশী, এই অজুহাতে বাড়তেই থাকল। যতই বাজির বা বীমার অর্থ বাড়তে থাকল ততই সুদের হার বাড়তে থাকল। এই প্রক্রিয়ায় ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা অবশ্যম্ভাবী করে তোলা হল।[২৭] এই ভাবে ব্যক্তিগত বা কোন তহবিলের অর্থ বাজী ধরে বাড়ানর ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু এবার সংকট ছিল রাষ্ট্রের (sovereign debit crisis) ।

গ্রীসের সংকট

২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে সরকারী তথ্যে প্রকাশ পেল গ্রীসের ঘাটতি তার জাতীয় আয়ের ১২ শতাংশের বেশী। ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্ধারিত সীমা ছিল তিন শতাংশ। ধারণা ছিল এটা ৬ শতাংশ হতে পারে। এই অতিরিক্ত ঘাটতির কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে সিডিএস এর মূল্য বাড়তে থাকল- গ্রীক সরকারের ৩৩০ বিলিয়ন ইউরো ঋণের সুদও বাড়তে থাকল। ২০১০ সালের জানুয়ারী নাগাদ গ্রীক সরকারের পক্ষে বাইরের সাহায্য ছাড়া ঋণ খেলাপী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। অনানুষ্ঠানিকভাবে গ্রীক সরকার ইউরো এলাকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করেছিল। সেই সময় গ্রীস জার্মানীর ব্যাংকগুলোর কাছে ৫৩ বিলিয়ন ইউরো ও ফ্রান্সের ব্যাংকগুলোর কাছে ৭৫ বিলিয়ন ইউরো ঋণগ্রস্ত ছিল। গ্রীস ঋণখেলাপী হলে এই ব্যাংকগুলো বিপদগ্রস্ত হতে পারে এই আশংকায় ইউরো কর্তৃপক্ষ সাহায্য করবে না জানাল। এ ছাড়া জার্মানী ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য উদ্বৃত্ত দেশগুলি বিদ্যমান ব্যবস্থায় তাদের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যে যে সুবিধাজনক অবস্থান ছিল সেটা পরিবর্তন করতে চাচ্ছিল না। ফলে গ্রীসকে আরও অতিরিক্ত সুদের হারে ঋণ নিতে হল। ২০১০ সালের মে মাসে বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কিত হল যে গ্রীস এবং অন্যান্য ঋণগ্রস্ত ইউরোপীয় দেশও ঋণখেলাপী হয়ে যাবে। সব দেশেরই সরকারী বন্ড কেনা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। ২রা মে ২০১০ ইউরো ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মূদ্রা তহবিল (IMF) গ্রীসকে ১১০ বিলিয়ন ইউরো অত্যন্ত উঁচু সুদে ধার দিতে রাজী হল। এত উঁচু সুদের ফলে গ্রীসের পক্ষে এই ঋণ বা তার আগের ঋণ কোনটাই পরিশোধ করার সম্ভাবনা ছিল না। ব্যাংক ও অন্যান্য বিনিয়োগকারীরা এটা বুঝে গ্রীস ও অন্যান্য ইউরোপীয় ঋণগ্রস্ত দেশের খেলাপী হওয়ার উপর বাজী ধরা বাড়াতে থাকল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৭৫০ বিলিয়ন ইউরোর তহবিল সৃষ্টি করল (European Financial Stability Facility) যেটা অন্য কোন ইউরোপীয় দেশ ঋণখেলাপী হওয়ার ঝুঁকিতে পড়লে উদ্ধার করা যায়। এই তহবিলের গঠন ছিল এমন যে, ঋণ নেওয়া ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, এটা আগেই বলা হয়েছে। এটাও বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারল এবং বাজি ধরা চলতে থাকল। দূর্বল রাষ্ট্রগুলোর ঋণগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণ এবং তাদের অর্থনীতির সুস্থতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা না করে আরও চড়া সুদে ঋণ দিয়ে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। উপরন্ত ঋণগ্রস্ত দেশগুলির সরকারের উপর কৃচ্ছ্রসাধন চাপিয়ে দেওয়ায় অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে।

চীন

১৯৯২ সালে দেং জিয়াওপিং এর বিখ্যাত দক্ষিণ চীন সফর এরপর বিশ্ব বাণিজ্যে চীন বড় আকারে প্রবেশ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ শক্তির পুনরায় আবির্ভাব যেমন চমকপ্রদ, পৃথিবীর ভবিষ্যতের উপর এর প্রভাব বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার উত্থানের মতই গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করা হয়। চীনের শিল্প উৎপাদনের উন্নতির পথ ছিল দ্বৈত অর্থনীতি। দেশে অনেক ছোট ছোট অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন করা হল, যেখানে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া হল বিদেশী কোম্পানীগুলোকে। সারা দেশ থেকে কম মজুরীর শ্রমিক পাওয়া গেল।[২৮] পশ্চিমা ও জাপানী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে কারখানা তৈরীর অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু প্রযুক্তি হস্তান্তর (technology transfer) এর দর দস্তুর রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে করা হল। বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তুলনামূলকভাবে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করে সারা বিশ্বে, বিশেষত আমেরিকায় রপ্তানী করা শুরু করল। চীনা পণ্য আমেরিকায় আসা শুরু করায় আমেরিকায় উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলো তাদের পণ্যের দাম কম রাখার জন্য শ্রমিক মজুরী আরও কমানর জন্য চাপ অব্যাহত রাখল। গত শতকের নব্বইএর দশকে চীনের রপ্তানী চমকপ্রদভাবে গড়ে প্রতি বছর ১৫.৬ শতাংশ হারে বাড়তে থাকল। এরপরও পৃথিবীর মোট রপ্তানীতে চীনের অংশ ছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মোট রপ্তানীর চাইতে কম। ২০০০ সালের পরবর্তী চার বছর রপ্তানী বাড়ল গড়ে প্রতি বছর ২৫ শতাংশ হারে।[২৯] দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও জাপানের কোম্পানীগুলি তাদের উৎপাদন চীনে হস্তান্তর করা শুরু করল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নতুন শিল্পোন্নত দেশগুলো ও জাপানের প্রযুক্তি স্থানান্তর করে চীন আরও উন্নত প্রযুক্তির পণ্যদ্রব্য তৈরী ও রপ্তানী শুরু করল। প্রথম দিকে শ্রমঘন পণ্যদ্রব্য যেমন জুতা, খেলনা, জামাকাপড়, খেলাধূলার সামগ্রী ইত্যাদি তৈরী করলেও কয়েক বৎসরের মধ্যেই কম্পিউটার এর কি বোর্ড, মাউস বানান শুরু করে ৯০

এর দশকের প্রথমদিকে। নব্বই এর দশকের মাঝামাঝি এসে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ তৈরী করতে থাকে। এ ব্যাপারে তাইওয়ানের কোম্পানীগুলো চীনে উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে কম্পিউটার ও তার যন্ত্রাংশ উৎপাদনের মূল্য ৭১৬ মিলিয়ন ডলার থেকে ৪১ বিলিয়ন ডলার হয়ে যায়। ২০০৪ হতে ২০০৫ সালের মধ্যে চীনের শিল্প উৎপাদনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল বিদেশী কোম্পানীগুলির এবং রপ্তানীর প্রায় ৬০ শতাংশ ছিল তাদের। ২০০৩ সাল নাগাদ উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য রপ্তানীর পরিমাণে চীন জাপান ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে ছাড়িয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চীন পৃথিবীতে একটি শিল্প শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল। মাত্র চার বৎসরের মধ্যে (২০০২ থেকে ২০০৪) আমেরিকায় চীনের রপ্তানী প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল (১০০ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৭ বিলিয়ন ডলার) এবং আমেরিকার আমদানী অংশের ৯.৬ শতাংশ বাড়িয়ে ১৬.৩ শতাংশে নিয়ে গেল। আমেরিকায় রপ্তানীর যে অংশ চীন বাড়িয়ে নিল সেই পরিমাণ অংশ জাপান ও পূর্বএশিয়ার দেশগুলির কমে গেল। ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় জাপানের রপ্তানী ৭ শতাংশ কমে গেল। কিন্তু চীনে রপ্তানী বাড়ল ৬ শতাংশ। এর অর্থ দাঁড়াল এই যে, ক্রমেই জাপান ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোম্পানীগুলো চীনে পুঁজি বিনিয়োগ করা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে থাকল আর অর্ধপ্রস্তুত পণ্যদ্রব্য চীনের কারখানাগুলোতে পুরোপুরি সম্পূর্ণ করে আমেরিকায় রপ্তানী করতে থাকল। জাপানী ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোম্পানীগুলি আগেই আমেরিকায় পণ্য বাজারজাত করার অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগ ছিল, ফলে চীনে উৎপাদিত পণ্যও দ্রুত আমেরিকার বাজারে স্থান পেল।

নব্বই এর দশকে চীন পৃথিবীর উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানীর বাজারে তার অংশ দ্বিগুণ বাড়িয়ে ফেলে। এরপর প্রায় অর্ধেক সময়ে (২০০০ থেকে ২০০৪ সাল) এটা আরও দ্বিগুণ বাড়ায়। কিন্তু এই বৃদ্ধি আমেরিকার বাজার এর উপর নির্ভরশীল ছিল। ২০০১ সালে যখন আমেরিকার অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়, তখন চীনের রপ্তানী বৃদ্ধির হার নব্বই এর দশকের গড় ১৬ শতাংশ থেকে কমে ২০০১ সালে ৬ শতাংশ হয়। এই সময়কালে আমেরিকার আমদানীর পরিমাণ ছিল রপ্তানীর চাইতে বেশী। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ঘাটতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অর্থ দিয়ে পূরণ করত। এটা হত আমেরিকার ট্রেজারী বন্ড কেনার মাধ্যমে আর আমেরিকায় বিনিয়োগের মাধ্যমে। নব্বই এর দশকের শেষভাগেও ট্রেজারী বন্ডের সুদের হার ছিল ভাল, তাই এটা কিনতে সবাই আগ্রহী ছিল। এ ছাড়াও এই সময়ে বেশী লাভের আশায় বিপুল পরিমাণ বিদেশী অর্থ আমেরিকায় বিনিয়োগ করা হয়, অনেক আমেরিকান কর্পোরেশনগুলোর বন্ড ও ইক্যুইটি (equity) বিপুল পরিমাণে কেনা হয়। এই অর্থ আসায় আর একটা ফল হল, এতে আমেরিকার ইক্যুটিগুলোর (equity) দাম বাড়তে থাকল, ডলারের দামও বাড়তে থাকে ও পণ্যের বাজার চাঙ্গা হয়, ফলে বিদেশী পণ্যের বিক্রিও বাড়ে। বিদেশীরা আমেরিকায় অর্থ বিনিয়োগ করে তাদের নিজেদের বাণিজ্যেরও সুবিধা করছিল। ২০০১ সালের অর্থনৈতিক ধ্বসের পর ব্যক্তি বিনিয়োগকারীরা আমেরিকায় প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে ও স্টক কেনায় আর উৎসাহ পেল না। এতে current account ঘাটতি আরও বাড়ল, ডলারের দাম কমতে থাকল। ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ডলারের দাম ইউরোর তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কমে গেল। ডলারের মূল্যমান যদি আরও কমত তাহলে আমেরিকার অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটত। আরও কমলে (১) বিদেশীরা আমেরিকায় তাদের সম্পত্তি ব্যাপক হারে বিক্রি করা শুরু করত এবং তাতে সম্পত্তি এবং স্টক বন্ডের দামে ধ্বস নামত, অথবা (২) সরকারকে মুদ্রামান ঠিক রাখার জন্য সুদের হার বাড়াতে হত ফলে অর্থনীতিতে ধ্বস নামত।

ডলার এর মুদ্রামান আরও না কমার কারণ হল- চীন, জাপান ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলি আমেরিকার সঙ্গে তাদের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতির ফলে প্রাপ্ত অর্থের বেশীরভাগই আমেরিকায় বিনিয়োগ করছিল, এতে ডলারের সঙ্গে তাদের মুদ্রার মান প্রায় স্থিতিশীল ছিল। তাদের এটা করার কারণ ছিল, ডলারের মুদ্রামান কমলে তাদের রপ্তানী কমে যেত। ব্যক্তি পুঁজির আমেরিকায় বিনিয়োগ কমায় যে শূন্যস্থান হল তা এই দেশগুলি তাদের বিনিয়োগ বাড়িয়ে পূরণ করল। ২০০৩ সালে আমেরিকায় current account ঘাটতি হল ৫৩০ বিলিয়ন ডলার-এর প্রায় ৯০ শতাংশ এই দেশগুলি পূরণ করল, আমেরিকায় তাদের সম্পদের পরিমাণ ৪৮৫ বিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে। ২০০৪ সালে আমেরিকার ৬৭০ বিলিয়ন ডলার ঘাটতির ৪৬৫ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৭৫ শতাংশ) এই দেশগুলি পূরণ করল। এই ঘাটতি পূরণে চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটা বড় অংশ নিয়েছিল। [৩০] ডলারে কেনা বেচা হয় এমন সম্পদ (asset) বিপুলভাবে কেনার ফলেই ডলারের মুদ্রামান টিকে থাকল। শুধু তাই নয়, এটা প্রেসিডেন্ট বুশের প্রশাসন যে বিরাট ঘাটতির সৃষ্টি করেছিল, তার বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা করল। ২০০০ সাল থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে আমেরিকার বাজেট ৩ শতাংশ উদ্বৃত্ত থেকে ৩.২ শতাংশ ঘাটতি হল। ৯৬০ বিলিয়ন ডলার এর ট্রেজারী বন্ড বিক্রি করে এই ঘাটতি পূরণ করার ফলে সুদের হার কম থাকল। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা

এই বন্ড কেনে নাই। এক তৃতীয়াংশ কিনেছিল আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক, রাজ্য (state) সরকার ও স্থানীয় সরকার- কিন্তু দুই তৃতীয়াংশই কিনেছিল বিদেশী সংস্থা, যার মধ্যে প্রধান ছিল পূর্ব এশিয়ার (চীন সহ) ব্যাংকগুলো। এই কেনার ফলে আমেরিকার অর্থনীতি স্থিতিশীল ছিল- সুদের হার কম ছিল, ঋণ নেওয়া সহজ ছিল। এর ফলেই বাড়ীঘর ও স্থাবর সম্পত্তির দাম বাড়তে থাকল আর আমেরিকার অর্থনীতির চাকা সচল হল। এভাবে পূর্ব এশিয়ার ব্যাংকগুলো বুশ প্রশাসনকে আয়ের চাইতে তাদের সরকারী ব্যয় বিপুলভাবে বাড়াতে সক্ষম করল, যেটা না হলে অর্থনীতিতে তখনই ধ্বস নামত।

তবে এত বিপুল পরিমাণ ডলার খরচ করায় পূর্ব এশিয়ার ব্যাংকগুলোর (যার মধ্যে চীনের ব্যাংক ছিল অন্যতম) স্বার্থও ছিল। এর ফলে ডলারের মুদ্রামান বেশী থাকায় ও মার্কিন অর্থনীতি সবল থাকার কারণে পণ্য চাহিদা বাড়তে থাকায় পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি আমেরিকায় রপ্তানী বাড়াতে থাকল। কিন্তু সমস্যাও থাকল। ডলার কিনতে থাকায় চীনসহ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বড় ধরনের মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার ঝুঁকি নিতে হল। চীনে স্থাবর সম্পত্তির দাম বাড়তে থাকল। এই প্রক্রিয়া কোনভাবে বাধাগ্রস্ত হলে স্থাবর সম্পত্তির দাম হঠাৎ করে পড়ে গেলে চীনের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ার সম্ভাবনাও ছিল।

সারণীঃ বিদেশী ব্যাংকগুলোর আমেরিকায় সম্পত্তি বৃদ্ধি (বিলিয়ন ডলার)

ব্যাংক	সাল			
	২০০০	২০০৩	২০০৭	২০০৯
জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ব্যাংক	৮০	১৬০	৪৫	৩২
নতুন আবির্ভূত (emerging) অর্থনীতিসমূহ ,মূলত চীন	১২০	২৪০	১২৫৫	১২৭২

এছাড়া যে বিপুল সম্পদ (asset) তারা আমেরিকায় ডলারে কিনতে থাকল, ডলারের মুদ্রামানের উর্ধ্বগতি ভবিষ্যতে এক সময় থামতে বাধ্য, তখন এই সম্পদের দাম কমে গেলে এটা তাদের জন্য বিরাট ক্ষতি নিয়ে আসবে- এই ঝুঁকিও নিতে হল। ডলারের মুদ্রামান কমে যাওয়ায় বিপুল ক্ষতি মেনে নিতে হয়েছিল জাপানকে ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে। আমেরিকার অর্থনীতিতে ফল হল ডলারের মুদ্রামান বেশী ও সুদের হার কম থাকায় অর্থ লগ্নী করা হতে থাকল স্থাবর সম্পত্তিতে ও অর্থবাজারে এবং তার থেকে উদ্ভূত ঋণ ভিত্তিক অর্থ দিয়ে ভোগ্যপণ্য কেনায়। উৎপাদন বাড়াবার বা আধুনিকায়নের জন্য কলকারখানা বা যন্ত্রপাতিতে পুঁজি বিনিয়োগ হল না। অর্থনীতিতে এই ধারা কয়েক বছর আগে ধ্বস নামিয়েছিল।

২০০৮ সালের অর্থনীতির ধ্বসের পর আমেরিকা চীনকে তার অর্থ রেনমিনবীর (renminbi) মান বাড়ানর জন্য চাপ দিয়েছে। এটার একটা কারণ হল আমেরিকা চাইছে ডলার এর মুদ্রামান তুলনামূলকভাবে কমলে রপ্তানী বাড়িয়ে মন্দা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। তবে আমেরিকা এ ব্যাপারে খুব দৃঢ় অবস্থান নিতে পারছে না। আমেরিকার অনেক কোম্পানী চীনে উৎপাদন করে পণ্য আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে বাজারজাত করে। চীনে মুদ্রামান বাড়ালে প্রতিটি আইপ্যাড, কম্পিউটার, এমনকি মটর গাড়ী (অনেক মটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ চীনে তৈরী হয়) দাম বাড়বে, কোম্পানীগুলোর বিক্রি কমবে, লাভ কমবে। কাজেই তারা আমেরিকা সরকারের এই চাপ দেওয়ার বিপক্ষে। এ ছাড়া রেনমিনবীর (renminbi) মান বাড়াতে হলে চীনকে ডলার কেনা কমাতে হবে। এতে আমেরিকায় সুদের হার বাড়বে ও সম্পদের দাম (ট্রেজারী বন্ড, ইক্যুটি ও স্থাবর সম্পত্তিসহ) কমবে। আমেরিকার অর্থনীতিতে ধ্বস নামার সম্ভাবনা প্রবল। মুদ্রামান বাড়লে চীনের সমস্যা হবে রপ্তানী হ্রাস, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া, বিদেশী পুঁজি চীনে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ, স্থাবর সম্পত্তির দামের উর্দ্ধগতি। এই সমস্যাগুলো ১৯৯৫ সালে পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে ঘটেছিল- যা পরে অর্থনীতিতে ধ্বস নামিয়েছিল। এই সমস্ত কারণে চীন ও আমেরিকা (এবং ইউরোপীয় দেশগুলি) পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে বড় পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা কম।

তথ্যসূত্রঃ

১. http://www.investopedia.com/terms/d/derivative.asp.Accessed 20 August 2013
২. Varoufakis Y.The Global Minotaur. London,2011 p 122
৩. National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States. 2011 p 228-229
৪. http://en.wikipedia.org/wiki/credit-rating-agency. Accessed 20 November,2013
৫. Varoufakis Y. p 131
৬. www.conservapedia.com/Recession-of-2008. Accessed 3rd September, 2013
৭. www.econ.ohio-state.edu/mccafferty/econ/502.02/Current Events 2009, Accessed 23 August,2013
৮. Varoufakis Y. p 149
৯. Story L and Becker J. Bank Chief Tells of US Pressure to Buy Merril Lynch. The New York Times, 11th June, 2009
১০. Varoufakis Y. p 153
১১. http://en.wikipedia.org/wiki/American-International-Group. Accessed 5th September, 2013
১২. Varoufakis Y. p 171
১৩. www.theguardian.com/commentsisfree. Heidi Moore. Syria: the great distarction. Accessed 11 September, 2013
১৪. Varoufakis Y.p162
১৫. http://en.wikipedia.org/1997-Asian-Financial-Crisis. Accessed 15 October, 2013
১৬. Varoufakis Y. p 193-194
১৭. Brenner R.The Economics of Global Turbulance, London, 2006, p 67
১৮. Bartlett B. How the Revial of PostWar Germany Began. www.economixblogs-nytimes.com/2013/06/18/the revial- of- post- war- Germany.Accessed 27 october,2013
১৯. Brenner R. p 68
২০. Armstrong P.Glyn A. Harrison J. Capitalism since 1945. London,1991 p 50,94
২১. Brenner R. p 73
২২. Giersch H. Growth, Cycles and Exchange Rates. The Experience of West Germany. Stockholm,1970 p 15
২৩. Brenner R. p 75
২৪. Brenner R. p 232
২৫. OECD. Economic Survey of Germany.1992-93. Paris, 1993 p 10
২৬. Varoufakis Y. p 197
২৭. Varoufakis Y. p 205
২৮. Varoufakis Y. p 212
২৯. Brenner R, p 323
৩০. Brenner R. p 328

চতুর্দশ অধ্যায়

ফিরে দেখা

মানব জাতির ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব ছিল অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। পঞ্চদশ শতক ও তার কিছু আগের সময় জাহাজ নির্মাণ পদ্ধতি, মানচিত্র ও যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজ চালনার প্রভূত উন্নতি হয়। স্পেন, হল্যান্ড, বৃটেন ও পর্তুগালের বণিকেরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী পণ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা করে। আগেও এক দেশ ও আরেক দেশের মধ্যে নৌবাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তা ছিল এক একটা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এই প্রথম বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য শুরু হল।[১] বৃটিশ বণিকেরা পশম (wool) বিক্রি করে চীনে রেশমবস্ত্র কিনত, রেশমবস্ত্র বিক্রি করে জাপানে তরবারি কিনত, তরবারি বিক্রি করে ভারতে মশলা কিনত এবং মশলা বিক্রি করে আবার পশম কিনত। এইভাবে এই পণ্যগুলো সার্বজনীন মুদ্রা হিসাবে কাজ করত। দূরপাল্লার এই বাণিজ্যে একটা পণ্যের দাম যেখানে কম সেখান থেকে কিনে যেখানে দাম বেশী সেখানে বিক্রি করে লাভ করা হত। এক সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর সঙ্গে দাস ব্যবসা যোগ হল। আফ্রিকা থেকে মানুষ ধরে এনে আমেরিকায় তুলা উৎপাদনকারীদের কাছে বিক্রি করা শুরু হল। তুলা উৎপাদনে বিনা মজুরিতে তাদের কাজ করান শুরু হল। আর একপর্যায়ে বৃটিশ ভূস্বামীরা এই লাভজনক ব্যবসায় যোগ দিল। তাদের বিনিময় করার মত নিজস্ব পণ্য ছিল একটাই, ভেড়ার পশম (wool)। মেষ পালন বাড়ানর জন্য তারা বহুপুরুষ ধরে আবাদ করতে থাকা জমি থেকে ব্যাপকভাবে কৃষকদের উৎখাত করল আর দখল করা জমি ঘিরে (enclosure) ফেলল যাতে কৃষকরা ফিরতে না পারে। এর সাথে সাথে জমি ও শ্রম পণ্যে পরিণত হল। প্রতি একর জমি ইজারা নেওয়ার মূল্য নির্ভর করত ঐ এক একর জমি হতে কতটা ভেড়ার (wool) পশম পাওয়া যাবে এবং বিশ্ববাজারে তার দামের উপর। ভূমিহীন শ্রমিকদের শ্রমের দাম ছিল খুবই কম। ফলে বণিকেরা পণ্য বিশ্ববাজারে বিক্রি করে যে দাম পেত তার একটা বড় অংশ নিজেরা নিতে পারত। কয়েকটি বিশেষ উপাদান মিলে ফ্যাক্টরী বা কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটাল, এর মধ্যে একটা হল বণিকদের লভ্যাংশ জমা করা পুঁজি, নিজ জমি থেকে উৎখাত হওয়া বহু কৃষক (অল্প মজুরিতে কাজ করতে যারা বাধ্য), সহজে খনি থেকে তোলা যায় এমন কয়লা, আর কিছু কারিগরী উদ্ভাবন, যেমন বাস্পচালিত ইঞ্জিন ও যন্ত্রচালিত তাঁত। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল অন্য দেশ থেকে লুটপাট করে সম্পদ নিয়ে আসা। অর্থনীতিবিদ কিইনেস এর মতেই বৃটিশ পুঁজির উৎস হল অন্যান্য দেশের ধনসম্পদ জোর করে নিয়ে নেওয়া।[২] মধ্য সপ্তদশ শতকে সরকারী মালিকানা ও সরকারী সমর্থনে বৃটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সামরিক শক্তির বলে ভূমধ্যসাগরে ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তারা বাণিজ্যে দক্ষ কিন্তু সামরিক শক্তিতে দুর্বলতর ডাচ ও জার্মান বণিকদের উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে কোণঠাসা করে ফেলে। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় সামরিক শক্তির সমর্থনে ভারত উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তার করে এবং এই অঞ্চল থেকে প্রভূত ধনসম্পদ বৃটেনে নিয়ে যায়।[৩] আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভের পর শিল্প বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামের পণ্য আমদানী বন্ধ করে দেশীয় পণ্যের বাজার তৈরী করে, দেশীয় উৎপাদনে ভর্তূকি দেয় ও ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের দুটো বড় উপাদান সেইসময় তৈরী হয়েছিল। একটা ছিল কিছু মানুষের হাতে যথেষ্ট মূলধন জমা হওয়া, আর একটা ছিল একটা বড় জনগোষ্ঠীকে ভূমিহীন করে জীবন ধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত করা। পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলে এই প্রক্রিয়া তার নিজস্ব গতিধারায় এগোতে থাকে।

এই পর্যায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজি সঞ্চয় ক্রমেই বাড়তে থাকল। শ্রমের ফলে যে উদ্বৃত্ত মূল্য বা surplus value সৃষ্টি হয় তা পুঁজিপতিরা নিয়ে নেয়। এই উদ্বৃত্ত মূল্য আবার পুঁজিতে খাটান হয়। এভাবে পুঁজি বাড়তেই থাকে ফলে পুঁজি খাটানর জন্য নতুন বিনিয়োগের দরকার হয়। প্রয়োজন হয় আরও শ্রমিকের, কাঁচামালের ও নতুন উৎপাদিত পণ্যের জন্য নতুন বাজারের। কাজেই এই প্রক্রিয়া চরিত্রগতভাবে ক্রমেই প্রসারমান।[৪] পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাজ হল এই সম্প্রসারণের পথের বাধা দূর করা এবং এজন্য অনুকূল পরিস্থিতি বজায় রাখা। প্রসারমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠন ও প্রযুক্তির পরিবর্তন হয়। পুঁজিবাদের প্রথম পর্যায়ে ছিল পণ্য উৎপাদন বা manufacture। একই কারখানায় অনেক কারিগর কাজ করত এবং বিশেষ দক্ষতার ভিত্তিতে কিছুটা শ্রম বিভাজন ছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে (ইংল্যান্ডে এই পর্যায় ছিল মোটামুটি ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত) কারিগররা অপেক্ষাকৃত কম যান্ত্রিক উৎপাদন (যা প্রথম পর্যায় বা manufacture এ ছিল) থেকে আরও যান্ত্রিক বা machine industry উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেও

বৃটেনে লক্ষ লক্ষ তাঁতী ছিল, যারা হস্তচালিত তাঁত ব্যবহার করত। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই পুঁজিপতিরা কারখানায় যন্ত্রচালিত তাঁত চালু করল আর তাঁতীরা ব্যবসা থেকে বিতাড়িত হল।[৫]

যন্ত্র ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে শিল্প উৎপাদন, পণ্য পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতি হতে থাকল। প্রথমদিকে উৎপাদন ছিল ছোট আকারের ব্যক্তি মালিকানায় বা ছোট ছোট অংশীদারদের যৌথ মালিকানায় পরিচালিত। ক্রমেই এ গুলোর জায়গা দখল করল বড় বড় কর্পোরেশন, যে গুলো ছিল বড় আকারের যৌথ মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা। কর্পোরেশন ভিত্তিক উৎপাদনে পুঁজির আকার অনেক বাড়ল আর তা ক্রমেই কেন্দ্রীভূত হতে থাকল। এই ব্যবস্থার ফলে আরও সৃষ্টি হল ক্রমবর্ধমান ও বড় পরিমাণের অর্থ জমা করা, আদান প্রদান করা, ধার দেওয়া ও বিনিয়োগ করার জন্য একটি অর্থসংক্রান্ত পরিকাঠামো। এই পরিকাঠামোর মধ্যে ছিল ব্যাংক, securities market ও holding company এবং আরও অন্যান্য সংস্থা।[৬] কর্পোরেশন ভিত্তিক ব্যবসা যেমন অর্থসংক্রান্ত পরিকাঠামো তৈরী করল- এই পরিকাঠামো আবার কর্পোরেশনের কর্মকান্ড প্রসার করতে থাকল। পুঁজির আকার বৃদ্ধি, কেন্দ্রীভূত হওয়া ও কর্পোরেশনের মাধ্যমে কাজ হওয়া ঊনবিংশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে শুরু হয়ে এখনও চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধি তিন দফায় হয়েছিলঃ বিংশ শতকের শুরুতে, বিংশ শতকের বিশের দশকে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। এই তিন পর্যায়ের মধ্যে ছিল অর্থনৈতিক মন্দা। ১৯৬২ সাল নাগাদ সবচেয়ে বড় ১০০টি কর্পোরেশন পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমি, ভবন ও যন্ত্রপাতির ৫৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে একই ধরনের ব্যবস্থা বিরাজ করছিল।

পণ্যের দামের উৎস হল শ্রমিকের শ্রম-এই ধারণা কার্ল মার্কস প্রচার করলেও এর উৎপত্তি আরও আগে। যাকে অনেকেই অর্থনীতি শাস্ত্রের জনক বলে মনে করেন সেই এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) লিখেছিলেন "The real price of everything, what it really costs the men who want to acquire it, is the toil and trouble of acquiring it….. It is not by gold or silver, but by labour, that all the wealth in the world was originally purchased, and its value to those who possess it and who want to exchange it for some other object, is precisely equal to the quantity of labour which enables them to purchase or command"।[৭]

সব জিনিষের দাম শ্রমের পরিমাণের উপর নির্ভর করলে মানুষে মানুষে সম্পদের অসমতা খুব বেশী হতে পারে না। কেউ হয়তো কিছুটা বেশী সময় কাজ করে বা কারও দক্ষতা কিছুটা বেশী, তারা সম্পদ কিছুটা বেশী পেতে পারে, কিন্তু তার পরিমাণ অন্যদের চাইতে খুব বেশী হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবতা হল অল্প কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক, অধিকাংশ মানুষ কম বিত্তবান। কারণ হল লাভ বা মুনাফা (profit)। কার্ল মার্কস এর প্রায় একশ বছর আগে এ্যাডাম স্মিথ এটার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মূলধনও একটা মূল্য যোগ করে, যাকে তিনি রাজস্ব (revenue) বলেছিলেন। পুঁজির উপাদানগুলো যেমন যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ইত্যাদি শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায়। কিন্তু এগুলোও আগে শ্রমের দ্বারাই তৈরী হয়েছিল, যাকে মার্কস মৃত শ্রম (dead labour) নাম দেন। কাজেই যে কোন জিনিষের মূল্য নির্ভর করে শ্রমের উপর, যার কিছুটা বর্তমান ও আর কিছুটা আগের (dead labour)। সে কারণে পুঁজিপতিরা যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ও অন্যান্য অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্য যে অর্থ পায় তারও ভিত্তি শ্রমের উপর। পুঁজিপতির লাভসহ সকল মূল্যের উৎস শ্রম, এই ধারণা পুঁজিবাদের সমর্থকদের জন্য বিব্রতকর। তাদের বিশ্লেষণ হচ্ছে লাভ হল পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিপতির শ্রমিক নিয়োগ করার পুরষ্কার। মার্কসের মতে এই বিশ্লেষণ উদ্ভট। পুঁজিপতি যখন টাকা বিনিয়োগ করে তখন সে কোন ত্যাগ স্বীকার করে না। তার সম্পদের পরিমাণ বরং লাভসহ বাড়ে।[৮] শ্রমলব্ধ মূল্যের একটা অংশ পুঁজিপতি নিয়ে নেয় এটা এ্যাডাম স্মিথই উল্লেখ করেছেন, "In the original state of things, which precedes both the appropriation of land and the accumulation of stock, the whole product of labour belonged to the labourer… But as soon as the land becomes private property the land owner demands a share of the produce. The produce of all labour is liable to a like deduction of profit … In all manufactures the greater part of workmen stands in need of a master to advance them the materials of their work……. He shares in the product of their labour."

এ্যাডাম স্মিথের যুগে যে বাস্তবতা ছিল এ যুগে তা আরও বেশী সত্য। সম্পদ তৈরীর সমস্ত উপাদান (কারখানা,যন্ত্রপাতি, কৃষিভূমি) গুটিকয়েক মানুষের হাতে। বৃটেনে গত শতকের শেষভাগে ২০০টি কোম্পানী (যে গুলোর নিয়ন্ত্রক ছিল ৮০০ জন পরিচালক, যারা অনেকেই একাধিক সংস্থার নিয়ন্ত্রক) মোট পণ্যের অর্ধেকের বেশী উৎপাদন করত। বৃটেনের প্রায় আড়াই কোটি মানুষের কাজ করার বিকল্প নাই। এটা শুধু যে কারখানার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, যারা কারখানার শ্রমিক নয়, অফিসে বা দোকানে কাজ করে, তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। খুব কমসংখ্যক মানুষ নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কাজেই যারা কাজ করে তাদের উপর পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ আছে। এদের শ্রমের একটা অংশ পুঁজিপতিরা লভ্যাংশ হিসাবে নেয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ইতিহাস হল মন্দা ও সমৃদ্ধির ইতিহাস। দু'শ বছরে দেখা গেছে মাঝে মাঝে উৎপাদন বাড়তে বাড়তে এক সময় মন্দা শুরু হয় ও উৎপাদন কমে যায়, বেকারত্ব বাড়ে। এরপর আবার উৎপাদন বাড়ে। এইভাবে একবার সমৃদ্ধি একবার মন্দা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান তার লাভ যতদুর সম্ভব বাড়ানর চেষ্টা করে। যখন ব্যবসা লাভজনক থাকে যখন প্রতিটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বাড়াতে থাকে। তারা নতুন যন্ত্রপাতি বসায়, নতুন কারখানা তৈরী করে, আরও শ্রমিক নিয়োগ করে, এই বিশ্বাসে যে উৎপাদন যতই বাড়বে বিক্রিও ততই বাড়বে, লাভও তত বাড়বে। তাদের উৎপাদন বাড়াতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যারা যন্ত্রপাতি তৈরী করে, শ্রমিকদের জন্য ভোগ্যপণ্য তৈরী করে, তাদের উৎপাদন ও বিক্রি বেশী হতে থাকে। সমস্ত অর্থনীতি সবল হয়ে ওঠে, বেকারত্ব কমে যায়।

তবে এই সমৃদ্ধি স্থায়ী হয় না। উৎপাদন বাড়ার এক পর্যায়ে এসে কাঁচামাল, দক্ষশ্রমিক, প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ ইত্যাদির ঘাটতি হয়ে যায়। বাজার অর্থনীতিতে সব প্রতিষ্ঠান নিজেদের উৎপাদন বাড়ানর চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করে না। ফলে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়, সুদের হার বাড়ে, লাভ কমতে থাকে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশী হওয়ায় পণ্য অবিক্রিত থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলো তখন উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়। শ্রমিক ছাঁটাই করে, কোন কোন প্রতিষ্ঠান দেওলিয়া হয়ে যায়।[৯]

শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক পুঁজিপতিরা মন্দা কখন শুরু হবে তা বুঝতে পারে না। রাজনীতিবিদরাও বুঝতে পারে না। গত শতকের ৭০ এর দশকের মন্দার আগে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জন স্যামুয়েলসন বলেছিলেন আর কোনদিন মন্দা হবে না। গত শতকের ৮০ এর দশকে আমেরিকা ও ইউরোপের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অর্থনীতির অবস্থা ভাল বলে প্রচার করেছিলেন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ও অর্থমন্ত্রী নরম্যান্ট ল্যামন্ট বার বার বলেছিলেন মন্দা হবে না। প্রায় সব অর্থনীতিবিদরা তাদের সমর্থন করেছিলেন। ১৯৯০ এর পর শুরু হল মন্দা। নরম্যান ল্যামন্ট এরপর এভাবে কথা বলতে থাকলেন যেন মন্দা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। প্রতিটি মন্দায় মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে, সম্পদের ব্যাপক অপচয় হয়। গত শতকের ৯০ এর দশকে মন্দার সময় বৃটিশ অর্থনীতি প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৬ শতাংশ কম উৎপাদন করেছে। তিন বছর ধরে মন্দায় প্রতি বছর প্রায় ৩৬ বিলিয়ন পাউন্ডের উৎপাদন ক্ষতি হয়েছে।[১০] এটা ছিল এর আগের ১৬ বৎসরে তৃতীয় মন্দা। মন্দার সময় মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদনের ব্যবস্থা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে আর মানুষ জীবন ধারণের যা প্রয়োজন তা পায় না।

দুই শতাব্দী আগে একজন ফরাসী অর্থনীতিবিদ Jean Baptistie Say বলেছিলেন বাজার অর্থনীতিতে সংকট ঘটতে পারে না। সরবরাহ সবসময় চাহিদার সমান হয় এটা বাজারের "অদৃশ্য হাত" নিশ্চিত করে এবং পণ্যের দাম ও উৎপাদন কি পরিমাণে হবে তার নির্ণায়ক হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে প্রচলিত neo-classical মতবাদের এটা অন্যতম স্তম্ভ। তবে পণ্যের মূল্যের সংকেতের উপর ভিত্তি করে উৎপাদন ও সরবরাহ মসৃনভাবে করতে পারা সম্ভব নয়, বিশেষত: বর্তমান যুগে। পণ্য উৎপাদনের প্রস্তুতি শুরু হয় অনেক আগে। চাহিদা মত কল কারখানা তৈরী করতে হয়, যা কয়েক বছর লাগতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কাঁচামাল সংগ্রহ করতেও অনেক সময় লাগে। পরিকল্পনা করার সময় পণ্যের যে মূল্য ও চাহিদা ছিল তা পরে অন্যরকম হতে পারে। বিশেষত: "মুক্ত বাজারে" এক প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে উৎপাদন করে না। ফলে কখনও অতিরিক্ত উৎপাদন হয়, কখনও হয় ঘাটতি। পরিণতিতে মন্দা ও সমৃদ্ধি ঘটে। গত শতাব্দীর ৬০ দশকের শেষ দিকে Roy Radner নামে একজন অর্থনীতিবিদ গাণিতীক (mathematical) বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন বাজার অর্থনীতিতে সবসময় চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এটা সম্ভব নয়।[১১] বাস্তবে শেষ পর্যন্ত চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা হয় মন্দার পর সমাজ ও অর্থনীতির অনেক ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে।

অর্থনীতির গতির এই উঠানামা, মন্দা ও সমৃদ্ধির এই চক্র ঊনবিংশ শতাব্দীতেও দেখা গিয়েছিল। কার্ল মার্কসের মতে মন্দা শুরু হয় শিল্প বিপ্লব হওয়ার পর। প্রথম মন্দা হয় ১৮২৫ সালে। একটা সময়ে দেখা যেত সমৃদ্ধির, যখন উৎপাদন বাড়তির দিকে চলত আর বেকারত্ব কমে দুই শতাংশের কাছাকাছি থাকত। এর পরের সময়ে দেখা যেত পড়ন্ত উৎপাদন আর বেকারত্ব বেড়ে ১০ শতাংশের কাছাকাছি। মোটামুটি নিয়মিতভাবে কয়েক বৎসর পর পর এই চক্র চলত, তবে কয়েকটা চক্রের পর দেখা যেত গভীর মন্দা ও স্বল্পমেয়াদী সমৃদ্ধি। প্রায় ৫০ বছর পর পর এই রকম গভীর মন্দা হতে দেখা গেল। ঊনবিংশ শতকের ৭০ এর দশকের শেষের দিকে এই রকম গভীর মন্দা দেখা যায়। আবার বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকেও মন্দা হয় গভীরতর। কেন মাঝে মাঝে মন্দা গভীর হয় তা নিয়ে শুরু থেকেই বিশ্লেষণ হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ডেভিড রিকার্ডো লক্ষ্য করেছিলেন বিনিয়োগে লাভের হার ক্রমেই কমে যায়।[১২] এই ক্রমহ্রাসমান লাভের হার মন্দা গভীরতর হওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। কারণ লাভের হার কম হলে প্রতিটি মন্দা থেকে উত্তরণ আরও বেশী সময় নেয়।

লাভের হার ক্রমেই কমতে থাকে কেন সেটা নিয়েও মতপার্থক্য আছে। রিকার্ডো "Law of diminishing returns" দিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় বীজ, সেচ ও অন্যান্য উৎপাদনের রসদ বাড়াতে থাকলেও এক পর্যায়ে জমির উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমতে থাকে। তবে অনেকের মতে শিল্প উৎপাদনে এরকম হওয়ার কথা নয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে একসঙ্গে বেশী শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে খরচ কম পড়ে, তা'হলে লাভের হার কমা উচিৎ নয়।

লাভের হার কমে আসার ব্যাখ্যা কার্ল মার্কস দিয়েছেন। তাঁর মতে এটা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। প্রতিটি পুঁজিপতি অপর সব পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। টিকে থাকার উপায় হল আরও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাতে শ্রম কম দিতে হয় এবং উৎপাদন বাড়ে। এতে নির্দিষ্ট শ্রমশক্তির বিপরীতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়তে থাকে। যা বর্তমান কালেও ঘটতে দেখা যাচ্ছে। প্রায় সব শিল্প প্রতিষ্ঠানই নুতন উদ্ভাবন ও নুতন যন্ত্র উৎপাদনের কাজে প্রয়োগ করছে। ফলে উৎপাদনের প্রতিটি অংশে শ্রমিকের প্রয়োজন কম হয়। এর অর্থ এই নয় যে, সবসময় শ্রমিকের সংখ্যা কমতে থাকে। মোট উৎপাদন বাড়তে থাকলে মোট শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়বে। তবে বিনিয়োগের পরিমাণ ও শ্রম শক্তির অনুপাত বাড়তে থাকে। গত কয়েক দশকে এটা বেশ কিছু গবেষণায় দেখান হয়েছে। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত Booking Papers এ N.M.Bailey দেখান পণ্য উৎপাদনে পুঁজি ও শ্রমের অনুপাত যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৭-৫৮ সালে ছিল ১.৪৩, ১৯৭২-৭৫ সালে বেড়ে হয় ২.২৪। অক্সফোর্ডের পরিসংখ্যানবিদ Colin Clark দেখান যুক্তরাজ্যে ১৯৫৯-৬২ সালে ছিল ১.৭৮, ১৯৭২-৭৫ সালে বেড়ে হয় ২.১৯।[১৩]

কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ও শ্রমের অনুপাত সমস্যা নয়। বিনিয়োগ বাড়িয়ে উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে কম শ্রম ব্যবহার করে তুলনামূলকভাবে কম খরচে বেশী উৎপাদন করলে বাজারের আরও বড় অংশ পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাই প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বাজার দখল করার জন্য অধিক বিনিয়োগ করে। বাজারের অংশ বাড়লে বিক্রির পরিমাণ বাড়বে,লাভের অংশ বাড়বে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাই সর্বাধূনিক যন্ত্র এবং সর্বনিম্ন শ্রমশক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন খরচ কমিয়ে বাজারে তার পণ্যকে অন্য প্রতিষ্ঠানের চাইতে বেশী প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে এসে বাজারের আরও বড় অংশ দখল করার চেষ্টা করে।

তবে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য এই প্রক্রিয়া অপরিহার্য হলেও সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। লাভের উৎস যেহেতু শ্রম তাই যন্ত্রপাতির খরচ বাড়তে থাকে আর শ্রমশক্তি কম হওয়ায় লাভের হার কমতে থাকে। ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার যতই উন্নতি হয়, লাভের হার বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির হারের চাইতে কম বাড়ে।[১৪] একটি প্রতিষ্ঠান বা একজন পুঁজিপতির জন্য যা অবশ্য করণীয় তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যখন অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চেষ্টা করতে থাকে তখন সামগ্রিকভাবে লাভের হার কমতে থাকে। সব পুঁজিপতিই প্রভাবিত হয়ে এবং লাভের হার বাড়ানর জন্য আরও উন্নত যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ করার উদ্যোগ নেয়।

কার্ল মার্কসের এই বিশ্লেষণ কোন কোন অর্থনীতিবিদ সঠিক মনে করেন না। তাঁদের মতে কোন পুঁজিপতিই মুনাফার হার কমতে থাকলে বিনিয়োগ বাড়াবে না। বৃটিশ অর্থনীতিবিদ ইয়ান ষ্টীডম্যান ও জাপানী অর্থনীতিবিদ নোবুও ওকিশিও বলেন ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের বিপরীতে লাভের হার কমে যাওয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত এটা সঠিক নয়।[১৫] কিন্তু গত শতাব্দীর ৭০ ও ৮০ এর দশকে আগের দশকগুলোর চাইতে লাভের হার কমতে দেখা গেল এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তিনটি মন্দার মধ্য দিয়ে গেল।

লাভের হার কমে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও পুঁজিপতিরা বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। প্রধানত: তিনটি উপায়ে লাভের হার বাড়ানোর চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ তারা শ্রমিকদের আরও বেশী সময় কাজ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এতে শ্রমের "উদ্বৃত্ত মূল্য" বাড়ে এবং লাভের হার বাড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রথমদিকে শিল্প বিপ্লবের পর এটা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হত। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনের চাপে কাজ করার সময় কমেছিল। বৃটেনে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে সপ্তাহে গড়ে ৭২ ঘন্টা কাজ করত শ্রমিকরা, বিংশ শতাব্দীতে ৪৪ ঘন্টা হয়েছিল। মহামন্দার পর ১৯৩৩ সালের পরের দশকে এটা বেড়ে অনেকদিন স্থিতিশীল ছিল। ১৯৭৩ সালের মন্দার পর আবার বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৩ সালে শ্রমিকেরা গড়ে সপ্তাহে ৪০.৬ ঘন্টা কাজ করত। ১৯৮৫ সালে তা বেড়ে ৪৮.৪ ঘন্টা হয়। বৃটেনে ১৯৮৬ সালের পরবর্তী দশকে শ্রমিকেরা সপ্তাহে গড়ে ১ ঘন্টা বেশী কাজ করত। ইউরোপের মূল ভূখন্ডে শ্রমিকেরা শ্রম ঘন্টা বাড়ানর প্রচেষ্টা আন্দোলন করে থামিয়ে রেখেছিল। দ্বিতীয়তঃ পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের একই সময়সীমার মধ্যে আরও বেশী কাজ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এজন্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করা হল। হেনরী ফোর্ডের মটর গাড়ি তৈরীর কারখানায় এসেম্বলী লাইন চালু করা হল, এতে শ্রমিকেরা বাধ্য হল যে গতিতে এসেম্বলী লাইন চালান হয় সেই গতিতে কাজ করতে। এ ছাড়া যন্ত্রপাতিতে কাজের সংখ্যা গণনা করার জন্য মেকানিক্যাল কাউন্টার লাগান হল। এই প্রক্রিয়া বর্তমান যুগেও চলছে। কাজের পরিমাণ মূল্যায়ণ করার জন্য নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। কাজের পরিমাণ হিসাব করে সেই অনুপাতে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু একই সময়সীমার মধ্যে কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে লাভের হারের উন্নতি করা একটা পর্যায়ের পর আর সম্ভব হয় না।[১৬] তখন পুঁজিপতিরা আবার কাজের সময় বাড়ানর চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কমানর চেষ্টা করে। এর অর্থ এই নয় যে শ্রমিকদের বেতন সবসময় কমে। অর্থনীতি যখন সমৃদ্ধির পর্যায়ে থাকে তখন মোট উৎপাদন বাড়ে, পুঁজিপতিদের লাভের হার বাড়ে, শ্রমিকদের মজুরীও কিছুটা বাড়ে। এমনকি বিংশ শতাব্দীর ৭০ ও ৮০ দশকে মন্দার মধ্যেও শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মানের সামান্য উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু এর বিনিময়ে শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়েছে। তবে পুঁজিপতিদের লাভের হার বজায় রাখতে হলে একটা পর্যায়ে শ্রমিকদের মজুরী কমাতেই হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিগত তিন দশকে শ্রমিকদের গড় মজুরী কমান হয়েছে।

নিও ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির একটা অংশের প্রচলিত মত যে শ্রমিকের মজুরী যদি কমতে থাকে তাহলে একটা পর্যায় আসবে যখন পণ্য বিক্রি আবার লাভজনক হবে। তখন বিনিয়োগ আবার বাড়বে। কাজেই শ্রমিকদের মজুরী বিনা বাধায় কমানর জন্য শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়া অথবা দুর্বল করে দেওয়া দরকার। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় না। মন্দা ঘটেছে যে সব দেশে শ্রমিক সংগঠন দুর্বল সেদেশে, আবার যে সব দেশে শ্রমিক সংগঠন শক্তিশালী সে দেশেও । বিংশ শতাব্দীর ৩০ দশকে আমেরিকা ও বৃটেনে শ্রমিক সংগঠন দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মন্দা হয়েছিল। ৯০এর দশকে এই দুই দেশে শ্রমিক সংগঠনগুলোর শক্তি খর্ব করার পরও মন্দা ৬০ দশকের চাইতেও গভীরতর হয়েছিল (৬০ দশকে শ্রমিক সংগঠনগুলোর শক্তি আরও বেশী ছিল)। কেইনেসিয়ান (Keynesian) অর্থনীতিবিদেরা ৩০ ও ৪০ দশকে বলে ছিলেন শ্রমিক মজুরী কমালে মন্দা আরও গভীর হবে। কারণ মজুরী কমলে শ্রমিকরা পণ্যদ্রব্য কম কিনতে পারে, ফলে চাহিদা কমে। অবিক্রিত পণ্য থাকায় পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ বাড়ায় না। কিইনেসিয়ানদের যুক্তি ছিল সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করে চাহিদা বাড়ালে মন্দার তীব্রতা কমবে। ত্রিশের দশকের মহামন্দার পর থেকে প্রায় পঁচিশ বছর এই চিন্তাবিদদের প্রভাব বেশী ছিল কিন্তু মধ্য সত্তুরের দশকের মন্দায় বড় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সরকারী হস্তক্ষেপের পরও মন্দা কমাতে না পারায় এর প্রভাব কমে যায়।

প্রতিটি মন্দায় পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরিবর্তন আসে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবসা চালাতে পারে না-দেওলিয়া হয়ে যায়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে টাকা থাকায় তারা লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কম দামে কিনে নিতে পারে।

১৯৯০ সালের মন্দায় লন্ডনের Canary Wharf office development বিক্রি করতে হয়েছিল ৬০ মিলিয়ন পাউন্ডে যার প্রকৃত মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন পাউন্ড। এতে মূল মালিক রাইখম্যান ব্রাদার্স ক্ষতিগ্রস্ত হলেও যারা কম দামে কিনল তাদের জন্য লাভ হল। এইভাবে কল-কারখানাও কম দামে বিক্রি হয়। ফলে অল্প দামে আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনে কোন কোন প্রতিষ্ঠান আবার উৎপাদন শুরু করতে পারে।

তাই যে সব প্রতিষ্ঠান মন্দায় টিকে থাকতে পারে তাদের লাভের হার বাড়ে। মন্দায় কল-কারখানাসহ পুঁজির বড় অংশ ক্ষতির মধ্যে ধরা হয়। ফলে শ্রম শক্তির অনুপাতে বিনিয়োগের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির হার কমে। কাজেই মন্দায় সামগ্রিকভাবে লাভের হার বাড়ে। তবে শ্রমশক্তির তুলনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রবণতা পুরোপুরি বন্ধ হয় না। কোন কোন বিশেষজ্ঞের হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৮০ সাল থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে শ্রমশক্তির তুলনায় বিনিয়োগ দ্বিগুণ বেড়েছিল। একই ধরণের ঘটনা বৃটেনে ১৯৮০ সালের মন্দায় দেখা গিয়েছিল।[১৭] লাভের হার বৃদ্ধিও স্থায়ী হয় না। ১৯৮০-৮২ সালের মন্দায় গড় লাভের হার বৃদ্ধি এই দশকের শেষে কিছুটা বেশী হয়, কিন্তু ৫০ তা ৬০ ও ৭০এর দশকের প্রথমদিকের হার বৃদ্ধির চাইতে কম ছিল। ৯০ এর মন্দায় আবার তা কমে যায়।

সারনী

সমৃদ্ধির যুগ (১৯৪০-১৯৭০) ও মন্দার যুগের (১৯৭০-১৯৯৩) এর তুলনামূলক ছক চিত্র (গড় বাৎসরিক পরিবর্তন)

	পণ্য উৎপাদনের মোট লাভের হার		ব্যক্তিগত ব্যবসায় লাভের হার	
দেশের নাম	১৯৫০-৭০	১৯৭০-৯৩	১৯৫০-৭০	১৯৭০-৯৩
যুক্তরাষ্ট্র	২৪.৩৫	১৪.৫	১২.৯	৯.৯
জার্মানী	২৩.১	১০.৯	২৩.২	১৩.৮
জাপান	৪০.৪	২০.৪	২১.৬	১৭.২

সূত্রঃ Brenner R.The Boom and the Bubble,2002

বৃটেনে পুঁজিবাদের আবির্ভাবের পর চক্রাকারে বার বার ফিরে আসা মন্দা ক্রমেই ব্যাপক ও তীব্র হতে থাকে। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের (১৮০৩ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত নেপোলিয়নের ফরাসী সাম্রাজ্য ও বৃটেনের নেতৃত্বে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পরায় সংঘটিত যুদ্ধাবলী) পর বৃটেনে অর্থনৈতিক মন্দা হয়। তাতে শহরে ও গ্রামে মানুষের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। অসন্তোষ গড়ে উঠতে থাকে। বৃটিশ সরকার বিপ্লবের ভয়ে আরও বেশী নিপীড়নমূলক আইন তৈরী করে। এই ঘটনাগুলো সে যুগের দুজন বড় Classical অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস ও রিকার্ডোকে চক্রাকারে সংঘঠিত মন্দার কারণ বিশ্লেষণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল বার বার ঘটতে থাকা এই মন্দাগুলো অবধারিত ও মেনে নেওয়া উচিৎ। এই মত অসন্তোষ প্রশমিত করতে বেশী সাহায্য করেনি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বুদ্ধিজীবীদেরও সন্তুষ্ট করে নি।[১৮] তবে এই বুদ্ধিজীবীরা তখনও শিল্পবিপ্লবের আগের সময়ের প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের শান্তিতে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। শিল্প সমৃদ্ধ সমাজের সংকট নিরসনের চিন্তা তাদের ছিল না। ১৮৩০ ও ১৮৪০ সালের মন্দা বৃটেন ছাড়াও ইউরোপের মূল ভূখন্ডের দেশগুলিতে দেখা দিল। এই সময় বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হল। পর পর কয়েকটি বিদ্রোহ ঘটে গেল। এর মধ্যে ছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লব ও ১৮৪০ সালের প্যারিস অভ্যুত্থান। মার্কস ও এঙ্গেলস এর কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো (Communist Manifesto) এই সময়ে প্রকাশ হওয়াটা কাকতালীয় নয়। তবে সমসাময়িক ঘটনাবলীর উপর এই ম্যানিফেষ্টোর প্রভাব তেমন পড়ে নি।

এই বিদ্রোহগুলো দমন করা হল। ১৮৪৮ সালের পর অর্থনীতিতে কিছুটা সমৃদ্ধি আসল ও সংঘাতের সম্ভাবনা কমে গেল। এই সময় শিল্প বিপ্লব আরও সংহত হল এবং সমস্ত ইউরোপ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তৃত হল। এই বিস্তারই ছিল সমৃদ্ধি ফিরে আসার অন্যতম কারণ। যে সব প্রযুক্তি বৃটেনে চালু করা হয়েছিল তা তখন ইউরোপের অন্যান্য দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হল। ফলে উৎপাদন বাড়ল, নতুন বাজার সৃষ্টি হল, অর্থনীতির উন্নতি হল। তবে পৃথিবীর অন্যান্য

অঞ্চল, যেগুলো ইউরোপীয় দেশগুলোর দখলে ছিল, এই শিল্প বিপ্লবের বাইরে রয়ে গেল। সেগুলোতে সাম্রাজ্যবাদীরা স্থানীয় উৎপাদকদের বেড়ে উঠতে দিল না। চীন ও জাপানও এর বাইরে রয়ে গেল।

১৮৭৩ সালে স্টক মার্কেটে ধ্বস নামল ও সমৃদ্ধির যুগ শেষ হল। এরপর আবার প্রায় বিশ বছরব্যাপী মন্দা থাকল যা great depression নামে পরিচিত। প্রবৃদ্ধির সময় ইস্পাত তৈরী, রেলপথ তৈরী ইত্যাদিতে লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছিল। শেষদিকে এসে পুঁজির পরিমাণ বাড়তে থাকল কিন্তু লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করার সুযোগ কমে গেল। রেলপথ, ইস্পাত তৈরী এগুলোর বাজার পূর্ণ হয়ে গেল। ভুয়া কোম্পানী তৈরী করে লাভের সৃষ্টি করা এবং এই ধরনের ফাঁকিবাজি ব্যাপকভাবে শুরু হল। পরিণতিতে ধ্বস নামল। ১৮৯৫ সাল নাগাদ অর্থনীতি আবার সবল হতে থাকল। এই সময় নতুন প্রযুক্তির প্রচলন হল। মটরগাড়ি চালু হল। মটরগাড়ি, জাহাজ ও কারখানায় জ্বালানী তেল ব্যবহার করা শুরু হল। এতে আগের প্রযুক্তি চাপে পড়ল যেমন, কয়লাচালিত রেলগাড়ি ও জাহাজ। পুরনো প্রযুক্তির শ্রমশক্তি কাজ হারাতে থাকল। ফলে এই সময় শ্রমিক আন্দোলন ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছিল।

এই সময় রাষ্ট্র পরিচালকরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, কিছু কিছু শিল্প ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের উদ্যোগেই করতে হবে। কারণ এগুলিতে বিনিয়োগ ব্যয়বহুল ও ব্যক্তি পুঁজি এগিয়ে আসে না। এর মধ্যে ছিল পানি সরবরাহ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের অংশ বাড়ল এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত মানুষের সংখ্যাও বাড়ল। অর্থনীতি পরিচালনা ব্যক্তি পুঁজির হাতে পুরোপুরি ছেড়ে না দিয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা বাড়ান হল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বৃটিশ সরকার কয়লা উৎপাদন ও রেলপথ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল। তবে অর্থনীতি সবল রাখার জন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু হবে তা পরিস্কার ছিল না। সাধারণভাবে এটা মনে করা হত সরকারের ভূমিকা হচ্ছে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা ও সুদের হার কম রাখা। তবে এটা যে অর্থনীতিতে পৌণ:পূনিক মন্দা ঠেকাতে পারবে না তা কেউ জানত না।[১৯]

১৯২৫ সালে অর্থনীতি সচল হল। তারপরই ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকার ওয়াল স্ট্রীটের পুঁজি বাজারে ধ্বস নামল। এটা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে, সম্পদের দাম কমল, অনেক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল ৩০ দশকের মহামন্দা। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে অনেক দেশের উৎপাদন ১৫ শতাংশ কমল। বেকারত্ব অনেক দেশে ৩০ শতাংশের বেশী হল। ১৮৭৩ সালের মন্দার চাইতেও এই মন্দায় সামাজিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। ফলে রাজনীতিতে তার প্রভাবও ছিল বেশী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যে ঋণ (বিশেষত: জার্মানীর) নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল তা ভেঙ্গে পড়ল। সব দেশই নিজস্ব বাজার রক্ষার জন্য আমদানীতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করল। বৃটেন ও আমেরিকার আভ্যন্তরীন ও অধিকৃত দেশগুলির বাজার বড় থাকায় তুলনামূলকভাবে জার্মানী বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল, কারণ জার্মানীর অধিকৃত দেশ ছিল না।

১৯৩৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার উদ্যোগ নিলেন। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, পুঁজিপতিদের বিরোধিতা, সুপ্রীম কোর্টের বাধা এইসব কারণে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হল সীমিত। একটা ক্ষেত্রে রুজভেল্ট বাধা পেলেন না তা হল অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে (finance sector) মজবুত করা। এটা পুঁজিপতিরাও সমর্থন করল। ওয়াল স্ট্রীটে ধ্বস নামার পর ব্যাংকিং খাতেও ধ্বস নামে। শুধু ১৯৩০ সালেই প্রায় দুই হাজার ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। এটা অর্থনীতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। Federal Deposit Insurance Corporation নামে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানত এই প্রতিষ্ঠানে বীমা করার জন্য আইন করা হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের দেশগুলি সেখানকার ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যাংকগুলির দায়িত্ব নিয়েছিল। এভাবে রাষ্ট্র বিপদগ্রস্ত ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানর অলিখিত অঙ্গিকার থাকার প্রথা চালু করল।

মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রের সম্পদ বিনিয়োগ করে মন্দার ক্ষতি থেকে উত্তরণ পরিকল্পনা পরবর্তীতে (১৯৩৬ সালের পর) বৃটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইনস এর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে Keynesianism নামে পরিচিত হয়। যদিও এই প্রক্রিয়া তাত্ত্বিক সমর্থন ছাড়াই আগে শুরু হয়েছিল। বৃটেন ৩০ দশকের প্রথমদিকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বেশী উৎসাহ না দেখালেও জার্মানী ভার্সাই চুক্তি অমান্য করে আগ্রাসী কর্মকান্ড শুরু করলে সামরিক খাতে ব্যয় বাড়াতে বাধ্য হয়। ১৯৩৬

থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে বৃটেনের প্রতিরক্ষা বাজেট তিনগুণ বাড়ান হয়। এরপর ১৯৪০ সালে যুদ্ধ শুরু হলে সব মানুষকে কাজে লাগান হয় (full employment)।

ত্রিশ দশকের মন্দার চরিত্র ছিল আগের মন্দাগুলির চাইতে আলাদা। এবারের মন্দা ছিল দীর্ঘস্থায়ী। অন্যান্য বারের মত এবার অর্থনীতিতে স্বাভাবিক গতি ফিরে আসে নি। ১৯৩৩ সালে অর্থনীতি কিছুটা গতি ফিরে পেলেও পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার আগেই ১৯৩৭ সালে আবার ধ্বস নামল। বেকারত্বের হারই এটা তুলে ধরতে পারে। ১৯৩৩ সালে বেকারত্বের হার শীর্ষে পৌঁছে, শ্রমশক্তির ২৪.৯ শতাংশ। ১৯৩৭ সালে কমে ১৪.৩ শতাংশ হয়ে পরের বছর (১৯৩৮) আবার বেড়ে ১৯ শতাংশ হয়। বিশেষজ্ঞরা আশা করেছিলেন কিছুটা সময় লাগলেও অর্থনীতি আবার সচল হবে। তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের চাহিদার কোন শেষ নাই। অর্থনীতিতে ভারসাম্য না থাকার কারণে মন্দা হলেও চাহিদা বজায় থাকার জন্য সচল হয়। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে বাধা আসার কারণ ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, যা সাময়িক। ১৯৩০ এর দশকে অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল তাঁর বহুল পঠিত অর্থনীতির বইয়ে লিখেছিলেন, মানুষের নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হবে না এমন মনে হয় না, কাজেই পুঁজির বিনিয়োগের প্রয়োজনও শেষ হবে না।[২০] কিন্তু ৩০ দশকের মন্দা এ তত্ত্ব যে সঠিক নয় তার প্রমাণ দিল। পুঁজির অভাব ছিল না, ছিল বিনিয়োগ করার চাহিদার অভাব। সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারায় যে ত্রুটি ছিল তা তুলে ধরলেন কেইনস (Keynes) তাঁর ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত বই General Theory of Employment, Interest and Money তে। এতে তুলে ধরা হল যে, সম্পদ পুঞ্জিভূত করার প্রক্রিয়ার বাধা অর্থনীতির ব্যবস্থার মধ্যেই থাকতে পারে এবং তা নিজে নিজে ঠিক হয়ে যাবে তাও নয়। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাসে চিড় ধরল। আরও দু'জন অর্থনীতিবিদ আলভিন হ্যানসেন ও যোসেফ সুমপিটার এ ধারাটি সমর্থন করেন ও আরও বিশ্লেষণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু না হলে সম্ভবত মন্দা ৪০ দশকেও থাকত।[২১] যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকার কোন সীমা থাকল না। রাষ্ট্র উৎপাদনের সব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে থাকল, বাজেট ঘাটতি দ্বিগুণ হয়ে গেল। পুরনো কারখানা আবার সচল করা হল, নতুন নতুন কারখানা তৈরী করা হল, উৎপাদন আকাশ ছুঁয়ে গেল। শিল্পকারখানাগুলো যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণের উৎপাদন বাড়িয়ে তুলে রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ দুর্বল হয়ে গেল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সমৃদ্ধ হল। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিল্প উৎপাদন মহামন্দার ইতি ঘটাল। যুদ্ধশেষে পৃথিবীর মোট সম্পদের অর্ধেকটাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু যুদ্ধের পর প্রায় অর্ধেক ইউরোপই ছিল সোভিয়েত লাল ফৌজের দখলে আর পশ্চিমা জনগণ প্রকাশ্যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা শুরু করেছিল। এছাড়াও যুদ্ধশেষে মন্দা আবার ফিরে আসতে পারে ভেবে পুঁজিবাদী দেশগুলোর কর্ণধারেরা ভয় পেতে লাগল। জন কেনেথ গলব্রেথ বলেছেন,১৯৩০ এর দশকের মন্দা আসলে শেষ হয় নি, তা যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যে মিলিয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই তারা আমেরিকার ব্রেটন উডস শহরে মিলিত হয়ে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর জ্যেষ্ঠ ঐতিহাসিক জেরাল্ড হাইন্স লিখেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেয়। সেই সময় মার্কিন প্রশাসনে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব জর্জ কেনান লিখেছেন, আমেরিকার উচিৎ হবে মানবাধিকার, জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, গণতন্ত্র এসব নীতিনির্ধারণের সময় বিবেচনায় না আনা, যদিও জনসমক্ষে আলোচনার সময় এসব কথা বলতেই হয়। নীতিনির্ধারণের সময় বিবেচনায় আনতে হবে শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের বিষয়। এসব তথ্য সংক্রান্ত দলিল বহু বছর পরে দেখতে দেয়া হচ্ছে।[২২]

আমেরিকার পরিকল্পনায় ডলারকে কার্যত বিশ্বের মুদ্রায় পরিণত করা হল। ব্যবস্থা করা হল আমেরিকা ইউরোপ ও জাপানে পুঁজি রপ্তানী ও বিনিয়োগ করবে। ইউরোপ ও জাপান আমেরিকার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মেনে নেবে।[২৩] বিশ্ব অর্থনীতিতে বৃটেনের কর্তৃত্ব খর্ব করে দেওয়া হল। পরাজিত শক্তি জার্মানী ও জাপানকে পুনর্গঠনে সহায়তা করল আমেরিকা। মার্শাল প্ল্যানের মাধ্যমে ১৯৫১ সালের মধ্যে ১২.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে ইউরোপের উৎপাদন ৩৫ শতাংশ বাড়ান হল। আমেরিকা ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তার মোট জাতীয় আয়ের ২ শতাংশ এই সহায়তায় খরচ করল।

বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পঁচিশ বছরে অভূতপুর্ব উন্নতি করল, অনেকেই এটাকে "পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ" বলেন। মার্কিন অর্থনীতি বাড়ে তিনগুণ, জার্মানীর পাঁচগুণ, ফ্রান্সের তিনগুণ ও বৃটেনের দুইগুণ। এই সময়ে শিল্পোন্নত দেশগুলির মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হারের গড় বছরে ৪.৩ শতাংশ হারে বাড়ে। এর আগের

বছরগুলিতে এই গড় ছিল অর্ধেক। এই প্রবৃদ্ধির কারণ কয়েকটি, যুদ্ধবিধস্ত শিল্প কারখানা ও কৃষির উন্নতির জন্য বিনিয়োগ, যুদ্ধ পরবর্তী ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি। তবে অর্থনীতিতে অস্ত্র উৎপাদনের প্রধান ভূমিকা বজায় রাখা একটা বড় কারণ। ৩০ দশকে মার্কিন অর্থনীতিতে অস্ত্র উৎপাদনের অংশ ছিল মাত্র ১ শতাংশ, যুদ্ধের পর পরই ৫০ এর দশকে তা বেড়ে হল ১৫ শতাংশ। এমনকি ৬০ এর দশকেও এটা ছিল ৮ শতাংশ।[২৪]

শিল্পোন্নত দেশগুলোর মোট জাতীয় আয় (GNP) এর যোগফলের শতাংশ হিসাবে কতকগুলি দেশের অংশঃ

দেশের নাম	১৯৫৩ সাল	১৯৭৭ সাল
আমেরিকা	৬৯	৪৮
জাপান	৩.৬	১৭.৭
পশ্চিম জার্মানী	৬.৫	১৩.২
ফ্রান্স	৮.০	৯.৭
যুক্তরাজ্য	৮.৯	৬.৩

সূত্রঃHarman C. Explaining the Crisis. London,1987 p.97

এই দীর্ঘ সময় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি বজায় থাকায় পুঁজিবাদী দেশগুলোর কর্ণধার ও বিশ্লেষকদের মধ্যে মন্দার ভীতি কেটে গেল। ক্রমেই এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হল যে মন্দা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে এবং অর্থনীতিতে এখন থেকে প্রবৃদ্ধিই চিরন্তণ হবে।

যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থেই জার্মানী ও জাপানে শিল্প গড়ে তুলল। ১৯৫২ সালে জাপানের মাথাপিছু গড় আয় মালয়েশিয়া বা ব্রাজিলের মাথাপিছু গড় আয়ের চাইতেও কম ছিল। পৃথিবীর মোট রপ্তানীর মাত্র ১.৭ শতাংশ ছিল জাপানের। ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে জাপান পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হল। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় ও বিশ্বে সমর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য আমেরিকা সমরাস্ত্র শিল্পে উচ্চ বিনিয়োগ বজায় রাখল তা আগেই বলা হয়েছে। জার্মানী ও জাপান পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে তাদের রপ্তানী বাজার বাড়িয়ে নিল। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকেও বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রাখতে পেরেছিল। ফলে অস্ত্র উৎপাদন চালু রাখা ও সাথে সাথে বিদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে পেরেছিল। কিন্তু বাজার বজায় রাখার জন্য অস্ত্র উৎপাদন কিছুটা কমাতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৫১ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় অস্ত্র উৎপাদনে জাতীয় উৎপাদনের ১৩.৪ শতাংশ ব্যয় হত। ১৯৬০ এর দশকের প্রথমদিকে কমে হয় ৮ শতাংশের কাছাকাছি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। পরাজয় এড়াতে প্রেসিডেন্ট জনসন ও নিক্সন সামরিক ব্যয় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাড়িয়ে দেন। এই অতিরিক্ত চাপের ফলে মার্কিন রপ্তানী প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ল। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল এবং আমেরিকার পুঁজিপতিরা যুদ্ধের বিপক্ষে চলে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে প্রথম রপ্তানীর চাইতে আমদানী বেশী হল।

সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় লাভের হার কমে আসছিল, ফলে বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা ও বেকারত্বের হার কম রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। জাপান ও জার্মানী উচ্চহারে পুঁজি বিনিয়োগ করছিল, অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় এ হার ছিল প্রায় দ্বিগুণ।[২৫] উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তারা কম দামে পণ্য সরবরাহ করতে পারল। তাদের বাজার অংশসহ মোট বাজারের অংশ তারা বাড়াল ও মুনাফার হার বাড়ল। প্রতিযোগিতায় পণ্যের দাম কমল। অন্যান্য দেশগুলিও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করতে বাধ্য হল। এভাবে মুনাফার হার ক্রমেই কমতে থাকে। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকার পণ্য উৎপাদন খাতে মুনাফার হার ৪৩.৫ শতাংশ কমে যায়। জি-৭ দেশগুলির গড় পণ্য উৎপাদনে মুনাফার হার কমে ২৫ শতাংশ।[২৬] আমেরিকায় বাণিজ্য ঘাটতি ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যয় বাড়ায় ডলারের সরবরাহ বাড়ে ও ডলারের মুদ্রামান কমতে থাকে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী ডলারের সঙ্গে স্বর্ণের যে নির্দিষ্ট মান রাখার চুক্তি ছিল তা আমেরিকা বাতিল করে। ফলে জার্মানী ও জাপানের মুদ্রার মান বেড়ে যায়,

উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়ে এবং মুনাফার হার কমতে থাকে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে ১৯৭০ এর পরের বছরগুলিতে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা বেশী হওয়ায় (over capacity) প্রায় এক পঞ্চমাংশ উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকে।

৬০ দশকের শেষ দিক থেকেই পণ্য উৎপাদনে মুনাফার হার কমতে থাকে এবং উৎপাদন ক্ষমতার অব্যবহৃত অংশ বাড়তে থাকে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সালে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এটাই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্পোন্নত বিশ্বে আগের তুলনায় বছরের কম উৎপাদন। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে জ্বালানী তেলের দাম বাড়া এই মন্দার কারণ বলা হলেও মন্দার মূল কারণ ছিল পণ্য উৎপাদনে মুনাফার হার কমে যাওয়া।[২৭] যুদ্ধ পরবর্তী প্রায় দুই দশকব্যাপী সমৃদ্ধি যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত সমস্যা সমাধান করে নি তা এই মন্দা তুলে ধরল। তবে বিশেষজ্ঞরা এটা এখনও মানতে পারেন নি। যুদ্ধ পরবর্তী যে চাহিদার সৃষ্টি হয়েছিল (কারণ সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে) সেটা পূরণ হয়ে যাওয়ার পর লাভজনকভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করার সুযোগ কমে আসতে থাকল। বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতারও পূর্ণ ব্যবহার করা যাচ্ছিল না।[২৮]

আমেরিকার উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার

সাল	হার শতাংশ
১৯৬৫	৮৯
১৯৬৭	৮৭
১৯৬৯	৭৯
১৯৭১	৭৮.৫
১৯৭৩	৮৪
১৯৭৫	৭৩
১৯৭৭	৮২
১৯৭৯	৮৬
১৯৮১	৭৯.৫
১৯৮৩	৮২
১৯৮৫	৮০

সূত্রঃ Economic Report of the President,1986

সত্তুরের দশকের মন্দার ফলে কেইনসিয়ান অর্থনীতিবিদরা সমালোচনার মুখে পড়েন। সীমিত রাষ্টীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব এবং মন্দা এড়ান সম্ভব-তাদের এই মত ঠিক নয় তা প্রমাণ হল। নিও ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা বল্লেন এর মধ্যে বাজারের (market) বিকৃতি ঘটিয়ে বিপথে নেওয়া হয়েছে। সম্পদ সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করা হয় নাই। নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরাই এই সময়ের পর থেকে প্রাধান্য পান। কিন্তু তাঁরাও মেনে নেন নি যে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মন্দা অন্তর্নিহিত।

মন্দার কারণে পৃথিবীব্যাপী যেন বিপর্যয় না ঘটে সে জন্য পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলি সচেষ্ট হল। মন্দা থেকে উত্তরণের জন্য সাতটি বড় পুঁজিবাদী দেশগুলো ১৯৭৫ সাল থেকে বৎসরে একবার অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা সমন্বয় করার জন্য মিলিত হওয়া শুরু করলেন যা জি-৭ নামে পরিচিত। এই বার্ষিক সভা এখনও হচ্ছে। কারণ হল বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থায়ী সমৃদ্ধি আসে নি, মন্দা এখনও বারে বারে ফিরে আসছে।

১৯৫০ এর দশকে আমেরিকায় কর্মচারীদের অবসরভাতা দেওয়ার জন্য পেনসন স্কীম চালু করা হয়েছিল। এটাই ছিল বেসরকারী খাতের কর্মচারীদের অবসরভাতার প্রধান উৎস। এই তহবিলের টাকা বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লগ্নী করা হত। অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি কম থাকলে এই তহবিলগুলোর পক্ষে অবসরভাতা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই ব্যাংক ও

অন্যান্য অর্থ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান যাতে মন্দায় দেওলিয়া হয়ে না যায়, তার ব্যবস্থা আমেরিকা সরকার নিল। দেওলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকার আর্থিক সহায়তা দিল। ফলে খুব কম ব্যাংকই দেওলিয়া হল। এছাড়াও ১৯৭৪ সালে আমেরিকার কংগ্রেস Employee Retirement Income Security Act পাস করল। এর মাধ্যমে বেসরকারী পেনসন ফান্ড গুলোকে দেওলিয়া হওয়ার হাত থেকে সুরক্ষা দেওয়া হল। এই আইনের নিশ্চয়তার ফলে বেসরকারী পেনসন ফান্ডগুলোকে ফাটকা বাজারে ব্যবহার করার সুযোগ হল ও অর্থ বাজার পরবর্তীতে ফেঁপে উঠার একটা বড় উপাদান হয়ে দাঁড়াল।[২৯] ২০১০ সালের মার্চ মাস নাগাদ জাপানের পেনসন ফান্ডগুলোর মূল্য ছিল ১৩৭০ বিলিয়ন ডলার, আমেরিকার ব্যাংকগুলোর ৮৩২ বিলিয়ন, নরওয়ের ৮৫৬ বিলিয়ন ও নেদারল্যান্ডের ৪২৭ বিলিয়ন ডলার।[৩০] ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে সবচেয়ে বড় পেনসন ফান্ডগুলোর আটটি তাদের মোট অর্থের ৪৫ শতাংশ বেসরকারী equity fund এ বিনিয়োগ করার জন্য দিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে আমেরিকায় মোট স্টকের ১৬ শতাংশ ছিল সব পেনসন ফান্ডগুলোর মালিকানায়। ১৯৯৪ সালে তা বেড়ে হল ২৬ শতাংশ। ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালে শেয়ার বাজার এ ধ্বস নামায় আমেরিকার সরকারী পেনসন ফান্ডগুলো তাদের অর্থের ২৭.৬ শতাংশ হারায়। ফলে অনেকেই তাদের নির্ধারিত অবসরভাতার চাইতে অনেক কম নিতে বাধ্য হয়।

অর্থনীতিতে গতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯৮০ এর দশকের প্রথমভাগে আবার মন্দা ফিরে আসল। কিন্তু পণ্যের কম চাহিদা ও মন্দা যে অন্তর্নিহিত এটা কর্তৃপক্ষ বা বিশেষজ্ঞ কেউই স্বীকার করছিল না।এটার দুটো কারণ ছিল- প্রথমতঃ এটা স্বীকার করলে অর্থনীতি গতিশীল করার জন্য ব্যক্তিপুঁজির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দাবী জোরালো হত। দ্বিতীয়তঃ এটা মেনে নেলে উৎপাদন ক্ষমতার যে অংশ কম চাহিদার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল না, তা বাতিল করতে হবে। ফলে স্টক, বন্ড ইত্যাদির দাম কমে যাওয়ায় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হত। এরকম একটা বিপর্যয় ঠেকানর জন্য ক্রমেই কমতে থাকা জাতীয় আয়ের আরও বড় অংশ দিয়ে পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ানর বিকল্প তাদের কাছে ছিল না। এই কারণগুলোর জন্য অর্থনীতিতে নয়া উদার বা নয়া ক্লাসিক্যাল মতবাদের অনুসারীরা রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়ের সমতা আনার প্রচেষ্টা করেনি। তারা কর কমিয়ে দিল যা পুঁজিপতিদের বেশী উপকারে আসল। যুক্তি ছিল এই অর্থ তারা বিনিয়োগ করে অর্থনীতিতে গতি আনবে। এছাড়াও সুদের হার কমিয়ে বা বাড়িয়ে বাজারে অর্থের সরবরাহের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল। পুঁজি চলাচলে বিধিনিষেধ কমান হল। অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধার দেওয়ার ক্ষমতা আর বিভিন্ন ধরনের Financial Instrument বাজারে ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু কার্যত এর ফলে সরকার অর্থের সরবরাহের উপর তার নিয়ন্ত্রণ হারাল। পুঁজি চলাচল অবাধ করা, অন্যান্য দেশের আমদানী নীতি চাপ দিয়ে পুঁজিপতিদের সুবিধা দেওয়া, এগুলোই ছিল নব্য উদার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের ফল। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার কম হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা কম ব্যবহার করা পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে দেখা গেল। ফলে বিনিয়োগের সুযোগ আরও কমতে থাকল।

১৯৮০ এর দশকে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে (তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও হংকং) শিল্প কারখানা বাড়ার ফলে পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা বিশাল ভাবে বাড়ল। জাপান ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মোট রপ্তানীতে ০.৯ শতাংশ থেকে ৬.০ শতাংশ বাড়াতে পেরেছিল। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ১.২ শতাংশ থেকে ৬.৪ শতাংশ বাড়াল। ১৯৯০ সাল নাগাদ আমেরিকার এই অংশ ছিল ১১.৭ শতাংশ, জার্মানীর ১২.৭ ও জাপানের ৮.৫ শতাংশ।[৩১] এই সময় পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো শুধু যে ভারী শিল্প উৎপাদন শুরু করেছিল তাই নয় তারা উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন পণ্য তৈরীও শুরু করেছিল। এটা পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলল। উন্নয়নশীল দেশগুলোর পণ্য কেনার ক্ষমতা বাড়ল না। ফলে পণ্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে পণ্যের দাম কমতে থাকল, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার ও লাভের হারও কমতে থাকল।

লাভের হার কমে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে আমেরিকায় পুঁজিপতিরা পৃথিবীর অর্থনীতির গঠন পরিবর্তন করল। প্রথমত: ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি আমেরিকার সরকারের মাধ্যমে প্রতিযোগী দেশগুলোকে বাধ্য করল মুদ্রামান বাড়াতে। ফলে আমেরিকার পণ্যের দাম কম হওয়ায় প্রতিযোগিতায় তারা বাজার দখল করতে পারে। দ্বিতীয়ত: তারা দেশে ব্যবসার নিয়ম কানুন শিথিল করল, পুঁজি ও পণ্যের আন্তর্জাতিক চলাচলের বাধা কমিয়ে দিল।

১৯৮৫ সালের প্লাজা চুক্তি (Plaza Accord) অনুযায়ী জাপান ও জার্মানী তাদের মুদ্রামান বাড়াতে বাধ্য হল। ফলে তাদের পণ্য রপ্তানী কমে গেল। জাপান ও জার্মানীর অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিল। আমেরিকার অর্থনীতি ১৯৮০ দশকের শেষভাগ ও নব্বই দশকের প্রথমভাগে কিছুটা উন্নতি হল। কিন্তু জাপান ও জার্মানীর অর্থনীতি ধীরগতি হওয়ায় পণ্যের চাহিদা কমে গেল। আমেরিকার রপ্তানী আশানুরুপ বাড়ল না।

জাপান ও জার্মানীর অর্থনীতি চাঙ্গা করার জন্য ১৯৯০এর দশকের মধ্যভাগে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সরকার "উল্টো প্লাজা চুক্তি"(Reverse Plaza Accord) করে ডলারের মুদ্রামান বাড়তে দিল। এটা আমেরিকার অর্থনীতিতে চাপের সৃষ্টি করল। আমেরিকার পণ্য নিজ দেশে ও বিদেশে দাম বাড়ার জন্য প্রতিযোগিতায় দুর্বল অবস্থানে চলে গেল। ২০০৩ সাল নাগাদ আমেরিকার current account এ ৫০০ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি হল। বিদেশের কাছে ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল ৭.১ ট্রিলিয়ন ডলার। ঘাটতি পূরণ করার জন্য বিদেশ থেকে পুঁজি প্রবাহের প্রয়োজন হল। তবে আমদানীমূল্য কম হওয়ায় পণ্যের দাম বাজারে কম থাকল, আমেরিকার ভোক্তারা খুশী থাকল। মুদ্রাস্ফীতিও কমল, আমেরিকার অর্থবাজার বিদেশী পুঁজির প্রবাহে চাঙ্গা থাকল। আমেরিকায় বাড়ি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পদের দাম বাড়ল। আমেরিকার কোম্পানী গুলো নিজ দেশে উৎপাদন ব্যয় বাড়ায় তাদের কারখানা অন্যান্য দেশে ক্রমে স্থানান্তর করল যেখানে উৎপাদন করলে খরচ কম হবে। এতে আমেরিকার কোম্পানীগুলি লাভ বজায় রাখতে পারল।[৩২] তবে আমেরিকার শ্রমিকরা কাজ কমে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ডলারের উচ্চ মূল্যমান জাপানের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে নি, পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতিতেও কাঙ্খিত গতি আনতে পারেনি। জাপান গড়ে তুলেছিল বিশাল উৎপাদন ক্ষমতা। নির্মাণ কোম্পানী, ব্যাংকের শাখা ও সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাড়ি ও অন্যান্য পণ্য তৈরীর এত বেশী শিল্প ছিল যেগুলোর উৎপাদিত পণ্যের বাজার দেশে বিদেশে ছিল না। ফলে এই শিল্প কারখানাগুলো পূর্ণমাত্রার চাইতে কম উৎপাদন করছিল। ব্যাংকগুলো ঋণভারে জর্জরিত ছিল। অর্থনীতিতে মন্দা চলতে থাকল (২০০৩-০৪ সালে চীনের চাহিদার জন্য সাময়িক উন্নতি হল)। পুঁজিতে লাভের হার কমতে থাকল, বেকারত্ব ৫.১ শতাংশ রয়ে গেল।

পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো ডলারের উচ্চমূল্যে ক্ষতিগ্রস্ত হল কারণ তাদের মুদ্রার মান ডলারের সঙ্গে বাঁধা ছিল। তাদের রপ্তানী উচ্চমূল্যের জন্য কমে গেল। ৯০ দশকে অর্থনীতিতে ধ্বস নামল ও বিদেশী পুঁজি ব্যাপকভাবে প্রত্যাহার করা হল। এই দেশগুলিতে পণ্যের চাহিদা কমে গেল। মোট উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে চাহিদার ব্যবধান আরও বাড়ল। জাপান ও পূর্ব এশিয়ায় এই মন্দায় একটা সম্ভাবনা ছিল দেওলিয়া হয়ে যাওয়া কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে ফেলা, কিন্তু তা হল না। আমেরিকা ও ইউরোপের বহুজাতিক কোম্পানীগুলো সস্তায় এসব কারখানা কিনে নিল। গাড়ি তৈরীর ক্ষেত্রে যেমন ইসুজুর কারখানা কিনল ফোর্ড, মিৎসুবিসির কারখানা কিনল ডেইমলার ও বেনজ এবং নিসানের কারখানা কিনল রেনঁ। বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা রয়েই গেল।[৩৩]

১৯৯০ এর দশকে সারা বিশ্বে অর্থনীতি সংস্কার করা হচ্ছিল। উন্নত দেশে এই সংস্কার পরিচিত হচ্ছিল নব্য উদার নীতি বা Neo-liberal হিসাবে, উন্নয়নশীল দেশে পরিচিত ছিল Structural Adjustment হিসাবে। এই সংস্কারগুলির ফলে পণ্য চাহিদা ক্রমে আরও কমে আসছিল। জাপান ও পূর্ব এশিয়ার মন্দা এটাকে আরও গভীরতর করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রীয় সহায়তায় অর্থনীতি পরিচালনায় কেইনসিয়ান নীতি (Keynesian managed capitalism) ১৯৭০এর দশকের শেষভাগে এসে মন্দার কারণে বিতর্কিত হয়ে পড়ে। এই নীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ক্ষমতাসীন হল যথাক্রমে রোনাল্ড রেগান ও মার্গারেট থ্যাচার। তাদের প্রচার ছিল রাষ্ট্রের ভূমিকা কমিয়ে এনে অর্থনীতিকে মুক্ত করা।[৩৪] উন্নত দেশগুলিতে সরকারী ব্যয় (বিশেষত জনকল্যাণ খাতে) কমান হল। শ্রমিকদের মজুরি কমান হল ও ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই হল। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের বেতন গড়ে ৫ শতাংশ কমল।[৩৫] প্রেসিডেন্ট বুশের সময়কালের শেষে ১৯৯২ সালে আয় অনুযায়ী জনসংখ্যার নীচের ৬০ শতাংশের আয় আরও কমে এমন স্থানে আসল যা ইতিহাসে কোন সময়ই হয় নি। এই ধারা পরবর্তী ডেমোক্র্যাট্রিক শাসনামলেও অব্যাহত থাকল। অপরদিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভ ৪০ বৎসরের মধ্যে সবচাইতে বেশী হল ১৯৯৭ সালে, ৫.৬ শতাংশ।[৩৬]

১৯৮০র দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে "নব্য উদার" অর্থনীতি সাধারণ মানুষের অবস্থার অবনতি ঘটাল । এই দেশগুলির জন্য এই দশক "হারানো দশক" বা "the lost decade" নামে পরিচিত। ল্যাতিন আমেরিকায় দারিদ্র সীমার নীচে

বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১৩ কোটি থেকে বেড়ে ১৮ কোটি হল। আফ্রিকায় বাণিজ্য উদারীকরণ, রপ্তানীযোগ্য পণ্যের মূল্যহ্রাস, বেসরকারীকরণ সবকিছু মিলে প্রতি বছর মাথাপিছু গড় আয় আশির দশকে ২.২ শতাংশ কমল।[৩৭] ১৯৯০ সাল নাগাদ আফ্রিকার ৬৯ কোটি মানুষের ২০ কোটি মানুষই দরিদ্র হল। ১৯৯০ এর দশকে এই ধারা অব্যাহত থাকল। সারা বিশ্বে অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ বাড়ল। জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ৫৪ টি উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু গড় আয় কমে গেল। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে দারিদ্রের হার তিনগুণ বেড়ে গেল- ১০ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করতে লাগল। পূর্ব এশিয়ায় ১৯৯৭-১৯৯৯ এর মন্দার কারণে ১০ লক্ষ থাইল্যান্ডের অধিবাসী ও ২ কোটি ১০ লক্ষ ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে যোগ হল। তবে চীনে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ দারিদ্রসীমার উপরে উঠে আসল।[৩৮]

পণ্য উৎপাদন লাভজনক না হওয়ায় পুঁজি ফাটকা বাজারে (speculation) নিয়োজিত হতে থাকল। উচ্চ প্রযুক্তি কোম্পানীগুলোর স্টকের দাম সুদের হার কম রেখে বাড়ান হল। দাম বাড়তে থাকলে এগুলোর কেনা বেচায় লাভও বাড়ে। পুঁজির উৎস ছিল জনসংখ্যার উচ্চ আয় সম্পন্ন ২০ শতাংশ আর বিদেশী বিনিয়োগকারীরা। তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকমিউনিকেশন নির্ভর শিল্পগুলোর স্টকের দামের উর্ধ্বগতি ছিল তাদের বর্তমান লাভের কারণে নয়, ভবিষ্যতে লাভজনক হবে এই প্রত্যাশায় তাদের স্টকের দাম বাড়তে থাকে। এটাকে virtual capitalism নাম দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে আমাজন ডটকম কোম্পানীকে তুলে ধরা যায়, যার স্টকের দাম দ্রুত বাড়ছিল যদিও কোম্পানী মোটেই লাভ করে নি। বাস্তব কৃতিত্ব স্টকের মূল্যবৃদ্ধির কারণ না হয়ে ভবিষ্যতে অনিশ্চিত স্টকের দাম বাড়ার কারণ হয় এবং তা তখন উচ্চবাজীতে জুয়াখেলার মতই হয়ে যায়। এ ধরনের দাম বাড়া যে অস্থিতিশীল তার চিহ্ন ১৯৯৮ সালেই দেখা গিয়েছিল। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদদের তৈরী করা কম্পিউটার নির্ধারিত মডেলের উপর স্টক বাজারের গতির উপর ভিত্তি করে ব্যবসা করা Long Term Capital Management নামে Hedge fund প্রথমদিকে এক ট্রিলিয়ন ডলারের তহবিল স্টকে বেচা কেনা করে বাৎসরিক ৩৪ শতাংশ লাভ করেছিল। ১৯৯৭-৯৮ সালে বাজার কম্পিউটার মডেল নির্দেশিত পথে না চলায় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে এই ফান্ড দেওলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু এই ফান্ড ব্যাংকগুলো থেকে এত অর্থ ধার নিয়েছিল যে এর ফলে অনেক বড় ব্যাংকও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত। ফেডারেল রিজার্ভ (আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক) ব্যাংকের চেয়ারম্যানের নির্দেশনায় এই ব্যাংকগুলোকে সরকারী অর্থ দিয়ে বাঁচান হল।[৩৯]

কিন্তু এই ধরনের বিপদসংকেত ফাটকাবাজী বন্ধ করতে পারে নি। টেলিকমিউনিকেশন খাতে পুঁজি বিনিয়োগকারীরা অর্থ ঢালছিল। চাহিদা নয়, অর্থের সরবরাহই টেলিকম শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছিল। টেলিকম কোম্পানীগুলো লক্ষ লক্ষ মাইল ফাইবার অপটিক কেবল বসাচ্ছিল, শুধু স্থলে নয় সাগর তলেও। ২০০০ সাল নাগাদ টেলিকম কোম্পানীগুলির বাজার মূল্য হল ২.৭ ট্রিলিয়ন ডলার যা সমস্ত পণ্য উৎপাদনে জড়িত শিল্পগুলির ১৫ শতাংশ। কিন্তু কেবলগুলির ব্যবহার হচ্ছিল মাত্র ২.৫ থেকে ৩ শতাংশ।[৪০] ১৯৯৬ সালে কোম্পানীগুলো সবচাইতে বেশী লাভ করে, ৩৫.২ বিলিয়ন ডলার, ১৯৯৯ সালে তা হয় ৬.১ বিলিয়ন ডলার, আর ২০০০ সালে ক্ষতি হয় ৫.৫ বিলিয়ন ডলার। তিনটি প্রশংসিত কোম্পানী গ্লোবাল ক্রসিং, ফোয়েল ও ওয়ার্ল্ডকম দেওলিয়া হয়ে যায়। পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত কোম্পানীগুলোর মোট বাজার মূল্য ১৯৯৪ সালে ৪.৮ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০০০ সালে ১৫.৬ ট্রিলিয়ন ডলার হয়। কোম্পানীগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভের চাইতে এর বাড়ার পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। ২০০১ সালে মার্চ মাসে স্টক মার্কেটে ধ্বস নামল, তখন ৪.৬ ট্রিলিয়ন ডলার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এই অর্থ ছিল ১৯৮৭ সালে স্টক মার্কেট ধ্বসে লোকসানের চারগুণ ও আমেরিকার মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেক। ২০০২ সালে এই লোকসান বেড়ে হল ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। কাগজের সম্পদের অর্থনীতির বাস্তব করুণ অবস্থার কারণেই এই বিশাল ক্ষতি। চাহিদার অভাব, পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার করতে না পারা, লাভের হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকা, এইসব সমস্যায় জর্জরিত অর্থনীতি যে ফাটকাবাজারের মাধ্যমে উদ্ধার করা সম্ভব নয় তা এই ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরল।

প্রেসিডেন্ট বুশ দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্থনীতির এই বেহাল অবস্থা উত্তরণের চেষ্টা করলেন। কর (tax) কমান হল, কিন্তু যাদের আয় বৎসরে ১০ লক্ষ ডলারের উর্দ্ধে তারা ছাড় পেল ১৮০০০ ডলার, আর যাদের আয় কম তারা ত্রিশগুণ কম পেল। বলা হল এই অর্থ খরচ করলে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। ২০০৩ সালে আবার কর কমান হল।

এতে ধনীদের আরও বেশী সুবিধা দেওয়া হল। সাধারণ মানুষের গড় আয় আরও কমল, আরও ৫৩ লক্ষ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে চলে গেল।[৪১] ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ আরও ৩০ লক্ষ মানুষ বেকার হল।

ইরাক যুদ্ধ শুরু করা হল, তার জন্য খরচ হল। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তী পাঁচ বছরে প্রতিরক্ষা খরচ ৭০ শতাংশ বাড়ান হল, জ্বালানী তেল ও গ্যাস খাতে প্রেসিডেন্ট বুশের বন্ধুদের লক্ষ লক্ষ ডলার কর রেয়াত দেওয়া হল। প্রেসিডেন্ট বুশ দায়িত্ব নেওয়ার সময় বাজেট মোট জাতীয় আয়ের ২.৪ শতাংশ উদ্বৃত্ত ছিল, চার বছর পর ৩.৬ শতাংশ ঘাটতিতে চলে গেল। বুশ প্রশাসনের প্রথম ছয় বৎসর আমেরিকা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন ডলার ধার নিয়েছিল। আফগানিস্তান আর ইরাকের যুদ্ধে বিশাল আর্থিক ব্যয় হল। যুদ্ধের আগে প্রশাসনের একজন মুখপাত্র বলেছিলেন, খরচ হতে পারে ২০ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকার নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ ষ্টিগলিজ এর হিসাব মতে ২০০৭ সাল নাগাদ খরচ হয়েছে কমপক্ষে ২ ট্রিলিয়ন ডলার। সমস্ত আফ্রিকার দেশগুলিতে আমেরিকা বৎসরে সেই সময় সাহায্য দিত ৫ বিলিয়ন ডলার- যা ছিল আফগানিস্তান ও ইরাকের যুদ্ধের দুই সপ্তাহেরও কম খরচ।

অর্থনীতি সামাল দেওয়ার জন্য ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড সুদের হার কমাতে থাকল এবং সুদের হার এক শতাংশে পৌঁছাল। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে নিলে সুদের হার আসলে ২ শতাংশ ঋণাত্বক হল। এতে মানুষ ঋণ নিয়ে খরচ করা শুরু করল, ২০০৭ সাল নাগাদ ক্রেডিট কার্ডে মোট দেনা হল ৯০০ বিলিয়ন ডলার। বাড়ি কেনার জন্য অবাধে ঋণ দেওয়া হতে থাকল। ভবিষ্যতে শোধ দেওয়ার ক্ষমতা যাচাই করা হল না। এর ফল কয়েক বছরেই দেখা গেল। দেনা শোধ করতে না পেরে ২০০৬ সালের মার্চ মাস থেকে পরবর্তী এক বছরে ব্যক্তি পর্যায়ে দেওলিয়া হওয়ার হার ৬০ শতাংশ বাড়ল।

অর্থ বাজারে ফাটকাবাজি ক্রমেই বাড়তে থাকল। শেয়ার বা স্টক না কিনে শুধু শেয়ার বা স্টক কেনার সুযোগ বা option কেনা শুরু হল। দাম কমলেও ক্ষতির পরিমাণ কম থাকত। জুয়া খেলার সমতুল্য এই ব্যবস্থায় নিজের অর্থ দিয়ে করা হত না। ব্যাংকের অর্থ ধার নিয়ে এই ব্যবসা ক্রমেই বর্ধিত আকারে হতে থাকল। বিদেশ থেকে আসতে থাকা অর্থে আমেরিকায় এটা মহীরুহে পরিণত হল। সুদের হার কম রাখা হল, বাড়ির জন্য অর্থ ধার নেওয়া সহজতর করা হল, এটা আগেই বলা হয়েছে। শুধু বাড়ী কেনার জন্য নয়, ধারে বাড়ী কেনার পর বাড়ীর দাম বাড়লেই এই বর্ধিত দামের উপর ভিত্তি করে আরেকটা ধার নেওয়া যেত। এই অর্থ অন্যান্য জিনিষ কেনার জন্য খরচ করা সম্ভব হল। আমেরিকায় এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ (unsecured) ঋণের পরিমাণ আকাশচুম্বী হল। ১৯৬০এর দশকের তুলনায় ৭০ দশকে ব্যক্তিগত ও ক্রেডিট কার্ডের ঋণ বেড়েছিল ২৩৮ শতাংশ। ৭০ দশকের তুলনায় ৮০ দশকে তা বাড়ল ৩১৮ শতাংশ। ৯০ এর দশকে ৮০ দশকের তুলনায় আরও ১৮০ শতাংশ বাড়ল। ২০০৮ সালে ধ্বস নামার আগের অর্থ বৎসরে ৯০ এর দশকের তুলনায় তা আরও ১৬৩ শতাংশ বাড়ল।[৪২]

ধারে বাড়ী কেনার চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়তে থাকল। ২০০২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বাড়ীর গড় দাম বাড়ল যুক্তরাজ্যে ৬৫ শতাংশ। কানাডা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ায় বাড়ল ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। আগেই বলা হয়েছে ব্যাংকগুলো ক্রমেই ঋণ দেওয়ার শর্তগুলো শিথিল করছিল। এটা ছিল পুঁজিপতিদের ইঙ্গিতে রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতিফলন। অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলি অর্থবাজারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে আসছিল। ব্যাংকগুলো উঁচু সুদের হারে ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ীর ঋণ এক অভিনব পন্থায় বিক্রি করার ব্যবস্থা করল। যা Collateralized Debt Obligations (CDO) বা Securitized Derivatives নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে ঝুঁকিবিহীন ও বিভিন্ন স্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ মিলিয়ে তা বিভিন্ন মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা হল। বলা হল এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণগুলির ঝুঁকি থাকবে না। ওয়াল স্ট্রীটের rating এজেন্সীগুলি এগুলিকে উচ্চ rating দিল। ব্যক্তি মানুষ, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এগুলোকে কেনা বেচা শুরু করল। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও উচ্চমানের হিসাবে CDO কেনা বেচা বাড়তে লাগল। অনেক বিদেশী ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানগুলো বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করল। ২০০৩ সালে গৃহ ঋণের ২৬ শতাংশ ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলো সবই CDO তে অন্তর্ভুক্ত করে বিক্রি করা হল। ২০০৮ সালে ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের গৃহ ঋণ ভিত্তিক বন্ড বাজারে ছিল যা আমেরিকার মোট বিদেশী ঋণের চাইতেও বড় অঙ্কের ছিল। বাস্তব অর্থনীতির তুলনায় এই ঋণ ভিত্তিক বন্ডের অর্থনীতির আকার ক্রমেই বাড়ছিল। ২০০৬ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতি এক ডলার আয়ের বিপরীতে ১.৮ ডলার এর বন্ড ছাড়া হয়। চার বছর পর ২০০৭ সালে এটা ৬৪০ শতাংশ বাড়ে। প্রতি ডলারের জন্য ১২ ডলারের বন্ড ছাড়া হয়।[৪৩] বন্ডের ব্যবসায় অর্থের পরিমাণ এত বেশী ছিল যে

অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদনের ব্যবসার চাইতে বন্ডের ব্যবসার পরিমাণ অনেক বেশী হল। উদাহরণ স্বরূপ: পৃথিবীর অন্যতম বড় মটর গাড়ি প্রস্তুত কোম্পানী জেনারেল মটরস এর অর্থ ব্যবসায় অংশের পরিমাণ গাড়ি বিক্রি অংশের চাইতে বেশী হয়ে গেল। বন্ডগুলোকে অর্থের সমতুল্য ধরে নিয়ে আদান প্রদানে মুদ্রার মত ব্যবহার করা হতে থাকল। বন্ডের সরবরাহের কোন সীমা না থাকায় সুদের হার কম থাকল, সম্পত্তির মূল্যও ক্রমেই বাড়তে থাকল।

এই পরিস্থিতি যে অস্থিতিশীল ও একসময় ভেঙ্গে পড়বে তা নীতি নির্ধারকরাও ধারণা করতে পেরেছিলেন। ফেডারেল রিজার্ভের সাবেক চেয়ারম্যান পল ভোলকার যিনি এই পরিস্থিতি সৃষ্টির একজন হোতা ছিলেন, ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে লিখেছিলেন,"আমেরিকার সাফল্যের পিছনে যা কাজ করছে তা হল বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থের প্রবাহ, প্রতিদিন প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারের সমান এবং তা বাড়ছে। .... জাতি হিসাবে আমরা সচেতনভাবে ঋণ করি না বা ভিক্ষা করি না। আমরা আকর্ষণীয় হারে সুদও দিচ্ছি না, আমরা ডলারের মান কমে যাওয়ার বিরুদ্ধেও সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা করছি না. . . . . আমাদের দোকানপাট ও গ্যারেজ বিদেশী পণ্যে ভরে ফেলেছি, প্রতিযোগিতায় দাম কম থাকছে। ফলে আমাদের সঞ্চয় কম থাকা সত্ত্বেও এবং প্রবৃদ্ধি বাড়া সত্ত্বেও সুদের হার কম থাকছে।

আমাদের সঙ্গে যারা বাণিজ্য করছেন এবং যারা আমাদের দেশে পুঁজি পাঠাচ্ছেন তাদের জন্যও এটা সুবিধাজনক। কোন কোন দেশ, যেমন চীন আমাদের প্রসারমান দেশীয় বাজারের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ডলার রাখতে ইচ্ছুক। ডলারই এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা বলতে যা হওয়া উচিৎ তার সবচাইতে কাছাকাছি।

কিন্তু সমস্যা হল এই স্বস্তিপূর্ণ ব্যবস্থা অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না। আমার জানা মতে এমন কোন দেশ নাই যে তার উৎপাদনের চাইতে ৬ শতাংশ বেশী ব্যবহার ও বিনিয়োগ করে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে। আমেরিকা আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়ে নিচ্ছে"।[৪৪] ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক অর্থ লেন দেন দেশের ৯০ শতাংশ ছিল উৎপাদন সম্পর্কিত কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত। ১০ শতাংশ ছিল অর্থবাজারে ফাটকাবাজিতে নিয়োজিত। ১৯৯৫ সালে আন্তর্জাতিক অর্থ প্রবাহের ৯৫ শতাংশই হল ফাটকাবাজিতে নিয়োজিত। সাতটি বড় শিল্পোন্নত দেশের এই অর্থপ্রবাহ ছিল এক ট্রিলিয়ন ডলার। এটা তাদের সম্মিলিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাইতে অনেক বেশী।[৪৫]

আরেকজন উচ্চপদস্থ বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার Stephen Roach (বিনিয়োগ ব্যাংক মরগ্যান ষ্ট্যানলীর প্রধান অর্থনীতিবিদ) ২০০২ সালে বলেন, "আমেরিকা কেন্দ্রিক বিশ্ব অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতার অবসান হওয়ার কাহিনী এটা। ইতিহাস বলে এ ধরনের ভারসাম্যহীনতা টিকে থাকতে পারে না। কম সঞ্চয় করে আমেরিকার অর্থনীতির পক্ষে কি ক্রমেই বাড়তে থাকা সামরিক দায়িত্বে শ্রেষ্ঠ্যত্ব বজায় রাখা সম্ভব? আমার নিশ্চিত উত্তর হবে না"।[৪৬]

আমেরিকার নীতিনির্ধারকরা জানতেন যে, ধ্বস নামবে। ২০০৭ সালেই ধ্বস শুরু। সেঞ্চুরী ফাইনান্সিয়াল নামে গৃহঋণ কোম্পানী দেওলিয়া হল। বেয়ার ষ্টার্নস ও বি,এন, পি প্যারিবা (ফরাসী কোম্পানী) তাদের Hedge Fund এর টাকা শোধ করতে পারছে না জানাল। ইউরোপীয় ব্যাংকগুলি অর্থের সংকট হবে এই ভয়ে নিজেদের মধ্যে লেনদেন বন্ধ করল। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে প্রথমে ৯৫ বিলিয়ন ইউরো এবং তারপর আরো ১০৯ বিলিয়ন ইউরো ছেড়ে দিল। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো বাজারে বিপুল অর্থ ছাড়ল যার পরিমাণ তারা জানাল না। আমেরিকার বড় দুটি ব্যাংক সিটিগ্রুপ ও মেরিল লিঞ্চ কোটি কোটি ডলারের ক্ষতির কথা প্রকাশ করল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ ১০ লক্ষ আমেরিকান, যারা গৃহঋণ শোধ করতে পারছিল না,তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা দিলেন। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক পাঁচটি ব্যাংককে যে কোন পরিমাণ অর্থ দেওয়ার অঙ্গিকার করল। ২০০৮ সালে একে একে বৃটেনের নর্দান রক, আমেরিকার বেয়ার ষ্টার্ন অর্থ লেনদেন করার ক্ষমতা হারাল। এপ্রিল মাসে বৃটেন, আয়ারল্যান্ড ও স্পেনেও বাড়ির দাম কমা শুরু হল। বাড়ি কেনার জন্য ঋণ নেওয়া মানুষরা আরও অর্থসংকটে পড়ল। আগষ্ট মাসে আমেরিকাতেও বাড়ির দাম কমা শুরু হল। আমেরিকার সরকারী মালিকানাধীন গৃহঋণ সংস্থা ফ্রেডি ম্যাক ও ফ্যানী মে দুটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানর জন্য ঋণ সুরক্ষা ও অনুদান মিলে সরকার প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন ডলার দিল। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনের স্টক মার্কেটে ধ্বস নামল। এই মাসেই আমেরিকার অন্যতম বড় বিনিয়োগ

প্রতিষ্ঠান লেম্যান ব্রাদার্স দেওলিয়া হল। এই পতনের পর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরা বন্ড বিক্রি করা শুরু করল। আরেকটা বড় ব্যাংক মেরিল লিঞ্চের পতন আমেরিকার সরকার সাহায্য দিয়ে ঠেকাল। এই সব প্রতিষ্ঠানের বীমা যেখানে করা ছিল, আমেরিকা ইনসিওরেন্স গ্রুপ (AIG) এর লেন দেন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল, আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১৪৩ বিলিয়ন ডলার দিয়ে উদ্ধার করল। ইউরোপে ফর্টিস ব্যাংক ধ্বংসের মুখে পড়ায় জাতীয়করণ করা হল। এইভাবে একের পর এক ব্যাংক ও অর্থ সংক্রান্ত (finance) প্রতিষ্ঠানের পুঁজিবাদী বিশ্বজুড়ে পতন ঘটতে থাকল। অক্টোবর মাসে আমেরিকার কংগ্রেস তার ট্রেজারীকে ৭০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করার অনুমতি দিল এ সব প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানর জন্য। জার্মান সরকার ৫০ বিলিয়ন ইউরো ব্যাংক উদ্ধার করার জন্য দিল, এর তিন দিন পর আইসল্যান্ডের ৩ টি ব্যাংকই ধ্বংসের সম্মুখীন হল, সরকার এগুলোকে জাতীয়করণ করল। কার্যত: আইসল্যান্ড দেশ হিসাবে দেওলিয়া হয়ে গেল। সব দেশে সুদের হার কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কাছে পৌছাল। অক্টোবরের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হল যে, আমেরিকা ও বৃটেনের অর্থনীতিতে মন্দা (recession) শুরু হয়েছে। ২০০৮ সালে নিউ ইয়র্কের স্টক ব্যবসা তার মোট মূল্যের শতকরা ৩১ ভাগ হারাল।[৪৭]

২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট ওবামা দায়িত্ব নিলেন এবং বললেন, আমেরিকার অর্থনীতি খুবই অসুস্থ (very sick)। বেকারত্বের হার ৭ শতাংশে পৌছাল এবং ১৯৮০ এর দশকে মন্দার পর এবারই সবচাইতে বেশী মানুষ চাকুরী হারাল। প্রেসিডেন্ট ওবামা ৭৮৭ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য ঘোষণা করলেন অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার জন্য। এটা গেইথনার-সামার্স প্ল্যান (Geithner -Summers Plan) নামে পরিচিত। মার্চ মাসে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ আরও ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারের "ঝুঁকিপূর্ণ" ঋণ (bad loan) কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানাল। ২০০৯ এর মে মাসে আমেরিকার তৃতীয় বৃহৎ গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানী ক্রাইসলার দেওলিয়া হল এবং ইতালীর ফিয়াট কোম্পানী অনেক কম মূল্যে কিনে নিল। এর পরের মাসে আমেরিকার সর্ব বৃহৎ গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানী জেনারেল মটরস দেওলিয়া হয়ে গেল। সরকার এর দায়িত্ব নিল।[৪৮]

এভাবেই অর্থনীতির বিপর্যয়ের অবস্থা চলতে থাকল। বিবরণ এক সময় শেষ করতে হবে তাই এখানে থামতে হচ্ছে।

১৯৩০ এর দশকের মন্দায় ১৯৩২ সাল নাগাদ আমেরিকার ঋণ হয়েছিল মোট জাতীয় আয়ের ২৬০ শতাংশ। এবারের মন্দায় শুরুতে ২০০৮ সালে আমেরিকার ঋণ ছিল মোট জাতীয় আয়ের ৩৬৫ শতাংশ। দুই বৎসর পর ২০১০ সালে এটা ৫৪০ শতাংশ ছাড়ায়। এই অঙ্কের বাইরে রয়েছে derivatives যার আনুমানিক মূল্য মোট জাতীয় আয়ের চারগুণ। আমেরিকায় প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ বেকার হল এই ধ্বসে। আমেরিকার পরিবারগুলির ৪০ শতাংশ ক্রমেই আরও বেশী ঋণ করতে বাধ্য হল। ধ্বসের আগেই ২০০৮ সালে আমেরিকার শ্রমিকের প্রকৃত গড় আয় ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিকের চাইতে কম ছিল, যদিও শ্রমিকেরা আরও বেশী সময় কাজ করছিল এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতাও অনেক বেশী হয়েছিল। যারা এই "কাগুজে সম্পদ" (paper assets) তৈরী করে এই ধ্বসে কমপক্ষে ৪ ট্রিলিয়ন সম্পদ নষ্ট করল তারা নিজেরা বিশাল অঙ্কের বেতন ভাতা নিতে থাকল। এই ধ্বসে তারা সরকারী সাহায্যসহ ১০ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশী সহায়তা পেল।

ধ্বস নামার কয়েক বছরের মধ্যে ভূমিকা বদল হয়ে গেল। ২০০৮ সালে ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল দুর্দশাগ্রস্ত। সরকার বিনা শর্তে রাষ্ট্রীয় অর্থ খরচ করে তাদের ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসল। কোটি কোটি ডলার তারা রাষ্ট্রকে ফেরৎ তো দেয়ই নি, অর্থ নেওয়ার কথাও তারা স্বীকার করে না। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও ক্ষমতার ব্যবহার করেই ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা পেল ও শক্তি সঞ্চয় করল। রক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। আমেরিকা ও ইউরোপ দু' জায়গাতেই রাজনীতিবিদেরা সেই সব ব্যাংকের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত যাদের তারা অল্পদিন আগে বাঁচিয়েছে।[৪৯] যে প্রতিষ্ঠানগুলো এই ফাটকাবাজির কেন্দ্রে ছিল তাদের কোন সমালোচনা হল না, অর্থের শক্তির কাছে সবাই ভীত থাকল। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ও তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যথাযথ পর্যালোচনা করা হয় নি, ফলে এ ধরনের ঘটনার পুণরাবৃত্তি রোধের কোন ব্যবস্থাও হয় নি। আমেরিকার কংগ্রেস আইন করে ২০০৮ সালের ধ্বসের তদন্ত করার জন্য Financial Crisis Enquiry Commission স্থাপন করেছিল। ২০১১ সালের ২৭শে জানুয়ারী রিপোর্ট প্রকাশিত হল। একটা দুর্বল উপসংহারে পৌছান হল, ধ্বস হয়েছিল অত্যধিক ঝুঁকি নেওয়া ও দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য। ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট ১৯০৭ সালের Tillman Act আইন বাতিল করল। এই আইন রাজনৈতিক

প্রভাব কেনার জন্য কর্পোরেশনগুলির অর্থব্যয় বেআইনী করেছিল। এখন কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা যে রাজনীতিবিদরা তাদের পক্ষে থাকবে (বিশেষত: আর্থিক খাতের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে) তাদের অবাধে অর্থ দিতে পারবে। কর্পোরেশনগুলির ক্ষমতা সীমিত রাখার জন্য বিকল্প আইন করার ওবামার চেষ্টা কংগ্রেসে পরাস্ত হল। ব্যাংক, কর্পোরেশন ও অর্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার সময় হয়ত ছিল যখন তারা ধ্বসের পর পরই দুর্বল অবস্থায় ছিল, কিন্তু সে সময় পার হয়ে গেছে।

এখন আমেরিকার অর্থনীতি তার পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার কমই ব্যবহার করতে পারছে। বেকারত্বের ফলে পণ্য ও সেবার চাহিদা বাড়ছে না। ওয়াল স্ট্রীটের ব্যাংক ও অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রভাবিত করার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। কিন্তু উৎপাদনে লাভের হার কম, আবার আর একটি অর্থনৈতিক বুদ্বুদ গড়ে তোলা যাচ্ছে না। আমেরিকায় চাহিদা সৃষ্টি না হলে ইউরোপ ও জাপানে অর্থনীতিতে প্রাণ ফিরে পাবে না। এমনকি চীনেরও এই বৈদেশিক চাহিদা দরকার যার অভাবে চীনের অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মাধ্যমে সচল রাখা হয়েছে। চীনের বড় বড় কারখানাগুলির উৎপাদিত পণ্যের আভ্যন্তরীন বাজার তৈরী হয় নি।

জনমত নিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্র

এরিষ্টোটল এর "Politics" নামক বইটি হচ্ছে পরবর্তী সব রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি। তিনি ধরে নিয়েছিলেন গণতন্ত্রে সবারই অংশগ্রহণ থাকতে হবে (নারী ও দাস-দাসী ছাড়া) এবং গণতন্ত্রের লক্ষ্য হবে সর্বসাধারণের মঙ্গল।[৫০] তাঁর মতে যদি সত্যিকারের গণতন্ত্রে কিছু অতি ধনী মানুষ থাকে আর কিছু অতি দরিদ্র মানুষ থাকে তবে দরিদ্র মানুষেরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে ধনীদের সম্পত্তি নিয়ে নিবে। এটা ন্যায্য কাজ হবে না। কাজেই বিকল্প হচ্ছে, গণতান্ত্রিক অধিকার সীমিত করা অথবা দারিদ্র ও অসাম্য দূর করা (দ্বিতীয়টাই এরিষ্টোটল শ্রেয় মনে করেছিলেন)। সম্পদের অসাম্য ও গণতন্ত্র যে সহঅবস্থান করতে পারে না এই ধারণা বিজ্ঞানের বিকাশের (Enlightenment) যুগেও ছিল। ক্লাসিক্যাল চিন্তাবিদ যেমন ,এ্যাডাম স্মিথ, ডি টকভিল, জেফারসন তারাও এটা স্বতসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন। প্রায় ২৫০ বছর আগে দার্শনিক ডেভিড হিউম বলেছিলেন কত সহজে এত বেশীসংখ্যক জনগণ অল্প সংখ্যক মানুষ দ্বারা শাসিত হচ্ছে তা আশ্চর্যজনক। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল সব সরকারের ভিত্তি হল জনমত নিয়ন্ত্রণ তা সে সামরিক একনায়ক হোক বা জনপ্রিয় নির্বাচিত সরকার হোক।[৫১] পরবর্তী সময়ে জনগণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কতটুকু তা চিন্তাবিদদের পীড়িত করেছে। অনেকেই অধিকার দিতে রাজী ছিলেন কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। হিউমের সমসাময়িক দার্শনিক ফ্রানসেস হাচিসন মনে করতেন কোন কোন সিদ্ধান্ত জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চাপিয়ে দেওয়া যায়, যদি অজ্ঞ জনগণ পরবর্তীতে তা মেনে নেন। এতে সম্মতি নিয়ে শাসন করার নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে বলা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মলগ্নে সংবিধান রচনার মূল ব্যক্তি ছিলেন রাজনীতিবিদ জেমস ম্যাডিসন (পরবর্তীতে চতুর্থ প্রেসিডেন্ট)। তিনি বলেন, ইংল্যান্ডের নির্বাচন যদি সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হয় তা হ'লে ভূমি মালিকদের নিরাপত্তা থাকবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিহীনরা আইন করে তাদের জমি নিয়ে নিবে। সংবিধানে এই ধরনের অবিচার যাতে না হয় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ম্যাডিসন এর নীতি ছিল এরকম: সাধারণভাবে সকল জনগণের অধিকার থাকবে, তবে যাদের সম্পত্তি আছে বা সম্পদ আছে তাদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা থাকতে হবে। তবে সময়ের সাথে সাথে ম্যাডিসন তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ১৭৯২ সালে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, উঠতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সম্পদশালীদের রক্ষা করছে ঠিকই কিন্তু জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে না। ফলে সংখ্যলঘিষ্ট জনগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করবে।[৫২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এর প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা ও আমেরিকার জনসংযোগ শিল্পোদ্যোগ (Public Relations Industry) এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এডওয়ার্ড বার্ণে (Edward Bernays) তাঁর বইয়ে লিখেছেন, জনগণের অভ্যাস ও মতামত সচেতনভাবে ও চতুরতার সাথে প্রভাবিত করা হচ্ছে গণতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ জন্য বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিতভাবে অবিরাম প্রচারণা চালিয়ে যেতে হবে। জনগণের অনুমোদন আদায় করে নেওয়া হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার মূল কথা। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে Committee on Public Information স্থাপন করেন। এডওয়ার্ড বার্ণে ছিলেন এর কর্মকর্তা। যুদ্ধে জার্মানদের বর্বরতা সম্বন্ধে প্রচার চালিয়ে যুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্য এই কমিটি সফলভাবে কাজ করল এবং আমেরিকার জনমত

যুদ্ধের অনুকূলে নিয়ে আসল। অনেকেই জানেন না এই কাজে জার্মান নৃশংসতা সম্পর্কে অনেক মিথ্যা প্রচারণার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। সংগঠিত প্রচারণায় যে জনমত প্রভাবিত করা যায়, এটা তার উদাহরণ। উড্রো উইলসনের প্রচারণা সংস্থার আর একজন কর্মকর্তা ও একজন প্রভাবশালী আমেরিকান সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান তাঁর বইয়ে লিখেছেন, বুদ্ধিমান সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হচ্ছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়, নীতি নির্ধারণ ও তার পক্ষে জনমত তৈরী তাদের দায়িত্ব। অজ্ঞ জনসাধারণের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ রোধ করতে হবে। তারা দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা হবে মাঝে মাঝে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠীর কাউকে ক্ষমতায় বসান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউই (John Dewey) তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সত্যিকার বুদ্ধিবৃত্তির মুক্ত চর্চা ও সামাজিক দায়িত্ব পালন সম্ভব নয় বলে মনে করেছিলেন। রেডিওর ব্যবহার শুরু হওয়ার পর এই মাধ্যমকে জনমত নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ব্যবহার আমেরিকার কর্পোরেশনগুলি শুরু করে। যুদ্ধের সময় এই কার্যক্রম স্থগিত ছিল। যুদ্ধের পর ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হল জনমত প্রভাবিত করার জন্য। "মুক্ত" শিল্পোদ্যোগ বা free enterprise (যা ছিল প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র সমর্থিত ব্যক্তি পুঁজির অবাধ কার্যক্রম) অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার জন্য বিপদের সম্মুখীন এই প্রচারণা রেডিও, সিনেমা, পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার শুরু করা হয়। এই তৎপরতার পিছনে "কমিউনিষ্ট" বা "বিদেশী চক্রান্ত" এই সব ছিল লক্ষবস্তু এবং এই ধরনের কাজ (অর্থাৎ ব্যক্তি পুঁজির অবাধ কাজের সমালোচনা) দেশবিরোধী কাজ বলে প্রচার করা হল।[৫৪] কমিউনিষ্টরা সরকার পরিচালনায় ঢুকে পড়েছে এই বিষয়ে আমেরিকার চেম্বার অব কমার্স ১০ লক্ষাধিক পুস্তিকা বিতরণ করল। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে Advertising Council একশত মিলিয়ন ডলার খরচ করে আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব্যের প্রচার শুরু করল। প্রতিটি কর্পোরেশনই তাদের নিজেদের কর্মচারীদের অর্থনীতি শিক্ষার নামে পুঁজিবাদের মাহাত্ম্য শিখাতে লাগল। আমেরিকার ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বলল, কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক সংগঠনগুলো এর লক্ষ্যবস্তু ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মহামন্দার কারণে ধনিকগোষ্ঠীর প্রভাব অনেকটা খর্ব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা আবার উদ্ধার করার জন্য ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এতে সহায়তা করে। ১৯৫০ এর দশকের শেষদিকে এই ধারণা ব্যাপক ছিল যে, লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং সামাজিক সাম্যের পক্ষে জনমত দুর্বল হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই সর্বোত্তম এরকম বিশ্বাস জনমনে গ্রথিত হয়েছে তা মনে করা হয়েছিল। পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যম (যা গণমাধ্যমের প্রায় পুরোটাই) কর্পোরেশন কর্তৃক লালিত বুদ্ধিজীবি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রচারণা ব্যবস্থা অপ্রিয় পরিস্থিতিকে জনমনে অপরিহার্য করে তোলে। আমেরিকার এই প্রচারণার কাজে ধনিকশ্রেণী বাৎসরিক প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে, যা মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৫ শতাংশের বেশী এবং এর বড় অংশের জন্য তারা কর রেয়াতও পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে প্রচারণায় আরও সাফল্য আমেরিকার চেম্বার অব কমার্স দাবী করে। সরকারের অভ্যন্তরে তথাকথিত "কমিউনিষ্ট"দের অর্ন্তঘাতমূলককাজ সম্পর্কে প্রচারণা চালায় ট্রুমান সরকার। আনুগত্য প্রমাণের অভিযান চালায়। চেম্বার অব কমার্স বলে তাতে করে যে সমস্ত লোক "ধনীদের সম্পদ লুট করে" গরীবের উপকার করার কথা মনে করত তাদের অনেককে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। একটা উদাহরণ হল Office of Price Administration। এই দপ্তরের কাজ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে দেশে পণ্যদ্রব্যের দাম কম রাখা। যুদ্ধের পর এই দপ্তরের বিরুদ্ধে প্রবল বিরূপ প্রচারণা শুরু হয়। ট্রুমান সরকার এই দপ্তরের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হল। ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মকর্তা গর্বের সঙ্গে বলেন, ব্যাপক প্রচারণায় কাজ হয়েছে আরও হবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে প্রচারণার ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ক্ষতিকর বলে তুলে ধরা হয়। শ্রমিক সংগঠনবিরোধী আইন করাও সম্ভব হয়। শ্রমিক সংগঠনগুলোর তৎপরতাও কমে যায়। এর প্রভাব এখনও আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে স্নায়ু যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে মুক্তচিন্তা বন্ধ করা হয়। সিনেটর ম্যাককার্থী মুক্ত মতামত যারা প্রকাশ করেছিল তাদের মতামত প্রকাশ বন্ধ করা, চাকুরীচ্যুত করা এমনকি অনেককে কারারুদ্ধ করার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। যাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন আলবার্ট আইনষ্টাইন (বিশ্ব বিখ্যাত পদার্থবিদ), বারটল্ট ব্রেশট (বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার), চার্লি চ্যাপলিন (বিখ্যাত অভিনেতা) এবং আরও অনেকে।[৫৫] ১৯৭৮ সালে আমেরিকার কংগ্রেসের একটি শুনানীতে প্রকাশ পায় ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর এক বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে তৃণমূল পর্যায়ের প্রচারণার কাজে। এর সাথে আরও আছে

"উপরতলার জন্য প্রচারণা" যেখানে শিক্ষিত মানুষকে লক্ষ্য করে প্রচারণা করা হয়। এগুলোর লক্ষ্য থাকে পুঁজিপতিদের কাজে যেন কোন বাধা না আসে।

সাধারণ মানুষের মতামত ও উচ্চবিত্তদের মতামতে বিরাট ব্যবধান দেখা যায়। আমেরিকার অন্যতম জনমত জরিপ সংগঠন (The Chicago Council on Foreign Relations and the Program on International Policy Attitudes at the University of Maryland) ২০০৪ সালে জনমত যাচাই করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণে কিয়োটো চুক্তি অনুমোদন, আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যাল কোর্ট অনুমোদন ও আন্তর্জাতিক সংকট নিরসনে জাতিসংঘকে প্রধান ভূমিকায় রাখার পক্ষে ছিল। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আন্তর্জাতিক সংকটে নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার ভেটো প্রয়োগের বিপক্ষে ছিল, এই সব বিষয়ে দুই দল রিপাবলিকান, ডেমোক্র্যাটিক এবং পুঁজিপতিদের অবস্থান হল জনমতের বিপরীত।[৪৬] বাস্তবে জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয় না। শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধির পক্ষে,এবং শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় বাড়ানর পক্ষে ছিল, কিন্তু দুই দলের অবস্থানই এর বিপক্ষে। ২০০৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় লেখা হয় সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন নাই। রাজনৈতিক সমর্থন বলতে আসলে ইনসিওরেন্স কোম্পানী, ঔষুধ কোম্পানী, হাসপাতাল মালিকদের কোম্পানী ও শাসকশ্রেণীর সমর্থন তারা বোঝাতে চায়। কিন্তু জনমত বিপুলভাবে পক্ষে ছিল তা জনমত জরিপে প্রমাণিত হয়েছে।

জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করা বা জনমতকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে শুধু আমেরিকায় বিদ্যমান তা নয়। সমস্ত শিল্পোন্নত দেশেই তা আছে। Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ৩৪টি শিল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার একটি সংগঠন। ১৯৯২ সালে OECD র একটি গবেষণায় বলা হয়, অল্প কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং সরকার ও উৎপাদক সংস্থাগুলির মধ্যে আন্ত:ক্রিয়াই উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্পগুলির বাজার নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমনীতি নির্ধারণ করে। সাধারণ জনগণ এ সম্মন্ধে অবগত নন, তাদের মতামত দেওয়ার কোন সুযোগ নাই।

২০১০ সালের ২১শে জানুয়ারী আমেরিকার গণতন্ত্রের জন্য একটি "কৃষ্ণ দিবস" এবং গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের আরেকটি মাইলফলক। এমনকি নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা পর্যন্ত লিখেছে "কর্পোরেশনগুলির অঢেল অর্থের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত ও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের চাপ দিয়ে সিদ্ধান্ত আদায় করার ব্যবস্থা করে গণতন্ত্রের হৃদয়ে আঘাত করা হয়েছে"। ১৯০৭ সালের Tillman Act আইন দ্বারা এতদিন পর্যন্ত কর্পোরেশনগুলি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন দল বা প্রার্থীকে অর্থ দিতে পারত না। তবে কর্পোরেশনগুলি পরোক্ষভাবে বিপুল অর্থ নির্বাচনে খরচ করে এসেছে। এখন প্রকাশ্যভাবেই তারা তা করতে পারবে। এই দিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত দেয় নির্বাচনে কর্পোরেশনগুলোর অর্থ ব্যয়ের সীমা থাকবে না। এর ফলে কর্পোরেশনগুলির পক্ষে নির্বাচন কিনে নেওয়ার কোন বাধা থাকল না। অল্প সংখ্যক ধনবান ব্যক্তি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া আরও সহজ হল।[৫৭] নির্বাচনের ব্যয় হয়েছে উঠেছে আকাশচুম্বী। এমনিতেই দল ও প্রার্থীদের কর্পোরেশনগুলির কাছে বাঁধা পড়তে হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ওবামা যে শীর্ষ ব্যবসায়ীদের তার প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়েছেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। ধনিকগোষ্ঠী সন্তষ্ট, জনসাধারণের মতামতের কোন দাম নাই।

শতকরা ৮০ ভাগ আমেরিকার মানুষ মনে করে দেশ ভুল পথে চলছে এবং সরকার চালায় অল্প সংখ্যক স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর মানুষ, তারা জনসাধারণের স্বার্থ চিন্তা করে না। শতকরা ৯৪ ভাগ মনে করে সরকার জনমতকে আমলে নেয় না। ৭০ শতাংশের বেশী মানুষ মনে করে পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা সমাজ ও রাষ্ট্র করায়ত্ত করেছে। ৮০ শতাংশের বেশী মানুষ মনে করে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত বেকারদের ভাতা দেওয়া, বয়স্কদের দেখাশোনার ব্যবস্থা করা,এবং জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ২০০৮ সালের নির্বাচনে দুই দলের প্রার্থীই সবচেয়ে বেশী অর্থ সাহায্য পেয়েছে financial institution এর কাছ থেকে। প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রশাসনের নীতি নির্ধারকদের অর্ধেকেরও বেশী এই সব প্রতিষ্ঠানে অতীতে সম্পৃক্ত ছিলেন। যে অল্প কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ২০০০ সালের অর্থনৈতিক সংকট আসন্ন বলেছিলেন তার একজন ডীন বেকার। তাঁর মতে ওবামার ট্রেজারী সেক্রেটারী ল্যারী সামার্স হলেন বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টির অন্যতম হোতা।[৫৮]

২০০১ সালের পর আমেরিকায় গণতান্ত্রিক অধিকার আরও খর্ব করা হয়। Patriot Act আইন আমেরিকার কংগ্রেসে অনুমোদন করে সরকারকে অনেক বর্ধিত ক্ষমতা দেয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যে কোন মানুষকে সন্দেহ করলে তার টেলিফোন কথাবার্তা, ইন্টারনেট ব্যবহার, কেনাকাটার বিবরণ, সবই শুনতে বা দেখতে পারে। ওয়ারেন্ট ছাড়াই তাকে বা তার সম্পত্তি তল্লাশী করতে পারে। বাস্তবে যে কোন মানুষকে অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখার ক্ষমতা দেয়। আমেরিকার সংবিধানের স্বীকৃত অধিকার হরণ করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[৫৯] আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। আমেরিকার ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট তার বাৎসরিক রিপোর্টে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অন্যান্য দেশের সমালোচনায় মুখর থাকে, কিন্তু ২০০১ সালের পর ৩ বৎসরে আমেরিকা যা করেছে তার মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। (১) আট হাজার মুসলমান যুবককে শুধু ধর্মের কারণে খুঁজে খুঁজে ধরা হয়েছে। (২) আমেরিকার নাগরিক নন এমন লোকদের গোপন সামরিক আদালতে বিচার করা হয়েছে। (৩) Concentration Camp স্থাপন করে সন্দেহভাজন লোকদের বিভিন্ন দেশ থেকে ধরে নিয়ে এসে বছরের পর বছর বিনা বিচারে অমানবিক অবস্থার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। (৪) আবু গারাইব ও অন্যান্য স্থানে বন্দীদের উপর নির্যাতন করে তথ্য আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৬০] (৫) অন্যান্য দেশ থেকে অনুমতি ছাড়াই মানুষ ধরে নিয়ে গেছে।[৬১] ১৯৪৫ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ৫০টি দেশের সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করেছে। যার মধ্যে অধিকাংশই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত। প্রায় ৩০ দেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করা বা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। প্রায় ৩০টি দেশে যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক নেতা বা রাষ্ট্রনায়কদের হত্যা করার চেষ্টা করেছে, অসামরিক জনসাধারণের উপর বোমা ফেলেছে, রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে।[৬২] সাম্প্রতিককালে ইউরোপ ও আমেরিকায় কোটি কোটি ফোন আলাপে আড়ি পেতেছে আমেরিকার National Security Agency যা এডওয়ার্ড স্নোডেন এর ফাঁস করা উইকিলিকসে জানা যায়। ৩৫ জন অন্যান্য রাষ্ট্রের নেতার ফোনেও আড়িপাতা হয়েছে।[৬৩] এর মধ্যে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ও জার্মানীর চ্যান্সেলরও ছিলেন।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ "উদার গণতন্ত্র" থেকে ক্রমেই সরে আসছে এবং তাদের নিজেদের দেশেই মানবাধিকার সীমিত করে ফেলেছে। পরবর্তীতে আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এক পেশে নীতি অনুসরণ করেছে। পশ্চিমা গণতন্ত্র ক্রমেই পৃথিবীর মানুষের কাছে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি

প্রায় ২৫ বছর আগে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করে বৈজ্ঞানিকেরা ঐক্যমতে পৌঁছান। বর্তমান শিল্প-কারখানা ভিত্তিক সভ্যতা জ্বালানীর জন্য নির্ভর করছে মূলত: জীবাশ্ম থেকে উদ্ভূত তেল ও গ্যাসের উপর, তা বিপদজনকভাবে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলেছে। ২০১৩ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) সুইডেনের স্টকহোম শহরে তার রিপোর্ট পেশ করে। সারা পৃথিবী থেকে ৮৩১ জন বৈজ্ঞানিক ২০০৭ সাল থেকে প্রকাশিত গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করে এই রিপোর্ট তৈরী করেন। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বলেন, IPCC জলবায়ু পরিবর্তনের উপর বিশ্ব পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল। ইতিপূর্বে এই কাজের জন্য সংস্থাটি নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। তাদের মত হল জলবায়ু পরিবর্তন নিশ্চিতভাবেই ঘটছে এবং মানুষের কর্মকান্ডই এজন্য দায়ী। গত ৮ লক্ষ বছরের মধ্যে এই সময়েই বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে। বিগত তিন দশকে প্রতি দশকের আগের দশকের চাইতে বিশ্বের তাপমাত্রা বেশী ছিল। তাপমাত্রা ২১০০ সালে শিল্প বিপ্লবের আগের বছরগুলোর চাইতে ২ ডিগ্রীর বেশী বাড়তে পারে। দুই ডিগ্রীর চাইতে বেশী বাড়া বিপদজনক মনে করা হয়। সমুদ্র জলরাশির উচ্চতা ২১০০ সাল নাগাদ ২৬ থেকে ৮২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। তাঁরা বলেন জলবায়ু পরিবর্তনই আমাদের জন্য সবচাইতে বড় সমস্যা।[৬৪] বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ লর্ড ষ্টার্ন বলেন জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাবকে খাটো করে দেখা বাতুলতা হবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিরাট ঝুঁকির কারণ। বৈজ্ঞানিকদের মতামতের চাইতে সমস্যার প্রকটতা আরও বেশী হওয়ার সম্ভাবনা।[৬৫]

বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন আগামী দশক ও শতকগুলিতে হিমবাহ, পর্বতচূড়া ও মেরুদ্বয়ের জমাট বরফ গলতে থাকবে, সমুদ্রগুলোতে অম্লতা বাড়বে, বনভূমি কমতে থাকেবে, পতঙ্গ বাহিত রোগ বাড়তে থাকবে। খরা, সাইক্লোন ও বন্যা আরও অধিক সংখ্যায় ও তীব্রতায় হতে থাকবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আরও দুর্ভিক্ষ হতে থাকবে। পৃথিবীর বড় বড় এলাকা মানুষের চাষের অযোগ্য হয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিকেরা আরও বলেছেন, এজন্য পদক্ষেপ নিতে দেরী করা অনুচিত। মানুষের কর্মকান্ডের ফলে বায়ুমন্ডলে যে কার্বন ডাই অক্সাইড জমছে তা শতবছরের বেশী থাকবে। বর্তমান প্রজন্ম পৃথিবীর যে ক্ষতি করে যাচ্ছে তা অপরিবর্তনীয় এবং চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। ইতিহাসে মানব সৃষ্ট এই জলবায়ু পরিবর্তনের মত এতবড় বিপর্যয় আর কখনো ঘটে নি।[৬৬]

এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের সাবধানবাণী আমলে নেওয়া হয় নি। ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োতো শহরে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পৃথিবীর উত্তাপ বাড়ানর জন্য যে সব গ্যাস দায়ী (Greenhouse gases) সেগুলো কমানর জন্য অপর্যাপ্ত কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চুক্তি হয়েছিল। এর পরও প্রতি বৎসরই এই গ্যাস নির্গমন বেড়েছে। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন শহরে আবার সম্মেলন হয়। এবার উল্লেখযোগ্য কোন চুক্তি হয় নি। যখন গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন ক্রমেই বাড়ছে এবং পৃথিবীর উত্তাপও বাড়ছে, তখন আমেরিকায় একটা অদ্ভুত ঘটনা শুরু হল। বিগত দুই দশকে পশ্চিমা সভ্যতায় বিজ্ঞানকেই সংস্কৃতির নিয়ামক বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এবার অভিযান শুরু হল পৃথিবীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মত ভুল তা প্রচার করার জন্য। আমেরিকার জ্বালানী তেল-গ্যাস কোম্পানীগুলো বিপুল অর্থব্যয় করতে লাগল বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে, যে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে না, বৈজ্ঞানিকেরা ভুল। এই মত আমেরিকার সাধারণ মানুষের কাছে জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব কমিয়ে আনা শুরু করল। ক্রমেই তা অন্যান্য দেশের মানুষকেও প্রভাবিত করছে।

পূরোভূমিঃ মুক্ত কর হে বন্ধ

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিশাল উৎপাদন ক্ষমতা। এই উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তি হল আরও অধিক পুঁজি বিনিয়োগ ও বর্ধিত লাভ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যবস্থায় আধিপত্য নিয়ে আছে, বিশ্বের বড় পণ্য বাজার ও পুঁজি খাটানর স্থান হিসাবে। আমেরিকান বহুজাতিক কোম্পানীগুলি চষে বেড়াচ্ছে পুঁজি খাটিয়ে লাভ করার সুযোগের খোঁজে। লাভের জন্য তাদের এই সবল উদ্যম পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিস্তৃত করছে আবার একই সঙ্গে মন্দা ও ধ্বসের সম্ভাবনা বাড়াচ্ছে। এই সংকটের একটি কারণ হচ্ছে অল্পসংখ্যক মানুষ বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা ও বিশাল অর্থের নিয়ন্ত্রক আর অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যাদের সমাজ ও অর্থনীতির চালিকাশক্তির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত ও ক্রমশ: নিম্নগামী -তাই এই বিশাল উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণ ব্যবহার করা যাচ্ছে না, বিনিয়োগও বাড়ান যাচ্ছে না, লাভের হারও নিম্নগামী। সাম্পতিক কালে লাভের হার বাড়ানর জন্য "মৌলবাদী" মুক্ত অর্থবাজার নীতি বিশ্ব অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার উপর চাপিয়ে দেওয়ায় উন্নয়নশীল দেশের জনগণের আয় আরও কমে আসছে। পুঁজির নিয়ন্ত্রকদের সম্পদের পরিমাণ আরও বাড়ছে। ফলে প্রকৃত পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় অর্থ বাজার বিভিন্ন উপায়ে ফাটকাবাজী পুঁজি খাটান ও লাভের উৎসে পরিণত হয়েছে।[৬৭] সাম্প্রতিককালে প্যারিস স্কুল অফ ইকনোমিক্স এর অধ্যাপক থমাস পিকেটি দেখিয়েছেন ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য মুক্তবাজার অর্থনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পুঁজি বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে গেছে।[৬৮] উন্নত পুঁজিবাদী দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (United Nations Development Programme) দেখিয়েছে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য দ্বিগুণ বেড়েছে।[৬৯]

সংকটের আর একটা কারণ হল প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ধিত ব্যবহার এবং ক্রমবর্ধমান বর্জ্য পদার্থ জমা হয়ে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন। অতীতে মানুষের বসবাসের পরিবেশগত ভারসাম্য বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের সম্মুখীন আর কখনও হয়নি। মানব

সভ্যতার বর্তমান অবস্থান বিশাল ঝুঁকির সম্মুখীন। অর্থবাজারের সংকট ও অর্থনীতির ধ্বস রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু জলবায়ু বিপর্যয় অপরিবর্তনীয় অবস্থানে পৌঁছেছে।[৭০] বিশ্বের ধনী দেশগুলোর প্রচেষ্টায়ও এটা ফেরান সম্ভব নয় বলে অনেকেই মনে করেন।

১৯৪৫ সালের পর পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম মানবজাতি নিজেদের ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করে। দীর্ঘমেয়াদীভাবে তা জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটছে। আরও দ্রুত ধ্বংসের পথ হচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ পাল্টা আঘাত না হানলেও এক পক্ষের পারমাণবিক আঘাতে পরিবেশের যে বিপর্যয় ঘটবে তা মানব সভ্যতার অবসান ঘটাবে।[৭১] ১৯৬২ সালে কিউবার সংকটের সময়, ১৯৭৩ সালে আরব- ইসরাইল যুদ্ধের সময় এবং ১৯৮৩ সালে প্রেসিডেন্ট রেগানের প্রশাসনের সময়, এই তিনবার পৃথিবী পারমাণবিক যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল এটা জানা গেছে। পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি কমানর বাস্তব উদ্যোগ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর বাধার জন্য এ পর্যন্ত নেওয়া যায় নি।

পুরোভাগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠন ও ক্রিয়ার বিবর্তন কোন পথে তা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা বিশাল জনগোষ্ঠীর কমই থাকবে, ফলে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হবে না। অর্থ সংকট চলতে থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতের পরাশক্তি থাকবে তবে অর্থনৈতিক শক্তি কমতে থাকবে। অনেকের ধারণা কোন বিপর্যয় না ঘটলে চীনের অর্থনীতি আগামী দুই তিন দশকের মধ্যে আমেরিকার চাইতে আকারে বড় হবে।[৭২] অর্থনীতিতে উৎপাদনের ভূমিকার চাইতে অর্থবাজারের ফাটকাবাজীরও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। ফলে বার বার শেয়ার বাজার ও অর্থনীতিতে ধ্বস দেখা যাবে।

পৃথিবীতে ধণিকগোষ্ঠীর হাতে অর্থের পরিমাণ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (International Labour Organization-ILO) এর ২০১৩ সালের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায়, পৃথিবীর ধনী দেশগুলির কোম্পানী গুলোর তহবিলে মুদ্রা ২০০০ সালে ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে ২০০৮ সালে ৫.২ ট্রিলিয়ন ডলার ও ২০১১ সালে ৬.৫ ট্রিলিয়ন ডলার হয়েছিল। কিন্তু বিনিয়োগের সুযোগ কমে যাওয়ায় মোট জাতীয় আয়ের অনুপাতে এই দেশগুলিতে বিনিয়োগ ২০০৭ সালে ২১.৬ শতাংশ থেকে কমে ২০১২ সালে ১৮.৫ শতাংশ হয়েছে।[৭৩]

এই বিশাল সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর জনসংখ্যার বিরাট অংশ দারিদ্র, ক্ষুধা ও নিরক্ষরতার মধ্যে রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (Food and Agricultural Organization) হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর ৮৭ কোটি মানুষ যথেষ্ট খাবার পায় না। ২০১০-১২ সালের মধ্যে আফ্রিকায় ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ১৭.৩ কোটি থেকে বেড়ে ২৩.৯ কোটি হয়েছে। বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি ৯ লক্ষ শিশু মারা যায়, এর অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ লক্ষেরও বেশী শিশুর মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি। অথচ পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন প্রতিটি মানুষকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার দেওয়ার জন্য (মাথা পিছু গড়ে ২৭২০ কিলো ক্যালরী) যথেষ্ট। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। ২০১০ সালে পৃথিবীর প্রায় ৭৭ কোটি মানুষ নিরক্ষর ছিল, যার দুই-তৃতীয়াংশই নারী। প্রায় ১২ কোটি যুবমানুষ সাধারণ পড়া বা লেখা আয়ত্ত করতে পারে নি।[৭৪] প্রায় ২০ কোটি মানুষ কর্মসংস্থানহীন। UNICEF এর মতে বিশাল মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু কমাতে এবং সার্বজনীন সাধারণ সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমেরিকার বাৎসরিক প্রতিরক্ষা খাতের ১০ শতাংশই যথেষ্ট।[৭৫]

একদিকে অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা ও অঢেল ক্রমবর্ধমান পুঁজি অন্য দিকে বিশ্বের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা ক্রমেই কমতে থাকা এই দুই মিলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কম থাকবে এবং মাঝে মাঝে মন্দা হবে এটা অনেকের মত। অর্থবাজারের ফাটকাবাজী চলতে থাকায় হঠাৎ ব্যাপক ধ্বসও নামতে পারে- যদিও অর্থনীতিকে রক্ষার নামে বড় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে জনগণের অর্থ দিয়ে অতীতের মত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা হবে, এটাও

অবধারিত। ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে "যে ভাবে সামরিক বাহিনীতে সৈনিকদের শারীরিক প্রশিক্ষণের দ্বারা শৃঙ্খলা আনা হয় তেমনি জনমত নিয়ন্ত্রণ" করা না হলে এই অবস্থা চলতে পারত না।[৭৬] এই সংকট পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে নিহিত। কাজেই কোন সংস্কারের মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। তবে সংকট লাঘবের চেষ্টার চাইতে পুঁজি বিনিয়োগে লাভের অংশ বাড়ানর জন্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাধারণ জনগোষ্ঠীর সম্পদ নানাভাবে ধনিক শ্রেণীর হাতে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। ফলে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে।

প্রচারণার একটা বড় দিক হচ্ছে এই অবস্থার বিকল্প নাই এই মত জনমনে গ্রথিত করা। মানব সমাজ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে এবং বর্তমানে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সর্বোত্তম, এটা সারা বিশ্বের গণমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। এই ধরনের প্রচারণা ১৯২০ ও ১৯৫০ এর দশকেও করা হয়েছিল, যা পরবর্তী ঘটনা পরম্পরায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে।[৭৭] উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ মানবজাতির লক্ষ বছরের ইতিহাসে মাত্র কয়েক শতকের। এর আগের সমাজব্যবস্থা গুলিকেও সেই সময় অপরিবর্তণীয় মনে করা হয়েছিল। দাস প্রথার অবসান থেকে শুরু করে উপনিবেশবাদের শেষ, ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে পরিবর্তন এসেছে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে। বর্তমান যুগে, প্রযুক্তির আরও উন্নততর পর্যায়ে, যখন সমগ্র মানবজাতির ন্যুনতম চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা উৎপাদন ব্যবস্থার আয়ত্তের মধ্যে, তখন পরিবর্তন শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, মানবজাতির নৈতিক দায়িত্ব।

পরিবর্তন সব সময় মঙ্গল বয়ে আনবে এটা ধরে নেওয়া যায় না। সংকটের মুখে গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার জন্য ধনিকশ্রেণী ক্রমেই নিপীড়নের পথ নিচ্ছে, মানবাধিকার হরণ করে চলেছে। বিশ্বের সব দেশের ইলেকট্রনিক মাধ্যম মোবাইল ফোন, ই-মেইল নজরদারীতে আছে, বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা বাড়ান হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মার্কিন সেনাবাহিনী ১৬ বার দেশের বাইরে অভিযান চালিয়েছে। ১৯৯০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত চালিয়েছে ৪৫ বার। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণের সমন্বিত প্রতিরোধ ছাড়া বার বার অর্থনৈতিক ধ্বস অবশ্যম্ভাবী। ফলে আরও কঠিন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা শাসকগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মান চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী রোজা লুক্সেমবার্গ বলেছিলেন ধনতন্ত্র থেকে উত্তরণের বিকল্প সামাজিক প্রগতিও হতে পারে আবার তা হতে পারে বর্বরতায় ফিরে যাওয়া।[৭৮]

১৯৮২ সালে ৮ ই ডিসেম্বর ল্যাতিন আমেরিকার নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর নোবেল পুরস্কার ভাষণে বলেছিলেন "বন্যা ও মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধ, কোন কিছুই জীবনের জয় বন্ধ করতে পারে নি.....পৃথিবীর সবচাইতে সমৃদ্ধশালী দেশগুলি এমন ধ্বংসাত্বক ক্ষমতা অর্জন করেছে যা মানব জাতিকে একশ বার ধ্বংস করতে পারে। শুধু তাই নয় সমস্ত জীব জগত ধ্বংস করতে সক্ষম।.....আজ থেকে ৩২ বছর আগে এমনই দিনে আমার গুরু উইলিয়াম ফখনার বলেছিলেন- আমি মানব জাতির ধ্বংস মেনে নেব না। এই ধ্বংসের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা যারা কাহিনী রচনা করি এটা বিশ্বাস করতে চাই বিপরীত বাস্তবতাও রচনা করা সম্ভব। এই বিপরীত বাস্তবতা হবে উচ্ছল জীবনের জয়গান"।[৭৯,৮০]

তথ্যসূত্রঃ

১. Varoufakis Y. The Global Minotaur. London, 2011 p 27
২. Quoted in Chomsky N. World Orders Old and New. New York,1996, p 113
৩. Chomsky N. World Orders Old and New. New York,1996, p 115
৪. Sweezy PM. Modern Capitalism and Other Essays. New York,1972, p 6
৫. Harman C. Economics of the Madhouse. London, 1995, p 28
৬. Sweezy PM. p 27
৭. Quoted in Harman C. Economics of the Madhouse. p 20
৮. Harman C. p 22
৯. Harman C. p 33
১০. Harman C. p 34
১১. Harman C. p 36
১২. Sweezy PM. p 132
১৩. Harman C. p 46,47
১৪. Harman C. p 47
১৫. https://wikipedia.org/wiki/Okishio_theorem, accessed 20 August,2014
১৬. Harman C.p 53
১৭. Harman C.p 62
১৮. Shutt H.The Trouble with Capitalism, An Enquiry into the Causes of Global Economic Failure. Dhaka,1999 p.9
১৯. Shutt H. p.13
২০. Magdoff H and Sweezy PM, Stagnation and Financial Explosion. New York,1987 p 41-44
২১. Varoufakis Y. p 55
২২. Chomsky N. Profit Over People. New York,1999 p 21
২৩. Varoufakis Y. p 67
২৪. Harman C. p 73
২৫. Harman C. Explaining the Crisis. London,1987 p 99
২৬. Brenner R. The Boom and the Bubble. London, 2002 p 17
২৭. Brenner R. p 18
২৮. Shutt H, p 14,15
২৯. Shutt H, The Decline of Capitalism. London, 2005 p 17
৩০. https://www.en.m.wikipedia.org/Pension Funds, Accessed 29 June,2014
৩১. Bello W. Dilemmas of Domination. New York, 2005, p 79
৩২. Blocker R. Why the Dollar Needs to Fall Further, Challenge. September-October,2003, p 29
৩৩. Keller M.Consolidation Means More Excess Capacity. Looksmart, April, 2000
৩৪. Bello W. p 83
৩৫. Mishell, Bernstein J. The State of Working America.1992-93. Washington,1993 p.3,4
৩৬. Pollin R. Contours of Descent. New York, 2003 p 61
৩৭. World Bank. Global Economic Prospects and the Developing Countries. Washington,1993,p.66
৩৮. Bello W. p 84
৩৯. Prestowitz C.Rogue Nation. New York, 2003 p 58
৪০. Brenner R.Toward the Precipice. London Review Books. 6 February,2003 p 20
৪১. Stigliz JE. The Economic Consequences of Mr.Bush. Vanity Fair, December, 2007
৪২. Varoufakis Y. p 128
৪৩. Varoufakis Y. p 128
৪৪. Volcker P.An Economy on Thin Ice. Washington Post,10 April, 2005

৪৫. Chomsky N. Profit Over People. p 23,24
৪৬. Quoted in Varoufakis Y. p 145
৪৭. Varoufakis Y. p 146-168
৪৮. Varoufakis Y. p 159,160
৪৯. Varoufakis Y. p 165
৫০. Chomsky N. Profit Over People. p 43,44
৫১. Chomsky N. How the World Works. Soft Skull Press 2011, p 208
৫২. Chomsky N. Profit Over People. p 52
৫৩. Chomsky N. Profit Over People. p 58
৫৪. Chomsky N. World Orders Old and New. New York,1996, p 89
৫৫. Chomsky N. World Orders Old and New. p 92
৫৬. Chomsky N. Imperial Ambitions. New York, 2005, p 135
৫৭. Chomsky N. The Corporate Take over of US Democracy. https://www.chomsky.info/articles/20100124.htm.Accessed 12 July,2014
৫৮. Chomsky N. The Election, Economy, War and Peace. https://www.chomsky.info/articles/20081125.htm.Accessed 12 July,2014
৫৯. Scarry E. Resolving to Resist, Boston Review, vol-29,no.1 (Feb-Mar,2004) p 12
৬০. Bello W. Dilemmas of Domination. New York, 2005, p 206,207
৬১. https://harpers.org/blog/2013/10/weekly review/2013-0-8.Accessed 8 october, 2013
৬২. Pilger J. In Ukraine the US is dragging us towards war.www.theguardian.com, Accessed 14 May,2014
৬৩. The New Age,29 october,2013
৬৪. www.theguardian.com. Accessed 27 september,2013
৬৫. www.theguardian.com/environment/2013/sept/24/Lord-stern-climate-change-risk,Accessed 24 september, 2013
৬৬. www.theguardian.com.Robert Manne. History will Condemn Climate Change Denialist.Accessed 16 July, 2014
৬৭. Bello W.Dilemmas of Domination. p 4
৬৮. www.theguardian.com.commentsisfree/2014/apr/12/capitalism-isnt-working-thomas-picketty.Accessed 14 April, 2014
৬৯. Chomsky,N. World Orders, Old and New. p 129
৭০. www.theguardian.com.Robert Manne.
৭১. Chomsky N. Humanity Imperiled: The Path to Disaster, Tomdispatch.com,4 June,2013
৭২. Bello W. Dilemas Domination. p 211
৭৩. The New Age. 4 June, 2013
৭৪. The New Age, 16 June, 2013
৭৫. Chomsky N. Profit over People. p 91
৭৬. Chomsky N. Profit over People. p 93
৭৭. Chomsky N. Profit over People. p 15
৭৮. Harman C. Economics of the Madhouse. p 105
৭৯. আনিসুল হক। হে কবিতা দুধভাত, তুমি ফিরে এসো। প্রথম আলো ১৪ মে, ২০১৩
৮০. Gabriel Garcia Marquez- Nobel Lecture. The Solitude of Latin America. www.nobelprize.org/nobel-prizes/literature/laureates/1982/marquez-lecture.html.accessed 26 June,2014

গ্রন্থপঞ্জিঃ

1. Alternatives to Economic Globalization. A Report of the International Forum on Globalization. San Francisco, 2002.
2. Amin S. Rereading the Postwar Period. New York, 1994.
3. Amin S. Empire of Chaos. New York, 1992.
4. Amin S. Capitalism in the Age of Globalization. London, 1997.
5. Amin S. The Implosion of Contemporary Capitalism. New York, 2013.
6. Amin S. Obsolescent Capitalism. London, 2003.
7. Amin S, Arrighi G, Frank AG, and Wallerstein I. Dynamics of Global Crisis. New York, 1982.
8. Baran PA. The Political Economy of Growth. New York, 1957.
9. Baran PA and Sweezy PM. Monopoly Capital. New York, 1966.
10. Bello W. Dilemmas of Domination. New York, 2005.
11. Bello W, Bullard N, Malhotra K. Global Finance. Dhaka, 2000.
12. Brenner R. The Boom and the Bubble. London, 2002.
13. Brenner R. The Economics of Global Turbulence. London, 2006.
14. Cameron R. A Concise Economic History of the World. New York, 1997.
15. Chandra B. Essays on Colonialism. Hyderabad, 1999.
16. Chomsky N. Year 501. The Conquest Continues. Boston, 1993.
17. Chomsky N. Profit over People, New York, 1999.
18. Chomsky N. How the World Works. Soft Skull Press, 2011.
19. Chomsky N. Imperial Ambitions. New York, 2005.
20. Chomsky N. World Orders Old and New. New York, 1994.
21. Chomsky N. American Power and the New Mandarins. New York, 1967.
22. Chomsky N. Interventions. San Francisco, 2007.
23. Chomsky N. Hopes and Prospects. London, 2010.
24. Chussodovsky M. The Globalization of Poverty and the New World Order. Pincourt, 2003.
25. Davis R. The Rise of Atlantic Economies. New York, 1973.
26. Frank AG. The Crisis in the World Economy. New York, 1980.
27. Harman C. A People's History of the World. London, 1999.
28. Harman C. Economics of the Madhouse. London, 1995.
29. Harman C. Explaining the Crisis. London, 1987.
30. Harris N. Of Bread and Guns. Harmondsworth, 1983.
31. Heilbroner R. Twenty-First Century Capitalism. Toronto, 1992.
32. Hobsbawm E. On Empire. New York, 2008
33. Hobsbawm E. The Age of Revolution. New York, 1996.
34. Hobsbawm E. The Age of Extremes. New York, 1996.
35. Hobsbawm E. The Age of Empire. New York, 1987.
36. Hobsbawm E. The Age of Capital. New York, 1996.
37. Kolko G. Main Currents in Modern American History. New York, 1976.
38. Maddison A. Class Struggles and Economic Growth. New York, 1971.
39. Magdoff H. The Age of Imperialism, New York, 1969.
40. Magdoff H. Imperialism from the Colonial Age to the Present. New York, 1978.
41. Magdoff H and Sweezy PM. The Deepening Crisis of Us Capitalism. New York, 1981.
42. Magdoff H and Sweezy PM. Stagnation and the Financial Explosion. New York, 1987.
43. Polin R. Contours of Descent. London, 2008.
44. Roberts JM. The Pelican History of the World. Harmondsworth, 1976.
45. Shutt H. The Decline of Capitalism. London, 2005.
46. Shutt H. The Trouble with Capitalism. Dhaka, 1999.
47. Smith AK. Creating a World Economy. Boulder, 1991.
48. Sweezy PM. Modern Capitalism and Other Essays. New York, 1972.
49. Sweezy PM and Magdoff H. The Dynamics of US Capitalism. New York, 1972.
50. Varoufakis Y. The Global Minotaur. London, 2011